আমার ধর্ম হিন্দুধর্ম

ডা. সুশীলকুমার বসু

আমার ধর্ম হিন্দুধর্ম

ডা. সুশীলকুমার বর

পারুল প্রকাশনী

আখাউড়া রোড, আগরতলা - ৭৯৯০০১, ফোন : ২৩৮৬৯৪৭

Amar Dharma Hindudharma - Dr. Sushil Kumar Bar

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৭

প্রচ্ছদ শিবেন্দু সরকার

মূল্য ২৫০ টাকা

উৎসর্গ

আমার পিতাঠাকুর
যিনি গার্হস্থ্য ধর্মের মূর্ত প্রতীক ছিলেন,
ঘনশ্যাম বর-এর
স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।

প্রাক্-কথন

কোন্ অনাদিকালে ব্রহ্মাবর্ত দেশবাসীগণ সুদূর মহাকাশের দিকে তাকিয়ে, ইন্দ্র, সূর্য বায়ু বা মরুৎ প্রভৃতির শক্তি তথা ঈশ্বর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা আজও উদ্ভাবিত হয়নি। পাণ্ডিত্যের মধ্যে এবং বিজ্ঞানীদের যুক্তিজালে নিবন্ধিত প্রায় ২০,০০০ হাজার বছর আগে হতেই। আধুনিক সময়ে আর্য-পরবর্তী যুগে বেদের ধারা অবলম্বনে আমরা অনেক দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছি। তবে সৃষ্টির দায়, ধারণ, ধ্বংসরূপ বিশ্লেষণে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব নামরূপ দেবতাগণকে সর্বমূলে জগতের সর্বেসর্বা বলা হয়। আমরা প্রকৃতিদেবী বা মাতা হিসাবে যে সাধনা করি, পূজা করি, বিভিন্ন দেবীগণের তাহাকে যোগ সাধনার নিয়মে শিবের মধ্যে পাই। অর্থাৎ সেখানে শিবকে পুরুষ ও প্রকৃতি বলা হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "বিশ্বের সকল জাতির সকল ধর্মের সূতিকাগার হল ঋগ্বেদ। সমস্ত দেশকাল পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন অর্থাৎ বেদের প্রভাব। এই বেদ হল সর্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা সমগ্র জগতের পূজা, এবং আর্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণভূমি হল বেদ।"

বেদ কোনো মানুষ আয়াস করে বা চিন্তাভাবনা করে সৃষ্টি করেননি। মুক্তচিত্ত, মুনি-ঋষিদের ধ্যানে প্রতিভাত বিষয়সমূহ (ঋক্সমূহ) কতকগুলি ঋক্ বা মন্ত্র দিয়ে হয় সূক্ত। বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়েছে। এতে মূলত দুটি সূক্ত প্রধান রূপে চিহ্নিত দেখা যায়। এর বর্ণনা দেওয়া আছে। হিন্দু আর্যগণ ঋক্গুলির সমষ্টিকে ঋগ্বেদ সংহিতা নামে সংকলন করেছেন। এখন সবাই বেদ সংহিতা বলেন। ঋষিগণ এর দ্বারা যাগযজ্ঞ নির্বাহ করতেন। বংশানুক্রমে কণ্ঠস্থ করে রাখতেন ; এবং ঐভাবেই চলত। অনেক পরে এই বেদ সংহিতাগ্রন্থ রূপে এসেছে। এই বেদ সংহিতা ঘিরে হিন্দু জাতির সকল ধর্ম কর্ম। চার বেদ, ২০ সংহিতা, ষড়দর্শনে সকলেরই চিন্তা বহু এবং লক্ষ্য এক দেখা যায়। লক্ষ্য "সেই তুমি!" "জগৎ ব্রহ্ম এই সত্যে উপনীত হওয়াই সকল শাস্ত্রের লক্ষ্য।"

বিশ্বজগৎ এক "পরমব্রহ্ম" হিন্দুধর্মের মূল স্বরূপ।

নানান মত, নানান পথে—তার বিচরণ। মূলে এক। দেখুন না ঋগ্বেদ বলছে—প্রজ্ঞানম্ আনন্দ ব্রহ্মঃ। সামবেদ বলছে, তত্ত্বমসি। যজুর্বেদ বলে, অহম্ ব্রহ্মঃ। আর অথর্ব বেদ বলছে, অহম্ ব্রহ্মোস্মিঃ। "ব্রহ্মাই জগৎ কারণ" ইহাই প্রতিপাদ্য করেছেন, আচার্য শংকর। তিনি জগৎগুরু উপাধিপ্রাপ্ত হন এই জন্যই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "মৃন্ময়কে চিন্ময় করিয়া তোলাই হিন্দুধর্ম, ইহা অত্যন্ত কঠিন।" তিনি আরও বলেছেন, "আমরা বিভিন্ন দেবদেবীকে পূজা করিতে পারি। কিন্তু কোনো কিছু চাহিতে পারি না ; তাহলে সেই পূজা মূল্যহীন হইয়া পড়ে।"

হিন্দুধর্মের মূল লক্ষ্য 'মোক্ষলাভ'। মোক্ষ কী? মোক্ষ হল আত্যন্তিক সুখলাভ, যেখানে দুঃখের কণামাত্র থাকতে নেই।

পরিশেষে বলি, হিন্দু কারা? আসিন্ধু ভারত যস্য পিতৃভূপুণ্যভূমিশ্চ সাঃ বৈ 'হিন্দুস্মৃতঃ'
"বীর সাভারকার"।

ইন্দু = হিন্দালি = সিন্ধু ...... হিন্দুস্থান! এই ভারতবর্ষ।

—গ্রন্থকার

— গ্রন্থকারের নিবেদন —

বিশ্বহিন্দু সভায় আমরা কী অকিঞ্চন? তাই মনে হয়। তা কেন? সেই প্রশ্নের সূত্র হতে আমার এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা পেলাম। কিন্তু সহায় নেই। যাঁদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সাহায্য বিভিন্ন ভাবে পেয়েছি, বিনম্র চিত্তে তাঁদের স্মরণ করি সর্বাগ্রে। এ ব্যাপারে পারুল প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রী গৌরদাস সাহা, ড. অরুণকুমার দাস, ড. অনন্তকুমার বেরা (গীতারত্ন), শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিস্ত্রি এম.এস্‌সি., শ্রীসত্যরঞ্জন দাস, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বসিরহাট শাখা—এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী। এঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

ডা. সুশীলকুমার বর

চ-কার মোশাস্ত্রাণি করাল ভৈরব
উত্তর পশ্চিম, পাঞ্চরাত্র বৈখানস
তন্ত্র ভাগবত শিব তথা সহস্রাণিঃ

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আমার মাতৃসমা বৌদিকে সতীকরণের প্রতিকার আমি করব, এর মূলোচ্ছেদ করবই করব।

—রাজা রামমোহন রায়

তোমরা যত খুশি মূর্তিপূজা করিতে পার, কিন্তু দেবতার কাছে কিছু চাহিবে না, তাহা হইলে তোমার পূজা ব্যর্থ হইয়া গেল।

—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিন্ময় ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে, স্মরণ করিতে মনে, কোনো জোর পাই না। জীবে প্রেম প্রকৃত ঈশ্বর সেবা।
ইহাই বিবেকানন্দের নতুন বেদান্ত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

সূচি

আমার ধর্ম হিন্দুধর্ম

১। বিশ্বসৃষ্টি ও তার ক্রমবিকাশ

হিন্দু বেদ পুরাণ মতে বিশ্বসৃষ্টির আলোকপাত করতে চাই। ইতিহাস এই সৃষ্টির হদিস দিতে পারে না, মানুষও পারে না। তবে কি করে জানা যাবে? সেই অপৌরুষের সৃষ্টি হতেই জানা যাবে। অতএব—আসুন দেখা যাক।

তমোঘ্ন, নিশুতি—আঁধার বা মিশকালো এক অবস্থা। সপ্ত সূর্য দ্বারা দগ্ধ এক অবস্থা। বর্ষণপ্লাবিত শুধু জল আর জল এক অবস্থা। আবার বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হিমশীতল বরফের আচ্ছাদিত আর এক অবস্থার ছবি আমরা পাই।

নারায়ণ জলে অনন্তনাগ শয্যায় বা বটপত্রে শায়িত এবং নিদ্রায় আছেন; যোগমায়া তাঁর নিদ্রা ভাঙাচ্ছেন। আবার তিনি নিদ্রিত হয়ে পড়ছেন। এইরূপ মহিষাসুরমর্দিনীতে শ্রী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ আমরা সবাই শুনে থাকি।

এই অবস্থায় নারায়ণ দেবতার সত্ত্বগুণের উদ্রেকবশত নিজেকে তিনটি ভাগে ভাগ করে ত্রৈলোক্যে অবস্থান করলেন। ঐ তিনটি অংশের এক একটি দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, গ্রাস বা ধ্বংস হয়ে থাকে। চতুর্যুগ সহস্র বৎসর অবসানে এইরূপ জলমগ্ন হয় পৃথিবী। কল্প নামে— নতুন সৃষ্টি হয়। এই সময় নারায়ণ কালরূপী ব্রহ্মা চতুর্বিধ প্রজা গ্রাস করে, ব্রাহ্মী রাত্রিতে মহার্ণবে সুপ্ত থাকেন। সহস্র যুগ পরিমিত প্রলয়রূপী রাত্রিকাল অতিবাহিত হলে কল্পের প্রথম সৃষ্টির সূচনা হয়।

সব দিক অন্ধকার! স্থাবর জঙ্গম কোথাও কিছু নাই। ব্রহ্মা তখন বায়ুরূপে জলরাশির উপরি-উপরি জোনাকির মতো বিচরণ করতে করতে পৃথিবী পুনঃ সৃজন করার উপায় খুঁজতে থাকেন। পৃথিবী জলরাশির মধ্যে অন্তর্হিত অনুমান করে বরাহরূপ ধারণ করে, জলের মধ্য হতে নিমজ্জিত পৃথিবীকে টেনে তুলে নৌকার মতো স্থাপন করলেন। এরপর গিরিচয়ন করলেন। পৃথিবীতে ভূপ্রকৃতি স্থাপন, সমুদ্র ও পর্বত তিনটি বিভাগ সৃষ্টি করলেন। এ ছাড়া তপঃলোক গোলোক, জনলোক, মোহলোক এইরূপ লোকের কল্পনা করলেন, পরে প্রজা সৃষ্টির জন্য তৎপর হলেন।

তিনি যখন তন্ময় চিন্তাযুক্ত তা থেকে হল মোহ, মহামোহ, তমঃ, তামসী ও অন্ধকার —তমোময় ; পঞ্চবিদ্যার আবির্ভাব হল।

ব্রহ্মা—এইরূপ অবৈধ সৃষ্টি দেখে ভাবিত হলেন ; অবসন্ন হলেন। এই অবৈধ সৃষ্টিসমূহ তির্যক স্রোত নামে খ্যাত। কুম্ভ আবৃত প্রদীপের মতো, বাইরে তমঃ আবরণে ঢাকা! সংজ্ঞাহীন অথচ ভিতরে সংজ্ঞাবিশিষ্ট। এইগুলি হল অজ্ঞানবহুল, উৎপথগ্রাহী, অহঙ্কৃত, অহংমনা অষ্টবিংশ বিধাত্মক, একাদশ ইন্দ্রিয়, নবধা উদরসম্পন্ন এবং অষ্টবিধ তারকাদি শক্তিসম্পন্ন। এরা সকলেই প্রকাশশীল এরা বহিরাবৃত। এইরূপ প্রকাশশীল তির্যক স্রোতরূপে দ্বিতীয় বিশ্বদর্শন করে। প্রজাপতি আবার ধ্যানস্থ হলেন। কিন্তু তিনি ইহাও দেখেছিলেন সত্ত্বগুণীয় ঊর্ধ্বস্রোতগণ সুখবহুল, প্রীতিবহুল, তারা বহিরাবৃত-অন্তরাবৃত। এই

উর্ধ্বস্রোত হতে হয়েছে রাত্র্যাদি যার বহিঃপ্রকাশ অন্তঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। এই উর্ধ্বস্রোত তৃতীয় বিশ্ব নামে খ্যাত।

উর্ধ্বস্রোতরূপ দেবতাদের দেখে খুশি হয়েছিলেন। ব্রহ্মা এইবার তাঁর ইচ্ছা সাধকের মতো ব্যক্তিদের সৃষ্টি করার। তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। সাধকদের উদ্ভব হলেন। কিন্তু তাঁরা অবাক সবাই ; অর্থাৎ নীচের দিকে প্রবর্তিত হলেন। তাই অবাকস্রোত প্রকাশবহুল। এদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য—এরা দুঃখবহুল। এইসব সাধকগণ মনুষ্যদের বহিঃপ্রকাশ ও অন্তঃপ্রকাশ দুই-ই। এরা গন্ধর্ব ধর্মীয়। এই অবাক স্রোত হল চতুর্থ সৃষ্টি। পঞ্চম সৃষ্টি—অনুগ্রহ বা বিপর্যয় শক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি এরা হল অনুগ্রহ চতুষ্টয়, অতীত ও বর্তমান বিষয় জানতে পারে। পঞ্চম ভৌতিক প্রাণীদের সৃষ্টিই হল ষষ্ঠ সৃষ্টি। তির্যক যোনি সৃষ্টি হল সপ্তম সৃষ্টি।

সাত্ত্বিক ও তামস অনুগ্রহ সৃষ্টি অষ্টম সৃষ্টি—এখানে বলা হয়েছে ; পঞ্চবিধ সৃষ্টি বৈকৃত এবং ত্রিবিধ সৃষ্টি প্রাকৃত। উভয় লক্ষণযুক্ত সৃষ্টির নাম—কৌমার। কৌমার সৃষ্টি বৈকৃত ও প্রাকৃত উভয় লক্ষণযুক্ত ইহাই নবম সৃষ্টি।

ব্রহ্মার এইসব সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্বক। এই নয় প্রকার সৃষ্টি ও তাহাদের পরস্পর সৃষ্টি বহু প্রকারের আছে। প্রথমে ব্রহ্মা নিজের সমান বিদ্বান মানসপুত্রদের সৃষ্টি করলেন ; যেমন —সনন্দ, সনক, সনাতন। এঁরা প্রজা সৃষ্টি না করে প্রতিসর্গ লাভ করেছেন।

এবার জল—অগ্নি—পৃথিবী—বায়ু—আকাশ দিক, স্বর্গ, সমুদ্র, নদী, পর্বত বনস্পতি ওষধি, বৃক্ষলতা, কাষ্ঠ, কলা, মুহূর্ত, সন্ধি রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, যুগ, বৎসর প্রলয় কাল না হওয়া পর্যন্ত এসব স্থায়ী পদার্থকে ব্রহ্মা পর পর সৃষ্টি করেছেন।

মানুষ সৃষ্টিকালে—ব্রহ্মার মুখ হতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃ হতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হতে বৈশ্য, পদতল হতে শূদ্র জাতির উৎপত্তি ঘটেছে। সহস্রশীর্ষ সুমনা, সহস্রপাদ, সহস্র চক্ষু, সহস্রবদন সহস্রভুক, সহস্রবাহু, আদিত্য বর্ণ ভুবন রক্ষক এক অপূর্ব হিরণ্যগর্ভ—যিনি অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত মহাপুরুষ জ্ঞাত তিনিই প্রজাপতি ব্রহ্মা ; কল্পের আদিতে রজোগুণে প্রজা সৃষ্টি করেন। কল্পান্তে তমোগুণে আবার সবকিছু গ্রাস করে ফেলেন। নারায়ণ একার্ণবে সুপ্ত থাকাকালীন সত্ত্বগুণে নিজেকে তিনভাগে বিভক্ত করে ত্রৈলোক্যে অবস্থান করে থাকেন। তাঁর তিন অংশ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ঘটে থাকে ; এবং চতুর্বিধ প্রজা গ্রাস করেন। এবং ব্রাহ্মীরাত্রিতে মহার্ণবে সুপ্ত থাকেন।

ব্রহ্মাসৃষ্টি কল্পের প্রারম্ভে চৌদ্দটি সংস্থার কল্পনা করেছিলেন, তাই সৃষ্টিকালের নাম হয়েছে কল্প। বর্তমান ও অতীত কল্প দুটির মধ্যস্থিত প্রতিসন্ধি ও পূর্বাবস্থা বুঝতে হয়। এক্ষেত্রে দুটি অবস্থা থাকে প্রাথমিক ভাবে। পরে ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যায়। যেমন রাত্রি আসে। প্রলয়কালীন রাত্রিকাল অতিবাহিত হলেই রাত্রিশেষে প্রজাপতি ব্রহ্মা বর্তমান কল্পে প্রথম সৃষ্টির সময়ে সৃষ্টির প্রয়োজনে সৃষ্টির কারণে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন।

দশযোজন বিস্তৃত শতযোজন উন্নত ধর্ম নামক বরাহ ; যার রং নীল মেঘের মতো ছিল, ছিল—সত্য ধর্মময়। তার জানুস্থানীয় হোম হল লিঙ্গ মহৌষধি অন্তরাত্মা, মন্ত্র তার হৃদয়, ধৃতসমন্বিত সোম হল তার শোণিত। বেদ হল স্কন্ধদেশ, হবির্গন্ধ—হব্য কব্য। প্রবল বেগ

প্রাগ্বংশ যেন শরীর। বিবিধ ছন্দ হল গতিপথ। গুহ্য হল উপনিষদ ও আসন ; ছায়া তাঁর পত্নী। নানা দীক্ষায় দীক্ষিত তিনি দ্যুতিময় যোগী যজ্ঞময় ; মহাকৃতি তাঁর মণিশৃঙ্গ উন্নত। প্রজাপতিজ্ঞ বরাহ হয়েই জলে প্রবেশ করেছিলেন। ঐ বরাহ তাঁর দুই দংষ্ট্রায় তুলে ধরেছিলেন রসাতলে নিমগ্ন পৃথিবীকে। দেবতার অনুগ্রহে সেই জলরাশি যথাভাগে অবস্থান করতে থাকল। পৃথিবী যেন নৌকার মতো ভাসতে থাকল, আর নিমগ্ন হল না। এইভাবে উদ্ধার হওয়া পৃথিবীর স্থিতি কল্পনায় পদ্মলোচন ব্রহ্মা পৃথিবী-বিভাজনে মন দিয়েছিলেন।

এই শুভ বরাহকল্পের প্রতি সন্ধিকালে সনাতন কল্প-এর কথা বলা হয়েছে। অতঃপর সৃষ্টিমানসে ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হয়েন কার্যকারণ সমন্বিত ক্ষেত্রজ্ঞ দেব অসুর পিতৃগণ ও চতুর্বিধ মানব উৎপন্ন করেন নিজের দেহ থেকেই।

'অসু' শব্দের প্রাণ, প্রাণ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় তাদের নাম অসুর হয়। অসুর সৃষ্টি হওয়ার পর প্রজাপতি তনু ত্যাগ করছিলেন। তমোগুণ বহুল অসুরদের ত্রিযামা রাত্রি নামে তমঃ আবৃত ছিল। এর পর অব্যক্ত ও সত্ত্ববহুল শরীর পরিগ্রহ করে প্রীত হন ব্রহ্মা। এই সত্ত্বগুণ বহুল দেহ হতে জন্ম নেয় পিতৃগণ। এই পিতৃগণ স্বয়ম্ভুব ছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মাকে পিতার মতোই দেখেন। ইহার পর ব্রহ্মা এই তনু ত্যাগ করলেন, পরিণত হল সন্ধ্যারূপে। দিবাভাগ দেবতাদের রাত্রি অসুরদের জন্য। এবার ব্রহ্মা রজোগুণসম্পন্ন মূর্তিধারণ করেন। এ থেকেই কতকগুলি মানসপ্রজার সৃষ্টি হয়। ক্রূরমনা প্রজারা গুহ্যক ও যক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। এদের দেখে ব্রহ্মার অশান্তি বেড়ে যায় এবং মস্তকের কেশ শীর্ণ হয়। এর ফলে—শীত—উষ্ণ—সুখ—দুঃখ—সর্পাদি প্রাণীর উৎপত্তি ঘটে।

ব্রহ্মার মধ্যে যে নিদারুণ ক্রোধের সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলেই সর্পশরীরে বিষ সৃষ্টি করেছে ; ক্রোধ থেকে সৃষ্টি কপিশবর্ণ এবং উগ্র মাংসাশী ভূতবিশেষ। ভূতত্ত্ব, ভূত। পিশিত মাংস ভোজনকারী এরা সব। ব্রহ্মা যখন গান চিন্তা করেছিলেন তখন যাদের উদ্ভব হয় তারা হল গন্ধর্ব।

এই অষ্টদেব যোনি সৃষ্টি হওয়ার পর দেখা যায় পৃথিবীর বহু স্থান খালি আছে ; ব্রহ্মার ইচ্ছায় বয়স থেকে (আয়ু) বায়স বা পক্ষীর জন্ম হয়। উদব দেশ ও পার্শ্বদ্বয় থেকে গো, পদদ্বয় থেকে অশ্ব, হস্তী, শরভ, গবয়, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বেতর এবং অন্যান্য পশুর জন্ম হয়। ব্রহ্মার রোমরাজি হতে জন্ম নেয় ওষধি ও ফলমূলসমূহ।

ত্রেতাযুগের আরম্ভে ব্রহ্মা পশু বিবিধ ওষধি সৃষ্টি করেন, যজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত হয় তার ব্যবস্থাই করেছিলেন। পশুদের মধ্যে যেমন—গো, মেষ, ছাগ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বেতর, গর্দভ প্রভৃতি গ্রাম্যজীব—প্রাণী। খুরযুক্ত পশু শ্বাপদ, হস্তী, বানর, পক্ষী এই পাঁচ প্রকার এবং উদ্দক ও সরীসৃপ প্রভৃতি অরণ্য জীবসমূহ সৃষ্টি হল এইভাবে।

চতুর্মুখ ব্রহ্মার পূর্বমুখ থেকে—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ যজ্ঞের দ্রব্যের মধ্যে—গায়ত্রী বরুণ ত্রিবৃত ও রথন্তর, সাম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

দক্ষিণ মুখ থেকে ছন্দ, পঞ্চদশ ত্রৈষ্টুভ কর্মস্তোত্রম্, বৃহৎসাম ও উকথ্য উৎপন্ন হয়। পশ্চিম মুখ থেকে সৃষ্টি হয়, সাম, জগতী ছন্দ পঞ্চদশ প্রকার ছন্দ স্তোত্রম্, বৈরাগ্য ও অতিরাত্রি। উত্তর মুখ হতে সৃষ্টি হয়—একবিংশ অথর্ব আপ্তোর্যাব, অনুষ্টুভ ও বৈকাভ।

ভগবান প্রজাপতি স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করার পূর্বে বিসুত বজ্র, মেঘ, রোহিত, ইন্দ্র, ধন্দু প্রভৃতি সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রহ্মার শরীর থেকে যে বিবিধ ভূতগ্রাম সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে প্রথমে দেবতা, অসুর, পিতৃলোক ও মানস প্রজার সৃষ্টি হয়েছে, তারপর যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব অপ্সরা নর-কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ, সর্প, অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমাদি সৃষ্টি করেন।

আরো দেখা যায় রাত্রিশেষে অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা যখনই মানস সিদ্ধি অবলম্বন করেছেন, তখনই নানাবিধ চরাচর সৃষ্টি হয়েছে।

ধীমান প্রজাপতির সৃষ্ট প্রজা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে না দেখেন, অমনি নিজ সদৃশ আরও অন্যান্য মানসপুত্রদের সৃষ্টি করেছেন। ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরস, মরীচি, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠ এই নয় জন তার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়।

ব্রহ্মা রুদ্রকে, সংকল্প, ধর্ম, সনাতন, সনৎকুমার, বিদ্বান, সনন্দ এঁদের তৈয়ার করেন। কিন্তু তাঁরা কেহই লৌকিক বিষয়ে মগ্ন হননি। তাঁরা সবাই উদাসীন, দোষহীন, স্বাধীন ও সাধক পর্যায় ; এতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হন। সেই রোষ থেকেই জন্ম নিল তেজ ; ইহা অগ্নিতুল্য। অর্দ্ধনারী, অর্দ্ধনররূপী সূর্য সহ ঐ তেজস্বী পুরুষটিকে ব্রহ্মা বললেন, 'নিজেকে বিভক্ত কর।' ঐ পুরুষ নর ও নারী রূপে বিভক্ত হলেন। ভগবান ঐ বিভাগ থেকে একাদশ ভাগ করেছিলেন। যেহেতু বলেন, "বিশ্বলোক স্থাপনের জন্য তোমরা যত্নবান হও।" এই বলে ব্রহ্মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

প্রজাপতি ব্রহ্মার এই কথা শুনে তারা রোদন করতে লাগল ও ইতস্তত বেড়াতে লাগল। এরাই একাদশ রুদ্র নামে পরিচিত। এদের সহস্র সহস্র অনুচর আছে। স্বয়ম্ভু মুখোদ্‌গত যে নারীদেহের কথা বলা হয়েছে তাঁর দক্ষিণ অর্দ্ধাংশ ছিল শুক্ল ও উত্তর অর্দ্ধাংশ ছিল কৃষ্ণ। স্বয়ম্ভু সেই দেবীকে বললেন, তোমার দেহকে বিভক্ত কর। দেবী তাঁর দেহকে বিভক্ত করলেন। স্বাহা, স্বধা, মহাব্দ্যিা, মেধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অপর্ণা, একপর্ণা, পাটলা, উমা, হৈমবতী, ষষ্ঠী, কল্যাণী, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, গৌরী, মহাভাগা নামে প্রসিদ্ধ হলেন। এইসব দেবীগণ উক্ত নারীরই জন্ম দেওয়া। এছাড়া বিশ্বরূপা ঐ দেবীর দেহ থেকে আরও এই সব দেবীগণ যথা—গৌতমী, কৌশকী, আর্যা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, সতী কুমারী যাদবী, দেবী, বরদা, কৃষ্ণপিঙ্গলা, বহির্ধ্বজা, শূলধরা, পরম ব্রহ্মচারিণী, মাহেন্দ্রী, ইন্দ্রভগিনী, কৃষ্ণকন্যা, একবাসকী, অপরাজিতা, বহুভুজা, প্রগলভা, সিংহবাহিনী, একানসা, দৈত্যহনী, মায়া, মহিষমর্দিনী, অমোঘা, বিন্ধ্যনিলয়া, বিক্রান্তা, গণনায়িকা, ভদ্রকালী এই নামসমূহ অতি বিখ্যাত। এই নামগুলি কীর্তন করলে জলে-স্থলে-জঙ্গলে, রোগে উদ্ধার পাওয়া যায়, শান্তি হয়।

ব্রহ্মার পুত্রদের মধ্যে মন থেকে রুচি, প্রাণবায়ু থেকে দক্ষ, দু-চোখ দিয়ে মরীচি, হৃদয় থেকে ভৃগু, জিহ্বা থেকে ঋষিক, মস্তিষ্ক থেকে অঙ্গিরস, কর্ণ থেকে অত্রি, উদানবায়ু হতে ব্যানবায়ু থেকে পুলহ, সমান বায়ু থেকে বশিষ্ঠ, অপানবায়ু থেকে ক্রতু এবং অভিমান, পুলস্ত্য, থেকে নীললোহিতভদ্র উৎপন্ন হয়েছিলেন।

ব্রহ্মার এই বারোজন মানসপুত্র সকলেই ছিলেন ব্রহ্মবাদী। এঁদের দ্বারা দ্বাদশটি বংশ উৎপন্ন হয়েছে, যেমন—দেবগুণান্বিত এঁরা তেমনি ক্রিয়াবান, প্রজ্ঞাবান, মহর্ষিদের দ্বারা

অলঙ্কৃত। প্রকৃতির বিকার ও ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভূত স্বয়ম্ভুব প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন। মহৎ থেকে বিশেষ পর্যন্ত যেসব প্রকৃতির বিকার পর্যন্ত লোক স্রষ্টা ব্রহ্মার ইচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কারণে আর যখন সৃষ্টিকাজে প্রবৃত্ত হল না, তখন প্রতিকারের জন্য চিন্তায় পড়লেন। তা থেকে জন্ম নিল মিথুন। তিনি কিছু প্রীতিলাভ করেন। এবং সেই তনুকে দ্বিধাবিভক্ত করেন ; ইহা পুরুষ ও নারী রূপে—দু-ভাগ থেকে—শতরূপা নারী আবির্ভূতা হলেন। এই নারী স্বর্গ ও পৃথিবী নিজের মহিমায় ব্যাপ্ত করেন। এবং পূর্বাকাশে অবস্থান করতে থাকেন।

অর্দ্ধসৃষ্ট এই যে নারী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিযুত বছর, দুষ্কর তপঃসাধন করেন। এই দীপ্তযশা নারী স্বামী রূপে লাভ করেন স্বয়ম্ভু 'মনু'কে। এই মনুর মন্বন্তর কাল "সপ্ততি যুগ রূপে জ্ঞেয়"। এই পুরুষ অ-যোনিজ শতরূপাকে লাভ করে রমণ করতে থাকে না। শতরূপার গর্ভে জন্ম নেয় প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ দুই পুত্র। প্রসূতি এবং আকুতি নামে দুই কন্যা (এই দুই কন্যা হলেন যাবতীয় প্রজার জননী)।

প্রভু স্বয়ম্ভুব প্রসূতিকে দক্ষের করে এবং আকুতিকে রুচির করে সম্প্রদান করেন। রুচি আকুতির গর্ভে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে যমজ সন্তান প্রসব হয়। যজ্ঞ ও দক্ষিণার দ্বাদশপুত্র হয়। এই দ্বাদশ পুত্র স্বয়ম্ভুব মন্বন্তর মধ্যবর্তী সময় যাম নামক দেবতাগণ ছিলেন। ওদিকে দক্ষ, প্রসূতির গর্ভে চতুর্বিংশতি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যাগণের নাম যথা —

শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি, কীর্তি এই তেরোটি কন্যাকে ধর্মের করে সম্প্রদান করেন। বাকি ১১টি যেমন—খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসুয়া, উজ্জা, স্বাহা এবং স্বধা এদেরকে গ্রহণ করেন অন্যান্য মহর্ষিগণ।

যেমন—রুদ্র, ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, অগ্নি এইসব পিতৃগণ। সতীকে স্বয়ং মহাদেব বিবাহ করেন এ তো সবার জানা।

এই চতুর্বিংশতি কন্যাগর্ভে যেসব পুত্রগণ জন্মলাভ করেন তাঁরা মন্বন্তরের প্রলয় কাল পর্যন্ত অবস্থান করেন।

ঐসব কন্যার গর্ভে যেসব পুত্র জন্ম নিয়েছিলেন তাঁদের নাম এইরূপ—শ্রদ্ধাপুত্র কাম, লক্ষ্মীপুত্র দর্প, ধৃতি পুত্র-নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র লাভ। মেধাপুত্র—সুত। ক্রিয়াপুত্র দণ্ড ও সময়। বুদ্ধিপুত্র—বোধ ও অপ্রমাধ। লজ্জাপুত্র—ক্ষেম। সিদ্ধিপুত্র সুখ। কীর্তিপুত্র যশঃ। এঁরা সকলেই ধর্মপুত্র নামে খ্যাত। এঁরা ছাড়া রতির হর্ষ নামে আর একটি পুত্র ছিল, এদের সকলের পরিণতি হল সুখ।

অধর্ম ও হিংসা থেকে নিকৃতি ও অনৃতের উৎপত্তি হয়। এই অনৃতের দ্বারা ভয়-মায়া বেদনা ও নরক এই দুই মিথুন উৎপন্ন হয়েছে। ভয় ও মায়া এই মিথুন থেকে ভূত বিনাশক মৃত্যু এবং নরক ও বেদনা এই মিথুন থেকে দুঃখ জন্ম নেয়। মৃত্যু থেকে ব্যাধি জরা, শোক-দুঃখ থেকে ক্রোধ ও অসূয়ার উদ্ভব হয়।

অধম জাত এরা সবাই। ব্যাধি প্রভৃতিরও স্ত্রী-পুত্র আছে। এরা সবাই নিধন নামে খ্যাত। এই অধম নিয়ামক সৃষ্টিকে তামস সৃষ্টি বলে। এর পর নীললোহিত রুদ্র ব্রহ্মার আদেশে সতীকে চিন্তা করলেন এবং আত্মসমান সহস্র সহস্র পুত্র হল—যাঁরা উৎকৃষ্ট নন এবং নিকৃষ্ট

নন। অথচ যাঁরা তাঁরই মতো রূপ, তেজ ও বলসম্পন্ন ছিলেন। রুদ্ররূপী রুদ্রপুত্রদের দেখে ব্রহ্মা রুদ্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা এই রূপ প্রজা সৃষ্টি করিও না।" রুদ্রদেব বললেন, "ব্রহ্মণ—আমি বিরত হলাম। তুমি সৃষ্টি কর"। দেবেশ রুদ্র আর প্রজা সৃষ্টি করলেন না। উর্ধ্বরেতা হয়ে স্থাণুর মতো অবস্থান করলেন।

রুদ্র শঙ্করের এক নাম স্থাণু।

জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, স্রষ্টৃত্ব, আত্মসম্বোধ ও অধিষ্ঠাত্রীত্ব এই দশটি গুণ শংকরের শরীরে সদা বিদ্যমান। বায়ুপুরাণ মতে—পৃথিবীকে পাঁচটি গুণ যুক্ত দেখা যায়। এরা একে অপরকে ধারণ করে থাকে। মহান থেকে বিশেষ পর্যন্ত সাতটি মহাবীর্য ভূত। একে অপরের থেকে ভিন্ন প্রজা সৃষ্টি করতে পারেন না। সকলে মিলে পরস্পরের আশ্রয়ে পুরুষাধিষ্ঠিত অব্যক্তের কৃপায় একটি অণ্ড সৃষ্টি করে। সেই বিশেষ পদার্থ থেকেই এককালে উৎপন্ন জল বুদ্বুদ সম বিশাল অণ্ড। উহা ব্রহ্মার কার্যকারণ রূপ জলমধ্যে অবস্থান করেন।

ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, সেই ব্রহ্মা অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা হয়ে ছিলেন। ইনিই প্রথম শরীরধারী, এঁকেই পুরুষ বলে। ইনিই আদি কর্তা। ইনি হিরণ্যগর্ভ ; চতুর্মুখ ব্রহ্মা। সকল সৃষ্টিতেই এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে ব্রহ্মা বলে। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত এই প্রাকৃত সৃষ্টি কোনো বুদ্ধিতে হয়নি, তড়িৎপ্রকাশের মতো হঠাৎ প্রকাশিত হয়েছে। গুণের সমতা হলেই লয় হয়। বৈষম্য হলেই সৃষ্টি হয়, এই নিয়মে চলে। তিলের মধ্যে যেমন তেল থাকে, দুধে যেমন ঘৃত হয়, সেইরকম অব্যয়ের আশ্রিত যে তমোগুণ তা সত্ত্ব ও তমোগুণের মধ্যেও থাকে। প্রকৃতিস্থ পুরুষরূপী পরমেশ্বর, দিবাভাগে পরম যোগ দিয়ে প্রকৃতিদেবীর ক্ষোভ জন্মান। এতে প্রকৃতির রাগ হলে রজঃ প্রবর্তিত হয়ে থাকে। জলে যেমন বীজ জন্মায় তেমনি রজোগুণে সমস্ত কাজের জন্ম দেয়।

গুণবৈষম্যের জন্যই অধিষ্ঠিত ক্ষেত্রজ্ঞেরা সৃষ্টি হয়। গুণ-ক্ষোভ থেকেই, তিন দেবতার উৎপত্তি হয়েছে। এঁরা সর্বজীবকে আশ্রয় করে রয়েছেন।

রজঃ—ব্রহ্মা, তমঃ—অগ্নি, সত্ত্বঃ—বিষ্ণু। রজঃ স্রষ্টারূপে ব্রহ্মা ; তমঃ যে অগ্নি প্রকাশ করেন তিনি কালরূপে সত্য প্রকাশ করেন। তখন বিষ্ণু উদাসীনরূপে থাকেন।

এঁরাই তিন লোক, এঁরাই তিন বেদ, এঁরাই তিন গুণ অগ্নি। এঁরা পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে থাকেন। ক্ষণের জন্যও পরস্পরকে ছাড়া থাকেন না।

রজঃগুণ যুক্ত ব্রহ্মা, জগৎ সৃষ্টির কাজ করেন। পুরুষ পর, ঈশ্বর পর-দেব।

মহেশ্বরের অধিষ্ঠিত প্রকৃতি, মহেশ্বরের প্রেরণায় প্রকৃতি সৃষ্টিরূপে আবৃত হন। সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের অধিষ্ঠিত সদ, সদ্যাত্মক। প্রকৃতির গুণবৈষম্য ছিল, ব্রহ্মা ও বুদ্ধি এই মৈথুন এক সাথে সৃষ্টি হয়েছেন। ব্রহ্মাই প্রথমে তেজ দিয়ে প্রকাশিত হন। আবার প্রথম শরীর ধারণ করেন তিনিই। ইনি অনন্ত জ্ঞান বিপুল ঐশ্বর্যের ; ধর্মের ; এবং বৈরাগ্যের সৃষ্টি করেছিলেন।

ব্রহ্মার কাছে যে যা চেয়ে থাকেন সে সবই অব্যক্ত থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইনি সৃষ্টিতে চতুর্মুখ কালরূপে অন্তর্ক আর বিষ্ণুরূপে সহস্রশীর্ষ পুরুষ। স্বয়ম্ভুব'র এই তিনটি অবস্থা মনে রাখতে হবে।

ব্রহ্মা ব্রহ্মারূপে সত্ত্ব ও রজঃগুণকে আশ্রয় করে থাকেন, কালরূপে রজঃ ও তমঃ এবং পুরুষরূপে সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করে থাকেন। ব্রহ্মারূপে তিনি সৃষ্টি করেন। কালরূপে সব কিছু ধ্বংস করেন, আর পুরুষরূপে উদাসীন থাকেন। স্বয়ম্ভুবর গুণগুলি বলা হল। প্রজাপতির এই তিনটি অবস্থা। ব্রহ্মার রং পদ্মগর্ভাভ, কালো, নীলাঞ্জনের মতো আর পুরুষ শ্বেতকমল প্রভা। ইনি সকলের প্রথম ভগবান বা আদি দেব।

তাঁর জন্ম নেই বলে তিনি 'অজ'। ইনি প্রজাদের পালন করেন তাই প্রজাপতি, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে মহান বলে তিনি মহাদেব। ইনি সকলের ঈশ্বর কারো বশ্য নন। সবার চেয়ে বড়ো, তাই তিনি ব্রহ্মা। সর্বভূতে আছেন তাই ভূত। ক্ষেত্রগুলি জেনেছেন তাই ক্ষেত্রজ্ঞ। সমস্ত ভূতের মধ্যে রয়েছেন তাই বিষ্ণু।

অব্যক্তপুরে শুয়ে রয়েছেন তাই পুরুষ। ইনি কারো উৎপাদিত নন, আর সকলের পূর্ববর্তী বলে ইনি স্বয়ম্ভুব। সকলের যজনীয়—তাই তিনি যজ্ঞ। অতি বিক্রান্ত বলে তিনি কবি। সবার ক্রমণীয় বা গণ্য তাই ক্রমণ। সর্ববর্ণকে পালন করেন। তিনিই আদিত্য। সকলের অগ্রগণ্য আর তাঁর অগ্নিরূপকে বলে 'কপিল'। এরপর হিরণ্য আর ইনি হিরণ্যের গর্ভস্বরূপ। এই জন্য পুরাণে এঁকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়।

সেই স্বয়ম্ভু সৃষ্টির থেকে নিরত হলেই কত কাল কীভাবে পেরিয়ে যায় তা একশত বছরেও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সৃষ্টিকর্তা পরমব্রহ্ম যতক্ষণ সৃষ্টি করে চলেন, সেই সময়কে বলে কল্প, হাজার হাজার কোটি কোটি কল্প অতীত হয়ে তাতে লয় পেয়েছে।

আবার সেই পরিমাণকাল অবশিষ্ট রয়েছে। এই কল্পকালের মধ্যে চৌদ্দজন মনু জন্মান। বর্তমান বরাহ কল্পের এই প্রথম ভাগ চলছে। ঐ চৌদ্দজন মনু যে জন্মান, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অতীত কেউ বা বর্তমান। আর কেউ ভবিষ্যতে জন্মাবেন।

সত্য যুগের পরিমাণ ছিল দৈব চার হাজার বছর সেই সময় মিথুন জন্মাত। মেয়েদের মাসিক ঋতু হত না। সেই সময় কল্পবৃক্ষের মধু ফলমূল ছিল তাদের খাদ্য। শীত গ্রীষ্ম বোধ কিছুই তাদের ছিল না।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, এবার কিছু বলছি তাহা এইরূপ—

হে মুনিরা সত্যযুগ সন্ধ্যাংশ হয়ে এলে ত্রেতা যুগের শুরু জানিবে। যুগ ধর্মের একপাদ সন্ধ্যাংশ এবং সন্ধ্যাকালীন ধর্মের একপাদ ত্রেতা আরম্ভের সেই সন্ধ্যাংশকালীন ধর্মের একপাদ, এইভাবে আস্তে আস্তে তপস্যা শাস্ত্রজ্ঞান, বল, আয়ু ক্ষয় পেয়ে থাকে ; প্রজাদের আগের মতো সিদ্ধি থাকে না। কিন্তু সে সময় অন-সিদ্ধি সুরু হয়। জলের সূক্ষ্মতা নষ্ট হওয়াতে যে গর্জনকারী মেঘের রূপ পায় তখন তা থেকে বৃষ্টি হয়। একবার সেই বৃষ্টি হলেই প্রজাদের থাকার জায়গার জন্য নানান গাছ জন্মাত তা থেকে তাদের উপভোগের সমস্ত জিনিস পেয়ে যেত এবং তাতেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হত।

আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয় সবকিছুই। আসক্তি ও লোভ বেড়ে যায়। এ থেকে খুঁজতে থাকে তার চরম অভিব্যক্তি বিকাশের পথ। এ সময়ে মেয়েদের ঋতু হতে শুরু হয়, আকাশে গর্ভোৎপত্তি ঘটে নতুন নতুন জন্মের শুরু হয়।

এ সময়ে মানুষের চরম সুখ শান্তি হয়েছিল। কিন্তু বাড়াবাড়ি শুরু হওয়ায় কল্পবৃক্ষের

মধু, ফলের টান ধরে যেতে থাকে, অত্যন্ত লোভ ও অনাচার এর মূলে ছিল। ফলে কল্প বৃক্ষ ক্ষীণ হয়ে গেল। এখন প্রজাদের শীত বাত গরমে পীড়িত হতে, গায়ের বস্ত্র খুঁজতে থাকে। শারীরিক ক্লেশ বোধ খুব বেশি বুঝতে পারল, পীড়িত বোধ হতে থাকল তারা। বাসস্থান আর না হলে চলে না। অসুস্থ শরীর নিয়ে বিপদ, কী করে কী হয়। এখন নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে গৃহনির্মাণ করে বাস করতে অভ্যস্ত হয় তখন। মরূদ্যান, উচ্চস্থান খুঁজে কষ্ট নিবারণের জন্য, দুর্গনির্মাণ, বাড়ি নির্মাণ করতে থাকে। এইভাবে ছোট, গ্রাম, পুর, অন্তঃপুর, জনপদ গড়ে উঠতে থাকে। ঐসব নির্মাণকাজ হিসাব রাখার জন্য আঙ্গুল দিয়ে পরিমাপ সংজ্ঞা স্থির করত তখন। এই গণনার হিসাব এইরকম, যথা—প্রদেশ, হস্ত, কিষ্কু, ধনু ইত্যাদি। দশ আঙ্গুলে এক প্রাদেশ হত।

১২ আঙ্গুলে এক বিতস্তি। ২০ আঙ্গুলে এক রতি, ২৪ আঙ্গুলে এক হস্ত। ৪ হাতে এক ধনু। ২০০০ ধনুতে এক গুব্যাতি। ৮০০০ ধনুতে এক যোজন। ৪ হাতে এক ধনু, দণ্ড-নালিক আবার যুগও বলা হত।

তারা চার রকম দুর্গ আশ্রয় করত। এর মধ্যে ৩ রকম দুর্গ স্বভাবজাত। চতুর্থ রকম ইহা কৃত্রিম, তার সৌধগুলি উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা পরিখা অনেক জলে ভরা ; দ্বারদেশে সেতু সংযুক্ত স্বস্তিকাখ্য অর্থাৎ

卐

ঐ হল স্বস্তি চিহ্ন। ঐ চিহ্ন অত্যন্ত পবিত্র ও শুভ বিদিত ছিল। পরিখা দীর্ঘ প্রস্থে ৮ হাত × ১৩ হাত হতই। এই আয়তন খুব ভাল গৌরবের ছিল।

৮ × ৯ হাত পরিমাণও ছিল, যে যেমন মানুষ আর কী?

ছোটো গ্রাম, নগর গ্রাম ও তিন রকম দুর্গ দেখা যেত। পর্বত বা জল দিয়ে সীমারেখা করা হত। গৃহপথ ২ ধেনু। উপরথ এক ধনু। ঘণ্টাপথ চারপদ। গৃহ থেকে গৃহান্তর ছিল ত্রিপাদ। বৃত্তিপথ—অর্ধপদ, প্রাগ্‌বংশ—একপদ পরিমিত। অবস্কর বা জল বের করার পথ বা নর্দমা ছিল একপদ। এইরকম বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলত তারা। ত্রেতাযুগের প্রথমে ভগবান স্বয়ম্ভু প্রজাপতি তাদের ঐরূপ অবস্থা বুঝে এবং দেখে বিচার করে পৃথিবী যে ওষধিগুলি গ্রাস করেছে তা এবং আরো যা দরকার তার জন্য পৃথিবীকে দোহন করলেন। সমস্ত তপস্যাদি, গ্রাম, অরণ্য সতেরো রকম ওষধি যথা—

ব্রীহি, যব, অনু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদার, কারুষ, কলায়, মাষ, মুঙ্গ, মসুর, নিমপাষ, কুলত্থ প্রভৃতি জন্মাত। এইসব এবং যজ্ঞ সাধন পর্যন্ত দোহন করলেন। নানান রকম গাছ লতা বল্লী, তৃণ ফুল, ফল, মূল ইত্যাদি কর্মসিদ্ধি কারণ যা কিছু প্রয়োজন হেতু উপায় করে দিলেন।

★ 'ত্রেতাযুগ'—আরম্ভ হতে সৃষ্টির বিকাশ আরম্ভ আমরা জেনেছি। সমাজে বিরোধ বিসম্বাদ প্রভৃতির নিষ্পত্তির জন্য ব্যবস্থা ছিল। ভূমি কর্ষণ করে শস্য উৎপন্ন তখন হত। যারা বলবান তারা জমির মালিক ছিল, ক্ষত্রিয়গণ প্রজাদের রক্ষা করত। যারা সত্যবাদী, সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান ছিল তারাই ব্রাহ্মণ বলে সম্মান পেত। দুর্বল অথচ কুটিল যমের মতো সব সময় স্বার্থসাধনের জন্য হিংসা করত, সেই কীনাসপদবাচ্য প্রজাদের বৈশ্য বলা হত।

যারা শোকরত বা দুঃখিত ছোটাছুটি করত, নিস্তেজ অল্প বলশালী তারা শূদ্র। শূদ্রগণ, জন মজুরের মতো সকলের সব কাজ করে জীবনধারণ করত।

এইভাবে চতুর্বর্ণের বিধানে ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিকাশানুসারে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই হল ত্রেতাযুগের প্রথম পাদের কথা।

ত্রেতাযুগ—বৈবস্বত মনুর সময় কালকে বলা হয়।

বৈবস্বত মনুর সময় অর্থাৎ তৃতীয় মনুর কাল ১৪টি মন্বন্তর বলা হয়। এই ১৪ মন্বন্তর অন্তে কল্প হয়। পৃথিবী আবার নতুন করে সৃষ্টি হবে। এই হল জগতের সৃষ্টি লীলাচক্র।

১৪ মন্বন্তর সম্বন্ধে কিছু কিছু বলার চেষ্টা করব। আসুন—সেইসব আলোচনা কেমন লাগে দেখা যাক।

প্রথম বরাহকল্পে স্বয়ম্ভুব মনুর সংখ্যা চতুর্দশ এবং তার কতক বর্তমান, কতক অতীত বলে বর্ণিত আছে, যেগুলি ভবিষ্যতে হবে তাও। পূর্ণ যুগ সহস্র কাল ধরে মনু প্রভৃতি নর নাথেরা এই পৃথিবীকে পরিপালন করে গেছেন।

এইভাবে সমস্ত অতীত, অনাগত, ভবিষ্যৎ এবং মন্বন্তরের একটি কল্পের কাহিনী বুঝতে হবে।

এক একজন মনু যুগ সহস্র কাল রাজত্ব করে থাকেন।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৫ম অধ্যায়ে আছে—সনাতন কল্পের চতুর্দশ মন্বন্তরে দেবতাদের সংখ্যা ছিল আঠাশ কোটি। ঐ দেবতারা বৈমানিক অর্থাৎ অন্তরীক্ষবাসী হয়ে থাকেন বা আছেন।

সহস্রদেব যুগ অতিবাহিত হলে তাঁরা ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হন। যেখান থেকে আর ফিরতে হয় না। সেখানে ব্রহ্মময় হয়েই থাকেন। মানুষের মুক্তি কখন হয়?

একটি ছক দিয়ে দেখানো হল।

তপলোকে দশ সহস্র দেব যুগ স্থিতি পরে মোহলোকে সহস্র দেবযুগ অবস্থান করে সত্য লোক স্থিতিতে সহস্র দেব যুগ পর ব্রহ্মালোক কিছুদিন পর মুক্তি পুনঃজন্ম নাই।

শিবপুরাণের জ্ঞানসংহিতায় আছে—

৫/২৫ — ২৭ দ্রষ্টব্য।

চতুর্যুগ সহস্রানাং সমূহং দিনমুচ্যতে।
রাত্রিশ্চ তাবতী তস্য মানমেতন ক্রমেনতু

তাৎ সৃষ্টেশ্চ কার্যং বৈ কর্তব্যম বিধিধৈর্গুণৈঃ।
গুণেষু চ ভবান্ শ্রেষ্ঠঃ সত্ত্বাত্মা পুরুষোত্তম্।

বাংলা অর্থ হল—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারিটি যুগ সহস্রবার পরিবর্তিত হলে ব্রহ্মার এক দিবস হয়। ঐরূপ সহস্র চারি যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি পক্ষ, মাস, বর্ষ পরিমাণও এই অনুসারে হয়। প্রলয়কাল কত বৎসর অন্তে তা বর্ণনায় আছে অবগত হউন।

★ প্রথম স্বয়ম্ভুব স্বয়ং ব্রহ্মা, ইনি প্রথম মনু। ইহা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

★ ইহার পর মনু—ভগবান দ্যুতিমান বা স্বরোচি। ইন্দ্র বিপসচিৎ নামে বিখ্যাত ছিলেন। এই সময় উর্জ, স্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চয়, অর্বরীবান নামে সাতজন ঋষি ছিলেন। মহাত্মা, স্বরোচি, মনু, চৈত্র, কিম্পুরুষ প্রভৃতি নামে সাতজন বীরপুত্র ছিলেন, তাঁরা পৃথিবী পালন করতেন।

তৃতীয় মন্বন্তরে সুরচি নামে উত্তানপাদ রাজার এক বীর মহাবল পুত্র ছিল। তার নাম উত্তম। উত্তানপাদের ছেলে ধর্মপ্রাণ উত্তম 'বভ্রব' মেয়ে বহুলাকে বিবাহ করেন। বহুলা রাজার প্রতি বীতরাগ ছিলেন, সেইজন্য তাহাকে বনবাসে দিলেন। এর পর রাজা বড়ই অসুখী হয়ে দিন কাটাতে থাকেন। তিনি কোনো বিবাহ করলেন না।

এই সময়ে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী অপহৃতা হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ রাজার কাছে এসে তার স্ত্রী উদ্ধার করে দিবার আবেদন করেন। রাজা সব শুনে ব্রাহ্মণকে বোঝালেন। ঐ স্ত্রীর কথা ভুলে যেতে অনুরোধ করলেন এবং বিবাহ করার জন্য সব খরচ রাজা দেবেন স্বীকার করলেন।

ব্রাহ্মণ তাতে রাজি হলেন না। কারণ স্ত্রীকে রক্ষা করলেই তো সুসন্তান লাভ হয়। আত্মাই নিজের স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়। এইজন্য তাকে জায়া বলা হয়।

সেইজন্য, নিজের আত্মাকে রক্ষা করতে হলে সন্তানকে রক্ষা করা হয় ; তাই স্ত্রীকেও রক্ষা করার চরম দায়িত্ব ও কর্তব্য এসে পড়ে। আমি কোনোমতে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারি না। এতে বংশের দোষে পিতৃপুরুষ নরকগামী হবেন, 'মহারাজ আমার স্ত্রীকে আপনি খুঁজে দিন।' এরপর রাজা সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। এ বন, সে বন খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে এক ঋষির আশ্রমে গিয়ে হাজির। ঋষি তাঁকে সবকিছু বললেন, উত্তম রাজা জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রীকে পাতালের নাগরাজ 'কপোতক' অপহরণ করেছে। সে তাকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু, সর্পরাজের মেয়ে নন্দা তার ইচ্ছাপূর্ণ হতে দেয়নি। নন্দা তাকে লুকিয়ে রেখেছে। ফলে সর্পরাজ মেয়েকে অভিশাপ দেন, সে বোবা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের স্ত্রী পবিত্র আছেন, ঋষি এই কথা বললেন। রাজা উত্তম, "হে ব্রাহ্মণ আমাকে সবই বললেন যখন, অনুগ্রহ করে আর একটি কথা বলুন। আমার স্ত্রী কেন আমাকে অপছন্দ করেন, সে কথাটি বলুন"। মুনি বললেন "বিয়ের সময় আপনার উপর রবি, মঙ্গল এবং শনির দৃষ্টি ছিল, এবং আপনার স্ত্রীর উপর শুক্রের ও বৃহস্পতির দৃষ্টি ছিল"। আরো বললেন যে, স্ত্রীর চন্দ্র ও আপনার মঙ্গল একে অন্যের বিপরীত। ফলে এখন আপনার স্ত্রীকে বিয়ে করে সংসার ধর্ম পালন করুন। স্ত্রীর সঙ্গে একসঙ্গে সবরকম ধর্ম রক্ষা করুন। নিজের ধর্মের সাহায্যে পৃথিবী পালন করুন"।

এই উত্তম মন্বন্তরে গণেস্বধামা নামে দেবতার নিজের তেজে আলোকিত থাকত। ইহা তাদের প্রথম গণেস্ব। দ্বিতীয় গণ সত্য এবং তৃতীয় গণের দেবতাদের শিব বলা হয়। তাদের মনে করলে সকল পাপ দূর হয়। পঞ্চম গণ হল যে দেবতারা নিজের নিজের কাজ করে যেত তারা। এই মন্বন্তরে পাঁচরকম গণ ছিল। প্রত্যেক গণই বারোজন দেবতার অধীন ছিল। সেই দেবতাদের সুশান্ত নামে ভাগ ছিল। এঁদের ইন্দ্র একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ত্রৈলোক্য গুরু হয়েছিলেন। তিনিই তখন দেবরাজ সুশান্তি নামে বিদিত ছিলেন। এই মনুর অজ, পরশুচি দিব্য নামে খুব শক্তিমান ছেলে ছিলেন। তাঁরা তখনও রাজা উত্তমের সময় ছিলেন, এবং পৃথিবী শাসন করতেন। সে যুগেও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি যুগের ভাগ ছিল। এই যুগ-এর পরিমাণ কাল অপেক্ষা মন্বন্তরের সময় কাল একটু বেশি হয়ে থাকে।

★ তামস বা চতুর্থ মন্বন্তরের কথা শুনুন। স্বরাষ্ট্র নামে পৃথিবী বিখ্যাত একজন রাজা ছিলেন। তিনি অনেক যজ্ঞ করেছিলেন এবং খুব জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন ; তাঁর সুন্দরী একশত স্ত্রী ছিল। রাজা দেবকৃপায় দীর্ঘায়ু ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীরা সবাই অল্পায়ু এবং সময় মতো মারা গেল। নিজের আপন জনেরা সময়কালে মারা গেলে রাজা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন, এই সুযোগে বিমর্দ নামে অন্য রাজা তাঁর রাজত্ব কেড়ে নিল। স্বরাষ্ট্র রাজ্যহারা হয়ে বর্নের মাঝে কোনো নদীর ধারে তপস্যা করতে থাকেন, এইসময় খুব বন্যা হয়েছিল। চারিদিকে অন্ধকার, অন্যদিকে জলে সব ভেসে গেল। এতৎ অবস্থায় যখন রাজা মর মর, অসহায় ভাবে জলের তোড়ে ভেসে আসা এক হরিণীর সাথে ধাক্কা খাওয়ায়, রাজা তাকে যেন জড়িয়ে ধরে আশ্রয় পেলেন।

হরিণী তখন বলল, "হে রাজন আপনার হস্ত আমার মনে এক আবেগের সঞ্চার করেছে"। রাজা বললেন, "তুমি মানুষের মতো কথা বলছ, কে তুমি?" হরিণী বলল, "হে রাজন আমি দৃঢ়ধম্বার মেয়ে আপনার স্ত্রী উৎপলাবতী। আপনার একশত স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলাম। তারপর সে এক গল্প বলল ঐ হরিণী রূপের কারণ কী?

আমি অনুবৃত্তি চক্ষু মুনির ছেলে সুতপার অভিশাপে হরিণী রূপ পেয়েছি। কারণ হরিণী হয়ে যেন আমি এই বনে থাকি। এর বেশি আর কী বলব! আমাকে বলেছিলেন, "তোমার গর্ভে লোল নামে এক মুনিপুত্র জন্মাবে, তোমার স্বামী তোমাকে গ্রহণ করবেন। তোমার সেই ছেলে লোলই পৃথিবী জয় করবে। মনু সেই হবে তামস রাজা বা তামস মন্বন্তর"। সেই সময় যে ইন্দ্র ছিলেন—শিখি নাম। জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বলক, পীবর প্রভৃতি সাতজন ঋষি ছিলেন। নর, ক্ষান্তি, শান্ত, জানু, জঙঘ প্রভৃতি এঁরা ছিলেন তাঁর বলশালী পুত্রগণ।

ঋতবাক নামে একজন বিখ্যাত ঋষি সন্তানহীন ছিলেন। পরে রেবতী নক্ষত্রের শেষে এক ছেলে হল, সেই ছেলে অসৎ চরিত্রের ছিলেন।

এই ছেলে জন্মাবার পর হতে ঋষি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছেলের দুশ্চরিত্রতা, নিজের এই অবস্থা তাঁকে পীড়িত করতে থাকে। তিনি ঋষিগণের সমীপে উপস্থিত হয়ে সব বলার পর মহামতি গর্গ বললেন, "তোমার ছেলে রেবতী নক্ষত্রে জন্মেছে তাই এমন হল, তোমার নিজের বা স্ত্রীর কোনো দোষ নেই"। ঋতবাক বললেন, সেই নক্ষত্রের পতন হোক, আশু পতন হোক। সেই রেবতী নক্ষত্র ভূমিতে পতিত হয়ে গেল এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে

মনোরম যে পর্বত সেই কুমুদ যার চারদিকে জল, বনজঙ্গল, পঙ্কহীন দীঘি সৃষ্টি করেছে চারিদিক আলোকিত করে রেখেছে। প্রমুখ মুনি-এর নাম রেখেছেন "রেবতী"। কেন না রেবতী নক্ষত্র থেকে জন্ম তাই ; মুনিঋষিরা তো সবই জানেন! প্রমুখ মুনি এই 'রেবতী' কন্যাকে লালনপালন করেছেন। কন্যার বয়স হল, কিন্তু উপযুক্ত বর জুটছে না। একদিন মহাবীর দুর্গম বনের মধ্যে প্রমুখ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত। ঋষি আশ্রমে ছিলেন না। পরে ঋষি এলেন এবং ঋষি রাজাকে জামাতা সম্বোধন জানালেন।

রাজা বিস্ময়ান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "হে ঋষি আপনি আমাকে জামাতা সম্বোধন করছেন তাতে আমি অতি মুগ্ধ হলাম। আপনি আমাকে সকল খুলে বলুন"।

ঋষি বললেন, "হে রাজন, একটু আগেই তুমি রেবতীকে প্রিয়া সম্বোধন করনি? সে তো তোমার আসল স্ত্রী। এখুনি ভুল হয়ে গেল?"

রাজা বললেন, আমার স্ত্রীগণ যথা—সুজাতা, বদস্বা, বরূথজা, বিপাশা, নন্দিনী এঁরাই আমার স্ত্রী।

রেবতী! হে "পিতা। আমার প্রতি যদি আপনার স্নেহ থাকে তবে, রেবতী নক্ষত্রে আমাকে বিবাহ দিন।"

ঋষি বললেন, "মা। রেবতী নক্ষত্র চন্দ্রের মধ্যে আর নেই।" কন্যা বলল, বাবা ! সেই ঋতবাক যে তপস্যা দ্বারা এটা সম্ভব করেছেন, আমার পিতা আপনি সেই তপোবলে পুনঃ স্থাপন করুন। আমাকে সেই রেবতী নক্ষত্রেই বিবাহ দিন। অন্য নক্ষত্রে আমার বিবাহ দিবেন না।"

ঋষি বললেন, "হবে মা হবে, তাই হবে।" আমি রেবতী নক্ষত্রের ও চন্দ্রের স্থিতি স্থাপন করব।

রাজা দুর্গমের সাথে রেবতীর বিবাহ হল। ঋষি বললেন, "রাজা আমি মেয়ের বিয়েতে কী যৌতুক দিব? তুমি নিঃসংকোচে আমায় বল।"

রাজা বললেন, "হে ঋষি, আমি স্বয়ম্ভুব মনুর বংশে জন্ম নিয়েছি। আপনার আশীর্বাদে যেন মন্বন্তরে রাজা হয় এমন ছেলে পেতে চাই, এটাই আমার প্রার্থনা।"

ঋষি বললেন, "হে রাজা তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, তোমার ছেলে মনু হবে এবং ধর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞান হবে।"

রেবতীর গর্ভে রৈবতক মনুর জন্ম হয়েছিল। তাঁর সময়ের দেবতা মুনি-ঋষিদের এবং ইন্দ্র প্রভৃতির নাম যথা—দেবতাদের নাম সুমেধা, ভূপতি, বৈকুণ্ঠ, অমিতাভ এই চাররকম 'গণ' হত। প্রত্যেক গণে চৌদ্দজন করে দেবতা ছিলেন। চার 'গণে' দেবের মধ্যে যিনি সব থেকে বড়ো তাঁর নাম ছিল বিষ্ণু (ইন্দ্র)। যে সাতজন ঋষি ঐ সময় ছিলেন তাঁদের নাম হিরণ্য, রোমা, বেদশী, উর্ধ্ববাহু, দেববাহু, সুধামা, মহামুনি, পর্জন্য এবং সমস্ত বেদ-বেদান্ত জানা ঋষি বশিষ্ঠ। মহাবন্ধু মহাবীর্য সুমষ্টব্য সত্যক এঁরা সকলেই রৈবতক মনুর ছেলে।

স্বরোচি মনু ছাড়া আর সকলে স্বয়ম্ভুব মনুর বংশ ছিলেন, মনে রাখতে হবে।

★ চাক্ষুষ মনু হলেন ষষ্ঠ মন্বন্তরের মনু। এই মন্বন্তরে রাজা অনমিত্র—স্ত্রী ভদ্রা ছিলেন। এঁদের এক পুত্র খুব বিদ্বান ও জাতিস্মর। শিশু যখন মায়ের কোলে হাসত, তখন মা বলতেন, "বাবা তোমার মুখে হাসি দেখে আমার ভয় হয়।"

ছেলে বললে, "ঐ বিড়ালটা যে আমায় খেতে চায়, এ একজন জাতক হরিণী সেও আমাকে খেতে চায়। ওরা আমাকে খেতে চায়। তুমি কোলে নিয়ে আমাকে আদর করছ, চুমু খাচ্ছ, তাই আমি হাসছি। ওরা ওদের স্বার্থ দেখছে আমাকে খাবে, তুমি আমার মা ভাবছ, আমার থেকে কত উপকার পাবে।"

জাত হারিণী প্রতিদিন ২টি করে বাচ্চা চুরি করে একটার জায়গায় অন্যটা রেখে আসত। এইভাবে তৃতীয়টি খেয়ে ফেলত। এই নিয়মে রাজা বিক্রান্ত যে একটি ছেলে পেয়েছেন, তাতে আনন্দিত ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের নিয়ম পালনে তার জাতকর্ম করার জন্য গুরু এসে ছেলেকে বললেন, 'মাকে প্রণাম করে এস।' রাজার ছেলে আনন্দ তখন গুরুদেবের কথা শুনে হেসে ফেলল। পরে সে বলল, আমি কোন্ মাকে প্রণাম করব? ইনি তো বোধ নামে ব্রাহ্মণের ছেলে চৈত্র! বিশাল গ্রামে তাঁরা থাকেন।

আনন্দ বলল, আমি পৃথিবীর রাজা অনমিত্র নামে একজন ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী গিরিভদ্রার গর্ভে জন্মেছিলাম, আমাকে জাতহারিণী চুরি করে এনেছে। হৈমিনীর ছেলেকে যেমন বিশাল গ্রামে শুদ্ধ করা হয়েছে, এখানে আমাকেও শুদ্ধ করা হচ্ছে।

এই কথা শুনে রাজা তাঁর স্ত্রী অন্যান্য বন্ধুবান্ধব মিলে একমত হয়ে এই ছেলের জন্য মায়ামমতা ত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ চৈত্রকে পালন করেছিলেন তাকে পুরস্কৃত করে নিজের ছেলেকে এনে মানুষ করতে লাগলেন। এই চৈত্র পরে রাজা হয়েছিলেন।

যে আনন্দের পরিচয় উপরে বলা হয়েছে সে বড়ো হয়ে সাধু হয়ে তপস্যা করত। একদিন সে ব্রহ্মার সাক্ষাৎ পেয়েছিল।

ব্রহ্মা তাকে বললেন, "চাক্ষুষ" তুমি মুক্তি চাও কেন? তুমি ষষ্ঠ মনু হবে।" ব্রহ্মাই তাঁকে চাক্ষুষ বলে ডেকেছিলেন, তাই সে চাক্ষুষ মনু হয়েছিল।

বিশ্বকর্মার মেয়ের নাম সংজ্ঞা। তিনি মার্তণ্ডদেবের (সূর্যের) স্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর গর্ভে জন্ম নেয় বৈবস্বত। বিবস্বতের ছেলে বলে ঐ নাম হল। সূর্যের দিকে চোখ পড়লেই স্ত্রী সংজ্ঞা চোখ ফিরিয়ে নিতেন। সূর্য রেগে গিয়ে বলেছিলেন, আমাকে দেখে যেমন তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও তেমনি তুমি অবাধ্য সন্তান যমকে জন্ম দিবে। তারপর থেকে দেবী সংজ্ঞা সূর্যকে ঘন ঘন চোখ দিয়ে দেখতেন।

সূর্য বললেন, "এখন ঘন ঘন আমাকে দেখে তোমার চোখ খারাপ করে ফেলছো কেন? তুমি নদীর মত এক দুর্বার কন্যার জন্ম দিবে।" যমুনা নামে সেই নদী। এই মতে যম ও যমুনা সংজ্ঞার ছেলে ও মেয়ে হয়েছিলেন। সংজ্ঞার কাছে তাঁর স্বামী ছিলেন সাক্ষাৎ বিপদ। শেষে সংজ্ঞা এক কৌশল করে বাবার বাড়ি চলে গেলেন। যাওয়ার সময় নিজের শরীর থেকে ছায়া নামে এক স্ত্রী উৎপন্ন করে, তাকে শিখিয়ে দিলেন যে আমিই সংজ্ঞা। এর বেশি যেন কিছু না বলে, ছায়া তা মেনে দিল। কিন্তু শর্ত হল যে, যদি কোনো সময় চুল ধরে টানেন, তবে সে সব বলে দেবে। সংজ্ঞা বাপের বাড়ি চলে গেলেন। কিছুদিন পরে বিশ্বকর্মা আদর করে বললেন, "মা তুমি অনেকদিন আছ এবার বাড়ি যাও। মেয়েকে এত দিন বাবার বাড়ি থাকতে নেই। এতে অনেক রকম কথা হবে। তোমার কাছে তো বটে আমার কাছেও মন্দ ; অমর্যাদার। তুমি একবার ভেবে দেখ।"

সংজ্ঞা বাড়িতে না গিয়ে কুরুদেশে গিয়ে ঘোড়াব রূপ ধরে তপস্যা কবতে লাগল।

সূর্যদেব বিশ্বকর্মার দ্বারে এসে হাজির। সংজ্ঞা কোথায় জানতে চাইলেন। বিশ্বকর্মা বললেন, সংজ্ঞা এসেছিল তাকে তো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি!

সূর্যদেব খুঁজে খুঁজে সংজ্ঞার দেখা পেলেন। সংজ্ঞা তপস্যা করছে। তপস্যায় তাঁর প্রার্থনা যেন তাঁর স্বামীর তেজ বা জ্যোতি কমে যায়। তিনি যেন শান্ত কোমল ও সুন্দর হন। এই মাত্র ইচ্ছা তাঁর সাধনার। সূর্যদেব যেন ভাবিত হলেন, তাঁর প্রতি কোন রাগ বিদ্বেষ হল না। সূর্যদেব বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে জানালেন তাঁর তেজ কমিয়ে দিতে হবে। এর পর কী হল?

দেবতা, ঋষি, দেবর্ষির একসাথে মিলে সূর্যদেবের ধ্যান করতে থাকেন ; অনেক স্তুতি করে জানালেন, "হে দেব, তুমি তোমার নিজের ইচ্ছায় তেজ তোমার সংহার কর।"

এর পর সূর্যদেব নিজের তেজ কমিয়ে দিলেন। সূর্যতেজ থেকে আকাশ, সামময় তেজ থেকে স্বর্গ সৃষ্টি হল। মহামতি তষ্ট্রা, সূর্যতেজ ১৫ ভাগ করে দিলেন। সেই সূর্যতেজ থেকে মহাদেবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র, অগ্নির জন্য শক্তি, কুবেরের জন্য পালকি তৈয়ারি হল। অন্যান্যদের জন্য যেমন—যক্ষ, গর্ন্ধব, বিদ্যা এইসব উগ্র ব্যক্তিদের জন্য তৈয়ারি হল অন্য সব অস্ত্র। স্বয়ং বিশ্বকর্মা তা করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণু ১৬ ভাগ তেজ নিজের কাছে রাখলেন। বিশ্বকর্মা সেই ১৬ ভাগ শক্তিকে আরও ১৫ ভাগ করেছিলেন।

এর পর সূর্য ঘোড়ার রূপ ধরে উত্তর কুরু দেশে সংজ্ঞার সাথে মিলিত হন। সাক্ষাৎ হতেই ঘোড়ারূপী সংজ্ঞার মুখ দিয়ে নাসতা এবং দস্ত নামে দুই ছেলে বেরিয়ে এল। তারপর বর্ম আর খড়্গ নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রেবন্ত নামে এক ছেলে এল। সূর্য তাঁকে নিজের রূপ দেখালেন। এর পরে সংজ্ঞা ও সূর্য তাঁদের আশ্রমে চলে গেলেন। বড়ো ছেলে 'বৈবস্বত মনু', দ্বিতীয় ছেলের নাম 'অভিশাপ' রেখেছিলেন।

ছায়া সংজ্ঞার উৎপন্ন তাই সেও সূর্য্যকন্যা হলেন। বড়ো ছেলে সাবর্ণি ; সে সময় ইন্দ্র জন্ম হলেন সে সময় এই সাবর্ণিও মনু ছিলেন। শনিদেব—ইনিও সূর্য পুত্র শনি গ্রহদের মধ্যে থাকলেন। ছোটো মেয়ে তপতী নামে সংবরণ রাজার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর গর্ভে কুরু নামে সন্তান জন্ম নেয়। বৈবস্বত মনু-র সময় যে সকল দেবতা ঋষি ছিলেন তাদেব নাম যথা—

আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিল্ব, মরুৎ, ভৃগু, অঙ্গিরস প্রভৃতি ৮ জন দেবতা ছিলেন। আদিত্য বসু এবং বিশ্ব ছিলেন কশ্যপ মুনির পুত্র। সাধ্য, বসু, বিশ্ব এঁরা ধর্মপুত্র। মুনি ভৃগুর পুত্রগণ হলেন ভৃগুরা-পরিচিত। অঙ্গিরার সন্তান অঙ্গিরাগণ। স্বর্গকে মরীচি স্বর্গ বলা হয়।

এই সময় মহাত্মা উর্জস্বী ইন্দ্র হয়ে যজ্ঞের অংশ খেতেন। আগে রাজা ছিলেন যাঁরা বর্তমান এবং পরে যাঁরা হবেন তাঁরা সবাই খুব ভালো। সকলের সহস্র চোখ আছে, সকলেই বজ্র ধারণ করেছিলেন। সকলেই তাঁরা 'রাজা বলি' নামে বিদিত। পৃথিবীকে ভূলোক, অন্তরীক্ষ লোক 'দিব' স্বর্গকে (দিব্য) বলে। এই তিন লোককে "ত্রৈলোক্য" বলে। অত্রি, বশিষ্ঠ কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, কুশিক পুত্র বিশ্বামিত্র এবং ঋত্বিক নন্দন জমদগ্নি এঁরা

সাতজন মুনিকে এই সময়ের সপ্তর্ষি বলা হয়। ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, বৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্তি, দিষ্ট, করুষ এবং পুষস্ত্র এই নয়জন বৈবস্বত মুনির বিখ্যাত সন্তানগণ।

★ ৭ম মন্বন্তর বৈবস্বত মনুর সময় কাল।

★ অষ্টম মনু ও তার কথা। ছায়া সংজ্ঞা ও সাবর্ণির কথা আগে বলা হয়েছে। বৈবস্বত মনুর মতো ইনি অষ্টম মনু হবেন। এই সময় রাম, ব্যাস, গালব, দীপ্তিমান, কৃপ, শৃঙ্গ, দ্রোণি এই ৭ জন সপ্তর্ষি হবেন। এই মন্বন্তরের সময় সুতপা অমিতাভ তিনজন ছিলেন মুখ্য দেবতা।

এই দেবতাদের প্রত্যেকেই বিংশকগণ ছিলেন তপস্তপঃ। শত্রু, দ্যুতি, জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাস, দয়িত, ধর্ম, তেজঃ, রশ্মি, বক্রতু ইত্যাদি দেবতারা সুতপা দেবতাদের বিংশকগণ। 'গণ' সম্পর্কে শুনুন। দম, দান্ত, বিত, সোম, বিন্ত প্রভৃতি দেবতাগণ সকলকে এই সময়ের দেবতা বলা হয়। বিরোচনের পুত্র দৈত্যরাজ বলি যিনি এখনও প্রতিজ্ঞা করে পাতালে আছেন তিনিই এই সময়ে ইন্দ্রদেবতা সাবর্ণি মনুর বিরজা অধবীর, নির্মেহ, সত্যবাক কৃতি বিষ্ণু নামের সন্তানেরা সেই সময় রাজা ছিলেন।

★ নবম মনু। দক্ষের ছেলে সাবর্ণ সময়ে যে দেবতা যে ঋষি যে রাজা তাঁদের নাম এই রকম—পারামারীচি, ভর্গ এবং সুধর্মা। দেবতাদের তিন রকম 'গণ'। প্রত্যেক 'গণে'র বারোজন করে দেবতা আছেন।

অগ্নিদেবতার ছেলে কার্তিকেয় তিনিই সেই সময় অদ্ভুত নামে মহাশক্তিমান ইন্দ্র হবেন, তাঁর এক হাজার চোখ। মেধাতিথি, বসু, সত্য, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিমান, সবলব্য, হববাহন এঁরা তখন সপ্তর্ষি হবেন। ধৃষ্টকেতু, বর্হকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবাঃ, অর্চিষ্মান্য ভূরিদ্যু', ও বৃহত্তয় এঁরা দক্ষরাজার ছেলে এবং সাবর্ণ মনুর ছেলে রাজা হবেন।

★ দশম মনু। ব্রহ্মের ছেলে সাবর্ণের সময় সুখাসীন নিরুদ্ধাদি নামে তিনরকম দেবতা ভাবী মনুর মন্বন্তরে ভবিষ্যতের শত শত দেবতা হবেন। ঐ সময় প্রাণীর সংখ্যা একশত হবে। দেবতাদের সংখ্যাও শত শত। সমস্ত রকম ইন্দ্রের শক্তিই তখন ইন্দ্র হবেন। যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন যথা—তপমূর্তি, হবিষ্মান, সুকৃতি, সত্য, অপ্রতিম ও সপ্তম, বশিষ্ঠ এঁরাই সপ্তর্ষি সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ভূমিসেন, বীর্যবান, শতানিক বৃষঙ, অনমিত্র, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুপর্বা এই কয়টি দশম মনুব সন্তানগণ।

বিহঙ্গম, কামগ ও নির্মাণপতি দেবতাদেব তিনটি 'গণ' ছিল। প্রত্যেক 'গণ'-এর তিরিশ শত জন করে দেবতা থাকবেন যাঁরা মাস ঋতু এবং দিন তারাই নির্মাণপতি ছিলেন। রাত্রি হচ্ছে বিহঙ্গম। দেবতা এবং মুহূর্তের মধ্যে যা জন্ম নেয় সেগুলো কামগ দেবতাদের 'গণ'। ভীষণ শক্তিশালী বৃষাধ্য তাঁদের দেবতা হবেন। হবিষ্মান বরিষ্ঠ অরুণ ঋষির ছেলে ঋষ্টি নিশ্চর অনথ মহামুনি বিষ্টি সপ্তম অগ্নিদেবতা এঁরাই সপ্তর্ষি। সর্বত্রগ, সুশর্মা, দেবানীক, পুরুবদ্বয়, হেমধন্বা এবং দৃঢায়ু এরা সেই মনুর ছেলে এবং ভাবী রাজা হবেন। রুদ্রের ছেলে সাবর্ণ মনুর দ্বাদশ মন্বন্তরে যে সমস্ত দেবতা এবং মুনি হবেন যেমন—সুধমা, সুষমা, হরিত, রোহিত এবং সুবর্ণ—সেই মন্বন্তরে এই পাঁচ রকম দেবতার এক একটি গণ এবং প্রত্যেক 'গণের' দশজন করে দেবতা আছেন। এই সময় ঋতধামাকে তাঁরা ইন্দ্র মনে করেন। সপ্তর্ষি হবেন—দ্যুতি, তপস্বী, সুতপা, অপমূর্তি, তপোনিধি,

তপোরতি, অপভৃতি, দেববান, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদুরথ, মিত্রবান, মিত্রবিদ এঁরা মনুর ছেলে রাজা হবেন। সুধর্মা, সুকর্মা, সুশর্মা এঁরা দেবতা। মহাবলযুক্ত শক্তিমান, দিবস্পতি তাদের ইন্দ্র হবেন।

ভবিষ্যতে যাঁরা সপ্তর্ষি হবেন তাঁরা হলেন—ধৃতিমান, অব্যয়, তত্ত্বদশা, নিরুৎসুক, নির্মোহ, সুতপা এবং সপ্তম নিষ্প্রকম্প এই সাতজন ঋষি। চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়তি, নির্ভয়, দৃঢ়, সুনেত্র, যাত্রিবুদ্ধি এবং সব্রত এরা রৌচ্য মনুর সন্তানগণ।

★ রুচি বা রৌচৎ মন্বন্তর হল ত্রয়োদশ সংখ্যা। এই সময়ের পূর্বে ঋষি প্রজাপতি অল্প অল্প আহার খেয়ে অহংকারশূন্য, ভয়শূন্য, অল্প ঘুম সেরে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর গুরুজনরা বললেন, "বাছা! তুমি বিয়ে করনি কেন? এটা তো একটা পবিত্র কাজ। সমস্ত দেবতা, পিতৃপুরুষেরা, ঋষিরা, গৃহস্থরা সকলেই অতিথি সেবা করে স্বর্গ লাভ করেন। স্বাহা মন্ত্রে দেবতাদের স্বধা উচ্চারণ করে পিতৃপুরুষদের বষট মন্ত্র দ্বারা ভূতগণকে সেবা করেন। এই তিন ঋণ ভাগ করে গৃহস্থ হতে হয়। বিয়ে করে গৃহস্থ হওনি বলে প্রতিদিন দেবতা পিতৃপুরুষ, মানুষ এবং সমস্ত প্রাণীদের কাছে ঋণী হয়ে থাকছ। সন্তানের জন্ম না দিয়ে দেবতা, পিতৃপুরুষদের সেবা না করে তুমি মুক্তি পেতে পার না। ওহে বাছা! তোমার যা যা দুঃখ আসবে তা আমরা জানি।"

রুচি বললেন, বিয়ে করলে পাপ হয় এবং দুঃখ পেতে হয় ; সেজন্য আমি বিয়ে করিনি। ইন্দ্রিয়কে সংযত করে যে আত্ম সংযম করা যায় তাতেই মুক্তি পাওয়া যায়।

পিতৃপুরুষেরা বললেন, যাঁরা সংযমী তাঁরা নিশ্চই আত্মা শুদ্ধ করবেন। কিন্তু পুত্র, তুমি যে পথ নিয়েছ এটা কি মুক্তির পথ? দান করলে অশুভ নষ্ট হয়; ভাল মন্দ কাজ মানুষের স্বভাব। পূর্বের জন্মের অনেক খারাপ কাজ করা হয়ে থাকতে পারে, তার দোষ কাটে এই জন্মে। সুখ-দুঃখ ভোগের মধ্য দিয়ে পূর্বজন্মের পাপ ক্ষয় হয়। জ্ঞানীলোকেরা আত্মাকে এইরূপে শুদ্ধ করে থাকেন।

রুচি বললেন "হে পিতামহগণ! বেদে কর্মের যে পথ তাকে অবিদ্যা বলে। আপনারা কি আমাকে সেই অবিদ্যার পথে যেতে বলছেন?"

পিতৃপুরুষ বললেন, এই কর্মপথ যে অবিদ্যার তা ঠিক আবার কর্মের জন্যই এই পাপ কথাকে মিথ্যা বলা হয়। কর্ম বা সৎকাজে কি মন্দ ফল হতে পারে? কর্তব্য কাজ না করা যে কুকাজ একথা সত্য কিনা? বিষ্ঠ কখনো কখনো মানুষের উপকার করে। অবিদ্যাও তেমনি উপকার করে। সুতরাং তুমি বিয়ে কর। লৌকিক ধর্ম ভালো করে জান, যেন জন্ম বিফলে না যায়।

রুচি বললেন, আমার বয়স হয়েছে কে আমাকে মেয়ে দিবে? আমি তো গরিব, আমার পক্ষে বিয়ে করা অসম্ভব!

পিতৃপুরুষ বলতে 'হে বাছা! তুমি যদি আমাদের কথা শোন ভাল নচেৎ আমাদের পতন হবে। অধোগতি হবে। এই বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রুচি তখন কী করি, কোথায় যাই সাত-পাঁচ ভাবনায় পড়ে যান। শেষে তপস্যায় মগ্ন হয়ে যান। কঠোর তপস্যায় একশত বৎসর কেটে গেল, একদিন ব্রহ্মা দর্শন দিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! তুমি প্রজাপতি হবে প্রজা সৃষ্টি করবে। সন্তান জন্ম দিবে সুখে সংসার করে

সৎকাজের অধিকার পেয়ে যাবে ; তারপর সিদ্ধিলাভ হবে। সেইজন্য পিতৃপুরুষেরা 'তুমি বিয়ে কর' এইরূপ বলেছেন।" এই কথা বলে ব্রহ্মা চলে গেলেন। রুচি তখন হাঁটু গেড়ে বসে, মাথা নীচু করে পিতৃপুরুষের স্তব করেছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ২ অংশের ৯৭ অধ্যায়ে ঐ স্তবমালা আছে।

রুচি, প্রম্লোচা নামে সুন্দরী (অপ্সরার কল্যাণে) বরুণের ছেলে পুষ্কর-এর কন্যা যামিনি কে বিবাহ করেন। সেই রুচির ছেলে রৌচ মনু রৌচের মহাশক্তিমান অনেক ছেলে ছিল। তাঁরা গৌরবের সঙ্গে পৃথিবী পালন করতেন। পিতৃপুরুষের স্তব পাঠ করলে পূজাপাঠ করলে মহাপুণ্য হয়, রোগমুক্তি হয়, সন্তান লাভ হয়।

শাস্ত্রে লেখা আছে,ব্রহ্মা, সকল দেবতা ইন্দ্রাদি এবং দক্ষাদি সকলকেই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে ও শ্রাদ্ধক্রিয়া দ্বারা সেবা করতে হয়। ইহা বেদ, পুরাণ, সংহিতার নির্দেশ।

মুনিশ্রেষ্ঠ অঙ্গিরার ভূতি নামে এক ছেলে ছিলেন তিনি ছিলেন ভীষণ রাগী। সেই রাগী মুনির আশ্রমে হাওয়া-বাতাস খুব জোরে বইত না, সূর্য রশ্মি বেশি দিত না। শীতকালে শীত বেশি হত না এবং সারাবছর আশ্রমে নানান রকমের ফল ফুলে শোভা পেত। সর্বদা যেন কোনো অদৃশ্য প্রহরী আশ্রম পাহারা দিচ্ছে। এতটুকু ত্রুটি হলেই অনর্থ ঘটে যাবে। মুনিবর একদিন তাঁর ভাইকে দেখতে যাবেন, সেখানে যজ্ঞকর্ম আছে ; অতএব আশ্রম ছেড়ে যেতে হবে। আশ্রমের যজ্ঞ অগ্নি জ্বালিয়ে রাখার জন্য আগুন না নিভে যায় শান্তি নামে শিষ্যকে দায়িত্ব দিয়ে চলে যান। শিষ্য শান্তি আশ্রমে আগুন আগলাচ্ছেন" অন্য সবকিছু ঠিকই ছিল। কিন্তু একদিন হঠাৎ আগুন নিভে গেল। শান্তি খুব দুঃখিত ও ভীত হয়ে অগ্নিদেবতার ধ্যান করতে লাগলেন।

হাত জোড় করে অগ্নিদেবতার স্তবমালা পাঠ করতে লাগলেন—যিনি রাজসূয় যজ্ঞে ছয় মূর্তি ধারণ করেন তাঁকে নমস্কাব। যিনি সমস্ত দেবতার কাজ ভালো করে দেন যিনি সর্বদা, এই পৃথিবী রক্ষাকারী শুক্রসম দেবতা তোমায় নমস্কার। তুমি সকল দেবতার মুখস্বরূপ, তোমায় নমস্কার। তোমার মধ্য দিয়ে সকল দেবতা ঘি খেয়ে থাকেন, তোমায় নমস্কার। যজ্ঞের সময় তোমার মধ্যে যজ্ঞ হবি পড়ে, মেঘের সৃষ্টি হয়, জল হয়, পৃথিবী শস্যবতী হয়। হে বাতাসের বন্ধু তোমায় নমস্কার। 'হে অগ্নি' ! মানুষ তোমার সৃষ্টি করা ওষধিতে যে যজ্ঞ করেন—সেই যজ্ঞের মধ্যে দেবতা-দৈত্য, রাক্ষস এঁদের সকলকে ডাকা হয়। হে অগ্নিদেব তুমি সেই সমস্ত যজ্ঞের কারণ—তোমায় নমস্কার।

তুমি সকলকে সৃষ্টি কর। তোমার আশীর্বাদ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—দেবতা দানব যক্ষ দৈত্য, গন্ধর্ব, মানুষ, পশুপাখি, সরীসৃপ ; এদের তুমিই রক্ষা কর। তোমার থেকে এরা সৃষ্টি হয়। তোমার মধ্যে এরা মিশে আছেন এইভাবে ভগবান সূর্যদেবের আরাধনা করেছিলেন সেই শিষ্য শান্তি!

সূর্যদেব বললেন, "কী চাই হে ব্রাহ্মণ? তুমি যে ভক্তি-স্তুতি করেছ তাতে আমি খুশি। আমি তোমাকে বর দিতে চাই, বল কী চাই।"

শান্তি করজোড়ে বললেন, আমার গুরু অপুত্রক, তাঁকে পুত্র দিন তিনি সর্বসুখ লাভ করুন, যজ্ঞ অগ্নি পুনঃ জ্বালিয়ে দিন।

'তথাস্তু', সূর্যদেব বললেন, কিন্তু । তোমার জন্য কিছু চাইলে না তো? আমি বড়োই প্রীতি লাভ করলাম। সূর্যদেব বললেন, "তোমার গুরুর মহাবীর্যবান ভৌত নামে ছেলে হবে। সে রাজা হবে, তোমার গুরু খুব জ্ঞানী। তাই সমস্ত জগতে তার বন্ধুত্ব হবে। সেই ভৌত মুনির মনু নামে ছেলে, মহাবীর সুচি সেই সময় ইন্দ্র হবেন। সেই সময়ের দেবতাগণ— চক্ষু, কনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজির এবং ধারাবৃক্ষ এই পাঁচজন দেবতা ছিলেন সাতজন ঋষি— অগ্নীব, অগ্নিবাহু, শুচি, মুক্ত, মাধব, শত্রু এবং অজিত।

মনুর ছেলেরা হবেন—গুরু, গম্ভীর, ভরত, অনুগ্রহ, স্ত্রীমানি, প্রতীব, বিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী, সুবল, ব্রধ্ন এঁরা সবাই ভৌত মনুর পুত্রগণ।

চৌদ্দ মন্বন্তর কথা অতি সংক্ষেপে এখানে শেষ করলাম।

চৌদ্দ মনু'র নামগুলি যথা—ব্রহ্মা, স্বয়ম্ভুব, স্বরোচি উত্তম ঔত্তম মনু—তামস—বৈকাজ—চাক্ষুষ বৈবস্বত মনু—সাবর্ণি ইন্দ্র—সাবর্ণ—দক্ষপুত্র ব্রহ্মপুত্র—সাবর্ণ—সাবর্ণ রুদ্রপুত্র—রৌচমনু ভৌতমনু। মন্বন্তর কালে যাঁরা ইন্দ্র ছিলেন তাঁদের নামগুলি রিপসিচৎ। সুশান্তি, জল, দিবস্পতি, মহাবলশিখা, রিঞ্জ, উর্জস্বী, বলিরাজ কার্তিক, ঋতধামা, শুচি, ইন্দ্রদেব—এই ইন্দ্রগণ সকল দেবতার ক্ষমতা থেকে আলাদা। বেশি শক্তিধর ছিলেন। ইন্দ্র—অর্থাৎ দেবতাদের রাজা।

সপ্তম মনু বৈবস্বত কাল থেকে অর্থাৎ ত্রেতাযুগের প্রথম থেকে সৃষ্টির জাগতিক বিকাশ আরম্ভ হয়েছে শাস্ত্র মতে। নগর, গ্রাম, জনপদ, সমাজ, চতুর্বর্ণাশ্রম ইত্যাদির পত্তন ঘটেছে। সভ্যতার সূত্রপাত গড়ে উঠেছে। দুই যুগের মহান রাজা রাম + কৃষ্ণ অতঃপর কলিকাল।

আমি—রাম এবং কৃষ্ণ সম্পর্কে বলে ঐ দুই যুগের কথা শেষ করে দেব। যেহেতু রামচন্দ্র ও তাঁর সম্পর্কে তেমনি কৃষ্ণ সম্পর্কে জানলেই যুগোপম সব কিছু জানা হয়ে যায়।

সত্যযুগ কেটে গেলে ত্রেতা যুগ বলা হয়। সত্য যুগের আয়ুষ্কাল "এক সহস্র দেব যুগ।" এক সহস্রদেব যুগ অর্থাৎ মন্বন্তর কালের কিছু কম সময় যুগের বয়সকাল বুঝতে হয়। এক একজন মনুর রাজত্বকাল সহস্র দেবযুগ। এক সহস্র দেবযুগ যাবৎ এক মনু তাঁর বংশপরম্পরা রাজত্ব করে গেছেন, খুব হেরফের ঘটতে চোখে পড়েনি।

অব্যক্ত হতে পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি এই হল সৃষ্টির আদি কথা!

ব্রহ্মার তিনটি রূপ—সৃষ্টিতে চতুর্মুখ।

কালরূপে অন্তক। বিষ্ণুরূপে সহস্রশীর্ষ এক পুরুষ। তিনি পুরুষ, পুরে অবস্থান করেন তাই পুরুষ। পুরুষ পুরে সত্যগুণকে আশ্রয় করে থাকেন। সত্য বলতে আমরা যেমন বুঝি জানি তাই।

মনু বলতে এক একজন নরনাথকে বোঝায়। মনু এবং তাঁর বংশ মিলে মন্বন্তর শেষ হয়ে থাকে। এবং পরবর্তী মন্বন্তর শুরু হয়। এই আরম্ভ ও শেষ ঠিক দিনের শেষে সূর্য ধীরে অস্তমিত হয়ে যায়; কখনো সূর্যের প্রকাশ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠে, আবার মেঘ ছায়া ভাব হতে হতে নেমে আসে অন্ধকার—দিনের শেষে। মন্বন্তর—সময়কালীন রাজার ব্যক্তিত্ব, শৌর্য, বীর্য অনুসারে হয়েই থাকে মন্বন্তরের শেষ।

চতুর্যুগ সহস্রকাল অবসানে পৃথিবী জলমগ্ন হয়। চৌদ্দ মন্বন্তর শেষ হলে একেই কল্প বলে। কল্প অন্তে আবার নতুন করে সবকিছুই হবে। এক কল্পকালের দেবতাদেব সংখ্যা বলা হয়, **তিন শত কোটি বিরানব্বই হাজার একশত আট**। এঁরা সবাইকে অন্তরীক্ষব্যাপী বৈমানিক বলা হয়। মানুষ জন্মগ্রহণ করে যে-কোনো 'গণ' নিয়ে, যেমন দেবগণ—নরগণ —রাক্ষসগণ ইত্যাদি। গোত্র হল একটি শ্রেষ্ঠ প্রকরণ। আমরা যে গোত্র ধারণ করি তা কোনো-না-কোনো মহান ঋষির নাম বরাবব।

এঁরাই পিতৃপুরুষ নামে অন্তরীক্ষবাসী। এই পিতৃপুরষদের উদ্দেশ্যে তর্পণবিধি শাস্ত্রীয় বিধান। সকলের কাছে অবশ্য পালনীয় কর্তব্যকর্ম নামে বিধান আছে।

গোত্র প্রকরণ ও অন্যান্য কিছু জানবার জন্য পাঠ করুন **আহ্নিক কৃত্য**।

যেহেতু তর্পণ সকলেব জন্য নির্দিষ্ট তাই মার্কণ্ডেয় পুরাণের ২ অংশ ৯৫ - ৯৬ -৯৭ অধ্যায় মোতাবেক বাংলা লিখলাম।

তর্পণ ঃ শ্রাদ্ধে যাঁরা অধিদেবতা হয়ে বাস করেন সেই পিতৃপুরুষদের আমি প্রণাম করি।

স্বর্গে থেকে যাঁরা মুক্তি পেতে চান তাঁদের জন্য যে মহর্ষিরা, তাঁদের মুক্তি দান করেন আমি তাঁদেরকে প্রণাম করি। রাজা মহারাজারা যে পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধেব অন্ন দিয়ে থাকেন আমি সেই পিতৃপুরুষদের প্রণাম করি। নিজের কাজের সাথে যুক্ত থাকা বৈশ্যরা পৃথিবীতে যাঁদের ফুল ধূপ ধুনা দিয়ে, ভাত জল দিয়ে সন্তুষ্ট করেন, সেই পিতৃপুরুষদের আমি প্রণাম করি। **পাতালে যেসব সাপেরা অহংকার ত্যাগ করে আছেন, সেইসব পিতৃপুরুষদের আমি প্রণাম করি**। পাতালে যেসব সাপেরা থাকে তাদের ভোগ ও শ্রাদ্ধ দিয়ে আমি তাদের প্রণাম করি। যাঁরা দেবলোকে এবং আকাশে থাকেন আর পৃথিবীতে যাঁরা রাজাদের দ্বারা পূজা পান সেই পিতৃপুরুষদের আমি প্রণাম করি। আমার এই পূজা যেন তাঁরা গ্রহণ করেন। সত্যিকারের আত্মা এবং যাঁরা আকাশে থাকেন যোগী ঋষি যাঁদের শুদ্ধমনে আরাধনা করা হয়, আমি তাঁদের প্রণাম করি। স্বর্গে যাঁরা আছেন, যা কামনা করা হয়, চাওয়া হলে তার ফল দেবাব জন্য স্বধা মন্ত্র গ্রহণ কবেন, যাঁরা সকলকে ইষ্টনাম দিতে পারেন, যে দানে কোনো পাবার আশা করেন না ; সেই দানকাবীকে মুক্তি দিয়ে থাকেন—সেই পিতৃপুরুষদের প্রণাম করি। যাঁরা প্রার্থীদেব সকল প্রার্থনা পূরণ কবেন, যাঁবা রাজত্ব, দেবত্ব, তার থেকে বেশি সন্তান শক্তি, বাড়ি, টাকা পয়সা সকল প্রার্থিত বস্তু দান করেন ; আমি তাঁদের প্রণাম করি। আমার পূজায় যেন তাঁরা প্রীত হন, এই প্রার্থনা করি। যেসব পিতৃপুরুষ চাঁদেব কিরণে আকাশে থাকেন, তাঁরা যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। **যাঁরা ব্রাহ্মণের শরীর থেকে খাবার খান**, পিণ্ডদান করলে যাঁরা সন্তুষ্ট হন, সেই পিতৃপুরুষদের সন্তুষ্টির জন্য যে অন্নজল দেওয়া হয় তাঁরা সন্তুষ্ট হলে, আমি শান্তি পাব। দেবতারা গন্ডারের মাংস, কালো তিল পেলে তৃপ্ত হন, মহর্ষিরা কালো শাক পেলে তৃপ্ত হন, পিতৃপুরুষেরা যে প্রিয় খাবার ভালোবাসেন সেই খাবার ফলমূল দিয়ে আমি শ্রাদ্ধ দান করছি তৃপ্ত হোন। যাঁরা প্রতিদিন পূজা করেন ও পূজা পান, যে পিতৃপুরুষরা শাপলা ফুলের ন্যায় শুভ্র হয়ে ব্রাহ্মণদের পূজা পান, যাঁরা নতুন সূর্যের মতো লাল হয়ে ক্ষত্রিয়ের পূজা পান, যাঁরা নীল রং হয়ে শূদ্রদের পূজা পান সেই সমস্ত

পিতৃপুরুষদের আমি প্রণাম জানাই। হে পিতৃপুরুষগণ আমার দেওয়া ফল, ফুল, সুগন্ধি ধূপ, ধুনা, জল, হোমের দ্বারা তৃপ্ত হউন। আমার শ্রদ্ধা সহ প্রণাম নিন।

যাঁরা খুব সন্তুষ্ট হয়ে দেবতাদের নিকট দেয় প্রসাদ গ্রহণ করেন, তৃপ্ত হয়েন এবং নানা ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেন, যাঁদের দেবরাজ ইন্দ্রও পূজা করেন, সেই পিতৃপুরুষদের আমি প্রণাম জানাই। যাঁরা অসুরদের ধ্বংস করেন, প্রজাদের রক্ষা করেন, যাঁরা দেবতাদের আদি পুরুষ, যাঁদের দেবরাজ ইন্দ্রও পূজা করেন আমি তাঁদের প্রণাম করি।

হে ! অগ্নিদাত্তা—বার্হষদ—আজ্যপা, সোমপা পিতৃপুরুষেরা আমার তর্পণ গ্রহণ করুন। আজ্যপা পিতৃপুরুষেরা পশ্চিম দিকে, সোমপা উত্তর দিকে, রাক্ষস ভূত প্রেত পিশাচ অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমি প্রণাম জানাই।

যে পিতৃপুরুষেরা বিশ্ব, বিশ্বভুক, আরাধ্য ধর্ম, ধন্য, শুভানন, ভূতিদ, ভূতকৃত, ভূতি এই নয় রকম 'গণ' তাদের রক্ষাকারী যে যম তিনি যেন আমাকে সব দিক থেকে রক্ষা করেন।

কল্যাণ, কল্যাণকর্তা, কল্য তারাশ্রয় কল্যতা হেতু এবং অবোধ—এই ছয় রকম 'গণ' যে পিতৃপুরুষদের বর, বরেণ্য, বরদ, পুষ্টিদ, তুষ্টিদ, বিশ্ব পাতা এবং ধাতা এই সাতরকম 'গণ' আছে মহান, মহাত্মা, মোহিত, মোহিমবান এবং মহাবল পিতৃপুরুষদের পাপ নাশ করেন, পাঁচ রকম 'গণ' সুখদ ধনদ ধর্মদ, ও ভূতিদ, গিহ্নদ সব মিলে যে ৩২ 'গণ' আছে পিতৃপুরুষ যাঁরা সমস্ত জগৎ জুড়ে আছেন, তাঁরা যেন আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন। আমি তাঁদের প্রণাম করি। তাঁরা যেন আমার সর্ব মঙ্গলসাধন করেন। আমার এই শ্রাদ্ধ আপনাদের তৃপ্ত করুক। আমার সাধ্যমতো অকৃপণ ভাবে এই শ্রাদ্ধ অপর্ণ করছি—তৃপ্ত হোন, তৃপ্ত হোন। বষট তুভ্যাম্, বষট তুভ্যাম্। ইতি "তর্পণ-শ্রাদ্ধমালা"। পৃথিবীতে মানব জাতির জন্য 'বেদ' আদি ধর্মগ্রন্থ। বিবেকানন্দ বলেছেন, সকল ধর্মের সূতিকাগার হল বেদ। বেদ ভগবান ব্রহ্মার সৃষ্টি, তাই বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা হয় দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিদের ধ্যানে প্রতিভাত মহাসত্যই বেদ নামে রচিত। ইহা প্রথমে ঋষি বংশীয়গণ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং তাহা যজ্ঞ কর্মে ব্যবহার করিতেন।

জ্ঞানকে পরে ইহা সংকলিত আকারে বেদ সংহিতা নামে বিদিত।

এই বেদ গ্রন্থ কেহ কষ্ট সাধ্য কল্পনা করিয়া রচনা করেননি।

ব্রহ্মার যজ্ঞ বিধান সৃষ্টি কেন?

সত্যনিষ্ঠ ভাবে জীবনযাপন করত নিজের স্বরূপ জেনে নিজেকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির যোগ্য করে তোলাই মানুষ জন্মের সার্থকতা। এই বোধ জন্মানোর জন্যই যজ্ঞের আয়োজন। এই যজ্ঞে সূর্যই 'যজ্ঞেশ্বর'।

সকল পূজা অর্চনায় ও [illegible]কার্যে হোম করার নিয়ম আছে এইজন্য যে ; যজ্ঞেশ্বর অগ্নিদেবকে স্ম[illegible] করা এবং মনস্কামনা [illegible]বেদন করা। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যজ্ঞ করতেন, যজ্ঞের দ্বারা [illegible] জাগতিক প্রয়োজন সি[illegible] হত। এই নিয়ম সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগ জুড়ে বিদ্যমান ছি[illegible] সকলের ধর্মপুস্তক ও শাস্ত্রে [illegible]হা নির্দিষ্ট দেখা যায়।

এই য[illegible] দ্বারা ঋষিগণ সকল সাধন করতেন, যেমন—পুত্রলাভ, রাজ্যলাভ, ব্রহ্মত্বলাভ ইন্দ্রত্বলাভ[illegible]ক্ষলাভ, জন্ম ও জন্মের বিবর্তন ; অজন্মা, খরা, শস্য উৎপাদন সবই যজ্ঞ

দ্বারা নিষ্পন্ন হত। যেহেতু ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগ থেকে সৃষ্টির যথাযথ বিকাশ হয়েছে; তাই ত্রেতাযুগকে কেন্দ্র করে সবকিছু জানব।

ত্রেতা যুগের শ্রেষ্ঠ রঘু বংশোদ্ভব শ্রীরামচন্দ্র ভগবান রূপে (নর নারায়ণ) তাঁকে মূল বিষয় বলে বলতে চাই ত্রেতাযুগের ইতিবৃত্ত।

অযোধ্যার 'রাম' এই চরিত্র নিয়ে সকল মানুষের অন্তর উদ্বেলিত হয়।

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম সবকো সম্মতি দো ভগওয়ান"। মহাত্মা গান্ধি এই গীত গাইতেন। মহামুনি বাল্মীকি প্রণীত যে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ তা হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র গ্রন্থ। উত্তরকাণ্ড বা পরিশিষ্ট বলে বিদিত যে অদ্ভুত রামায়ণ তার বিষয়গুলিও অদ্ভুত। ইহা কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের নিকট অতি আদরণীয়।

অদ্ভুত রামায়ণে আছে ঋষিশোণিত হতে সীতার জন্ম। সহস্র স্কন্ধ রাবণ ও রামের যুদ্ধ বর্ণনা আছে। সীতার অসীতারূপ ধারণ এবং রামচন্দ্র কর্তৃক সীতার স্তবস্তুতি অতি চমৎকার এবং বেশ ভাবায়। যুদ্ধে রামচন্দ্র সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েন। সীতার যুদ্ধে অবতীর্ণ এবং রাবণ বধ কাহিনী আছে। যেমন দেবী দুর্গা মহিষাসুর মর্দন করেছিলেন দেবতাদের মঙ্গলের জন্য তেমনি সীতা রাবণ বধ করেছিলেন, পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য।

সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের পর সীতার মানসিক চাঞ্চল্যতা নিয়ে যে বর্ণনা দেখুন—

"রাবণের কাটামুণ্ড করিয়া গ্রহণ।
করিতে কন্দুক ক্রীড়া স্থির কৈলা মন।।
আচম্বিতে সেই মহা ঘোর রণস্থলে।
জন্মিল সহস্র মাতৃকা সকলে।।
সকলে বিকটাকার দেখি লাগে ভয়।
করয়ে কন্দুক ক্রীড়া আনন্দ হৃদয়।।
প্রলয়কাল যেন হইল উপস্থিত।
এইবার সকলেই মরিবে নিশ্চিত।।
জানাইল মত্যুঞ্জয়ে সকল গোহারী।
অন্যথায় পরিত্রাণ দেখিতে যে নারি।।
আইলেন রণস্থলে মহাদেব স্বয়ং আপনি।
দেববাক্য শুনি ভয় হৃদয়েতে মানি।।
সর্বদেব—'বল' কৈল তাহাতে সঞ্চালন।
নিজে হয়ে শবাকার ভূমিতে পতন।।
বিশ্বম্ভর হয়ে শিব পদে কৈল স্থিতি।
পৃথিবী তাহাতে সুস্থ হইল প্রকৃতি।।
ধরণী সুতার নৃত্যে যখন ধরণী।
আপনি হইলা অতি বিষণ্ণ বদনী।।
সেই সীতার পদশব্দ যতেক ঘর্ষণ।
নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘোর করি দরশন।।

অন্তরেতে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া।
করিতে লাগিল ধ্যান সে-রূপ চিন্তিয়া।।
ইন্দ্রাদি দেবগণ চিন্তিয়া মনেতে।
ত্রিভুবন নাশ হয় লাগিল ভাবিতে।।
জয় সীতা জয় সীতা সীতা জয় গান।
মরিল সহস্রস্কন্ধ রাবণ সীতাই কারণ।।

এই সীতাদেবী মিথিলা রাজা জনক কন্যা নামে বিদিতা। ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল সীতার বিবাহ সন্ধি। মনুষ্য দূরে থাকুক যে ধনু সুরাসুর, যক্ষরক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও উরগ কেহই আকর্ষণ উত্তোলন করতে পারেননি অথবা এতে জ্যা যোজন ও সংযোজন করতে কেউ পারেননি।

সেই ধনু রামচন্দ্র জ্যা সংযোজন পূর্বক ভঙ্গ করেছিলেন। জনক রাজা ঋষি বিশ্বামিত্রের অনুমতি নিয়ে অযোধ্যায় রাজা দশরথকে আনয়ন হেতু দূত প্রেরণ ও রথ প্রেরণ করেছিলেন। জনকের ইচ্ছা, তাঁর উপস্থিতিতে সীতার বিবাহ সম্পন্ন করতে।

পথে তিনরাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর রাজা দশরথ মিথিলা নগরীতে পৌঁছোলেন। রাজা দশরথ সভাস্থ হয়ে সমাদরে উপবেশন করে বললেন, "মহারাজ! ভগবান বশিষ্ঠ আমাদের কুলগুরু। আমার সকল কার্যে মুখে যা বলার ইনিই বলিয়া থাকেন, ইহা আপনার অবিদিত নহে। এক্ষণে মহর্ষি বশিষ্ঠ ! ইনি বিশ্বামিত্রের অনুমতিক্রমে আমার কুলপর্যায় কীর্তন করিবেন।

ভগবান বশিষ্ঠ বললেন, "মহারাজ! প্রমাণের ইহা অগোচর, ব্রহ্ম হইতে অবিনাশী ব্রহ্মার উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ জন্ম নেন।"

অদ্ভুত রামায়ণ থেকে বাল্মীকি প্রণীত যে সকল পরিচয় তাহা এইরূপ যথা—কশ্যপের পুত্র বিবস্ব। বিবস্ব হতে মনু উৎপন্ন হন। এই মনু প্রজাপতি নামে অভিহিত। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু ।এই ইক্ষ্বাকু অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকু পুত্র কুক্ষি, কুক্ষি পুত্র বিকুক্ষি। বিকুক্ষি পুত্র বান, বানপুত্র অনুরণ্য। অনুরণ্য পুত্র পৃথু। পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কু পুত্র ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার পুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র সুগন্ধি। সুগন্ধির দুই পুত্র ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। ধ্রুবসন্ধির পুত্র যশস্বী "ভরত"। এই ভরত রাজার নাম অনুসারে ভারতবর্ষ নাম হয়েছে। ভরতপুত্র মহাতেজা আসিত। এই আসিতের বিপক্ষে হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শাশীবান্দগণ উত্থিত আক্রমণ বা আক্রান্ত হয়েছিল। দুর্বল আসিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দুই স্ত্রীসহ হিমাচলে গমন করেন ও মারা যান। প্রবাদ আছে, আসিতের স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন অপরজনের গর্ভ নষ্ট করার জন্য বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু ভৃগুনন্দন ঊর্বঋষির কৃপায় মহিষী কালিন্দীর এক পুত্র জন্মায়। যে বিষ ভক্ষিত হয়েছিল তাও নির্গত হয়। স-বিষ বা গর তাই সগর নাম হয়েছিল। সগরপুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জপুত্র অংশুমান। অংশুমান পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। ভগীরথপুত্র কাকুৎস্থ। কাকুৎস্থপুত্র রঘু। রঘুর পুত্র প্রবৃদ্ধ। ইনি মাংসাশী রাক্ষস ছিলেন। ইঁহারই নাম পরে কল্মষপাদ হয়েছিল। ইঁহার পুত্রের নাম শঙ্খন। শঙ্খনের পুত্র সুদর্শন। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ। অগ্নির পুত্র শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র মরু।

মরুর পুত্র প্রশুশুক। প্রশুশুকের পুত্র অম্বরীশ। অম্বরীশ-পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতিপুত্র নাভাগ। নাভাগের পুত্র 'অজ'। অজপুত্র মহারাজ এই দশরথ।

রামলক্ষ্মণ ইঁহারই আত্মজ।

মহামুনি বশিষ্ঠ এইবার বললেন, "মহারাজ জনক এই পরম্পরা বংশের পরিশুদ্ধ মান মহাবীর মহাধার্মিক ও সত্যনিষ্ঠ। ইঁহারা সকল ইক্ষ্বাকুদিগের কুলভূষণ সন্দেহ নেই। রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে আপনার কন্যাদ্বয়ের শুভ পরিণয় অতি গৌরবের। আপনি অনুরূপ পাত্রে, আপনার রূপগুণসম্পন্না কন্যাদের সম্প্রদান করুন।" মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন "ভগবন", কন্যাদান কালে কুল পরিচয় দান করা সদ্বংশীয়দের অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং, আমিও আমাদিগের কুলক্রম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।" নিমি নামে অদ্বিতীয় বীর ধর্মপরায়ণ এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বীয় কর্মবলে ত্রিলোকমধ্যে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করেন।

তাঁহার পুত্র মিথি। মিথির পুত্র জনক। ইঁহার নামানুসারে আমাদের বংশ পরম্পরা সকলেই জনক নামে আহুত হয়ে থাকেন। জনকের পুত্র উদাবসু। উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্ধন। নন্দিবর্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু। সুকেতুর পুত্র—মহাবল দেবরাত।

রাজর্ষি দেবরাতের পুত্র বৃহদ্রথ। বৃহদ্রথের পুত্র মহাপ্রতাপ মহাবীর। মহাবীরের পুত্র সুধীর ও সুধৃতি। সুধৃতি থেকে ধার্মিক ধৃষ্টকেতু। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্যশ্ব। হর্যশ্বের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রতীন্ধক। প্রতীন্ধকের পুত্র মহাবল কীর্তিরথ। কীর্তিরথ থেকে দেবমীঢ় উৎপন্ন হয়। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ।

বিবুধের পুত্র মহীধ্রক। মহীধ্রকের পুত্র স্বর্ণরোমণ। স্বর্ণরোমণের পুত্র হ্রস্বরোমণ। ইঁহার দুই পুত্র, তার মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ। আমার ভ্রাতা বীরকুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমার পিতা বৃদ্ধ হওয়ায় আমার উপর রাজ দায়িত্ব বিদ্যমান। তিনি অর্থাৎ পিতা বানপ্রস্থ গিয়েছেন। পরে তিনি লোকলীলা সংবরণ করেন। বর্তমান **কুশধ্বজ সাংকাশ্যার রাজা**। সে এক ইতিহাস। সুধন্বা নামে এক মহাবল এসে মিথিলা অবরোধ করেন এবং বলেন, হরধনু ও জানকী যেন তাকে অর্পণ করি। আমি রাজি হইনি। এর ফলে যুদ্ধ। ঐ দুষ্টকে নিধন করে কুশধ্বজকে তাব রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেছি। অনন্তব বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ দেবের অনুমতি নিয়ে রাজা জনক তাঁর কন্যাদ্বয়কে বাম-লক্ষ্মণের হস্তে সম্প্রদান করলেন। রামচন্দ্র—সীতা, লক্ষ্মণ, উর্মিলার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হল।

এই দুইটি রাজ পরিবারের যে বংশ পরিচয় তাতে ত্রেতাযুগের পরিচয়সমূহ জ্ঞাত হওয়া যায়। এইসব রাজাদের রাজত্ব জুড়ে সকল সমাজব্যবস্থা, ধর্মাধর্ম, আচার-আচরণ সকল কর্মকাণ্ড, জীবনযাপন প্রণালী সবিশেষে জানা যায়। অতএব বিশেষ শিখিয়ে কলেবর বৃদ্ধি করবার প্রয়োজন নেই।

দ্বাপর যুগ—শ্রীকৃষ্ণ মহিমায় অত্যুজ্জ্বল। আসুন, এ বিষয় কিছু অবগত হওয়া যাক। 'দ্বাপর যুগ' সম্পর্কে শিব পুরাণে একটি শ্লোক আছে, বাংলায় তার মানে হল—সত্যে ব্রহ্মা, দ্বাপরে বিষ্ণু, ত্রেতায় সূর্য, কলিতে রুদ্র বা শিব।

প্রায় পুরাণে আছে সত্যের পর ত্রেতাযুগ।

কিন্তু মৎস্য পুরাণে দেখা যায়—

ধ্যায়েৎ কৃৎ এ যোজন যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াম্
দ্বাপরে অর্চয়ন কলৌ দান কর্মণি।

এইভাবে বিভিন্নতা অনেক ক্ষেত্রে আছে। এ নিয়ে আমাদের কোন্‌টা ঠিক-বেঠিক বোঝবার অবকাশ নেই, তাই তো শাস্ত্রকে ধরতে হবে। কোন্ শাস্ত্র? বেদবিহিত শাস্ত্র নিশ্চিত ভাবে। গীতা, উপনিষদ যে অনুশাসনে 'ঋদ্ধ' সেই শাস্ত্রই মুখ্য বিবেচিত। সেই শাস্ত্র যাকে বিবেকানন্দ বলেছেন, বেদ হল সকলের, বিশ্বের সকল ধর্মের সৃতিকাগার। আমরা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাদিতে ইতিহাস-বাংলা-সাহিত্য প্রভৃতিতে দেখি বৌদ্ধযুগে চরিতামৃত গ্রন্থ উৎকল, বঙ্গ বৃন্দাবন উত্তর ভারতময় প্রচারিত ছিল কোন্ গুণে? যেহেতু কৃষ্ণদাস উত্তর ভারতের লোক, তাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ কোন্‌সূত্রে লিখেছিলেন? সেসব মহা ইতিহাস এখানে বলার সুযোগ নেই।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতক জুড়ে ছিল বৈষ্ণব ভাবনার যুগ। শ্রীকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণ বা রাধাবল্লভী প্রেম রুদ্র ক্ষত্রিয়দের বৈষ্ণবী প্রেম ; সবই একাকার। দেখা যায়, বৌদ্ধযুগীয় ভাগবত আর কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি মথুরা বৃন্দাবন উৎকল, বঙ্গ উত্তর ভারতময় এক জগৎ সৃষ্টি করেছে। যেহেতু কৃষ্ণ যুগটি ভাগবত গ্রন্থময় দেখছি ; তাই নিমি রাজার স্মরণ করছি আর একবার। ঋষভনন্দন ৯ জন যোগীন্দ্রের পরিচয় জানা দরকার।

ভাগবতের একাদশ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখুন।

নারদ মুনি ব্যাসদেবকে ভাগবত উপদেশ দিচ্ছেন ; স্বয়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত নামে এক পুত্র ছিল। তাঁর পুত্র অগ্নিধ্র। অগ্নিধ্রপুত্র নাভি। নাভির পুত্র ঋষভ। এই ঋষভ বাসুদেবের অংশ এইভাবে বুদ্ধগণ বর্ণনা করেন। তাঁর একশত সন্তান ছিলেন। তাঁরা সবাই বেদ পারঙ্গম বলে বিদিত। ভরত রাজা জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। এই ভরতের নামে 'ভারতবর্ষ' নাম হয়েছে। মহারাজ ভরত বহুকাল পৃথিবী ভোগ করেন। পরে গৃহত্যাগ করেছিলেন। বানপ্রস্থ গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ বানপ্রস্থে গিয়েছিলেন রাজা ভরত।

এই বানপ্রস্থকালীন হরিণীর উপাখ্যান তাঁকে যেন অমর করেছে। রাজা 'ভরত' শ্রীহরির আরাধনা করেই, তিন জন্ম অন্তে পরম ভাগবত হয়েছিলেন। বাকি নিরানব্বইজন সন্তানের কথা শুনুন—৯ জন ব্রহ্মাবর্তনাদি নয় ভূমগুলের অধিপতি হন। ৮৩ জন পুত্র কর্মকাণ্ডের প্রবর্তক ব্রাহ্মণ বলে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁরা বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ৯ জন হলেন যোগী।

সমস্ত জগতে সকল ধর্মের অনুসন্ধান করলে এমন বংশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। একশত পুত্র সকলেই সুলক্ষণযুক্ত পৃথিবীখ্যাত মহিমময়—খুঁজে পাওয়া যায় কি? এই নব যোগীদের পরিচয় দেখনু। এঁরা ওই ১০০ ভাইদের মধ্যে নয় জন। নব যোগীদের নাম যথা—কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিলায়ন, আর্বির্হোত্র, দ্রাবর্দড়, চমস ও করভাজন।

এই নয়জন যোগীর কথাগুলি শ্রবণ ও অনুধাবন করলে মানুষের কাছে এর বেশি কিছু করণীয় থাকে না। কোনো প্রয়োজন হয় না। মানবজীবন দুর্লভ! এই জীবনেই পুরুষার্থ লাভ ঘটে। এঁরাই পরম ভাগবত ছিলেন, শাস্ত্র মতে।

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের নিকট হতে বৈদর্ভর বিবাহ বার্তা, রুক্মিণীর পত্র প্রভৃতি শ্রবণ

করে নিজ হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্তধারণপূর্বক সহাস্যে বললেন "হে দ্বিজবর, রুক্মিণীর ন্যায় আমার চিত্তও তাঁর জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়ায় নিশীথে আমাকে নিদ্রাকর্ষণ করে না।"

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় ৫ম খণ্ড ভাগবত দ্রঃ।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, রুক্মীণীর বিরোধের জন্য বিবাহ নিষেধ আছে ওটাও আমি জানি! কিন্তু বায়ু যেমন কাষ্ঠমধ্য হতে অগ্নিশিখা হরণ করে তেমনি আমিও রাজকুল মধ্য হতে যুদ্ধে উন্মন্থন করে সর্বাঙ্গশোষণা সৎপরায়ণা রুক্মিণীকে আনয়ন করব। তারপর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ পরশ্ব রাত্রিতে রুক্মিণীর বিবাহ লগ্ন জেনে সারথিকে ডেকে আদেশ করলেন, "দারুকি" দ্রুতগতি অশ্বসমূহকে সংযোজন করে শীঘ্র রথ প্রস্তুত করো।"

দারুক, অনুমতি মাত্রই শৈব, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প, বলাহক নামক অশ্ব চারিটি রথে জুড়ে সম্মুখে আনয়ন করলেন। ভগবান প্রথমত ব্রাহ্মণকে রথে উঠিয়ে নিজে আরোহণ করলেন। দ্রুতগামী সেই সকল অশ্বের সাহায্যে সেই রাতেই আনর্ত দেশ হতে যাত্রা করে পরদিন প্রাতে বিদর্ভ নগরে এলেন। কুণ্ডিনপতি রাজা 'ভীষ্মক' নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কেননা পুত্র স্নেহের হেতু, এই পুত্রের ইচ্ছায় শিশুপালের সাথে বিবাহের আয়োজন হচ্ছে। যাই হোক রাজা ভীষ্মক নিজের কন্যা রুক্মিণীকে শিশুপালের হাতে সম্প্রদান করার নিমিত্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে ব্যস্ত। সাধারণ পথঘাটহাট বাজার সংমার্জিত, সুশোভিত করা হচ্ছে ; জল সিঞ্চন করে মার্জনা করে গন্ধদ্রব্যাদি অনুলেপন দ্বারা বিভিন্ন পুষ্পমালায় শোভিত করা হয়েছে।

বিবাহসূত্র দ্বারা কৃতমঙ্গলা কন্যাকে নতুন বস্ত্রালংকারে উত্তম বেশ দ্বারা বিভূষিত করেছেন। বিপ্রগণ ও অন্যান্য উপস্থিত ব্যক্তিদের যথাবিধি আপ্যায়ন করা হচ্ছে। সবাই ব্যস্ত বিভিন্ন আয়োজন আপ্যায়নে।

পুরোহিত গ্রহশান্তির জন্য হোম করছেন। 'রাজা ভীষ্মক' কন্যার কল্যাণ কামনায় সুবর্ণ—রৌপ্য-বস্ত্র-ধেনু-গুড় মিশ্রিত তিল দান করছেন হৃষ্টমনে।

ওদিকে চেদিপতি দমোঘোষ তাঁহার পুত্রর শিশুপালের মঙ্গল নিমিত্ত অনুরূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়া সহ আয়োজন, যজ্ঞ-ব্রাহ্মণদের দ্বারা সকল শুভ কর্ম সুসম্পন্ন করছেন। মহামূল্য হোমমালায় সুসজ্জিত মদস্রাবী হস্তীসমূহ উৎকৃষ্ট রথ, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যসহ পরিবৃত হয়ে কুন্তিন নগরে উপস্থিত হলেন ; সকল বর পক্ষীয়গণ। বিদর্ভপতি ভীষ্মক পথ অগ্রসর হযে তাঁদেব যথাবিহিত অভিবাদন করত বরের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক গৃহে অধিষ্ঠান করালেন এবং চৈদ্যপক্ষীয শল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদুরথ, পৌণ্ড্রক আরও বহু বহু রাজন্যবর্গ যথাবিধি সেবিত ও সংবর্ধিত হলেন।

রাজনন্দিনী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় প্রতি মুহূর্তেই যেন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে, শরীর ঘর্মাক্ত হচ্ছে, হায়! এই রাত্রের অবসান হলেই বিবাহ দিবস ....কিন্তু! আমার তিনি বুঝি এলেন না! আমি নিতান্ত ভাগ্যহীনা। সেইজন্য বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা আমার প্রতি বিরূপ হয়েছেন। ওহো! হিমাদ্রি-দুহিতা গৌরী মহেশ্বর-গৃহিণী কি আমার প্রতি বিমুখ হলেন? সংবাদদাতা ব্রাহ্মণ তো এলেন না! তবে কি .... এইরূপ সাত পাঁচ ভাবছেন। তাঁর বাম উরু বাম বাহু, বাম নেত্র স্পন্দিত হচ্ছে? এমন সময় বার্তাবাহী ব্রাহ্মণ অন্তঃপুরে তাঁর সাথে

দেখা করলেন। ব্রাহ্মণকে রুক্মিণী প্রহৃষ্ট বদনে ও ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ তাঁর নিকট বললেন, 'যদুনন্দন এসেছেন এবং তোমাকে নিয়ে যাবেন সত্যবাক্য ঘোষণা করেছেন। এ সবই খুলে রুক্মিণীকে বর্ণনা করলেন।

এদিকে বিবাহ উৎসবের বিবিধ মধুর বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

কর্তৃপক্ষগণ অভ্যর্থনার নিমিত্ত তাঁদের নিকট সত্বর অগ্রসর হয়ে মধুপর্ক নির্মল বস্ত্র অন্যান্য উপহার এনে তাঁদের যথাবিধি বলবীর্য অনুযায়ী মর্যাদা সহকারে পূজা করছেন।

এই সভায় রাম, কৃষ্ণ সমাগত হলেন। বরযোগ্য বিধি দ্বারা তাঁদেরও বরণ করা হয়েছে। রাজা ভীষ্মক এইভাবে যথানুরূপ আতিথ্য বিধান করলেন। রাম, কৃষ্ণ ও তাঁর সৈন্যসামন্তদের জন্য পুরী সংকল্পিত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন জেনে বিদর্ভ নগরে যেন এক বিশেষ সাড়া পড়ে গেল। সকলে বলাবলি করছে কত কথা। রুক্মিণীই তাঁহার ভার্যা হওয়ার যোগ্য, বটে! অপর কেউ হতে পারে না। অহো। আমরা যদি পূর্ব পূর্ব জন্মেও কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে থাকি, তার ফলে ত্রিলোকর্তা—নারায়ণ প্রসন্ন হয়ে এই অনুগ্রহ করুন! অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ অদ্য বিদর্ভ রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ যেন করেন। রুক্মিণীদেবী হরষিত অন্তরে সাথি সমভিব্যাহারে গৃহ হতে বার হলেন। দেবী মন্দিরে চললেন। ভগবান হরিকে স্বকীয় শোভা দেখাবার মানসে দেবদর্শন ছলনায় কেবল সেখানে উপস্থিত হলেন মাত্র। তাঁর হাবভাব ও প্রসন্নতা অবলোকন দর্শনে অশ্ব-রথ-গজারূঢ় রাজাগণ যিনি যেখানে ছিলেন তিনি সেই স্থানে মূর্ছিতের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে ভূমিতে নিপাতিত হয়ে গেলেন।

রুক্মিণী তাঁর চরণপদ্ম বিকাশের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে একবার দেখা দিলেন। তারপর রাজকুমারী রথে আরোহণের জন্য বুঝি ইতস্তত দেখে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালাদি রাজন্যবর্গের ব্যূহভেদ করে বিপক্ষীয় নৃপগণের সমক্ষেই রুক্মিণীকে হরণ করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের গরুড়ধ্বজ রথে রুক্মিণীকে নিয়ে অবতর করলেন। শৃগালসমূহের মধ্য হতে সিংহ যেন সদর্পে স্বীয় ভাগ গ্রহণ করে অপসৃত হলেন। এদিকে জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ নিজের নিজের পৌরুষকে ধিক্কারপূর্বক ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কবচ ও কার্মুক রূপধারণ করে যথাযোগ্য বাহনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হলেন। শত্রুদের সৈন্য পশ্চাতে দেখে যাদব সেনাগণ নিজ নিজ ধনুকে টঙ্কার ধ্বনি করতে করতে সম্মুখে দণ্ডায়মান হল। অশ্বপৃষ্ঠ, গজস্কন্ধ ও রথের উপরিভাগ হতে অস্ত্রনিপুণ সৈন্যগণ শত্রুগণের শরবর্ষণ করতে লাগল। রুক্মিণী ভয়ে আকুল, সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে দেখছেন। শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে করে বললেন, "হে বামলোচনে ভয় করো না, তোমার শত্রুরা এখনিই বিনষ্ট হবে।" সঙ্কর্ষণাদি যদুবীরগণ শানিত বাণ দ্বারা বিপক্ষীয়দের অশ্ব, গজ, রথ, চূর্ণ ও ছিন্নভিন্ন করে চলেছে। পদাতিকগণের মস্তক সমরস্থলে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। বৃষ্ণিগণের প্রবল আক্রমণে তারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল, জরাসন্ধাদি রাজাগণ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পশ্চাদ্‌পসরণ করলেন। পাণিপ্রার্থী শিশুপালকে প্রবোধ দিতে সবই ব্যস্ত দেখা গেল। ভীষ্মপুত্র রুক্মীণী এসব কোনো মতেই মানতে পারছেন না। স্বয়ং তিনি সৈন্যসামন্ত নিয়ে পুনরায় ধাবমান হলেন। রুক্মীর

পণ যে, কৃষ্ণকে বধ করবেন। অন্যথায় তিনি কুন্ডন নগরে প্রবেশ করবেন না। হায়! রুক্সীর কটুবাক্য শুনে শ্রীকৃষ্ণ হাস্যকরত রুক্সীর শরাসন ছেদন করলেন। এরপর প্রাণে মেরে দেবার চিন্তা করলেন। কিন্তু রুক্সী বহু অনুনয়পূর্বক প্রাণভিক্ষা চাইলেন। পরিশেষে কৃষ্ণ তার মাথার চুল স্থানে স্থানে কেটে ছেড়ে দিলেন তাকে।

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ এখন দ্বারকাপুরীতে বাস করছেন। শ্রেষ্ঠ যাদবগণ পরিবৃত হয়ে আনন্দ মুখরিত দিন কাটাচ্ছেন। অট্টালিকার উপরিভাগে দীপ্তিশালিনী উত্তম বেশধারিণী পূর্ণ যৌবনা কান্তিমতী, রমণীগণ কুন্দক্রীড়ারতা। হস্তীসমূহ, পদাতিক, অশ্বারোহী, সুবর্ণনির্মিত রথসমূহ দ্বারা দ্বারকাপুরীর বাজপথ নিরন্তর সমাচ্ছন্ন থাকত। শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণ সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত, তাঁর গলদেশস্থ মালা মহিষীদের কুচকুঙ্কুমে আরক্তবর্ণ, আলিঙ্গনের আগ্রহে কুন্তলবন্ধন শিথিল হয়ে ইতস্তত তারা পরস্পর জলসিঞ্চন আনন্দে পরিবৃত গজ দলের ন্যায় যুবতীগণের পরিবেষ্টনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব শোভাধারণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় বনিতাগণ যে সকল মহামূল্য বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করতেন তা বাদ্য উপযোগী নর্তকী ও নটগণকে পারিতোষিক হিসাবে দান করতেন। এইপ্রকার গীতালাপ হাস্য, ইক্ষণ, কৌতুক ও আলিঙ্গনাদির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণের সহিত বিহার করায় তাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণ অপহৃত হয়ে যেত।

যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে ক্রিয়মান প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণপত্নীগণ যেন বৈষ্ণবীগতি—বৈষ্ণব প্রাপ্য প্রেমভক্তিই লাভ করতেন। যিনি দর্শনমাত্র স্ত্রীগণের মন হবণ করতেন, সেই কৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ দর্শন করেন তাদের মন যে হরণ হতই এ বিষয় আর কি বলার আছে!

সেই বিশেষ প্রেম, আদর আদিরাতিশয্য ভর্তৃগণের সেই তপস্যার বর্ণনা করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণকে নিত্য সিদ্ধাই বলা হয়। সাধুগণের পরম আশ্রয় ভগবান 'কৃষ্ণ'। এইপ্রকারে বেদোক্ত ধর্ম পুনঃপুন আচরণ করে গৃহস্থাশ্রমকেই ধর্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবিধ পুরুষার্থের স্থান বলেছেন। গৃহস্থ ধর্ম আচরণকারী ভগবান কৃষ্ণের ষোলো হাজার একশত আট জন মহিষীগণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণের নাম—১। রুক্মিণী, ২। সত্যভামা, ৩। জাম্ববতী, ৪। শ্রীকালিন্দী, ৫। মিত্রবিন্দা, ৬। নাগজিতী, ৭। শ্রীভদ্রা ও ৮। শ্রীলক্ষ্মণা।

এই পত্নীদের ছেলেদের কিছু পরিচয় এইরূপ—রুক্মিণীর গর্ভে জন্ম—সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন প্রদ্যুম্ন পিতার ন্যায় গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইনি মাতুল রুক্সীর কন্যাকে বিবাহ করেন।

প্রদ্যুম্ন পুত্র অনিরুদ্ধ বিবাহ করেন রুক্সীর পৌত্রীকে। তাঁর পুত্র বজ্র। বজ্রের পুত্র প্রতিবাহু, তৎপুত্র সুবাহু, সুবাহু পুত্র শান্ত সেন, শান্তসেন পুত্র শতসেন। এইরূপ অসংখ্য, অগণন। শুধু তাই নয়, এই যদুকুলে নির্ধন, অবহু, অল্পায়ু কেহই ছিলেন না বলা হয়।

যদু বংশোদ্ভূত বিখ্যাত পুরুষদের সংখ্যা অযুত বর্ষ ও গণনা করা যায় না। যদুকুল কুমারদের অধ্যয়নের জন্য নিযুক্ত তিন কোটি আট হাজার আটশত জন অধ্যাপক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ৮ জন মহিষীর প্রত্যেকের দশটি করে সন্তান ছিলেন। অন্যান্য ষোড়শ সহস্র পত্নীগণের প্রত্যেকের দশটি করে পুত্র জাত হয়েছিল। রোহিণীর গর্ভে দীপ্তিমান ও তাশ্রুততপ্তাদি পুত্রগণের উৎপত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ হতে উৎপন্ন পুত্রগণের জননীর সংখ্যা বলা

হয় অন্যূন অষ্টোত্তর শত ষোড়শসহস্র স্ত্রীগণের একটি একটি করে কন্য' ছিলেন। ইহা ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

কৃষ্ণ পৌত্র প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন পুত্র অনিরুদ্ধ, ইনি রাজা বানের কন্যা উষাকে বিবাহ করেন। এই অনিরুদ্ধ রুক্মীর পৌত্রী নাম 'রোচনা' তাকে বিবাহ করেছিলেন। একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, রুক্মীকে কৃষ্ণ বিসদৃশ মস্তক মুণ্ডন করে ছেড়ে ছিলেন ; তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হল কী করে? বলা যায়, ভগিনী সন্তুষ্টির জন্যই। রক্মীকে 'বলরাম' স্বয়ং হত্যা করেছিলেন। কেন? একটি অক্ষক্রীড়াকে কেন্দ্র করে। এই অক্ষক্রীড়ায় বলরাম দশ কোটি মুদ্রা বাজি ধরে জিতে যান। কিন্তু দলবাজি দ্বারা রুক্মী আমি জিতেছি, আমি জিতেছি বলে চিৎকার করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, বলেন, "তোমরা বনচারী গোপালক, অক্ষক্রীড়ার কী জান? অক্ষক্রীড়া এ তো রাজা মহারাজাদের খেলা।" এই বিদ্রূপাত্মক বাক্যে ক্রোধে বলরাম রুক্মীকে হত্যা করেন। কলিঙ্গরাজ দন্ত বাহিরকরত ব্যঙ্গ করায়, তাঁর সমূহ দন্ত উৎপাটন করে দেন।

দ্বাপর যুগের কাহিনী তথা মহাভারত সকল ভারতবাসীর জানা। মথুরা-বৃন্দাবন, দ্বারকা, কংসবধ, বসুদেব-দৈবকী আর কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা সহ গোপীদের বস্ত্রহরণ, ননী চুরি, শ্রীরাধিকার সহিত পরকীয়া প্রেম লীলা—যা রাধাবল্লভী প্রেম নামে খ্যাত। রাধিকার সহিত অনুরাগ, পূর্বরাগ, রাসলীলা সহ, লীলাকীর্তন, পদাবলী ইত্যাদি তো বৈষ্ণব সমাজে প্রেমভক্তির বন্যা এনেছে ; এসব কিই বা লিখব? চন্দ্রচূড় জটাজাল হতে গঙ্গার পূতধারার ন্যায় ভাসিয়ে দিল আসমুদ্র বঙ্গদেশ। শ্রীকৃষ্ণ লীলা প্রচারিত। হিমাচল হতে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ভারত জুড়ে তাঁর জয়যাত্রা এ-এক মহা জাগরণ ঘটেছে। সেই কৃষ্ণ বলেছেন ঃ

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যুধিষ্ঠির করহ শ্রবণ।
কলিযুগ আগত স্বর্গে করহ গমন।।
স্বর্গে আরোহণ কর ভাই পঞ্চজন।
আমার সময় হলে এ দেহ করিব পতন।।
কবে দেহে মৃত্যু আসি করিবে অধিকার।
কলি যে আগত স্বর্গে চলহ এবার।।
পাপেতে পূর্ণ হবে এই বসুন্ধরা।
অনিত্য সংসারে আর থাকিব না মোরা।।
কলি অধিকারে রাজা কত কষ্ট পাবে।
অনিত্য সংসারে আর কতকাল রবে?
শুন যুধিষ্ঠির হলে কলি অধিকার।
এত বয়ঃক্রম রাজা থাকিবে না আর।।
কলি কথা শুনি কহে যুধিষ্ঠির রাজন।
কহ শুনি দয়াময় সে কলি কেমন।।
কিবা রূপ হয় আর কিবা মূর্তি ধরে।
কোথায় বসতি করে কিবা কার্য করে।।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রভাস খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। প্রভাস যজ্ঞের শ্রীকৃষ্ণের মানবলীলা সংবরণ। ইহাই শেষ লীলা বলা হয়েছে।

কলির মানুষের জন্য ধর্ম-কর্ম কী হবে? শাস্ত্র মতে নির্দেশ সকলের মান্য করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ তো সাবধান করেই ছিলেন—কলির গতি, রীতি ইত্যাদি। সৃষ্টির আদি হতেই ধর্মের সাথে মানুষের নিবিড় একাত্মতা গড়ে উঠেছে। কেন? কীভাবে? এই ধর্মগ্রন্থে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সবকিছু বলার চেষ্টা করেছি। এই পুস্তকের বাইরে তাকাবার কোনো দরকার মনে করি না। আর এইজন্য বিজ্ঞানকেও আশ্রয় করে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি। কেন না! পৃথিবীতে যত জাত আছে তাদের নিজ নিজ আচরণ নিয়ম-মত-পথ আছে। ক্রমবিকাশ যেমন আছে, চরম উন্নতি তেমনই আছে। বিজ্ঞানকে সহায় করে চরম উন্নতি সম্ভব! অলৌকিক বা তেমন কিছু ধর্মের ভিত্তি হতে পারে না। হঠযোগ দ্বারা অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন করা যায়। ওইসব ব্যক্তি আমাদের ধর্মের গুরু হতেই পারে না। হিন্দুধর্ম বহু কঠিন এবং মহিমময়। মৃতে প্রাণদান বা মৃন্ময়কে চিন্ময় করে তোলার নামই হিন্দুধর্ম।"

ত্রেতাযুগ ও দ্বাপর যুগ ব্যাপী রাজধর্মই ছিল প্রজাদের মনোরঞ্জন করা। রামচন্দ্রের বংশধর ও রাজনীতকরা ঐরূপ প্রজারঞ্জক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য পরিচালনা তাঁর কর্মধারা হতেই দ্বাপর যুগের সম্যক পরিচয় জানা যায়। সেইজন্য দুই যুগের দুই দেবোপম চবিত্র রাজনীতির, বংশধারার সকল পরিচয় দিয়েছি ; এ থেকে সকল জানা সহজ হবে।

দ্বাপর যুগের সর্বশেষ রাজা পরিক্ষিৎ। তিনি বলেছেন তা এই কার্যকালের সূত্রে, বিশেষ স্মরণে রাখতে হবে। পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে রাজা পরিক্ষিৎ পৌঁছোলেন সরস্বতী নদীর তীরে। দেখলেন এক নরপতি বেশধারী শূদ্র দণ্ডহাতে গোমিথুনে করেছি তাড়ন। সেই মিথুন দীনভাবে একপদে দাঁড়িয়ে সেখানে ঘন ঘন কাঁপছে। গাভীটি ঘুরে ঘুরে তৃণ খেতে চায়। আর শূদ্ররাজা তাকে তাড়িয়ে মারছে।

এই অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে রাজা পরীক্ষিৎ জলদগম্ভীর স্বরে বললেন,

"কে রে!" স্পর্ধা তোর দেখছি আমি!
আমার প্রজার তুই করিস দুর্গতি?
"কৃষ্ণ অর্জুন আর নেই এই ধরণীতে।
তাই বুঝি তেজ তোর জাগিয়াছে চিতে?"

রাজা পরিক্ষিৎ এই কথা বললেন এবং গাভীর তিন পদ নেই কেন ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন। কিন্তু হায়। কোন উত্তর পেলেন না। তখন আত্মস্থ হয়ে ভাবলেন.... তপঃ....শৌচ....দয়া...সত্য এই চারটি পদ গাভীর। কিন্তু! এখনও এক পদ!

আসক্তি গর্ব মদ্য দেখি এই তিনে।
একে একে বিনাশিল তিনটি চরণে।।
রাজা পরিক্ষিৎ এবে সম্মুখে নেহারি।
ঘোর শত্রু শূদ্র রাজা কুকর্ম তাহারি।।
অসি নিষ্কাশন করি বধিবারে তারে।
শূদ্র কাঁপে থর থর সভীত অন্তরে।।

তোমার চরণে আমি চাইলাম স্মরণে।
তোমাতে নির্ভর করি মোর জীবন মরণে।।
সে ব্যক্তিরও ক্রন্দন, পদ তলে পতিত রাজার।
যাহার বীর্যে কাঁপে ভূ-চরাচর।।
কলিরে পতিত দেখি রাজা পরিক্ষিৎ।
ভাবিলেন মনে মনে যাহা কিছু হিত।।
না কর রোদন, তুমি মুছহ নয়ন।
আশ্রিতের বধ নহে শাস্ত্রের কথন।।
রাজা বলেন কর তুমি প্রতিজ্ঞা এখন।।
পালিবে যতনে যাহা বলিব বচন।।
জানি তুমি হে অধর্ম, অধর্মের বন্ধু তুমি সার।
মম রাজ্যে এলে তুমি লভিতে অধিকার।।
অতএব আমি বুঝি নিত্য সাথি সব।
লোভ চৌর্য ধর্মত্যাগ কাপট্য কলহ বৈভব।।
এখুনি যাহ তুমি এ সকল স্থান ছাড়ি।

নাহি সত্য, নাহি ধর্ম, যেখানে পাশা খেলা আর মদ্যপান, বারনারী রহে যেথা, লোকে হিংসে প্রাণ আর এক স্থান দিলাম তোমায় অধিকার—বৈরীভাব যেথা আছে হয় পঞ্চ প্রকার। এই পাঁচ রকম অনীতির পিছনে তুমি আশ্রয় করে থাকতে পার। রাজা পরিক্ষিৎ এইরূপ আদেশ দিলেন তাকে। অর্থকে অধর্ম সম বলা হয়েছে।

কলিতে এই ধর্ম তিনপাদ হীন।
চারিপদে পূর্ণরাজ্য করেন প্রবীণ
এ হেন কার্য রাজা করেন পরিক্ষিৎ।
শাসন করেন ধরা ধর্মে রত চিত।
সেই রাজা মহাসুখে রাজত্ব যে করে
ধর্মরাজ পরিক্ষিৎ অনেক কাল পরে।
অনন্তর ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হয়েন।

এবং তিনি বন গমন করেন।

ধর্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন সদাই—এই সময়ে শুকদেব তাঁকে ভাগবত সহ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান উপদেশ দিতেছিলেন।

ইহাই কলির প্রারম্ভ কাল।।

কবি প্রথমে দ্বিজ মূর্তি ধারণপূর্বক

গায়ে জামা মাথায় পাগড়ি পায়ে পাটি জুতা (বুটজুতা) ইজের পরা সুবেশধারী ভদ্র বেশি বাবু। ইনি রাজপথে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। এই পথে সাক্ষাৎ হয় এক গৈরিক বেশধারী রত্নমালা নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে ; ব্রাহ্মণ চলেছেন কৌপীন আঁটা জটাজুট ব্যাঘ্রচর্ম

কোশাপাত্র হাতে সরযূ নদীর তীরে তিনি চলেছেন তপস্যার কারণে। অশ্বপৃষ্ঠে চাবুক মেরে ঘোড়া ছুটিয়ে ব্রাহ্মণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন বাবু অর্থাৎ কলি।

ব্রাহ্মণ-তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। কলি নিজের পরিচয় দিলেন—

রাম রাজা কি সুখী ছিল নিজ ধর্মে।
তার চেয়ে বহু সুখী ত্যজি নিজ দ্বিজ ধর্মে।।
মানে জিনি কুরুপতি, কুবের জিনি ধনে।
যশে জিনি কামদেব ভূমে জিনি শরে।।
গুণে জিনি সারাথি, বিদ্যা জিনি দ্রোণেরে।
দ্বিজধর্ম ত্যাগ করে আনন্দেতে আছি।
আমার মত হবে সুখী যদি হে ব্রাহ্মণ।
আমার কথা রাখ কর মোর সাথে গমন।।

কৃৎ এ মানব ধর্ম দ্বাপরে গৌতমাস্মৃত, ত্রেতায় সাংখ্য্য লিখিত কলৌঃ পরাশর স্মৃতি, কলিযুগের ধর্ম কর্ম উক্ত শ্লোক মোতাবেক
অনুসৃত হউক এইরূপ শাস্ত্রের বিধান।

এইখানে সমাপ্ত

২। বিশ্ব সৃষ্টিতে বিজ্ঞানতত্ত্ব (মতবাদ)

সৃষ্টির বিবর্তনে দেখা যায়, প্রথম প্রস্তরযুগ, মধ্য প্রস্তরযুগ ও নব্য প্রস্তরযুগ। নৃবিজ্ঞানীগণ বলেন গ্লাইসটোসিন যুগের কথা। সেও এক করুণ অবস্থা। পৃথিবীর তাপমাত্রা নানা কারণে কমবেশি হয়ে থাকে। পৃথিবীতে একদা উত্তাপ বেড়ে গিয়ে অর্থাৎ সূর্যের দাবদাহ দ্বারা জ্বলে পুড়ে সবই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আবার হয়তো উত্তাপ একেবারে কমে কমে হিমশীতল বরফে —হিমবাহ সৃষ্টি হয়েছে এবং শীতলতাব ফলে যে বরফ ঢেকে আচ্ছন্ন হয়ে যেত তার ফলেই হিমালয়, আল্পস, আন্দিজ পর্বতমালা সম্পূর্ণ বরফে ঢেকে ছিল একদা। এক সময় ওই বরফ গলে যখন হিমবাহেব আকার নিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসত তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন গিরিবর্ত্ম। কোথাও হল বিস্তৃত গিবিবর্ত্ম, কোথাও উপত্যকা।

কোনো কোনো নদীপথ বুজে গেল। কোথাও নতুন নদীর সৃষ্টি হল। সেই নদী চলতে গিয়ে তার চাপে ও ঘর্ষণের নানান প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে নানান ভাঙচুর ঘটেছে। উঁচুনীচু সমতল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিখ্যাত হিমবিজ্ঞানী 'পনক' এবং বার্কনেস হিমযুগের চারটি অবস্থার কথা বলেন যেমন—গুঞ্জ, মিন্ডেল, রিস, উরগ।

হিমবাহের ঐরূপ পরিবর্তনের ধারা জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'ক্রুল' স্বীকার করেন না।

পৃথিবী অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল। প্রবল বর্ষণে সবকিছু নিমজ্জমান হয়ে শুধু জল আর জল হয়েছিল, এই অবস্থার পরিচয় পুরাণ শাস্ত্রাদিতে আছে দেখা যায়।

এই অবস্থার পর জীব ও প্রাণের স্ফুরণ হল কেমন করে? প্রথমদিকে পৃথিবীর প্রায়

সমস্ত দেশের মানুষের বিশ্বাস ছিল, মানুষের উৎপত্তি অলৌকিকভাবে ঘটেছে। তারা মনে করত ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রয়োজনে জীব ও জীবনেব সৃষ্টি কবেছেন। সৃষ্টির সেই আদি যুগেও উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দেখতে এখনকার মতোই ছিল। কোনো কোনো মানুষ এমন ধারণা করত যে মহাজগতের কোনো এক গ্রহ হতে উল্কাপাতের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে জীবের আগমন ঘটেছে। আবার এরকম ধারণাও ছিল যে পাথর, কাদা, মাটি এবং গলিত পদার্থ হতেই জীবনের বিকাশ। মহাজ্ঞানী অ্যারিস্টটল অজৈব বস্তুসমূহ হতে বহু কালব্যাপী অভ্যন্তরীণ রূপান্তরের মাধ্যমে জৈববস্তুর সৃষ্টি হয়েছে বলে ইঙ্গিত করেন। পরবর্তীকালে কয়েকটি আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জীবের সৃষ্টি কেবল জীব হতেই সম্ভব হয়েছে।

জীবনের বিকাশ নিয়ে বহু মতবাদ আছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানী তাঁদের বহু সাধনালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, যেমন—

১। **বিশেষ সৃষ্টিবাদ**—সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণায় পৃথিবীতে জীবগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণী পৃথক পৃথকভাবে একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। আজকের দিনে যেরূপে দেখা যাচ্ছে অতীতেও অনুরূপভাবে এদের আবির্ভাব ঘটেছে।

২। **স্বতঃস্ফূর্তবাদ বা অজীবজননবাদ**—এই মতবাদে কাদামাটি পচা-গলা পদার্থ হতে জীবনের উদ্ভব হয়েছে। এক খণ্ড মাংস যদি ফেলে রাখা হয় তা পচে গলে যাবে ; তার থেকে মাছির লার্ভা জন্ম নেবে। নিম্নস্তরের প্রাণীদের আবির্ভাব এইরকমেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে থাকে। তখনকার দিনে এই ছিল ধারণা।

৩। **বিপর্যয়বাদ**—ভূতত্ত্ববিদ **কুভিয়ার** বলেন, বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথকভাবে জীবের উদ্ভব হয়েছে। প্রতিবারের সৃষ্টির পর প্রকৃতির বিপর্যয়ের ফলে যখন অধিকাংশ নষ্ট হয়ে যায় তখন আবার সৃষ্টি হয়।

৪। **গ্রহান্তরবাদ**—এই মতবাদের বিষয় হল, পৃথিবীর জীবনধারা মহাবিশ্বের অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে। অন্যগ্রহের জীবন উল্কাপিণ্ডের মাধ্যম পৃথিবীতে এসে পড়েছে এবং ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

৫। **সায়ানোজেনবাদ**—জার্মান বৈজ্ঞানিক **ফ্লুজার** বলেন, বায়ুমণ্ডলের কার্বন ও নাইট্রোজেন হঠাৎ মিলিত হাযসায়ানোজেন নামে একপ্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করেছে এবং তার থেকে প্রোটিন উৎপন্ন হয় , সেই প্রোটিন নানাভাবে বিশ্লেষিত হয়েই প্রাণবস্তুর সৃষ্টি হয়েছে।

৬। **ভাইরাস তত্ত্ব**—অনেক বিজ্ঞানীর মতে, ভাইরাস পৃথিবীর আদিম জীব, এরা, জড় ও জীবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে পড়ে। কখন, কোথায় এবং কীভাবে পৃথিবীর বুকে জীবনের সৃষ্টি হয়েছিল সেকথা আজও সুগভীর রহস্য। বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের সাহায্যে এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াস অব্যাহত আছে। সম্পূর্ণ উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। প্রথমের দিকে যেসব ধারণা করা হত এখন তা পরিবর্তিত। আরও পরিবর্তন হবেই। এইরকম ধারণা করেন বিজ্ঞানীরা। প্রত্নজীব বিদ্যাঘটিত প্রমাণ তাদের জীবাশ্ম বা ফসিল এই সম্বন্ধীয় নানা বিষয়বস্তুর কথা তাঁরা বলেন। পাললিক অথবা স্তরীভূত শিলার স্তরে স্তরে নানা উদ্ভিদরাজি

ও জীবজন্তুর ধ্বংসাবশেষ আটকে গেলে চাপে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জীবদেহের কঠিনাংশ স্পষ্ট ছাপ রেখে যায় অথবা প্রস্তরীভূত অবস্থা গ্রহণ করে। এইভাবে প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের অংশ অথবা তার ছাপকেই জীবাশ্ম বলা হয়ে থাকে। অতীতের বহু ঘটনারাজির নীরব সাক্ষী ঐসব জীবাশ্ম। যুগে যুগে পৃথিবীর বক্ষে জীব এসেছে। এইভাবে থেকেছে হাজার হাজার বছর ধরে। পরবর্তীকালে নানারূপ নৈসর্গিক কারণে এরা চিরতরে বিদায় নিয়েছে, তবে এদের চিহ্ন মুছে যায়নি। পৃথিবী আপন বক্ষে অতি যত্নে ধরে রেখেছে তাদের সেই অমূল্য স্মৃতি। জীবাশ্মগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করলে অতীতের পৃথিবীর জীবদেহের সম্বন্ধে মোটামুটি পরিষ্কার ধারণাই জন্মায় না, তবে জীবদেহের মধ্যে একটা ধারাবাহিক সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরগুলিকে ভূতাত্ত্বিক রীতিমতো সাজানো হয়েছে। যে স্তরটি যত নীচে সেটি তত প্রাচীন বলা হয়।

ভূগর্ভের নীচের স্তর হতে যতই উপরে ওঠা যায় ততই আমরা প্রাচীন থেকে নবীনদের দিকে এসে থাকি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলিকে ভূতাত্ত্বিক স্তরগুলির উপর সরলতম জীব এবং উপরের স্তরগুলিতে অপেক্ষাকৃত জটিল জীবের উপস্থিতি রয়েছে, পর্যালোচনা করে ইহাই জানা যায়। এইভাবে পৃথিবীর শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় করা হয়েছে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গেছে ২০০ কোটি বছর প্রাচীন শিলাস্তরে কোনো জীবেরই দেহাবশেষ বা জীবাশ্মের চিহ্ন নেই।

প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছরের প্রাচীন শিলাস্তরে নানা জাতীয় সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম দেখা গিয়েছে। পরবর্তীকালে মাছ, উভচর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব ঘটেছে বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন শিলাস্তরের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলিকে পর পর সাজালে জীব অভিব্যক্তির একটি স্পষ্ট চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই ধারাবাহিকতার মাঝে মাঝে কিছু ফাঁক কিন্তু থেকেই যায়।

"ডারউইন" তাঁর সমুদ্রযাত্রায় গিয়েছেন, কেপভারদের দ্বীপের জীবগোষ্ঠীর পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং বলেছেন—"গ্যালাপ্যাগো দ্বীপপুঞ্জেও গিয়েছি। একই আশ্চর্য মিল দেখলাম। বিভিন্ন উদ্ভিদ, পতঙ্গ, পাখি অন্যান্য প্রাণীরাও কি আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য রক্ষা করেছে। আমি দেখেছি, আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদপ্রাণীরাও একই সাদৃশ্য বজায় রেখেছে।

৭। **কোষতত্ত্ব ঘটিত প্রমাণ**—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী এবং উদ্ভিদ থেকে শুরু করে সব উচ্চ পর্যায়ের প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে যে কোষ থাকে তাতে প্রোটোপ্লাজমের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই প্রোটোপ্লাজম কালক্রমে নানা কোষকলার ও বিভিন্ন অঙ্গসমূহের সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর বিচিত্র প্রাণীদের দেহকোষের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল আছে অনেক।

কোষের বৃদ্ধি, বিক।শ এবং বিভাজনের পদ্ধতিও একই ধরনের। কাজেই আমাদের ধরে নিতে হয় যে, বিশাল ও বিচিত্র পৃথিবীর সবই একই ভিত্তি হতে বিকশিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে এইসব কোষের গঠন জটিল হয়েছে এবং নানা জাতীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবজগতের সূচনা করেছে। জীবজগতের আলোচনা মানুষের অভিব্যক্তির প্রাণীর

জগতের যে অভিব্যক্তির কথা বলা হল তার সর্বশেষ পর্যায়ে আছে স্তন্যপায়ী প্রাণী। এই স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরই অন্তিম প্রান্তে দেখা যায় একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী যাদের নাম **"প্রাইমেট"**। এই প্রাইমেট থেকেই মানুষের বিবর্তন বলা হয়।

মনে রাখতে হবে যে, আমরা এমন কোনো প্রাণী থেকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভূত হইনি, যা থেকে আজকে কোনো 'এপ' জাতীয় প্রাণী বোঝায়। মানবগোষ্ঠীভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। জলবায়ু, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতির জন্যই এটা হয়। মানব সদৃশ 'এপ' এবং মানবের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার অনুকূলে সামান্যই জীবাশ্ম সংক্রান্ত প্রমাণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে দু-ধরনের জীবাশ্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল ভারতের শিবালিক পাহাড় অঞ্চলে প্রাপ্ত **'রামপিথেকাস'** অন্যটি **জাইগ্যান্টোপিথেকাস**।

আফ্রিকার ভূস্তরেও মানুষের আবির্ভাবের নানা তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। নৃ-বিজ্ঞানী L.S.B. Leakey কেনিয়াতে একটি অতি প্রাচীন জীবাশ্মের সন্ধান পেয়েছিলেন। এর নাম দেওয়া হল **কেনাইয়্যাপিথেকাস**। কেনাইয়্যাপিথেকাস অনেকটা রাখাপিথেকাসের সাথে মিলে আছে। হিমবাহের অবস্থার কয়েকটি জীবাশ্ম যেমন—**হোমোইরেকটাস, পিথেক্যানথ্রোপাস, সিন্যানথ্রোপাস** ওইসব জীবাশ্মগুলি সমসাময়িক বলা হয়েছে। তবে মোটামুটি সোজা হয়ে দাঁড়াবার হাঁটবার ক্ষমতা ছিল তাদের। এরা নানা হাতিয়ার তৈরি ও তার ব্যবহার জানত। সিন্যানথ্রোপাস জীবাশ্মগুলির সাথে বহু প্রস্তর হাতিয়ার এবং ছাই আধার পাওয়া গিয়েছে। এর থেকেই অনুমান করা হয়, সিন্যাথ্রোপাসেরা আগুনের ব্যবহার শিখেছিল এবং অগ্নি সংরক্ষণ তাদের একটা বিশেষ কার্যধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এদের মুখের চেহারা আধুনিক মানুষের রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু হয়েছিল, এবং এরা জিবটিকে মুখের ভিতর নাড়াচাড়া করতে পারত। অনুমান করা হয় যে সুপ্রাচীন কালের ওই মানুষেরা কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। হোমোইরেটাসভুক্ত জীবাশ্ম সারা পৃথিবীর মধ্যে খুব বেশি পাওয়া যায়নি। ইউরোপের জার্মানিতে হাইডেলবার্গ শহরের কাছে কেবলমাত্র একটি নিম্ন চোয়াল পাওয়া গিয়েছে। এটি কোনো এক হোমোইরেকটাস অন্তর্ভুক্তের অংশ হবে। এছাড়া পূর্ব ও উত্তর আফ্রিকার হোমোইরেকটাস এর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। পূর্ব আফ্রিকার ওলডুভাই উপত্যকা, উত্তর আফ্রিকার মরক্কোতে এদের সন্ধান মিলেছিল। যবদ্বীপ ও চীনের, আফ্রিকার ও জার্মানির হোমোইরেকটাদের মধ্যে কিছু দৈহিক বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হলেও এদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য ছিল না বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত।

মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীর ঠিক কোন্ স্থানে ঘটেছিল সে কথা নিয়ে কিছু মতবিরোধ আছে। ঋগ্‌বেদের রচনা নিয়ে যেমন বিভেদ এ ঘটনা তেমনই বলা হয়েছে। একদল বিজ্ঞানীর মতে দক্ষিণ মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগ মানুষের আদি জন্মভূমি। এখানে পৃথিবীর প্রথম মানুষের শুভ আগমন ঘটেছিল। মাটির এই পৃথিবীতে মানুষের প্রথম পদচিহ্ন পড়েছিল এখানেই। মধ্য ও উচ্চ মায়োসিন যুগে হিমালয় পর্বত আকস্মিক মাথা তুলে উঠলে দক্ষিণ-মধ্য এশিয়ার জলবায়ু উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আসে। হিমালয়ের উত্তর দিকে বিশাল বনভূমির অবস্থান থাকায় তা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে বৃক্ষবাসী 'এপ' ও ওই জাতীয় প্রাণীরা ভূমিবাসী হতে বাধ্য হয়। এই বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিই পরবর্তীকালে

তাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। অভিব্যক্তিবাদের প্রবক্তাগণ ও চার্লস ডারউইন আফ্রিকা মহাদেশকেই মানব জন্মভূমির মর্যাদা দান করেছেন। সাম্প্রতিককালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. এল.এল.বি লিকি এবং শ্রীমতি লিকি যৌথভাবে আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকার ভূমিভাগের বিভিন্ন স্তরে প্রাপ্ত নানা ধরনের জীবাশ্ম সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা চার্লস ডারউইনের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে অনেকের মতে মানুষের আবির্ভাব—অভিব্যক্তি পৃথিবীর কোনো একস্থানে একটি বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল এমন হতে পারে না। বলেছেন তাঁরা বিজ্ঞান ধারাবাহিকভাবে পর্যলোচনা করেছে মানুষের ক্রমবিকাশকে নিয়ে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তত্ত্বগুলি যথা—প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব। ভূগোল বা ভৌগোলিক সমীক্ষা, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও শারীরিক তত্ত্ব সমাজবিদ্যাকেও বিশেষ অবলম্বন করতে হয়েছে। জীবনের উৎপত্তি বিকাশ কার্যপ্রণালীর মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিনিময় মাপকাঠি নিয়োজিত ছিলই। এইভাবে ধীরে ধীরে ফলিত শারীরিক ক্রিয়াবিক্রিয়া বিশ্লেষণ দ্বারা মানুষের ক্রমবিকাশ রূপ লাভ করেছে দেখা যায়। ১৯০১ খ্রি. বিজ্ঞানী ডি. ভ্রিসের গবেষণায় **মিউটেশন উৎপত্তি** মতবাদ প্রকাশ হওয়ার পর ডারউইন মতবাদ সংশোধনাকারে গৃহীত হয়েছে মাত্র। ডারউইনের মতে, জীবজগতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবৃত্তিসমূহ দ্বারা বংশানুক্রমে প্রবাহের ফলে ধীরে ধীরে সঞ্চারণ ঘটেছে।

পরিশেষে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। এই ধরনের পরিবৃত্তির নাম অবিরাম পরিবৃত্তি। ডি.ভ্রিস তাঁর মত অনুযায়ী বলেন, জীবদেহে আকস্মিকভাবে পরিবৃত্তি দেখা দেয়। প্রমাণস্বরূপ তিনি দেখান ইভনিং প্রিমরোজ নামে উদ্ভিদ, সাদা ফুল দিত। পরবর্তী 'জনিতে' লালফুল হয়ে যায়। এইভাবে খুলে যায় জিনেটিক তত্ত্বের দ্বার।

বিজ্ঞানের নিরলস প্রয়াস চলছে। এর পর কী হবে, কী জানা যাবে তার অপেক্ষায় সবাই দিন গুনছি।

৩। বিশ্বধর্ম ভাবনা ও মাতৃতত্ত্ব ঃ

বিশ্বদেবগণ, দেবতাগণ, বৈবস্বতমনু ঋষিগণ ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলে ৩৩ জন দেবের উল্লেখ করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ঐশীকার্য লক্ষ করে প্রাচীনগণ ঐশী শক্তির ৩৩টি নাম দিয়েছেন। পৌরাণিকগণ ৩৩ কোটি দেবতার কল্পনা করেছিলেন এ থেকেই বোঝা যায়। ৫৮ সূক্ত মতে 'এবং ইব ইদংধি বভূব সর্বৎ' অতএব প্রাচীন ঋষিদের কিছুই অবিদিত ছিল না। ১০/ ৭২/৪ এবং ১০/ ৯/ ৫ এই দুটি ঋকে ধরা পড়েছে অনেক দেশের মাতৃসাধনা ও ঈশ্বর তত্ত্ব। গ্রীকদেবতা জিউস-এর অনুসঙ্গী ছিলেন হারমিস, আইরিস। মিশরের নুট-সেব তাদের ছেলে মেয়ে। ভারতের গণেশের কাটামুণ্ড সংযোজন গজমুণ্ডে এর সাথে মিল দেখা যায়।

গল্পটি এইরূপ—ওসিরিজ ও আইসিসকে নিয়ে যে গল্প তা এইরূপ। রাজা ওসিরিজ খুব মানবদরদি ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেউ তাঁকে হত্যা করে বস্তাবন্দি করে নীলনদের জলে ফেলে দেয়। আইসিস তাঁর স্ত্রী নেফথাই সেই দেহ উদ্ধার করেন। কিন্তু সেই দেহটি কেড়ে নিয়ে চোদ্দোটি টুকরো করে মিশরের নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিলেন। আইসিস ইতোমধ্যে

একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। পুত্র-হোরাস। হোরাস বড়ো হয়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে সচেষ্ট ছিলেন। তবে মাতা আইসিসের অনুরোধে প্রাণে মারতে পারলেন না। কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে মাতাকেই বধ করেন। দেবতা 'থোথ' একটি গাভীমুণ্ড নিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তুলে দেন। এরপর হোরাস ও সেউ দেবতাদের বিচারকক্ষে হাজির হন।

মিশরের রাজমুকুট হোরাসকে দেওয়া হয়েছিল। ওসিরিজ—সূর্য। সেব—পৃথিবী। নুট—আকাশ সে—রাত্রি। আইসিস—আসন অর্থাৎ সিংহাসন। সূর্যের আসন আকাশ। যেমন—ভারতের উষাদেবী! এই মরমীয় তত্ত্বের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু বলা যায় ধর্মীয় চিন্তার কেমন সামঞ্জস্য আছে। আমাদের দেশে সতীর দেহকে ৫১ খণ্ড করা হয়েছিল। ওখানে দেখা যাচ্ছে ১৪টি খণ্ড করা হয়েছে।

নিগূঢ়ানন্দ তাঁর মাতৃতত্ত্ব, একান্নপীঠ গ্রন্থে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, তা যদি কেউ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন দেখবেন সেই সাধন-পীঠগুলির বৈশিষ্ট্য কত গভীর ও মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বশক্তির গতির পর্যায় হিসাবে এইরূপ ভাগ। এই ভাগগুলিকে তাই শক্তি সাধনার পীঠ হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রের সকল বৃত্তান্তগুলি এক একটি রূপক দ্বারা বর্ণনা করা আছে, ইহা ভুলে গেলে সবকিছু বৃথা হয়ে যাবে—আসল লক্ষ্যে পৌঁছোনো যাবে না।

এখনে সংক্ষেপে একটি বিষয়ে আলোকপাত করা যায় যে, শিব ও সতীর ঘটনার এই মর্মটির অর্থ—বৈদিক বিরোধী শক্তি হলেন শিব, ইনি কোনো অধ্যাত্ম শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। হয়তো তাঁর স্ত্রী সতী (যিনি গুরুপত্নী শিষ্যদের কাছে) সেই ভক্তদের দ্বারা সতীর স্মৃতিরক্ষার্থে এক একটি ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। গুরু নানকের ক্ষেত্রে এমন ভক্তদের অভিব্যক্তি তো সাম্প্রতিক কালেও দেখা গেছে। মা সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী, তিনি তো মাতৃরূপে আরাধ্যা দেখা যায়।

প্রাচীন এথেন্স-এর এক দেবী অগ্নরোস এঁর সাথে আমাদের ভারতের মা দুর্গার খুবই মিল আছে। এই দেবী ছিলেন কৃষির উন্নতি স্বরূপা দেবী। পরে ইনি এথেন্সের সাথে মিশে গেছেন। ভারতের বহু দেবী যেমন—দেবী দুর্গার সাথে একই নামে পূজিতা হয়েন দুর্গা পূজার সময় যে নবপত্র কলাবউ রূপে প্রতীক থাকে তা ওই কৃষির উর্বরা হেতু। এই নবপত্রিকা কী?

দাড়িম্বকদলী ধান্য হরিদ্রা মান কচু জয়ন্তী বিল্ব নবপত্রানি—এইরূপ বলা হয়। তাছাড়া দুর্গাকেও শাকম্ভরী শস্য দেবী হিসাবেও পূজা করা হয়।

প্রাচীন গ্রীকদের এক দেবী 'আর্টোমিস', ইনি আমাদের মা ষষ্ঠীদেবীর অনুরূপ দেখা যায়। প্রাচীন সেমিটিগণ দেবী 'অশটরট'-কে পূজা করত। এই দেবী মা দুর্গার ন্যায় বিভিন্ন শক্তিপীঠে পূজিতা অশটরট দেবী ছিলেন এমনিই। অশটরট দেবীকে একটি শিলাখণ্ডে পূজা করা হত। শিলাখণ্ডের চারদিকে অভিজ্ঞান দেওয়া হত। এইরূপ অভিজ্ঞান দ্বারা চারটি তীরকাঠি পুতে লাল সুতো দ্বারা বেষ্টন করাকেই অভিজ্ঞান বলা হয়। এইরূপ সকল পূজার্চনায় শুভকর্মে দণ্ড ঘেরা দিতে দেখা যায়।

মুসলমানগণ যে ছুন্নত কর্ম করেন তা তো প্রজনন ক্ষমতার জন্য উৎসর্গ মাত্র। ওই আর্টেসিস দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন গেজের অঞ্চলে সেমিটিক রা অশটরট দেবীকে ঝরনার উৎসরূপে ওই দেবীরই পুজো করত। মরুভূমির ধূসর অঞ্চলে ঝরনার জল তো আশীর্বাদস্বরূপ। অশটরট বা ঝরনা অথবা খেজুর গাছ, অশটরোথ বা মেষ বা ভেড়া এই ঝরনার জল, মেষপালন, খেজুর ফল নিতান্ত জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য! এইজন্য ওই দেবীর পূজা তাঁদের মঙ্গলদায়িনী জীবনদায়িনী মনে করা হত। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে অশটরটের গেহ নামের উল্লেখ ঃ এতেই বোঝা যায় যে, ওরা ওখানে অশটরট দেবীকেও পূজা করত।

আমাদের মা দুর্গাকে যেমন কৌশিকী, কাত্যায়নী, অম্বিকা, দুর্গা ইত্যাদি অনেক নামে পূজা করা হয়, ঠিক তেমনিই দেবী অশটরট-কে পূজা করা হত। প্রাচীন গ্রীসে বৃক্ষপূজার চলন ছিল। আমাদের ভারতে অনেক জায়গায় অদ্যাবধি হয় বৃক্ষপূজা। ম্যারাথন যুদ্ধের আগে এথেনীয়রা আর্টেমিসের কাছে 'মানত করত' রণদেবী হিসাবে। যুদ্ধে জয় হলে এবং যত ব্যক্তি মারতে পারবে যুদ্ধে ওই দেবীর কাছে ততগুলি ছাগ বলি দেওয়া হবে। এইভাবে বলির প্রচলন হয়েছে। ভারতে প্রাচীনকালে কালীপূজা, দুর্গাপূজায় বলি দেওয়া হত। এখনও হয় অনেক ক্ষেত্রে। 'আইদেবী' অসম দেশের আদি নরগোষ্ঠীর এক দেবী। এখানেও বলির প্রচলন ছিল। প্রাচীন সিরীয়দের রণদেবী বা যুদ্ধের দেবী 'আসাথরথেট' ইনি নরদেহ সিংহমুণ্ড। ভারতে নৃসিংহরূপ দেব স্মরণ করিয়ে দেয়। 'আথেন' প্রাচীন গ্রীসের এক দেবী, ইনি রণদেবী আমাদের মহিষাসুরমর্দিনী সেই দুর্গা।

মিশরীয়দের এক দেবী 'থোয়েরিস' এনার রূপ-জলহস্তীর মতো। এই দেবীই গ্রীকদের কাছে তাদেরই মতো করে রূপ দিয়ে গড়া হয়েছে। এই দেবী জন্মদানকারিণী দেবী নামে পূজিতা।

জাপানের শিন্টোধর্মে ইনিই জন্মদানকারিণী দেবী নামে পূজিতা হয়ে থাকেন। তাদের কাছে এঁর নাম আইকুগুহি। পাশাপাশি একটি পুরুষ দেবতাও ছিলেন, নাম জুনুগুহি। আইকুগুহি দেবী, সেহেতু পুরুষ দেবতা থাকা চাই। কেন? প্রজনন চাই। পুরুষ চাই তার জন্যই। আমাদেব শিবলিঙ্গ পূজা এইজন্য মনে কবা হয়। দেশের কালের বিভেদে অনেক কিছুই পবিবর্তন ও মার্জিত হওযা স্বাভাবিক। মুসলমানগণ আল্লাহ্, হিন্দুরা ব্রহ্মা, ইহুদিরা জেহবা-কে যেমন ভগবান জ্ঞানে আবাধনা করেন তাদের সেই ভাবনাকে এক ঈশ্বরবাদ বলা হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা আসে যে, হিন্দুরা বহু দেবদেবীর পূজা করেন। কিন্তু কেন পূজা করেন? কেন একেশ্বরবাদী বলা হল? সে উত্তর এই গ্রন্থের অন্যত্র পাবেন ; অনুধাবন করবেন যথা সময়। 'ভগবান' জন্মগ্রহণ করেননি। ভগবান কোনো জন্ম দেননি। তাঁর ইচ্ছায় সবকিছু হয়েছে, হয়ে যায়। ভগবান সর্বদা নির্গুণ-ভগবান, তিনি অসীম। দৃশ্যমান কখনই নন ভগবান। জাপানী ভাষায়—অমতে -অহো-মি-কমি। কমি অর্থ ঈশ্বর বা দেবতা। জাপানের দেবতাদের মধ্যে সূর্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। সূর্যকে তারা দেবী জ্ঞানে পূজা দিত। চন্দ্রকে দেবতা বলে জানত। জাপানের পুরাণ কাহিনীতে অমতেরসু ওহো মি কিম। স্বর্গের দেবী অর্থাৎ উর্ধ্বাকাশের দেবতা, রাত্রির দেবতা। সমুদ্রের দেবতা বা সংগ্রামের

দেবতা। কেন না সেখানে দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী আছে। তারা বিশ্বাস করত এই দেবী তাদের পূর্বপুরুষদের রাজ সিংহাসন দান করেছিলেন।

নেপালের কুমারী দেবীর মতো। এই দেবীর নিকট হতে নেপালের রাজারা প্রতি বছর ক্ষমতা গ্রহণ করে থাকেন। ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাঁদ রেজ্জার স্বীকার করে বলেছেন যে, দেবী আনিনিতই তাঁকে সার্বভৌম ক্ষমতা দান করে গেছেন। "আদি প্রজ্ঞা বা আদি দেবী" বৌদ্ধদের কল্পনা, হিন্দুশাস্ত্রে, ধর্মে, তন্ত্রশাস্ত্রেও এইরূপ আছে। নেপালের মহাযানী বৌদ্ধদের মধ্যে চার ধরনের তাত্ত্বিক সম্প্রদায় আছে। যেমন—স্বাভাবিক, ঐশ্বরিক, কার্মিক, যাত্নিক। হিন্দুশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মাকে আদি সত্তা বা পুরুষ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। Singularity বা একেশ্বরবাদ এ থেকেই উদ্ভুত। শক্তি হল আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি শূন্যের সঙ্গে সঙ্গম করেন বা লিপ্ত থাকেন। এইজন্য শক্তিকে রমণী বলা হয়।

এইরূপ মিলনের ফলে কাল, দেশ ও বিশ্বপ্রকৃতির উদয় হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্বকে স্বীকার করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রজ্ঞা হল আদি জননী। এই আদি প্রজ্ঞা থেকেই উদ্ভব বুদ্ধদেবের।

বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর সঙ্গম হয়ে থাকে, তাই প্রজ্ঞা বুদ্ধের রমণী তাঁদের এইরূপ বোধ ছিল, সেই নিয়মে ধর্মের মত। বৌদ্ধের ত্রিরত্ন চিন্তা উল্লেখযোগ্য। ধর্ম, প্রজ্ঞা, সঙ্গম, বিশ্বচিন্তা এই সঙ্গম থেকে এসেছে। স্বয়ম্ভু পুরাণে এই প্রজ্ঞাকে শিবের শক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শক্তি হলেন ত্রিলোকের জননী। তিনিই হলেন শূন্যতার শূন্যতা। তিনিই সকল বুদ্ধেব জননীও বটে। জগতের সকল রমণী সেই আদিশক্তিরই অবতার স্বরূপা। সকল পুরুষকেই আদি বুদ্ধের অবতার বলা হয়।

পুরুষের মধ্যে আছে সৃজনী শক্তি। শক্তির মধ্যে আছে উৎপাদিকা শক্তি বা ক্ষমতা। পুরুষ হল বীজ বা বিন্দু। শক্তি হল পরিপক্ক উৎপাদিকা—পরিপক্ক কোষ। এই উভয়ের মিলনে বোধিচিত্তের জন্ম হয়। বোধিচিত্ত থেকে সবকিছুরই প্রকাশ হয়। এই আদিশক্তিকে ত্রিকণা যুক্ত বলা হয়। শিবের ত্রিশূল সেই শক্তির প্রতীক। এই চিন্তার মধ্যে সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির ধারণা স্পষ্ট। হিন্দুদেব শিবশক্তির সহিত চীনের তাওবাদের অনুরূপ কল্পনা দেখা যায়। আদি পিতা ও মাতা তাও ও তাই। চীনাদের ঐ ধারণা বৌদ্ধ, হিন্দু, চীন বৌদ্ধ মতের অবলম্বী, একই মতের অনুসারী সবাই। চীনাদের আদি পুরুষ প্রকৃতি হলেন ইয়াং, ইন। এঁরাও বৌদ্ধমতাবলম্বী জানা যায়।

'ইলা বা অল্লাৎ' হলেন প্রাচীন আরবের পালমিরার এক দেবী। ইনি এক অদ্বিতীয়া ঈশ্বরের শক্তি রূপে পূজিতা হতেন। ইনি গ্রীসের এক দেবী আথেন-এর সমতুল্য ছিলেন বলা যায়। ইন্দ্রাণী, ইনি ভারতের বৈদিক সাহিত্যের দেবী বা ইন্দ্রের শক্তি। বালুচি ও কাইবেলি ব্যাবিলনের ইশতারা সুমেরীয় ইন্নিনি প্যালেস্টাইনের নিনা বা ঋগ্‌বেদের ননা এই সকল দেবীর মহিমা একই রকম। ইন্দ্রের পত্নী যেমন ইন্দ্রাণী, তেমনি শচী ছিলেন সেই ইন্দ্রাণী। মধ্যপ্রাচ্যের দেবতা সহসঃ ন্যুলু, তাঁর পুত্র 'শচ'। এই শচ থেকে শচীদেবীর নাম এসেছে। ইশতারা দেবীর যে উপাখ্যান আছে তেমনি উপাখ্যান আছে শচীকে নিয়ে। যেমন আমাদের গল্পে দেখা যায়, ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে হত্যা করে ব্রহ্মবধের অপরাধে অভিশাপের ভয়ে পালিয়ে

পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বা লুকিয়ে ছিলেন। দেবতারা তখন খুব সমস্যা মনে করে নহুঁষকে তাঁদের রাজা করলেন। নহুঁষ তো দেবতাদের রাজা হয়ে খুবই খুশি। এরপর চিন্তা করলেন, আমি যখন ইন্দ্রত্ব পেয়েছি তখন ইন্দ্রের শচীকে আমার পাওয়া দরকার। তিনি তখন শচীদেবীকে তলব করতে লাগলেন। শচীদেবী প্রস্তাব দিলেন, 'নহুঁষ যদি ঋষিযানে চড়ে তাঁর কাছে আসেন তবে শচী নহুঁষকে গ্রহণ করবেন।" এরপর ঋষিদের কাঁধে, দোলায় বা পালকিতে চড়ে যাওয়ার সময় মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হেতু ঋষিদের ধীরগতির জন্য পদাঘাত করেন। এই অন্যায়ের জন্য অভিশপ্ত হয়ে সর্প অজগর হয়ে গেল। ঋষিদের অভিশাপে রাজা নহুঁষ অজগর সর্প হয়ে গেল। দেবী ইশতার পশ্চিম এশিয়ার আদি মাতৃদেবী ছিলেন। ইশতার দেবীর প্রভাব আরব জগৎ ছাড়িয়ে গ্রীস ও রোমে প্রবেশ করেছিল।

জিউস, জুপিটার, বেল মারড়ু, হার্মেস নবুকে মার্কার, ক্রোনস, নিভিন, শনিগ্রহ ইশতারকে শুক্রগ্রহের সঙ্গে তুলনা করতেন তাঁরা। আফ্রোতের স্থান অধিকার করে নেয় ইশতার। ব্যাবিলনীয় মাতৃদেবীর গুণ বসানো হয় আফ্রোদি অশটরট-এর উপর।

ইশতারের গ্রীষ্মকালীন নাম দিলবৎ (শুক্রগ্রহের নাম গ্রীকদের কাছে পরিচিত ছিল সেই সময়) ভারতের দুর্গাদেবীর পূজায় বেশ্যাদ্বারের মাটি দরকার হয়। তাহা দেবী ঈশতারের স্বর্গীয় বেশ্যাত্ব বা তাঁর মন্দিরের বারবনিতা শ্রেণীর সাথে আমাদের দেবদাসীদের কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রাচীন আরবে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। এই সময় তারা দেবী হিসাবে শুক্রগ্রহের পূজা করত। দেবীর নাম ছিল 'অল' উজ্জা, মানে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হারীর শাসক 'মুনধির' উজ্জার কাছে বন্দিনী সন্ন্যাসিনীদের বলি দিয়েছিলেন বলে সিরিয়ার লেখকদের দ্বারা জানা যায়। ইনিই ছিলেন 'আফ্রোদিত'। সমসাময়িক এক লেখক 'প্রোকোপিয়াস-এর রচনায় জানা যায় যে, রাজা মুনধির অরেথাস নামে এক প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিস্টান রাজার বন্দীপুত্রকেও এই দেবীর [illegible] বলি দিয়েছিলেন। এক, একসময় দুই উজ্জার নাম উচ্চারণ করা হয়েছে সেটা সম্ভবত শুকতারা ও সন্ধ্যাতারাকে মনে রেখে। 'অল ঘরীয়ান' নামে দুটো দণ্ড ছিল। দণ্ড দুটো রক্ত মাখানো থাকত। মনে হয় হারীর রাজা এখানে নরবলি দিতেন। কুরানে Sirajii-19 উজ্জাকে মক্কার তিন উল্লেখযোগ্য দেবীর মধ্যে এক দেবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এদের ঈশ্বরের কন্যা হিসেবে কল্পনা করা হত। মক্কার কাছে নহলাতে এই দেবীর একটি বেদি আছে। এই বেদিতে তিনটি মাত্র বৃক্ষ ছিল। তবে মক্কা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা উজ্জাকে শুকতারা হিসেবে কল্পনা করত কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। দেবী তাদের কাছে দেবীই ছিলেন, অন্য কিছু নয়। বৃক্ষ দেখে মনে হয় তিনি বৃক্ষদেবী ছিলেন। বৃক্ষপূজার ধারা আজও আছে। ইবন ইশাক (৮ ম শতাব্দীর) বলেছেন যে অল উজ্জার ছিল একটি গৃহ। কুরেইশ গোষ্ঠীর অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। এটাই আস্তে আস্তে রূপের মধ্যে ধরা পড়েছে। গল্প আছে এই গৃহ ধ্বংস হয়ে গেলে একটি নগ্ন আবিসীনীয় মহিলা দেবী) স্বয়ং গৃহ ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁকে ধরে হত্যা করা হয়েছিল। সেপিটিক জাতিরা প্রথমে ছিল মাতৃতান্ত্রিক। পরে তারা পিতৃতান্ত্রিক হয়েছিল, তখন ঐ মা-দেবীও লিঙ্গ পরিবর্তন করে নিয়েছেন, প্রকৃতি থেকে প্রকৃত হয়ে গেলেন। মা-দেবীর লিঙ্গ পরিবর্তন

করে দেবতা হয়ে যেতেন। এমন হতই; সেমিটিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই লিঙ্গ পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল প্রথম ব্যাবিলনে। সুমের দেশের প্রভু বলতে তাঁদের কাছে ছিলেন "এন"। মহিলা বলতে, নিন। এনালি পুরুষ-দেবতা নিনলিল ছিলেন নারী এনালিল দেবতা। বহু আঞ্চলিক দেবী ইশতারের মধ্যে তাঁদের হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইশতারের মধ্যে মিশে গিয়ে মিলিত শক্তি হয়ে শক্তিশালিনী হয়েছিলেন। ধারণা একটা ছিল যে নারীদের শক্তি সম্পূর্ণ হতে পারে না। প্রকৃত শক্তি পুরুষের মধ্যেই থাকে। এইরূপ চিন্তাভাবনা করত এবং তা থেকেই ওই লিঙ্গ পরিবর্তন হত। সেমিটিকরা কিন্তু অশটরট-কে স্বতন্ত্র পূজা করত ঝরনার দেবী বলেই। তাদের কাছে' নিনা আ' দেবী ছিলেন জলদেবী। এই দেবীর পূজায় মাছ ভোগ দেওয়া হত।

আমাদের মেদিনীপুরের তমলুকে বর্গভীমা দেবীকে শোলমাছ ভোগ দেওয়া হয়। ইশতার দেবীর আসনের নীচে মাছ, সামুদ্রিক প্রাণী থাকে। দেবী "অটরগটিস" এর কাছেও মাছ ভোগ দেওয়া হত। মাছ ছিল তাঁর অতি প্রিয় বস্তু। যেমন মকরবাহিনী গঙ্গাদেবী। আমাদের কালী পূজায় মাছ দেওয়া হয় ভোগ হিসেবে। আবার দেখুন দুর্গাপূজার জন্য সমুদ্রের জল বা গঙ্গার জল দরকার হয়। কেন? জলের দেবী ইশতার যেমন শাকসবজির সাথে জড়িত ছিলেন, আমাদের দুর্গাদেবী অনুরূপ মনে হয়। ওরা ভোগমাছ দেয়, শাকসবজিও দিয়ে থাকে। আমরা জল দিই পূজায়, আমরা দেবীদুর্গাকে শাকম্ভরী নামে আলাদা পূজাও করে থাকি।

আমাদের শিবঠাকুরের গায়ে সর্প জড়িত কেন? সর্প হল সৃষ্টির গতি। গতি—যা শক্তি নামে অভিহিত। এই শক্তিই জীবের কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে সাধকগণ জানেন।

সৃষ্টিতে গতি আছে আধুনিক কালে বিজ্ঞান তা স্বীকার করে নিয়েছে। পাহাড়ে বড়ো বড়ো ফাটলের দিকে তাকিয়ে গ্রীকরা শক্তির প্রার্থনা করত। যুদ্ধে জয়ের বাসনা জানাত— বলে প্রমাণিত। এ থেকে আমাদের 卐 স্বস্তিক চিহ্ন, সেই গতির প্রতীক হিসাবে আমরা জানি বা কল্পনা করে পূজা করি।

শিবের স্কন্ধে ৬ টি চক্র (পাকানো), লিঙ্গে আছে ৩টি চক্র (পাকানো), সর্পের বেড়ি দেখা যায়। কেননা আমরা দেখি মিশরের দেবতা ফ্যারাওদের রাজমুকুটে সর্প ফণা তুলে শোভা পেত। এইজন্য আমাদের শিবের ঐ সর্প-বেশ! এই গতিতত্ত্ব ভারতীয় পুরাণের নির্দেশিকা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব। ব্রহ্মা প্রকাশ শক্তি, বিষ্ণু হলেন দেহস্থ প্রকৃতি তত্ত্ব!

শিব তো গতিশক্তির মূর্ত প্রতীক। সর্প হল শঙ্খিল গতির প্রতীক। সেই প্রতীক শিব ধারণ করেই আছেন। সর্প হল জগতের ঐশী শক্তির গতি। এই গতি এই চলমানতা কেমন? এই গতিশীলতার স্বরূপ বোঝানো সম্ভব নয়। অনুরোধ রইল যদি ভালো লাগে একবার বামন পুরাণ পড়বেন। রুশ ঐতিহাসিকগণ ইশতার পূজাকে উর্বর শক্তির পূজা বলে উল্লেখ করেছেন। ইশতারের স্বামী ডমুজ বা তম্মুজ হলেন উদ্ভিদের ব্যক্তিরূপ। গ্রীষ্মে তার মরে যাওয়ার অর্থ শস্য শুকিয়ে যাওয়া। বৃষ্টিতে তার নবজন্ম হল রজস্বলা। এবং পৃথিবীর শস্যের জন্ম দেওয়া। এখানকার লৌকিক আচার অনুযায়ী এইজন্য সুমের অঞ্চলে মহিলারা জুলাই মাসে ডুমাজি বা তম্মুজের জন্য শোক প্রকাশ করতেন। দেখা যায়, বাংলা দেশের মহিলারা

মাটিতে জল ঢেলে কাদায় হাত ডুবিয়ে সেই হাত দিয়ে বুক চাপড়ায়। মুসলমান মহিলারা গান গায়—'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে। এর মধ্যেও একটা শোকের আভাস আছে। মিশরের 'অসিরিজ' আইসিসের গল্পের সঙ্গে একটা মিল আছে।

মেসোপটেমিয়া কাহিনীতে দেখা যায়, ডুমজি বা তম্মুজে ছিলেন আদিতে ইনান্নার স্বামী। শস্যের দেবী হিসেবে ইশতাবের একটি নাম হল 'উরকিটটু'। সম্ভবত নামটি উরকু বা সবুজ এই শব্দ হতে এসেছে। উরুক বা এরেকের দেবী হিসেবে নয়।

দেবী ইশতারকে ধুলার রানি এবং শস্য ক্ষেত্রের অধীশ্বরী হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। অশেরা বা দন্ত যা ইশতারের কাছে খুব প্রিয় ছিল, তা সম্ভবত বৃক্ষের প্রতীক। ননা-ইশতারের প্রাচীন রূপ এই অশেরার মধ্যেই ছিল। প্রাচীন একটি শিলমোহরে দেখা যায় উপবিষ্টা অবস্থায় দেবী একগুচ্ছ শস্যের শিষ লক্ষ্মীর হাতে ধানের শিষের মতো ধারণ করে আছেন।

দেবী ইশতার বহু রূপ ও বহু মহিমায় মিশর ও মধ্য প্রাচ্য এশিয়া, গ্রীস, ব্যাবিলনীয় অর্থাৎ সেমিটিক ক্যালিটিক, ইরান, জার্মান সর্বত্র পূজিতা হতেন। তাঁর বহু রূপের মধ্যে মাতৃত্বের রূপ বিশেষ নজর কাড়ে। তিনি মানুষ সৃষ্টিকারিণী। সকল সৃষ্ট জীবকে তিনি উন্নতি করতে সাহায্য করেন। তিনি গর্ভদাত্রী। তাঁকে সৃষ্টিপ্রিয়া নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

বহু ভাস্কর্যে বা উৎকীর্ণ চিত্রে ইশতারকে এমন রূপেও দেখা যায় যে, তিনি শিশুকে স্তন পান করাচ্ছেন। (ভারতে তারামাকেও শিবকে স্তন পান করাতে দেখা যায়)। এইজন্য তন্ত্র মতে তারা হলেন জননী।

মা হিসেবে তিনি পার্থিব জীবকে আশীর্বাদশূত করতেন। তাঁর আশীর্বাদে মানুষ দীর্ঘ জীবন স্বাস্থ্য ও সম্পদের অধিকারী হত। এই যে দেবী ইশতার তাঁকে জাদুক্ষমতার অধিকারী বলেও মানা হত। এই জাদু বলেই তিনি দানবশক্তি প্রতিরোধ করতে পারতেন, সুতরাং জাদু বিদ্যায় ভূত-প্রেত ছাড়াবার জন্য তাঁকে স্মরণ করা হত।

মানুষের প্রতি তাঁর শুভ ইচ্ছা এবং প্রচণ্ড ক্ষমতার জন্য ব্যাবিলনে এই দেবীকে নানা প্রার্থনাতে যত বার স্মরণ করা হত অন্য কোনো দেবী বা দেবতাকে তা করা হত না। "রাজা অসুর বনিপাল' অন্য কোনো দেব-দেবীকে প্রার্থনা না করে তাঁকেই জানাত সকল কামনা। এইভাবে দেবী ইশতার মহামায়া বা চণ্ডী বা দুর্গা, তারা, ভৈরবী, শক্তিস্বরূপা দেবীর ন্যায় পূজা করা হত।

আমাদের শিবকে যোগী হিসেবে দেখা হয়। বামন পুরাণে তাই তিনি বলেন, "হে দেবী, হে প্রিয়তমা, আমার কোনো আশ্রয় নেই। আমি অরণ্যে চির ভ্রাম্যমাণ"। যোগী কেন?

যোগের মাধ্যমে মন সত্যসন্ধবলে ছন্দময় আলোড়ন হয়। ইহাই সৃষ্টি রক্ষার জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির দরকার তার বেশি নয়, কম নয়, সেই শক্তির প্রতীক, সতীর দেহত্যাগের পর যে ভয়ংকর রূপ তিনি ধারণ করেছিলেন তা তো বিপর্যয় সূচক। বিষ্ণু সতী দেহ শিব থেকে বিচ্যুত করে দেন কালচক্র দ্বারা, বিষ্ণুচক্র দ্বারা নয়। কারণ? বিষ্ণু তো বর্তমানের দেবতা নিয়তি, কাল, প্রকৃতি)। সৃষ্টির আদি ব্যাপার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সৃষ্টির পরবর্তী সৃষ্টি। অতএব দেবতা পর্যায় ব্রহ্ম কালের অতীত ইহা। সৃষ্টির পর্যায়। শিব ভবিষ্যৎ

শক্তি এবং প্রলয় ও ধ্বংসেরও শক্তি। ধ্বংসের মধ্যে নতুন সৃষ্টির সূচনা থাকে। মিশরের আমন শিবের অনুরূপ।

প্রাচীন ভারত, এশিয়া মাইনর, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যান্ড, গ্রেটব্রিটেন, সর্বত্র একটি চিহ্ন বিদ্যমান ছিল দেখা যায়। সেটি হল 卐 স্বস্তিকা চিহ্ন।

'অওর' এই দেবী ইউফ্রেটিস অঞ্চলের সিরিয়ারা, মাতৃরূপা পূজা করত।

এই দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে রীতি ছিল মহিলারা বারবনিতার ভূমিকা পালন করত। কোনো কুমারী তার কুমারীত্ব নাশ করত সেখানেই। লেবাননের হিয়োরো পোলিসে অশটরট (অওর) পূজাবিধি ছিল যে, কুমারী মেয়েকে দেবীর মন্দিরে অপরিচিত পুরুষের কাছে দেহ দান করতে হবে। ভারতবর্ষে অদ্যাবধি এই রীতি আছে, কেন না মন্দিরে-মন্দিরে যে দেবদাসী থাকার চল তা মনে হয় এ থেকেই এসেছে। এ সকল তন্ত্রসাধনার নামে একপ্রকার ভণিতা বলা যায়। শক্তিসাধনার ২টি ধারা আছে। আসল ষটযোগ, সেই নিয়মে অন্য কথা বলে। সুতরাং কোন্ নিয়ম কীসের জন্য সে তো ভেবে দেখার মতো।

'অরমইতি'—ইনি প্রাচীন ইরানীয় দেবী। ঋগ্‌বেদে যেমন ব্যক্তিরূপ আরোপ করে স্তুতি করা হত, তেমনি অরমইতি দেবী ধর্মের প্রতিমূর্তি ছিলেন।

'আনথিট' সিরীয় ও ফিনিসীয়দের এক সেমেটিক, রণদেবী ইনি। তাঁর দক্ষিণ হস্তে ঢাল ও বর্শার, বাম হস্তে গদা ছিল। 'আনকেৎ'— ইনি প্রাচীন মিশবের এক দেবী। নীলনদের জলকে দেবীরূপে কল্পনা করত তারা। এই দেবীর মাথায় পালক-মুকুট ছিল। প্রাচীন গ্রীসে টাইফোন ছিলেন ঘূর্ণি ঝড়ের দৈত্য! তাঁর ছিল শত সর্পশীর্ষ। জিয়াসকে আক্রমণ কবতে গিয়ে বজ্রের আঘাতে পতন হয় তাঁর। তাঁর পত্নীর নাম ছিল 'এচিদনা'! তিনি ছিলেন অর্ধমানবী, অর্ধসর্প। ভারতে যেমন 'উলুপী ছিল'। এ থেকে মিশরে 'স্ফিংস' 'বহুমস্তিষ্ক সর্প', হাইড্রা ও ড্রাগনরা এসেছিল ও থেকে বলেই বিশ্বাস। কৃষ্ণ যেমন কালীয় দমন করেছিলেন, নরশিরযুক্ত হাইড্রাকে হারকিউলিস হত্যা করে ছিলেন। খ্রিস্টান জ্ঞানবাদীগণ মনে করতেন, আদি সত্তাই প্রথম মানুষ হোলিগোষ্ঠ হল। আদম + ইভ নামে স্ত্রীশক্তি বা প্রথম মানবী এঁরাই। আমাদের মনু যেমন আদি মানুষ।

'ঐয়া' ইনি পশ্চিম আফ্রিকার যোরুবা নিগ্রোদের বজ্রদেবতা 'শঙ্গোর' তিন ভগ্নীর এক ভগ্নী ছিলেন ইনিই। 'ঐয়ার' শক্তি নাইজার নদীতে বাস করত। ঐয়া ছিলেন শঙ্গোর প্রধানা মহীষী। অনেক সময় তাঁকে ৯টি মস্তকবিশিষ্ট দেখানো হত। নাইজার নদীর ৯টি মুখ ছিল সম্ভবত তারই রূপ কল্পনা এইরকম।

'ওদুদুয়া' যোরুবাদের দেবী, তাঁর স্বামী 'অবাজলা'। আকাশ ও পৃথিবী দেখার দায়িত্ব ছিল অবাজলার উপর। 'ওদুদুয়া' ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শিশু কোলে তাঁর। তিনি ছিলেন প্রেমের দেবী। তাঁর প্রধান মন্দির আছে এডোতে, ওলোসা অঞ্চলে। পশ্চিম আফ্রিকার যোরুবা নিগ্রোদের সমুদ্র দেবতা 'ওলোকুন' এঁর প্রধান মহিষী ছিলেন। লগোস উপদ্বীপ অঞ্চলে এখনও স্বতন্ত্র দেবী হিসাবে তাঁকে পূজা করা হয়। তিনি মাছ, কুমির, হাঙ্গর ইত্যাদিরও দেবী। ইনি সব রক্ষা করেন এইরূপ বিশ্বাস। ধীবরগণ খুব ভক্তি অর্ঘ্য দিয়ে থাকে তাঁকে। ভারতবর্ষে

সমুদ্রকে রত্নগর্ভা বলে, এবং সমুদ্রদের বরুণকে পূজা করা হয়। **অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সমুদ্রের জল পাপহরা হয়ে থাকে।** এই সময় ৯৯ টি নদীর জল সমুদ্রের জলে এসে মেশে। সমুদ্র ও তীরবর্তী মানুষদের এইরূপ বিশ্বাস তখন ছিল। কাথিযাবাড় অঞ্চলে প্রতি মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে সমুদ্রতীরবর্তী অধিবাসীরা উপকূলে আগুন জ্বেলে আগুনে ঘি ঢেলে তাঁকে অর্চনা করত। মৎস্যজীবীরাও সমুদ্রে দুধ চিনি, মদ, ঢেলে প্রার্থনা জানাত। যখন জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরে ঘরে ফিরত তখন তাদের মুখের সামনে আগুন জ্বেলে বা প্রদীপ জ্বেলে দুষ্টশক্তি সকল মুক্ত করার চল ছিল।

পুরাণে সাগরের বর্ণনা আছে, যেমন—৭টি লবণ সাগর, ইক্ষু সাগর, সুরা সাগর, ঘৃত সাগর, দধি সাগর, দুগ্ধ সাগর ও জল আর জল।

আমাদের ঋগ্‌বেদে সূক্ষ্মাত্মার ব্যক্তিরূপ দিয়ে সূক্ত রচনা হয়েছে। যেমন নিঋতি (বিয়োগ) মানে মৃত্যু। কাম-আকাঙ্ক্ষা (যৌনতা)। কাল (সময়), স্কম্ভ-(সমর্পণ), প্রাণ-শ্বাস ক্রিয়া স্ত্রী-সৌন্দর্য ইত্যাদি।

"অসুনীতি" একদেবী! জরথ্রুষ্টবাদীগণ আর্মেনীয়জাতিগণ অসুনীতির অর্চনা করত।

"আমে-নো-উজুমে" ইনি জাপানের এক দেবী উজু থেকে বাঁদর মহিলার পূর্ব-পুরুষানী বলে উল্লেখ আছে। উজুমে দেবতাদের দরবারে নৃত্যগীত প্রদর্শন করত। আমাদের স্বর্গে যেমন উর্বশী নৃত্য করতেন। জাপানের শিন্টো সম্প্রদায়ের কোনো তরুণী পুরোহিত হত এবং বেদিতে বসে অনেক দিব্যবাণী শোনাত। আমরা দেখি, থানে বা মন্দিরে অনেক মেয়েতে ভর হয়। এই ভর অধিকাংশ মেয়েদের উপরেই হতে দেখা যায়। এদেরও লোকে দেবীজ্ঞানে ভক্তি পূজা।

গ্রীকদের দেবতা 'হারমি' দেবী আইরিশ ছিলেন পক্ষযুক্ত। আমাদের চিন্তাভাবনায় যেমন পরীদের কথা আছে। এই পরীগণকে বলা হয় সূর্যের দূত বা বার্তাবাহিকা।

শক্তি ও শক্তিমান একই জিনিস। মায়াশক্তিকে শিব বলা হয়েছে। শিব যখন সৃষ্টির কারণ তখন মায়াশক্তি রূপেই দেখা দেয়। শক্তি হিসাবে শিবের সঙ্গে বিশ্ব জগতের সরাসরি সম্পর্ক আছে শিবই শক্তি হিসাবে বিশেষ কারণ এবং শক্তি হিসাবে জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শক্তি শাস্ত্রে স্থূল সাধনশাস্ত্র হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তু বিশ্বকে দেখেছে, জীব পর্যায় থেকেই। তাঁদের মতে, বিশ্ব ও বিশ্বভূত, জীব সত্য, সেই শক্তি, বিশ্বসত্য, জীবসত্য, ঈশ্বর সত্য। অতএব সৃষ্টি আছে, তাঁদের মতে শিবই জগৎ সৃষ্টি করেন, তাতেও অবতার তো হয়েছেন বটেই। উপনিষদে এটি মাকড়সার জালের সহিত তুলনা করা হয়েছে। (ঊর্ণজাল)

ধর্মে যে যৌনভাবনা তা কোনো তত্ত্ব নিয়েই আসেনি। বিশ্বধর্ম চিন্তায় সহজভাবে কোনো মানস চক্ষুর দ্বারা দেব ও দেবীর সহযোগ ঘটেছে তার ব্যাখ্যা সহজ স্বাভাবিক। উৎপাদক, উৎপাদন এইজন্য পুরুষ ও স্ত্রীর ভাবনা। আবার অনেক ক্ষেত্রে কেবল পুরুষদেবতা যেমন ইসলাম, ইহুদি ভারতের ব্রহ্ম ঃ সেই ভগবান। এই ভগবান কে? বিজ্ঞান একে 'নিউটন ফিল্ড' রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যার থেকে প্রতি ১২ - ১৪ মিনিট অন্তর একটি প্রোটন ও ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে। সৃষ্টি সহজাত এইজন্য। ইসলাম ইহুদি খ্রিস্টান ধর্মে যে পিতৃতন্ত্রের কল্পনা

তা স্থূল, প্রাকৃত! পিতৃতত্ত্বের সঙ্গে এক নয়। ইহাকে করুণার সম্পর্ক বলা হয়। ভারতের বামাচারের ভাবনাচিন্তায় পঞ্চ ম-কার-মদ, মাংস, মুদ্রা, মৎস্য, মৈথুন। আসলে শক্তি সাধকদের ২ ভাগে ভাগ করা যায়। তন্ত্রসাধক ও ষোড় যোগসাধক। কত প্রভেদ আছে ঐ পঞ্চ '-ম' কার সাধনায়। অতি মরমীয় তত্ত্ব আছে। অপর পক্ষে, তন্ত্রসাধকগণের পঞ্চ 'ম'-কার এর সাক্ষাৎ দর্শন চাই। ষটযোগের বিধান—এই অবস্থা থেকেও নাকি উত্তরণ ঘটে। তন্ত্রসাধকরা বলেন। কিন্তু এই বৈষয়িকী আমাদের মনে সায় দেয় না। সত্যি কিনা ভেবে দেখুন! **ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের সাধনমার্গ** বৌদ্ধ মহাযানপন্থীরা নেপালে ৪টি ধাপে দেখা যায়। স্বাভাবিক, **ঐশ্বরিক, ধার্মিক, যান্ত্রিক**। ভারতীয় জৈনধর্মে তিনটি দেবী—স্বীকৃত **অম্বিকা, চক্রেশ্বরী, পদ্মাবতী**। এঁরা সবাই সৎ ধার্মিক। এঁদের দেবী মন্দির পর্বতশীর্ষ চূড়ায়। অম্বিকা সিংহ-বাহিনী। চক্রেশ্বরী হিসাবে তিনি অম্বিকার ভয়ংকরীরূপ নিয়ে বিরাজিতা'। ইনি চক্রধারিণী, রং কালো।

পদ্মাবতীর বাসস্থান পর্বতশীর্ষে, ইনি অম্বিকার তুলনায় ন্যূন। আসলে বৌদ্ধ এবং জৈন—ইহারাও আগমনীর শাস্ত্রের অধীন তন্ত্রসাধক মাত্র। বৌদ্ধরা ঈশ্বরবাদী। হিন্দুরা একেশ্বরবাদী আগম বা বামচার সম্পর্কে শাস্ত্র বলছে "বাম করাল ভৈরব উত্তর-পশ্চিম পাঞ্চরাত্র বৈখানম ভাগবত শিবস্তথা সহস্রাণি—আগমশাস্ত্রাণী।" শাম্বপুরাণ দ্রঃ। বৌদ্ধদের দেবী "প্রজ্ঞাদেবী।" প্রজ্ঞাপারমিতা। ইনি আদি প্রজ্ঞা বা আদিদেবী। বৌদ্ধগণ এইমতো সাধন করেন।

হিন্দু শাস্ত্র উলটো পথে চলে। যেমন নির্গুণ ব্রহ্মকেই আদি সংগা বা পুরুষ হিসাবে কল্পনা করেছে singularity একেশ্বরবাদ। এ থেকে উদ্ভূত শক্তিই আদ্যাশক্তি। ইনি শূন্যের সাথে রমণ করেন, তাই রমণী। পুরুষ এই রমণীর সাথে মিলনেই কাল, দেশ ও বিশ্বপ্রকৃতির উদয় হয়। কিছু কিছু হিন্দুতন্ত্রে দেবী শক্তিকে পুরুষ অপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়।

নাথ সাহিত্যে এই চিন্তা প্রতিফলিত। কিন্তু চীনের তাওবাদে অনুরূপ কল্পনা দেখা যায়। এদের আদি (পুরুষ 'ইয়ং') আদি (শক্তি 'ইন')।

বৈষ্ণব আগম, পঞ্চরাত্র সম্প্রদায় বলেন, মহাশক্তি 'লক্ষ্মী' তাঁর চূড়ান্ত পর্যায় হল নির্বিকল্প অবস্থা (বাসুদেব) অবস্থা। সেখানে তিনি অন্ধকার রূপ মহাশূন্যতা মাত্র। এই সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে, তন্ত্রসাধকদের বিভাগ আছে। এক হল সাধারণ সাধক। দ্বিতীয় গণ হলেন ষড়যোগ সাধক। এই ষড়যোগ সাধকগণ মহাসাধক পদবাচ্য বলা যায়। বলা বাহুল্য, যারা নিম্ন মানের সাধক তাদের চাই নারী, মদ, মাংস ইত্যাদি। ইহাই প্রকৃত বামাচার, ইহাতে ব্যভিচার দোষ আরোপ হতেই পারে। আগম শাস্ত্রে বৈষ্ণব বা শাক্ত সাধনের যে আভাস দেওয়া হল ভেবে দেখতে আবেদন করি। এই প্রসঙ্গে আচার্য শংকর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই সম্পর্কে সমালোচনা আছে, তা নিম্নরূপ।

আচার্য শংকর বলেন, সৎকারণবাদের কথা তা আমরা যোগ্য তত্ত্বের অনুরূপ দেখি না। শংকর আভাসকে সদৃশ পরিণাম বলেছেন। কিন্তু সদৃশ পরিমাণ পর্যন্ত বস্তুর কখনো সাত্ত্বিক জগতের উদ্ভব হয় না।

তত্ত্ব পর্যায়ে ও বস্তুতে সাত্ত্বিকতা সেই। যতক্ষণ পর্যন্ত না মায়ার হস্তক্ষেপ দ্বারা প্রকৃতি

স্থূল বিশ্বে প্রকাশিত হচ্ছেন। এজন্য নিষ্কল শিব—সকলশিব বলা হয়। এই 'সকল' শিব থেকে বিশ্ব প্রকৃতির জন্ম। জন্ম মানে প্রকাশ।

কীসের প্রকাশ?

চিৎ শক্তির প্রকাশ। সৃষ্টি হল তাই; যা মায়া শক্তির প্রভাবে....... চিৎ শক্তিকে সীমিত বিষয়রূপে প্রতিভাত করে। সাংখ্যে প্রকৃতি .... হতে পৃথিবী পর্যন্ত বিবর্তনকে ৬০টি অংশে ভাগ করে দেখানো হয়েছে; ইহাই ষষ্টিতন্ত্র বলে বিদিত।

স্বয়ম্ভু পুরাণে প্রজ্ঞাকে শিবের শক্তি হিসাবে বর্ণনা আছে। এই শক্তিই ত্রিলোকের জননী। সকল দেবদেবীর আদি জননী তিনিই। তিনিই হলেন শূন্যতার শূন্যতা। বলা হয়েছে, তিনি সকল বুদ্ধের জননী। জগতের সকল রমণীর আদি অবতার স্বরূপ তিনিই। পুরুষের মধ্যে আছে সৃজনী শক্তি। পুরুষ হল বিন্দু বা বীজ। শক্তি হল পরিপক্ব উৎপাদিকা কোষ।

উভয়ের মিলনে বোধিচিত্তের জন্ম হয়। যোগসাধনার সেই সূত্রটি এইরূপ—

সাধক যখন আসনে বসেন কী অবস্থা হয়? সেই মরমিয়া কাহিনী বলছি! যা শুনলে শ্রদ্ধা হয়, একটু বিনম্র ভক্তিতে মন লুটিয়ে পড়তে চায় তাঁর চরণে। যখন সাধকের ব্রহ্মতালু হতে লালা ঝরে অন্তর্দাহের জন্য! ইহাই 'মদ' বলা হয়েছে। রাগ-হিংসা-ক্রোধ এইসব পশু প্রবৃত্তিকে দমন করা; মানে সম্পূর্ণ সংযত হওয়ার নাম মাংস ভক্ষণ করা। আমাদের দেহের শিরদাঁড়ার সংলগ্ন দুটি নাড়ি—ইড়া পিঙ্গলা; এগুলি দিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করার বা গতি নিষ্প্রভ করতে হলে সহায় ঐ দুটি নাড়ি; এই শ্বাস সংযত-রুদ্ধ করলে কেমন ভাব হয় একটু পরখ করে দেখুন না! এই হল সাধকের মৎস্য ভক্ষণ।

শিরদাঁড়ার বহিরাবরণ হতে প্রবাহিত যে নাড়ি তার নাম 'সুষুম্না'। মস্তিষ্কে একপ্রকার পারদোপম পদার্থ ঘোর শ্বেত বর্ণ আছে। নাভিচক্রের কুণ্ডলিনী শক্তিকে সাধন দ্বারা যখন এই স্থানে "সহস্রার" সাথে মিলিত করে দেওযা যাবে; সেই কূটস্থ চৈতন্যভেদের নাম মৈথুন। সাধক তখন পরম ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়। সাধক এই অবস্থায় গেলে বা পৌছালে দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। যোগীরা সবজান্তা। তিনি ব্রহ্মময় হয়ে গেলেন। তাহলে তন্ত্রসাধনা কেমন জানা গেল? মদ মাংস নারী (মাগী) মৈথুন সে-কি ব্যাপার? সাধারণ মানুষের চিন্তার অগোচর যে! নারকেল মানে কি ছোপড়া বোঝায় নাকি? অথচ এইসবই ঘটে। আসলে—তন্ত্রসাধনায় হঠযোগ নামে একপ্রকাব অলৌকিক সাধন করা সম্ভব হয়! তাই-ই ম্যাজিক বা জাদু নামে খ্যাত। বৌদ্ধতন্ত্রে ইহা অতিমাত্রায় প্রকট। লোকনাথ বাবা একবার তিব্বত প্রদেশে গিয়েছিলেন এবং তিনি এসব প্রত্যক্ষ কবেছিলেন জানা যায়। তিব্বতীরা কি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী? হ্যাঁ! যাইহোক ধর্ম নিয়ে পরে অনেক আলোচনা করা যাবে।

ভারতের আদিম জাতিসমূহের মুণ্ডারিদের ধর্মভাবনা সম্পর্কে কিছু জানা যাক।

মুণ্ডারিদের ভগবান 'হরম-আসুল' ইনি বাঁশি শুনতে খুব পছন্দ করেন। কোনো ছেলে জন্মগ্রহণ করলে, ভগবান ঐ ছেলের ঠোঁটে, আঙুলে আশীর্বাদ দিয়ে থাকেন যাতে সে ভবিষ্যতে ভালো বাঁশি বাজাতে পারে। একদিন—সেংগেলদার আগুনে পৃথিবীর জ্বলছে সিং বোঙা আগুন ফেলেছিল আকাশ থেকে সেই আগুন দ্বারা পৃথিবী পুড়েছিল। একটি ছেলে একটি মেয়ে তারা মুন্ডারি। তারা শালবনের ছায়ায় টুইলা বাজাচ্ছিল। মেয়েটি নাচছিল।

তারা আগুন দেখে থমকে দাঁড়াল। শিং বোঙা আকাশ থেকে মুখ বার করে বললেন, 'আরে তোবা পালা'। "তোদের হাতে যে জনম মরণের ভার! তোরা হতে আবার সিজাবে যে" (নতুন জন্ম হবে)। তারা বলল, কোথা যাব?

'ও'-ই-যে দেখ'। আগুন রাঙা সাপ। তিনি নাগদেবতা। নাগীরা তখন ঐ ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে গেল এক কাঁকড়ার গর্তে। শীতল জল, তারা জলে ডুবে থাকল। কতদিন ছিল তা কে জানে? তারপর তারা সিংবোঙার ডাকে উঠে এল ঐ গর্ত থেকে। বাইরে এসে দেখে বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সিংবোঙা যেমন আগুন ঢেলে পুড়িয়ে ছিল, আবার বৃষ্টি দিয়ে বিশ্বভুবন ঠাণ্ডা করে দিল। কতদিন ধরে এসব সিজাল কে জানে? এই গাছপালা নদী পাহাড়, পশুপাখি, ফুল ফল, অরণ্য, কীটপতঙ্গ এই মানুষ! হ্যাঁ! জগতে সব আছে, মানুষ নেই ; "তোরা সিজা"। নতুন সৃষ্টি কর। 'শুন তোরা ;' মানুষে মানুষে মুণ্ডারি মানুষে ভুবন ভরে দে'। সেই ছেলে ও মেয়ে থেকে সকল মুন্ডারির সৃষ্টি হল। এইভাবে একদিন মুন্ডারিতে ভরে গেল—বাসিয়া, সিসাই, কোলেরিয়া বানো, লোহারডাগা, তোরপা, করাখুনটি, মুবহু, তামার, বুনদু, সোনা হাতু জোরহাট, জিলিংসেরেত ক্রোনতেরা, চাবারি, মাণি-সাই, বিরতা, কোটাম, সোনপুরগড, তাউ, তিলাই, মারচা, নাগাফেনী, পালকোট, তিরলা মানিহাতু, চাতরাদি, কুসুমটোলি, দিনবুকেল কামরা, পিগি, দোরমা, গোরাইদি, বিচাকুটি, কারিক, কোটগরা, চাইবাসা, সিংভূম ছোটোনাগপুব জুড়ে সকল মুন্ডারিদের ভুবন। জগতে প্রথম সৃষ্টিতে দেখা যায় অসুর, বাক্ষসদের প্রভৃতির এবং তির্যক সৃষ্টিসমূহ। এই রাক্ষস পিশাচ ইত্যাদি ধ্বংস হলে জগতে সুস্থ মানবসভ্যতা গড়ে সমাজ নগব ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। অসুবশ্রেষ্ঠ মহিষাসুর শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করেন দুর্গামাতা। মধ্য প্রাচ্যে এই দেবী হলেন 'ইশতারা'।

দেবী দুর্গার আর একটি রূপ আছে যোগনিদ্রারূপ। যোগনিদ্রা, 'কালরূপিণী'। ফলে দেবীর সঙ্গে বিষ্ণু-কৃষ্ণের একটা যোগসূত্র দেখা যায়। সম্ভবত, বৈষ্ণবেরা তাঁদের উপাস্য দেবতা বিষ্ণুকে অধীনে আনার জন্যই এমন করেছেন। ভারতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়কে দেখা যায়, ভিন্ন ধর্মের দেবদেবীকে তাঁদের দেবতার অধীনে আনার জন্য নানা ধরনের গল্প তৈরি করেছেন।

একই দেকতা বা দেবী বিভিন্ন নামে ও শক্তিতে অন্যান্য দেবদেবীদের নিজেদের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। এই প্রয়াস, শুধু ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর সর্বত্র এইভাবে—হাত ধরাধরি করে ধর্মভাবনা ও মাতৃতত্ত্ব-চিন্তা গড়ে উঠেছিল। সেই কথা বলা হয়েছে।

একটি কথা সততই মনে আসে যে, সেই কোনো অতীতে কেমন করে একই বেদিতে বিশ্বের ধর্মাভাবনা গড়ে উঠল? এ সত্যের সন্ধান কে দেবে? পৃথিবীর সকল ধর্মভাবনায় 'সর্প' জড়িত দেখা যায়। অথচ আধুনিককালে বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে তাকেই 'নিউট্রন ফিল্ড' বলা হয়েছে। সেই প্রাচীন মতেই মাতৃতন্ত্রে বলা হচ্ছে ; কুণ্ডলিনী শক্তি সেই সর্পরূপিণী শক্তি। এই কুণ্ডলিনী শক্তির উত্থানই সাধকের জন্ম বা বোধি লাভ ঘটে তন্ত্রসাধনায়। ইহা বড়ই বিস্ময়, বড়ো অদ্ভুত!

এইজন্য বলা হয় যে, অপৌরুষেয় ঋগ্‌বেদ। ইহা মানুষের সৃষ্টি হতে পারে না, সম্ভব নয়। পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মভাবনা সবই একই সূত্রে গাঁথা। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো

অবকাশ নেই। যা ঘটেছে বিভেদ ফারাক তা অতি আধুনিক। সে, ঐ যে আমাদের শাস্ত্রমতে বলে ত্রেতাযুগের শেষে কলির ৬৭২ বছর পরে ; যা কিছু ধর্মশাস্ত্রের বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে এই সময় হতেই মানুষের গড়া বিভেদ। গোড়ায় সবকিছুই এক সূত্রে গ্রথিত ছিল। তাই তো স্বামীজি বলেন, ঋগ্‌বেদ বিশ্বধর্মের সূতিকাগার, কেননা ইহা মানুষের সৃষ্ট নহে— অশরীরী।

৪। ঋগ্বেদ ভারতীয় না ইউরোপীয়ানদের রচনা?

নঃ তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহৎ যশঃ। বাংলা অর্থ হল---যিনি নিজের যশের দ্বারা নিজেই প্রকাশিত, তাহার কোনো মূর্তি হতে পারে না। হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন মন্ত্র বা ঋক্‌গুলির সমষ্টিকে ঋগ্‌বেদ সংহিতা বলে। এর দ্বারা যাগযজ্ঞ নির্বাহ করতেন। ঋষিবংশীয়গণ বংশানুক্রমে কণ্ঠস্থ করে রাখতেন আর যজ্ঞে তা ব্যবহার করতেন। অনেক পরে ঋক্‌গুলি সংহিতা নামে সংকলন করা হয়েছে। এক এক ঋষিবংশের ঋকগুলি এক এক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এইরূপ দেখা যায়। মোট দশটি মণ্ডলে সমস্ত ঋক্‌গুলি আছে। ইহাই 'ঋগ্‌বেদ সংহিতা' নামে সংকলিত। এখন কেহই ঋগ্‌বেদ বলেন না, ইহাকে ঋগ্‌বেদ সংহিতা বলেন।

প্রথম মণ্ডলে আছে যে ঋক্‌গুলি তার একটি তালিকা করলে এইরূপ দাঁড়ায়, যথা—

অঙ্গিরা বংশীয়দের	৩২ টি সূক্ত
কণ্ব বংশীয়দের	২৭ টি ,,
অগস্ত্য ,,	২৭ ,, ,,
গৌতম ,,	২৭ ,, ,,
দিবোদাস পুরুচ্ছেপ	১৩ ,, ,,
বিশ্বামিত্র	১১ ,, ,,
শক্তিপুত্র মধুকৃচ্ছ	৯ ,, ,,
অজীগত পুত্র শুনঃশোপ	৭ ,, ,,
মারীচপুত্র কাশ্যপের	১ ,, ,,
অন্যান্যদের	৩৭ ,, ,,
	মোট ১৯১টি সূক্ত আছে।

১৯১টি সূক্তের শেষ সূক্তটির কথা বলা হচ্ছে। এই সূক্তগুলির কি বক্তব্য তা বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়—

হে অগ্নি তুমি প্রভু, হে অভিলষিত ফলদাতা, তুমি যাবৎ প্রাণীর সঙ্গে বিশেষ রূপে মিশ্রিত আছ। তুমি যজ্ঞ বেদিতে ঝুলে আছে

আমাদিগকে ধন দান করো। তোমরা সকলে একত্রে মিলিত হও। একত্র কথা উচ্চারণ করো। তোমাদিগের সব একত্রিত ও একমত হোক। প্রাচীন দেবগণ এইরূপ একমত হয়ে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতেন। ইহাদিগের মন্ত্র এক হোক, সামিতি এক হোক, চিত্ত এক হোক।

আমি তোমাদিগের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত্ব করছি। এবং হবিঃ দ্বারা হোম করছি। তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হোক। হৃদয় এক হোক। তোমাদিগের মন এক হোক তোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করো। এই শেষ সূক্তটি শোনানো হল। কারণ প্রাচীন ঋষিগণ কত মানবদরদি তথা সমাজ সচেতন ছিলেন তা ঐ সূক্তে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ঐক্য এবং একতা ছাড়া মানুষ-সমাজ-রাষ্ট্র চলতে পারে না। এই সত্য প্রকটিত হয়েছে। তাঁরা সার্বিক কল্যাণের জন্য আহ্বান করেছেন। তাঁদের সকল নিবেদন সর্বশক্তিমান ভগবান, তথা গণদেবতার কাছেও।

বেদকে ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র দু-ভাগে বিভক্ত করা আছে। পরে ঐ উভয় বিভাগের অবান্তর বিভাগ......ঋক্, সাম, যজু তিন ভাগই স্থির করেছিলেন। মন্ত্রভাগ এক্ষণে সংহিতা নামে প্রচারিত। অনেক—ব্রাহ্মণ উপনিষদ নামে পরিচিত। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ইত্যাদি নাম। রাজরামমোহন রায় ১২টি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। শাস্ত্রে প্রায় ১৮৪টি উপনিষদের নাম আছে। মনে রাখতে হবে যে উপনিষদ হল ব্রহ্মবিদ্যা ; ইহা গুরুসমীপে পাঠ গ্রহণ করতে হয় তবেই বোঝা যায়, অন্যথায় আধুনিককালে সকলেই বেদসংহিতা বলেন। বেদান্ত দর্শনে ব্যাস প্রণীত ইহার ৫৫৭টি সূত্র আছে।

আচার্য শংকর, রামানুজ ৪টি সূত্রে বেদান্ত ভাষ্য রচনা করেছেন। কিন্তু বেদান্তকে শারীরিক কারণের জন্য পঞ্চম উপপাদ্য রচনা করেননি তিনি। বেদান্তের যে ৪টি সূত্র তার উল্লেখ করছি—প্রয়োজন—বিষয়—সম্বন্ধ—অধিকারী।

সকলের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রত্যেক শাস্ত্রে ঐ ৪টি সূত্র থাকতেই হবে ; এই কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। বলা প্রয়োজন যে, বেদান্ত ভাষ্যের ঋষি জৈমিনি 'পূর্ব মীমাংসা' করেছিলেন। অতএব—আচার্য, শংকর, রামানুজ 'উত্তর মীমাংসা' করেছিলেন মনে রাখতে হবে।

বর্তমান ভাষ্য—শংকর কৃত সকলের কাছে গ্রহণীয়। এই মত সকলের সিদ্ধান্ত ও অনুসৃত মতেই প্রচলিত আছে। বেদের অন্তর্গত—ঋষিদের পবিত্র নামগুলি হল—উশিজ পুত্র কুক্ষিগত। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। অজীগর্তের পুত্র শুনঃশ্যেপ। অঙ্গিরাপুত্র বিষম্যস্তূপ। ঘোরপুত্র কণ্ব। প্রকল্প, ভরদ্বাজ, অগস্ত্য, গৃৎসমদ, প্রজাপতিঋষি, সুকেশ, বামদেবঋষি, বিশ্ববারা (রমণী) ঋষি, বৃহস্পতি পুত্র শংসু, বশিষ্ঠ, বৈবস্বত, কাণ্বমেধ্যঋষি, ঋষি কাশ্যপ, অত্রি, ত্রাবতন-এর্দসস্যু (এই দুই ঋষি) যমঋষি, শঙ্খ ঋষি, দমন ঋষি, সংকুসুকঋষি, সিন্ধুক্ষিত। বিশ্বকর্মা ঋষি ও দেবতা, সোম-সূর্যঋষি ও দেবতা, হিরণ্যগর্ভ ঋষি, অথর্ব ঋষি, বৌধায়ন ঋষি, মনুঋষি, ঋষিবামদেব।

বেদ ত্রিকাণ্ড যথা—কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনা কাণ্ড। কর্মকাণ্ডই বেদ নামে অভিহিত আছে। এই অংশই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। আগে বলেছি, দর্শনের ঐ মীমাংসার কথা। যা ঋষি জৈমিনির পূর্ব মীমাংসায় বলা হয়েছে। উত্তর মীমাংসা—রামানুজ/শংকর। বেদকে ঘিরে হিন্দুধর্মের যত শাস্ত্র ও ধর্মমত আছে সমস্তই যথা বেদ—দর্শন—উপনিষদ-গীতা-পুরাণ ইত্যাদি যত শাস্ত্র আছে বেদের অন্তর্গত। একটি কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, **আমাদের শাস্ত্রগুলি সব পরোক্ষবাদ পুষ্ট**। ইহার অন্তর্নিহিত যে মূল সত্য তা সুন্দর রূপক দ্বারা পরিবেশন করা আছে।

আমরা ধরে নিতে পারি, যেমন বাল্মীকি ও ব্যাস বলে কেউ ছিলেন না। শাস্ত্রে—যেহেতু ১৮২ জন ব্যাসের পরিচয় পেয়েছি। দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ—কংসকে বধ করলেন ; কংস-হস্তে বিশাল তরবারি, অপর দিকে কৃষ্ণ খালি হস্ত! বলশালী কংসকে বধ করলেন শ্রীকৃষ্ণ, বক্ষোপরি উঠে। ততসময় কৃষ্ণকে মহারাজ কংস তার শিরশ্ছেদের কোনো উদ্‌যোগ নিলেন না। অথচ কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরাতে আনা হয়েছে বধ করার জন্যই। এইসব ঘটনা মনন-শীলতা দ্বারা অনুধাবন করলে নিজে নিজে সব বোধগম্য হবে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। এই অংশে আলোচনা করা হচ্ছে ঋগ্‌বেদ ভারতীয় না ইউরোপীয়গণের দ্বারা রচিত তার বিষয়।

এই ভারতবর্ষ বহু বহু কাল পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ ছিল। গ্রীক-তুর্কি-পাঠানরা ৩৫০ বছর, মোগলরা ২৫০ বছর ইংরাজগণ প্রায় ২০০ বছর এই ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছেন। ইংরেজগণ বড়ো জাতি বিদ্বেষী ছিলেন। অনার্য কালো বাঙালি ইংরেজদের কাছে দাস পদবাচ্য! অতএব মহৎ কিছু—ভালো, গৌরবের যা কিছু বিজিতদের থাকতে আছে নাকি? যা কিছু ভালো সকলই ইংরেজদের ; তারা শ্রীরামপুরে মার্শম্যান, কেরি সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতদের নিয়োগ করল ভারতের সংস্কৃত ভাষা শিখে নিতে হবে।

তাদের সহযোগিতা করার জন্য লোকের কোনো অভাব নেই। রাজার কি কিছু অভাব হয়, না থাকে? বেশি অর্থ দিয়ে, খেতাব দিয়ে, স্বীয় দলে নিয়ে আসলেন যত ভারতীয় জ্ঞানীগুণীদের। তারপর নির্দেশ দিলেন তাঁদের নতুন ইতিহাস নতুন পুরাণ, কাব্য, যা কিছু তাঁদের অনুকূলে আনতে হবেই। কারুর ট্যাঁ-ফু করার জো নেই। ইংরেজরা তখন প্রভু বনে গেছে। এসে গেল—আর্যতত্ত্ব! আর্যরা বহিরাগত, তাঁরা সিন্ধু নদীর তীরে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং সভ্যতার বিকাশ ঘটান তাঁরাই। সুতরাং বেদ ওই আর্য তথা ইউরোপীয়ানদের সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে কারা ঐ ঋগ্‌বেদ রচনা করেছেন সেই সম্পর্কে পরমেশ চৌধুরী—দিল্লি থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে-বলেছেন—"আর্য বলে কোনো জাতির অস্তিত্ব ভারতে ছিল না।"

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদরা বলেন, (হেনবি ক্রেইক) "শিক্ষা তো মানুষে মানুষে ব্যবধান কমাবার জন্যই। তাবা নিজের দেশকে, দেশের লোককে ভালোভাবে জানবে বুঝবে, তবেই তো দেশের দশের উপকার।

ব্যাপারটা কী? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মহান বিজয়? না। ওটা তো কোনো শিক্ষাব্যবস্থা নয়। প্রহসন মাত্র। এই কথাগুলি খোদ ইংরেজদের তোষামোদকারীর বক্তব্য। কারণ কি? কারণ হল, ওই ঋগ্‌বেদের ব্যাপারটা হয়তো ইংরেজ জাতির মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল, তাই সে কথা না হলে ঐরকম লেখা কেন? ইংরেজরা ভারতে এসে (আর্য) কৃষ্ণকায় ভারতীয়দের সাথে যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধে অনার্য দাস সকল পরাস্ত হল। যেহেতু ঋগ্‌বেদে 'দাস' কথাটা আছে। "কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া"য় দাস বলতে কী বলেছেন দেখা যাক। দাস কারা? কী তাদের বৈশিষ্টসমূহ? এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক কিন্তু জানে না। অনেক সাধনা করে বের করেছেন ....

ঋগ্‌বেদে আছে—মৃদ্ধাভাষঃ এবং অনাসঃ এই শব্দটা নাকি ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা

হয়েছে। মানে আদিবাসীদের ভাষার নামই মৃদ্ধাভাষঃ। এই শব্দটা প্রয়োগ হয়েছে আর্যদের শত্রু পুরুষদের ক্ষেত্রে। অতএব বিরুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যক্তিদের ভাষা অনাসঃ শব্দটা আরো জোরদারভাবে ব্যাখ্যা হয। অনাসঃ বা নাসিকাবিহীন বা থ্যাবড়া বিবর্ণ একপ্রকার মানুষই অনার্য ; দ্রাবিড়দের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়েছিল। দ্বিতীয় যুক্তি ইংরেজদের এইরকম— আক্রমণকারী আর্যরা বেগবান অশ্ব নিয়ে যুদ্ধ করেছিল ; আদিম অধিবাসীদের ঠেকাবার কোনো সুযোগ ছিল না। তারা পালিয়ে বনেজঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল মাত্র, ভারতবাসীরা ঘোড়া কি তা জানত না।

তৃতীয় যুক্তি হল—ঋগ্বেদের সময় আর্যরা সমুদ্রযাত্রা করত। কিন্তু অনার্যরা এসব আদৌ জানত না।

চতুর্থ যুক্তি—ভারতবর্ষ জলজঙ্গল ভরা। কিন্তু! বেদে তো বাঘের উল্লেখ নেই, এখানে ধানের কোনো উল্লেখ নেই কেন? বনাঞ্চলে তো হাতি খুব থাকে, তবে বেদে কেন তার উল্লেখ নেই? বেদে সোমরস উল্লেখ আছে তা তো জলাভূমিতে পাওয়া যাবেই না। সোমরস পাহাড় পর্বতেই পাওয়া যায়।

পঞ্চমত, ঋগ্বেদের সময় পুরোহিত সম্প্রদায় নিয়ে খুব কড়াকড়ি ছিল। এবং এ ছিল বংশগত। ব্রাহ্মণ শব্দটি হল ব্রহ্মার সন্তান। এতেই প্রমাণ হয় যে, পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত হতই। এইজন্য যজমান, পুরোহিত এটাও একটা যুক্তি ছিল তাদের।

ষষ্ঠত, ঋগ্বেদে ইন্দ্র এই কথা আছে—ইন্দ্র হল দস্যু। অনার্যদের সর্দার।

সপ্তম, যুক্তি— আচার্য "রোথ" বলেন, আর্যরা উত্তর-পশ্চিম থেকে ভারতে আসেন। সপ্তসিন্ধু শোভিত পাঞ্জাব প্রদেশে তাঁরা উপস্থিত হন। বস্তুত, তাঁদের প্রথম বাস তো সেই সিন্ধুতীরেই। এ-তো ঠিক? ঋগ্বেদ সংহিতায়, সিন্ধু নামের ভুরি ভুরি উল্লেখ আছে। কিন্তু গঙ্গার নাম মাত্র একবার আছে। .

পাঞ্জাবের নদীসকল ও পাঞ্জাবের নিকটস্থ গান্ধারাদি দেশই বেদ প্রণেতাগণের নিকট সুপরিচিত ছিল। আরো বহুতর প্রমাণ আছে। তিনি বলেন, বৈদিক যুগে বঙ্গদেশ ছিল অনার্যদের বাসভূমি। আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাঙালিদের মধ্যে অনার্য রক্তের প্রাধান্যই ছিল বেশি। বৈদিক যুগে বাংলায় আর্যরাই ছিলেন। বৈদিক ঐতিহ্যের অনেকাংশের উদ্ভব ঘটেছিল পূর্ব ভারতেই।

অষ্টম যুক্তি—ব্রিটিশ যাদুঘরের ড. 'হল' বলেন, "গ্রীস-ইটালির মতো ভারতবর্ষেও আদিবাসী অনার্য রক্ত টিকে রইল। বিজেতা আর্যরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল বহু আগেই"। এতে দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় মহাকাব্যগুলিকে পর্যন্ত অনার্য বলতে খুবই আগ্রহী ছিলেন।

নবম যুক্তি—বিংশ সংহিতার মধ্যে বিংশ সর্বাংশে নিরপেক্ষ মনুসংহিতা। ইহা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত মতে দেখা যায়। সেই মনুর কয়েকটি ঋক-সূক্ততে দেখা যায় XII–১ I–২১, ১, ৯১ IX–৩৩৪, X–৪, ৬, ১০, ১৪, ২৮, ৩০, ৪১, ৪৬, ৬৬, ৬৭, ৭৩, ১২২, ১৯২ প্রভৃতি সূক্তগুলিতে শূদ্রের ও আর্যদের কথা বলা আছে। তিনি সমাজচ্যুত গোষ্ঠীর মধ্যে যদি সুশীলা ভালো মেয়ে থাকে তাকে বিয়ে করতে আপত্তি নেই বলেছেন। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে খোলামেলা মেশায়, কোনো আপত্তি জানাননি। অতএব—ঋগ্বেদ আর্যদের দ্বারা রচনা। এতে সন্দেহের

কি থাকতে পারে? এই পর্যন্ত আর্যদের যে যুক্তিগুলি বলা হল—এখন ভারতীয়দের যুক্তিগুলি বলে নিয়ে পরে আরো যুক্তিতে যাব।

মনু তাঁর সংহিতায় শ্লোক ৪৫ বলেছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার জাতের আর্যরা। অন্যদের বলা হত দস্যু বা দাস। এখানে ভাষার কোনো সম্পর্ক নাই। দস্যু মানে পতিত ব্যক্তি। কেন পতিত? কারণ তারা পবিত্র অনুশাসন এবং শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানসূচি অবহেলা করত।

টীকাকার কুল্লুক আচার্য বলেন, আর্য বা ম্লেচ্ছ যে-কোনো ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, যেসব আর্য পবিত্র অনুষ্ঠান বিরোধী তারাই দাসু বা দাস। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্র তাঁর সন্তানদের সম্বোধন করেছেন "তোমাদের বংশধরেরা দেশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করুক"। যেহেতু সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অন্দ্র, পুণ্ড, সবর, পুলেন্দ্র, মুতীব প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ দাস্যু বা দাস। ক্ষত্রিয় মহাঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসজাত রাজা হরিশ্চন্দ্রের নবম বংশধর বাহু। হইহয়, তালজঙ্গদের দ্বারা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। আমাদের মত হল যে—ভারতীয়রা তখন ঘোড়া কী জানত না। এটা কি একটা যুক্তি হল নাকি? তাছাড়া যখন হরপ্পা, মহেঞ্জোদারোতে খননকার্য দ্বারা ঘোড়ার হাড় পাওয়া গেল, তখন ওরা বলল, অতি অল্প নিদর্শন মাত্র।

আমরা জানি, মুনিঋষিরা তাঁদের আশ্রম সাধারণত নদী তীরবর্তী কোনো স্থানে গড়তেন। প্রভাস-যজ্ঞ হয়েছিল আরব সাগরতীরে। তাছাড়া সাগর মন্থন হয়েছে। সাগরকে রত্নগর্ভা বলে চিহ্নিত করেছে; যেহেতু সাগর মন্থনে-প্রাপ্ত উচৈচশ্রবা, হয়, গাভী, পারিজাত, অমৃত, নানান রত্নরাজি—এ পরিচয় তো আছে! তবে কী করে ভারতীয়গণ তথা অনার্যগণ সাগরকে জানত না? আসলে সত্যকে উপেক্ষা করাই তাদের ষড়যন্ত্র। ঋগ্‌বেদে যা নেই সেগুলি তুলে ধরে একটা যুক্তি খাড়া করা অজুহাত মাত্র।

ঋগ্‌বেদে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে সেই সময় পুরোহিতরা বংশগত ছিল। তবু তারা সেইযুক্তি খাড়া করেছে। আমরা ধরে নিচ্ছি ঋগ্‌বেদে বাঘ, হাতি নেই। তাতেই কি প্রমাণিত হয় ঋগ্‌বেদ ভারতীয়রা রচনা করেননি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তো সুন্দরবনের নাম উল্লেখ দেখা যায় না; কিন্তু তিনি সুন্দরবনের গোসাবাতে বেশ কিছুদিন ছিলেন একসময়। রবীন্দ্রনাথ কি বাইরের কোনো ব্যক্তি হয়ে যাবেন? বাংলা সাহিত্যে ফিরিঙ্গি শব্দ দু-এক খানা গ্রন্থে পাওযা যায়। তার কি মানে হবে! Frank শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না এর অর্থ! ফিরিঙ্গি শব্দ কোথাও ব্যবহার হয় না। ঋগ্‌বেদে ধানের নাম নেই, আছে যব। যব, ধান সেই Corn রাইস হয় কি না? তা যদি না হয় তার ব্যাখ্যা দিলে ভালো হত। তা তারা লিখবে না। অথর্ব বেদে কিন্তু ধানম্ কথাটা আছে; সে কথা এড়িয়ে গেল। একি না জানার ভাণ না শয়তানি? ওরা বলে ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র-দেবরাজ ইন্দ্র নন্। কেননা দেবরাজ হল দস্যু আর বৃত্র হল এক মহাবীর! এই বীরকে ওদের খুব পছন্দ। কেন না ওরা বীরের জাত তো? তাছাড়া ইংরেজরা তাদের আলেকজান্ডারকে মনে করত এক মস্তান বীর, স্বয়ং ইন্দ্র। এই বীর তাঁর বিরাট বাহিনী নিয়ে দিল্লি জয়ে বেরিয়ে বিভিন্ন দেশ, ইরান প্রভৃতি দখল করে শেষে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে দখল কায়েম করেছিলেন।

আমাদের মত হল— ঘটনা কিন্তু অন্য। আসলে আলেকজান্ডার যুদ্ধে পুরুরাজের কাছে

পরাজিত হয়ে পায়ে ধরে প্রাণে বেঁচেছিলেন। এই ঘটনা তখন বলা হয়নি, লজ্জায়! আরো জানা যায় ভারতবর্ষ প্রকৃত স্বর্গ। আলেকজান্ডারের ভূস্বর্গ Paradise Lost—এই অভিযান তার পরিচয় Paradise Lost নেই। সেখানে আছে ভূস্বর্গ অভিযান। "সিড'ডৌ ক্যালথিনেস," নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে 'আবদুল্লা ওয়াবসার' তাঁর—'তাজজিইতুল—আমসর' গ্রন্থে লিখেছেন, "পৃথিবীতে সবচেয়ে বাসযোগ্য জায়গা হল ভারতবর্ষ। পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারতবর্ষ পবিত্র জায়গা। এর ধূলিকণা পবিত্র। এর বায়ু পবিত্রতার চেয়ে পবিত্র। ইউরোপীয়নদের চেয়ে এখানে আরবদের কথা বেশি গ্রহণযোগ্য। কারণ তারা ব্রিটিশদের চেয়ে আগে এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ আশা করা যায়। ইংরেজদের বহু আগে ভারতবর্ষে মুঘল পাঠাদের আগমন ঘটেছিল ৩৭২ বছর পূর্বে তারা রাজত্ব করেছেন ভারতে। অতএব ভারতবর্ষ পবিত্র দেশ এবং যথার্থ ধনী দেশ ছিল। এই আকর্ষণে বিদেশীরা স্রোতের মতো এদেশে এসেছে, পরস্পরের জানাজানির মাধ্যমে। এটাই হল গ্রহণযোগ্য তথ্য।

ইংরেজরা অতি-আধুনিককালে এল ভারতে সেই অর্থলোলুপ দৃষ্টি নিয়েই। এল বাণিজ্য করতে, সুযোগ বুঝে হয়ে গেল সর্বগ্রাসী রাজা ও শোষক।

ইংরেজাদের পোষা ব্যক্তিগণ বলেছেন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ; বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা যুগের পর যুগ ধরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। একে অপরের পাশে বন্ধুত্বপরায়ণ প্রতিবেশীর মতো মন নিয়ে বসবাস করে এসেছে।

যুগে যুগে তাদের মধ্যে যে বোঝাপড়া আদানপ্রদান ভাব গড়ে উঠেছিল এবং বহিরাগত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মিলিত প্রয়াস সৃষ্ট যে ধর্ম-সংস্কৃতি-সভ্যতা প্রাচীন ভারতবর্ষ বলতে তাই বোঝায়।

এই ধরনের বক্তব্য কোনোমতেই গ্রহণীয় নয়।

অথচ আমাদের মুখ দিয়ে তাদের কথাই বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে নামগুলি আসে তাঁদের মধ্যে আছেন ড. সুকুমার সেন, বি. কে. ঘোষ প্রমুখ। রাজা রামমোহন রায়কে ইংরেজদের দালাল বলে পরমেশ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন। ইন্দ্র-কথা শেষ হয়নি, ভারতীয়রা ইন্দ্রকে কেন পূজা করেন এবং কেন তিনি দেবতা! ইন্দ্র অহি নামে বৃত্রাসুরকে বিনাশ করেছিলেন।

বৃত্রাসুর নিহত হলেই রুদ্ধগতি নদীসকল বেগের সঙ্গে সমুদ্রে প্রবাহিত হত। ইন্দ্রের বজ্রপাত সুবৃষ্টির জন্য দরকার ; বৃত্র বা অসুর সর্বদা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। এই শত্রুতা করাই তাঁদের ধর্ম। রাক্ষসগণ মুনিঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করত, যজ্ঞ নষ্ট করে দিত। শাস্ত্রে পুরাণে আছে এখানে আকাশে বৃত্রাসুর সর্বদা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। সুবৃষ্টি সর্বদা দরকার ; বৃষ্টি হলে বৃক্ষাদি জন্ম নেবে, ভূমি সরস হবে, নদী জল পাবে, পৃথিবী শস্যশ্যামল হয়ে উঠবে! ইন্দ্র হলেন, জগতের চৈতন্যবিশিষ্ট কাজ করার অধীশ্বর ; ইন্দ্র বর্ষণকারী আকাশও বটে। পরে ইন্দ্রদেবকে আকাশের অধিকারী বা দেবতা এইরূপ চিন্তা করা হতে থাকে। এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে ঈশ্বরবোধের জন্ম হয়। একই ভাবে অন্যান্য দেবদেবীদের স্ব স্ব কাজের নিরিখে ঈশ্বরমণ্ডিত করা হয়েছে বলা যায়।

এই সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন—"ইন্দ্র নাম কোথা থেকে এল? কে নাম রাখিল, 'ঋগ্বেদে আদিত্য কথা আছে, এই আদিত্য 'অদিতি'। আর কশ্যপ নাম আছে। করম মানে কাজ বুঝি। ইহাই কর্ম। কর্ম বা কূর্ম হল কূর্ম বা কচ্ছপ। কচ্ছপকে কশ্যপ সাধুগণ বলেন কশ্যপ বা কাশ্যপ। অদিতি/কশ্যপ দুটি নাম—স্ত্রী পুরুষ। এই হল ইন্দ্রের বাবা-মা।

শতপথ ব্রাহ্মণে ৭, ৪, ১, ৫ "স-যৎ কূর্মো নামঃ। এতদ্বৈরূপ ধৃত্বা প্রজাপতি প্রজা অসৃজত"। যদসৃজত অকরোওৎ তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপা ইতি"। ইন্দ্র ধাতু বর্ষণে। তদুত্তর 'র' প্রত্যয় করলে ইন্দ্র শব্দ হয়। অতএব যিনি বৃষ্টি করেন তিনি ইন্দ্র। আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্র বধ করলেন। মানে বৃষ্টির বর্ষণে বাধা দূর করলেন। প্রকৃত অর্থ বৃষ্টির বিঘ্ন সকল বিনাশ করে বর্ষণ করলেন।

৯ম যুক্তি—বৈদিক যুগে বাংলার আর্যরা ছিলেন পূর্ব ভারতে। ইংরেজদের যুক্তি এখানে বৈদিক ঐতিহ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। বৈদিক ভারতবাসীদের কাছে কৃষ্ণসার চামড়ার খুব সমাদর ছিল, পূর্ব ভারতে তা সর্বত্র পাওয়া যেত। এখানে পশুচারণ সুবিধার জন্য দুধ ঘৃত যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্য সহজ লভ্য বলা যায়। বশিষ্ঠ মুনি আর্যভূমির সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগদের চরে বেড়াতে দেখা যায় সেই পর্যন্ত ভূভাগ আর্যদিগের আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের প্রকৃত জন্মভূমি বা বাসভূমি।

নিদান শাস্ত্রে বলা হয়, পশ্চিম দিকে আর্যসীমা সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মনু শাস্ত্রে ব্রহ্মাবর্ত এবং ব্রহ্মর্ষিদেশ এ দুটি স্থান হল মধ্যদেশ। এই মধ্যদেশকে আর্যদের একমাত্র বাসভূমি বলে নির্দেশ করেছেন। ইংরেজদের এই যুক্তিসমূহ ঠিক নয়। "ঋষিদের খেয়াল খুশিমতো আর্যভূমির কথা বলতে পারেন, এখানে ভালো লাগা মন্দ লাগা সাপেক্ষ ; তাছাড়া আমাদের বক্তব্য যে, "আর্য বলে কোনো জাত ছিল না"। আর্য কথাটা শিষ্টাচার বোধক।

এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "এ সকলকে যদি ধর্ম বলা যায়, তবে সে ধর্ম শব্দের অপব্যবহার। চোরের ধর্ম লুকোচুরি করা, তাই সাধারণ ধর্ম, রাজধর্ম ইত্যাদি বলা সেইরূপ। 'মনুর' সংহিতায় যাহা যাহা পাই তাহা যদি ধর্ম নহে, তবে জিজ্ঞাসা, মনুর কোন্ উক্তিগুলিতে হিন্দুধর্ম আছে এবং কোন্‌গুলিতে নেই! এ কথার কে মীমাংসা করিবে"?

হিন্দুধর্মে শিষ্টজনই আর্য, ইহা আমাদের ধর্মপুস্তকগুলিতে প্রমাণ আছে। সংস্কৃত গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে আর্য শব্দ ব্যবহার আছে। অতএব একটি বস্তাপচা আর্য যুক্তির চুক্তি করতে চায় কোন্ সাহসে?

রামায়ণে রাক্ষসজাতিভুক্ত ইন্দ্রজিৎ তাঁর পিতৃব্য বিভীষণকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গালমন্দ করতে গিয়ে নিজেকে অনার্য হিসেবে (বিভীষণকে) সম্বোধন করেছেন। এ কথার অর্থ কী দাঁড়ায়? মহাভারতে কুরুরাজ দুর্যোধন আত্মভর্ৎসনা করতে গিয়ে নিজেকে অনার্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ ছিল সিন্ধুরাজ্য-এর অনুরোধ তিনি রক্ষা করেননি। **(পর্ব দ্রোণ ১৫২ দ্রঃ)** পাণ্ডবভার্যা দ্রৌপদীর অভিযোগ হীনপদস্থ অনার্যরাই রাজা যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় প্রবৃত্ত করিয়েছেন **(সভাপর্ব পরিচ্ছেদ ৬৩ দ্রঃ)**।

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় যোদ্ধা অর্জুনকে বলেছেন, 'অনার্যের মতো আচরণ না করতে। **(গীতা ২,২ দ্রঃ)**

সংস্কৃত নাটকে দেখা যায়, স্ত্রী স্বামীকে সম্বোধন করেছে 'আর্যপুত্র'। শকুন্তলা নাটকে রাজা দুষ্মন্ত বা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে সম্বোধন করেছেন 'আর্যে'। ব্রাহ্মণরা তাঁদের ধর্মকে আর্য-ধর্ম বলেছেন। বৌদ্ধদের ধর্মের নাম 'আর্যপথ'। এ থেকে দেখা যায়, বৈদিক ভারতবাসীদের মধ্যে কোনোরকম আর্য জাতি পরিচয় বোঝায় না। বৈদিক যুগে বংশ পরিচয় হত। যেমন—ইক্ষ্বাকু বংশ, বৃষ্ণি বংশ। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন নাগরাজ আরিকের বংশ। গ্রীকরা তো ভারতীয়দের ইন্ডিয়া, আরবগণ বলত হিন্দি, তুর্কবাসীগণ বলত 'হিন্দলি'। অতএব কাবুল হতে উত্তর ভারতে গাঙ্গেয় সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের অধিবাসীদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো সাধারণ জাতি নেই। মৌর্যযুগের পরে যদিও উত্তর ভারতের 'আর্যাবর্ত' নাম মনু সংহিতায় লিপিবদ্ধ আছে। এতে জাতিগত তাৎপর্য কিছু ছিল না। যদি থাকে সে কথা আচার ব্যবহারকে বোঝায়। বৌদ্ধধর্মকে আর্যপথ বলা হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে কোনো জাতিভেদ নেই। বৈদিক পরবর্তী যুগে যখন হিন্দু সমাজে জাতি-বর্ণ বিভক্ত জনিত সমস্যা প্রকট হয়ে যায়, তখন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—প্রভৃতি বিভাজন হয়েছিল।

এই প্রথম ভাবতীয় সমাজ বিভক্ত হয়ে গেল। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীদের ঘৃণা, শত্রুতা, অবহেলা, নিপীড়ন, শোষণ ইত্যাদি দ্বারা পীড়িত করত। এই অবস্থায় বিভ্রান্ত সমাজকে কোলে টেনে নিলেন বুদ্ধদেব। সমাজের যত অবহেলিত জন বৌদ্ধধর্মের উদার সার্বভৌম আশ্রয়ে লালিত হতে থাকে সবাই। বুদ্ধদেব নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন। এমন তো বলা যায় না যে বুদ্ধদেব নিজে ক্ষত্রিয় হয়ে অপর আর্য জাতির জন্য ধর্ম প্রচার করেছেন? তা হয় না। বৌদ্ধধর্মের ৪টি আর্য। ইহা মহৎ সত্যকে বোঝায়। জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি বা মোক্ষলাভ . বলা হয়। অহিংসা, সৎ চিন্তা, সৎ ভাবনা, সৎজীবন যাপন। তাছাড়া আর্যপথের অষ্টাঙ্গিকা মার্গ আছে। যেমন—সঠিক উপলব্ধি, সঠিক ভাবনা, সত্যবচন, সৎ প্রচেষ্টা, সৎ মানসিকতা, সঠিক মানসিক সংযম। এই ৮ প্রকার মহৎ অনুশীলন বৌদ্ধধর্মের মরমীয় বাণী।

ইউরোপীয়ানরা 'নরডিক সভ্য', তাই তারা ঋগ্‌বেদের ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র দেবতাদের গায়ের রঙ মাথার চুল নিয়ে চিন্তার জাল ফেলেছে। তাদের মতে, বেদে রুদ্রকে স্বর্ণবাহু বিশিষ্ট হিসাবে বর্ণনার কথা বলেন। শুক্র যজুর্বেদ ১৬ ভাগ ইন্দ্রকে স্বর্ণবর্ণ দেহধারী বলা হয়েছে, ঋগ্‌বেদ ৩,৪৪,৪ তাঁর ঘোড়াগুলি হলুদ বর্ণের বলেছেন, তাঁর চুল হলুদ উজ্জ্বলভাবে দীপ্তিশালী ছিল বলেন।

সামবেদ—সূর্যদেব হলেন স্বর্ণহস্ত ১.২০ ঃ ৪, ২৫, ৩৪। শ্রুতিতে বৈদিক ঋষিদের স্বর্ণকেশ বলা হয়েছে। বোধায়ন ধর্মসূত্র ১২, ৩, ৫ এখানে "তাঁর চুল কালো থাকতে থাকতেই তাঁকে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করতে দাও"। সবর তার যামিনী ভাষ্যে ১.৩৩ এই অংশটির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বৈদিক ব্রাহ্মণরা কৃষ্ণকেশবিশিষ্ট ছিলেন। শতরুদ্রীয় ১৮, রুদ্রকে বাদামি দেহ বিশিষ্ট হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. বেট্রি হীম্যান এ প্রসঙ্গে বলেন, "ভারতবর্ষে আমরা মূলত দ্রাবিড় সভ্যতা সংস্কৃতির

প্রাধান্যই দেখতে পাই। কারণ, ভারতের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সঙ্গে দ্রাবিড়গণ যথেষ্ট খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল, আর্যরা পারেনি"।

এত সময় ইউরোপীয়দের রং-বর্ণ চুল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার পর ড. বেট্রি অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন। দ্রাবিড়রা ছিল সেই আর্যরা এইকথা বলতে চান।

আমাদের যুক্তি হল, গায়ের রং তত্ত্বে ভিন্নতা স্ববিরোধ তো ঘটেছে ; সবর ঋষি তাঁর যামিনী ভাষ্যে যা বলেছেন তাতেই প্রমাণিত হয়। দ্রাবিড় সম্পর্কে আলোচনায় দেখা যাক, আসুন। দেখা যাক দ্রাবিড়গণ আর্যদের উত্তরসূরি কিনা ভারতীয়গণ আর্য না, দ্রাবিড়ও না। বৈদিক যুগে যেসব ভারতবাসী বেদানুসারী ছিল না, ষোলো আনা তাদের বলা হত ব্রাত্য বা ধর্মচ্যুত। এই ব্রাত্যদের মধ্যে ছিল পৌন্ড্রক, ওড্রাজ, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যাদব, শক, কিরাত প্রভৃতি। সুতরাং দ্রাবিড়রা বহিরাগত না, ভিন্ন জাতিও না। ধর্মানুসরণের তারতম্যের জন্য ভারতবাসীরা আর্য এবং ব্রাত্য এই দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিল। দ্রাবিড়রা এই ব্রাত্যদের একাংশ, ভাষাতত্ত্বের নিরিখে বিচার করলেও দেখা যায় আর্যরা এবং দ্রাবিড়রা দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে নেই। এই প্রসঙ্গে রেভারেন্ড জি. কে. পোপ ১৮৬৮ দ্রাবিড ভাষাগুলির ভিতরে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক। আদিম পর্যায়ের পণ্ডিত গ্রৌভার পোপের সঙ্গে একমত ছিলেন। এমনকি বিশ ক্যান্ডাওয়েল, যিনি দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ আবিষ্কার করেছিলেন, তিনিও স্বীকার কবতে বাধ্য হন—দ্রাবিড ভাষাগুলির সঙ্গে আর্য ভাষার রয়েছে অসংখ্য অতীব প্রাচীন কৌতূহলোদ্দীপক সাদৃশ্য!

মিস্টার জে. সি. নেসফিল্ড দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে স্বীকার করেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অগ্রগণ্য যাঁরা তাঁরাও সির্দিয়ার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একমত নন। কেউ কেউ বলেন তারা আর্য, কেউ কেউ বলেন তারা মোঙ্গল। কিন্তু, সির্দিয়ার আদিম ভারতীয় জনগোষ্ঠীরা যারা দ্রাবিড় হিসেবে পরিচিত দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তারা অন্যান্য ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সমগোত্রীয় ছিল ইহা প্রমাণিত।

তারা যে বহিরাগত স্বতন্ত্র কোনো মানবগোষ্ঠী এ সম্বন্ধে কোনোই প্রমাণ উদ্ধার করা যায়নি। মাদ্রাজের ড. আর নাগস্বামীর অভিমত—শ্রীলঙ্কা, কাঙ্গি, অন্ধ্র, কর্ণাটক প্রভৃতি জায়গায় খ্রি. পূ. তৃতীয় দশক থেকে নয় দশক শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কার যেসব লিপি উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলি তামিল ভাষাভাষীদের ড্রামিড় বা দ্রাবিড় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এক হাজার বছর ধরে তামিল ভাষাভাষীদের দ্রামড়ি হিসেবে উল্লেখ করে এসেছে অ-তামিল ভাষাভাষীরা। অতএব দ্রাবিড় শব্দটির মধ্যে কোনোরকম জাতিগত ব্যুৎপত্তি নেই। জাতিগত যে ব্যাখ্যা তা অতীব আধুনিক।

এ যুগে দক্ষিণের সাধারণ সচেতন লোক পর্যন্ত সজাগ হয়ে উঠেছেন। এ প্রসঙ্গে হিন্দু-দৈনিক থেকে একটি চিঠির উদ্ধৃতি এইরকম—"*As long as we demarcate questions into so-called Dravidians and Arvans on the basis of the present day distribution perhaps we have to grope in darkness. Why not we go into the etymology of the two words? Probably, the word Dravida might have been applied to population that settled along*

side the river or tanks. It might have been derived from two roots—(Drava) liquid and vididi (settlement as in Telugu). All those who have been liking bv the side of the riverina course might have been referred to an Dravidians. Then the Dravidian element in Indus Valley civilisation will not be a surprise".

বাংলা বর্তমান জনসংখ্যার বিভাজনের ভিত্তিতে ভারতবাসীদের দ্রাবিড় এবং আর্য এই দু-ভাগে বিভক্ত করতে যাওয়া অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর শামিল। এই দুটো শব্দের মূল ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা করলেই ভাল হয় নাকি? খুব সম্ভবত যেসব ভারতবাসী নদী অথবা সরোবরের তীরে বসবাস করত তাদের দ্রাবিড় বলা হত। দুটো মূল শব্দাবলীর থেকেই উৎপত্তি হয়ে থাকবে শব্দটা। দ্রব অর্থে তরল, ভিভিদি অর্থে তেলেগু ভাষায় উপনিবেশ বলা হয়।

আর একটি আছে, এস. স্বামীনাথ শর্মার চিঠি হল। হিন্দু ঃ মাদ্রাজ 20.4.84

Dr. B. R. Ambedkar has treated the object elaborately in his book "Who are Sudra". 'শূদ্র কাহারা' নামক গ্রন্থে। যাই হোক সেসব উল্লেখ করে আমি লিখতে চাই না, প্রয়োজনে পাঠক বুঝবেন।

আর্য-দ্রাবিড় তত্ত্ব একটি উপাখ্যান মাত্র। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই বিধ্বংসী তত্ত্বটি খাড়া করেছেন বিভ্রান্ত করার মানসে।

আর্য শব্দটির সঙ্গে অ্যারিয়ান Aryan, গত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারা উদ্ভাবিত মূলে কোনো সম্পর্ক নেই। বেদে এই শব্দটির গুণগত উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা কোনো জাতি নির্ণয় সূচক শব্দ নয়।

বিশুদ্ধ আর্য বলতে কারো সন্ধান মেলে না ভারতবর্ষে। বিশুদ্ধ দ্রাবিড়দেরও মেলে কি? না। ইউরোপীয়দের দ্রাবিড় তত্ত্ব এইরূপ। তামিল এবং মালায়লম ভাষাভাষীদের কাশ্মীরি এবং পাঞ্জাবীদের চেয়ে বেশি দ্রাবিড় বলে মনে হয় না। কুর্গিদের বলা চলে সবচেয়ে বেশি আর্যতত্ত্বের অধিকারী—সুগঠিত শক্তপোক্ত পাঞ্জাবীদের থেকে আলাদা বলা চলে না। তারা বিশুদ্ধ রক্ত ধরে রাখতে পেরেছে, মানুষ গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে মিশ্রিত রক্ত ধারণ করেনি ; যেহেতু পার্বত্য দেশে তারা বিচ্ছিন্ন একাকী জীবনযাপন করত—নিজেদের তারা পরিচয় দেয় পাণ্ডুর বংশীয় হিসেবে।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারের খননের দ্বারা জাতীয় মানুষের কোনো অবশিষ্টাংশ মেলেনি। কিন্তু এর থেকে কি এ সিদ্ধান্তে আশা যায় যে সেই যুগে আর্য ভাষাভাষী মানুষের অস্তিত্ব ছিল না? কেউ এই কথাটির প্রমাণ করতে পারেন? কোনো নৃতাত্ত্বিক গবেষকের কাছে এমন কোনও তথ্য আছে যার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে ইন্দো-আর্যরাও হরপ্পা-মহোঞ্জোদারোর সভ্যতার ধারক বাহক ছিল না?

আসলে ভারতবাসীরা আর্যও না দ্রাবিড়ও না। এই বক্তব্য যে বৈদিক যুগে যেসব ভারতবাসী বেদানুসারী ছিল না ষোলো আনা তাদের বলা হত ব্রাত্য বা ধর্মচ্যুত। এরা কারা? পৌণ্ড্রক, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যাদব, শক, কিরাত প্রভৃতি। সুতরাং দ্রাবিড়রা বহিরাগত নয়,

ভিন্নজাতিও নয়। ধর্মানুসারে তারতম্য হেতুই ভারতবাসীরা আর্য এবং ব্রাত্য এই দুভাগে বিভক্ত হয়েছিল।

দ্রাবিড়রা এই ব্রাত্যদের একাংশ। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলেও দেখা যায় আর্যরা এবং দ্রাবিড়রা দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে নেই। এ প্রসঙ্গে রেভারেন্ড জি কে পোপ ১৮৬৮ সালে বলেছিলেন।

ড. বি. আর. আম্বেদকর তাঁর 'শূদ্র কারা' নামক গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে সিদ্ধান্ত টেনেছেন এ-ভাবে যে, আর্য জাতিতত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ। এই তত্ত্বটির প্রতিটি ধাপ ত্রুটিপূর্ণ। এই তত্ত্বটি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাচাই করতে গেলেই বিবিধ দূষণ চোখে পড়বে। প্রথমত, এই তত্ত্বটির কোনো ভিত্তি নেই। নিছক কতকগুলি অনুমানভিত্তিক এই তত্ত্ব। দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বেচ্ছাচারিতা বা বিকৃতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন এই তত্ত্ব। তথ্য ও যুক্তি বিশ্লেষণের আগেই তত্ত্বটি গৃহীত হয়েছে। এবং এর সমর্থনে তত্ত্বগুলি খুব সাবধানতার সঙ্গে সংগৃহীত এবং পরিবেশিত হয়েছে।

দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজের অভিজ্ঞতা এখানে বলছি,

"বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স পড়াতে গিয়ে আমি এমন কয়েকটা অংশের মুখোমুখি হয়েছি যেগুলি শেখাবার পক্ষে এত বেশি ঘৃণ্য মনে হয়েছে যে আমি সেগুলিকে বাদ দিয়ে পরবর্তী অংশে চলে গেছি।"

এই ভারতবাসীদের কাছে তাঁর আহ্বান ঃ "মুক্ত সুস্থ স্বচ্ছ স্বাভাবিক জীবনধারার সত্যিকার চিত্র যদি পেতে চাও তো নিজের অতীতে ফিরে যাও। স্বাধীনতা ও মুক্তির ধারণা অন্যের কাছ থেকে ধার করো না। পাশ্চাত্য থেকে কোনো দীক্ষা গ্রহণ করো না। অতীতে সত্যি সত্যিই তোমরা কী ছিলে, সে সম্বন্ধে নিজেদের নিজেরাই সাহায্য করো, আত্মসচেতন হও। তোমাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় পদ্ধতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের ধরন ধারণের পার্থক্যটুকু কি তা নির্ণয় করো। তাঁর মতে, অসম্পূর্ণ বিকৃত ইতিহাস শিক্ষাই ভারতবাসীদের হতাশ করেছে। ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের যা জানানো হচ্ছে তা সঠিক নয়। আমরা পরাধীন, এর জন্য দায়ী আমাদের অদৃষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

প্রাচীন ভারতবাসীরা সত্যিই কেমন ছিলেন—ভীরু, কাপুরুষ, দাস মনোভাবাপন্ন? বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, না। "প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণ পরাজিত হইবার পূর্বে যে বিশেষ বলশালী ছিলেন এমন বিবেচনা করিবার কারণ আছে। দুর্বল বলিয়া তাঁহারা পরাধীন হয়েন নাই।"

কারণগুলি কী কী? 'ভারত কলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে ঐ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন, এভাবে প্রথম আরবদেশীয়রা একপ্রকার দিগ্‌বিজয়ী। যখন যে দেশে আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহারা সেই দেশে জয় করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা কেবল দুইটি দেশ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স পূর্বে ভারতবর্ষ। আরবেরা মিশর ও সিরীয় দেশ মোহম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বছরের মধ্যে পারস্য দেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষ জয়ের জন্য তিনশত বৎসর পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মোহম্মদ বিন-কাশিম সিন্ধুদেশ অধিকৃত করিয়াছিলেন বটে,

কিন্তু তিনি রাজপুতনা হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ভারতজয় দিগ্‌বিজয়ী আরবদিগের সাধ্য হয় নাই।"

ইউরোপীয়নদের একটি বক্তব্য ছিল, ভারতীয়রা তো সাপ ব্যাঙ গোরু এসব পূজা করে, তবে আর্য হয় কি করে?

উপাসনা বা পূজা পদ্ধতি নিয়ে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র কি বলেছিলেন...? আসুন দেখি।

ঋগ্‌বেদে যে উপাসনা আছে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন "যাহার ভয়দায়িকা শক্তি নাই, অথচ হিতকর আমরা তাহারও আদর করি। অচেতন ওর্ষধি বা ঔষধি আমরা আদর করি। ছায়াকারক বটগাছ বা স্বাস্থ্যদায়ক শেফালিকা বা তুলসীর তলায় জল সিঞ্চন করি। উপকারী অশ্বের ভৃত্যবৎ সেবা করি। গৃহরক্ষক কুক্কুরকে যত্ন করি, দুগ্ধদায়িনী গাভীকে এবং কর্ষণকারী বলদকে আরো আদর করি। ধার্মিক মনুষ্যকে ভক্তি করি। এ এক জাতীয় উপাসনা। এই উপাসনার বশবর্তী হইয়া হিন্দু ছুতার কুড়ালি পূজা করে, কামাব হাতুড়ি পুজা করে, ব্রাহ্মণ পুঁথি পূজা করে।"

ইহার পর, আলফ্রেড লয়েল লিখিলেন, কি ভযানক উপধর্ম। এমন নিকৃষ্ট জাতির কি গতি হইবে? দেখা গেল, এই মহামান্য ব্যক্তি বুদ্ধির জোরে লেফটেনেন্ট গভর্নব হইয়াছিলেন; ভারত বিরোধী কুৎসা রচনার পুরস্কার বোধহয়! বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "যাহা সুন্দর, তাহা আমরা বড়ো ভালোবাসি। সুন্দর হইতে আমরা সাক্ষাৎ কোনো উপকার আমরা পাই না, তবু আমরা সুন্দরের আদর করি। যে ছেলে চন্দ্র কি উপকার বা অপকার করে জানে না সেও চাঁদ ভালোবাসে। যে ছবির পুতুল আমাদিগের ভালোমন্দ কিছুই করিতে পারে না তাহাকে আদর করি। সুন্দর ফুলটি, সুন্দর পাখিটি, সুন্দর মেয়েটিকে বড়ো আদর করি। চন্দ্র কেবল সৌন্দর্য গুণেই দেবতা, সাতাশ নক্ষত্র তাহার মহিষী।" প্রচার ১ম বর্ষ, পৃঃ ৩৭৪-৮৩ দ্রঃ।

হিন্দু উপাসনাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সকাম উপাসনা ও নিষ্কাম উপাসনা। যাহা উপকারী তাহা আদরের। যাহা আদরের তাহার আদর অনুষ্ঠেয কার্য ঈশ্বরানুমোদিত। এ-কথাটি বোঝবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বেদ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন: "শুক্ল যজুর্বেদে সংহিতায় দশ পূর্ণ মাস যজ্ঞে বৎসাপোকরণ মন্ত্রে আছে, "হে বৎসগণ তোমরা ক্রীড়াপরবশ সুতরাং বায়ুবেগে দিগন্তরে ধাবমান হও। বায়ু দেবতাই তোমাদেব রক্ষক।" হে গাভীগণ, আমরা শ্রেষ্ঠতম কার্য আরম্ভ করিয়াছি। তৎসাধনার্থ সবিতা দেবতা তোমাদিগকে প্রভূত তৃণ, বন প্রাপ্ত করুন। হে (স্বল্প বা বহুতর) রোগশূন্য আচরপ্রসূতা অবধ্য গাভীগণ! তোমরা অক্ষুব্ধ চিত্তে নিঃশঙ্কভাবে গোষ্ঠে প্রচুর তৃণশস্য ভোজনকরত ইন্দ্রদেবতার ভোগের উপযোগী দুগ্ধের পরিবর্ধন কর। তোমাদিগকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আক্রমণ অথবা চৌর প্রভৃতি পাপীগণ কেহই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। তোমরা এই যজমানের গৃহে চিরদিন বহুপরিবার হইতে থাক।"

এই হল অনার্যদের উপাসনা!

এখন বুঝুন কেন এবং কীভাবে হিন্দুরা ধর্মসাধনা করেন।

'আর্য বা নর্ডিক' জাতিদের একটা কাহিনী আলাদা করে বলে দিই। পরে আবার মূল আলোচনার আসা যাবে। বর্ণবিদ্বেষীরা শুধুমাত্র সাদা কালোয়, সাদা হলুদে তামাটের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করেনি, তারা শুধু এইটুকু প্রচার করেই ক্ষান্ত থাকেনি ; যে বর্ণসংকর প্রজনন সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং যেহেতু এতে সাদা লোকদের উৎকর্ষতা শ্রেষ্ঠত্ব হ্রাস পাবে তাই তারা শ্বেতকায়দের মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা করেছে।

শ্বেতকায়দের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে। পৃথিবীর অনুন্নত জাতিগুলিকে, পেছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিকে, উন্নত করা সুলভ্য করে তোলবার মহান দায়িত্বটা কাদের সবচেয়ে বেশি তাই প্রমাণ করতে—ইউরোপের বিভিন্ন শ্বেতকায় দেশগুলির মধ্যে শুরু হল শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা।

এই প্রতিযোগিতা থেকেই আর্যতত্ত্ব Aryanism বা নর্ডিকতত্ত্ব Nordism সৃষ্টি হয়েছে। জাতিসমূহের মধ্যে আর্যরাই শ্রেষ্ঠ এই-ই ছিল এই তত্ত্বের মূলকথা। এই আর্য উপাখ্যান থেকে জন্ম নেয় আরও কয়েকটি গৌণ বা অপ্রধান তত্ত্বের, যেমন—'জার্মানিজম' 'অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সোনিজম' এবং কেল্টিজম, এগুলির আবির্ভাব ঘটে যথাক্রমে জার্মানিতে, ইংল্যান্ডে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এবং ফ্রান্সে।

প্রমাণ করবার জন্য এগিয়ে এলেন অনেকেই। এগিয়ে এলেন ইটালির লেভি ১৮৯৬। এগিয়ে এলেন স্পেনের ওলোরজি ১৮৯৪। ইংল্যান্ডের বেড্ডু ১৯০৫। বেলজিয়ামের হাওজ ১৯০৬। জার্মান এবং ইটালির পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, সুস্থ সভ্য ছাত্ররা প্রধানত ডোলিচেসেফালিক, দক্ষিণ ইটালির ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা ছিল অন্য। নৃ-তাত্ত্বিকরা নিজেরাই দেখতে পেলেন যে, ভূমধ্যসাগরীয় ডোলিচোসেফেলিকরা ব্রাচিসেফালিক আলপাইনদের তুলনায় নিকৃষ্ট।

এ সব নৃ-তাত্তিকদের তত্ত্ব মেনে নিলে নিগ্রোরা যে সবচেয়ে বেশি ডোলিচোসেফেলিক তা মেনে নিতে হয়। এটা মেনে নিলে এই ব্যাপারটাও মেনে নিতে হয় যে নিগ্রোরা জাতি হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট। অযেঘান ব্রাসিসেফালিক এবং কৃষ্ণকায়দের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু আযেথান নিয়ম 'Law' অনুযায়ী তা এমনটি হতে পারে না। তাই ব্যাপারটার একটা উদ্ভট ব্যাখ্যা দিলেন। "সামান্য পরিমাণ ব্রাডিসেফালিক রক্তের মিশ্রণ মঙ্গলজনক, যেহেতু এতে আর্যদের অদম্য প্রাণশক্তির আতিশয্য কিছুটা হ্রাস পায় এবং তারা হয়ে উঠতে পারে অধ্যবসায়ী, ধীর স্থির।" এই মানসিকতা বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা অনুশীলন দ্বারা আরো জানার উপযোগী।

মাথার খুলির গঠন প্রকৃতি এ প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মস্তিষ্কের গঠন এবং তৎসঙ্গে মানসিক গঠন নিয়ন্ত্রণ করে 'খুলি'। ভাচের ডি ল্যাগোওজ বেশ জোর দিয়ে বলেছেন, "বর্বর দশা বা অসভ্য অবস্থা থেকে সেই ব্যক্তি বিশেষ পরিত্রাণ পেতে পারে না বা তার উর্ধ্বে উঠতে পারে না যেহেতু তার মাথার খুলি ব্রাচিসেফালিক।"

আযেথান এবং ল্যাগোওজ যাই বোঝাবার চেষ্টা করুন, তাঁরা প্রসঙ্গান্তরে এও দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বুদ্ধিজীবীদের ব্রাচিসেফালিক ঝোঁক থাকাটাই স্বাভাবিক। এমনকি তথা-কথিত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে কৃষ্ণকায় লোকদের প্রাধান্যই বেশি। ল্যাগোওজ কথার মার-

প্যাঁচ করেই বললেন ঃ বুদ্ধিজীবীরা কিল ব্রাচিসেফালিক। এই কিল ব্রাচিসেফালিক কথাটার কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছেন না নৃতাত্ত্বিকরা।

বস্তুত, বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীদের "করোটি" নিয়ে গবেষণা এইটাই প্রমাণ করে, আদিম জাতিগুলির সবরকম নৃতাত্ত্বিক গুণাবলীর সমাহার ঘটেছে তাঁদের মধ্যে। দেখা গেল, উপরোক্ত নৃসমাজতাত্ত্বিকরা anthroposociologists যে সূত্রাবলী এবং উপপত্তি উপস্থাপনা করেছেন সেগুলি পরস্পর বিরোধী। এইগুলির সাহায্যে ডোলিচোসেফালিকদের বুদ্ধিবৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যাচ্ছে না। এই কথাটিও প্রমাণিত হয়নি যে, সদ্য আসা লোকদের ওপর বড়ো বড়ো নগরগুলির প্রভাব নির্ভর করে। তাদের মাথার খুলির গঠন-প্রকৃতির উপর। নৃতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেছেন এবং প্রচার করেছেন যে, ডোলিচোসেফালিক-রাই শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। কিন্তু, তাদের এই বিশ্বাস বা প্রচারের কোনোরকম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কাল্পনিক আর্যদের জাতিগত ঔদ্ধত্যকে জোরালো সমর্থন জানাবার অপচেষ্টা মাত্র।

তাদের এই মহৎ অপচেষ্টার গুপ্ত উদ্দেশ্য টিউটন এবং প্যান জার্মান উৎকৃষ্ট অর্থবোধকে চাপিয়ে দেওয়া এবং তাদের এমন একটি নৈতিক পাসপোর্ট প্রদান করা যাতে তারা তথাকথিত অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতিবর্গের ওপর আধিপত্য করতে পারে, চালাতে পারে পাশবিক অত্যাচার।

এইবার এল আর্যতত্ত্ববাদের—! নাজিবাদ এবং ফ্যাসিবাদ। এলেন, চেম্বারলেইন, ওয়াল্টম্যান, থিয়োডারপেচ, কার্ল পেস্তা, রিচার্ডওয়াগনার এবং তাঁদের অনুগামী চ্যালাচামুণ্ডা সকল। গুরু যত না কয়, চেলা শত প্রায়! প্রচারের গুণে কত কি হয়েই যায়। আর্য অথবা টিউটনদের শ্রেষ্ঠত্ব বটবৃক্ষের মতো চিরস্থায়ী শেকড় গেড়ে বসল জার্মানিতে। জার্মানিগণের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা, জার্মানরাই অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতিবর্গকে যথার্থ শিক্ষিত এবং উন্নত করে তুলবেন। একটি ধর্মান্ধ যুগের সূচনা হল জার্মানিতে। অপরদিকে, অল্প সভ্য জাতিগুলি উলটোসুরে গাইতে লাগল, "ওহে জার্মান ব্রন্ডরা, এতো যে চেঁচাও তোমরা ত ইউরোপীয়ই নও। জন্মসূত্রে তোমরাও এশীয়, তোমরাও হুনদের বংশধর। সভ্যতা সংস্কৃতি কি আছে তোমাদের?"

আর্য বা নর্ডিকদের বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব ছিল না ; তারও একটি প্রমাণ আছে, যেমন— ১৯১৪ সালের পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় উইলিয়ম ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি জার্মানির একটি জাতিগত মানচিত্র "রেইসাল ম্যাপ" তৈরি করাবেন ; উদ্দেশ্য ছিল এর সাহায্যে তিনি আর্য উপাদানসমূহ প্রদর্শন করাবেন। উক্ত মানচিত্র কিন্তু প্রকাশ করা যায়নি। কারণ, জার্মানির কোথাও এমনকি 'ব্র্যাডেন'-এ পর্যন্ত বিশুদ্ধ আর্য রক্ত বা আর্য চেহারার লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রমাণিত হল জার্মানরা একটি মিশ্রজাতি। বিশেষ কোনো জাতি বা আর্য হতেই পারে না।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে রেষারেষি থেকেই গেল। এই যুদ্ধের পরে পরে আবার সেই শ্রেষ্ঠত্বের

মনগড়া মতবাদ ভয়ংকর দংষ্ট্রা ব্যাদন করে আসরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হল নাজি এবং ফ্যাসিবাদের বিশ্বজয়ের সংগ্রাম।

"জে, এল রিমার" প্রস্তাব দিলেন, কার মধ্যে কতটা জার্মান রক্ত আছে তাই বুঝে ইউরোপীয়দের বিভিন্ন জাতে বিভক্ত করা হোক।

সমাজের সবচেয়ে উঁচু বা সম্ভ্রান্ত শ্রেণী যাঁদের মধ্যে ষোলো আনাই জার্মান রক্ত প্রবাহিত তাঁরাই হবেন খাঁটি 'টিউটন'। তাঁরা ভোগ করুক পূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা। আংশিক জার্মান রক্ত সমৃদ্ধ জাতি, তারা ভোগ করুক সীমাবদ্ধ সুযোগসুবিধা। জার্মানরক্ত হীন যারা তাদের বঞ্চিত করা হোক কোনো বিশেষ সুবিধা হতে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করে তোলার জন্য এদের নির্বীজ করা হোক। হিটলারি রেইসিজমের প্রবক্তাদের অন্যতম "এফ. কে. গুণথার" ১৯২০-৩৭ আলপাইন জাতিরূপকে বর্ণনা করলেন এভাবে ...... এদের মানসিকতা সেই লোকটির মতো যার আছে ছোটো একটি কুটির এবং ছোট্ট এক টুকরো জমি। বেশিদিন অস্তিত্ব রক্ষা করতে অক্ষম এরা। আলপাইন রমণীরা পরিণত হবে ছোট্ট নিষ্প্রভ জীবে, সংকীর্ণ নোংরা পৃথিবীতে বার্ধক্যে উপনীত হতে না হতেই। তাঁর মতে, আলপাইনরা নগণ্য অসামাজিক অপরাধী মাত্র, ঠক-প্রতারক, ছিঁচকে চোর এবং যৌন-ব্যভিচারী। অন্যদিকে নর্ডিকগণ, অনেক বেশি মহৎ এবং বৃহৎ সংগঠনে সক্ষম। গুণথারের বক্তব্য শুনে, যাঁরা আঁৎকে উঠল তারা গ্যাটস-এর বক্তব্য শুনলেন ; তাঁর বক্তব্য, শরীর বৃদ্ধির এবং হিস্ট্রোলজিক্যাল, গঠন (চুল-হাড়-দাঁত এবং ত্বক) সংক্রান্ত পার্থক্য ধরা পড়ে (পশু আর মানুষের মধ্যে)। একজন নর্ডিকের সঙ্গে অন্য মানবজাতির কারও সঙ্গে ঠিক অতটাই পার্থক্য। একমাত্র নর্ডিকরাই পারে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে, একমাত্র নর্ডিকদের মধ্যে দেখা যায় সঠিক দ্বিপদ অবস্থান বা সম্পূর্ণ সৌষ্ঠব সম্পন্ন ঋজুদেহ। তিনি তাঁর বক্তব্যের ইতি টেনেছেন এইভাবেই।

জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হিটলার তাঁর গ্রন্থ Mein Kampf 1925 লিখেছেন, এইটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ইতিহাস থেকে, যে যখন নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে আর্যরা, রক্ত মিশ্রণ ঘটিয়েছে বা সংকর প্রজনন জন্ম দিয়েছে, তার নিশ্চিত ফল হয়েছে সুসভ্য জাতিগুলির সর্বনাশ ! আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায়, সেখানকার জনসংখ্যার বিরাট অংশ জার্মান। তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোক বিভিন্ন বর্ণের নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে রক্তমিশ্রণ ঘটিয়েছে। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যাপারটা ঘটেছে ঠিক উলটো। ওসব অঞ্চলে অধিকাংশ ইউরোপীয় অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে বর্ণসংকর প্রজনন ঘটেছে আঞ্চলিক আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সভ্যতা এবং জনসংখ্যার সঙ্গে ওসব অঞ্চলের পার্থক্য এত বেশি প্রকট। জার্মানদের অধিকাংশই বিশুদ্ধ রক্ত বজায় রেখেছে, বর্ণসংকর প্রজননকে প্রশ্রয় দেয়নি। তাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিভূ হতে পারছে তারাই। ভবিষ্যৎ দিনেও হতে থাকবে যদি না, তারা অজাচার দূষণের মাধ্যমে আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করছে।'

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও এ-ধরনের অপরাধ থেকে মুক্ত থাকেনি। বর্ণবিদ্বেষী বা বর্ণগর্বী লেখকদের অভাব ছিল না সেখানেও। ম্যাসিডন গ্র্যান্টের পাসিং অব দ্য গ্রেট রেইস ১৯১৬।

ক্লিনটন বি. স্টোডারড (আমেরিকাস রেইস হেরিটেজ ১৯২২। এবং লোথ্রোপ স্টোডারড দ্য রিভোল্ট এগেইনস্ট সিভিলাইজেশন ; "দ্য মিনেইশ অব দ্য আন্ডারম্যান ১৯২২" প্রমুখ্য লেখকদের কথাও এ প্রসঙ্গে বলা চলে। তাঁদের লেখার উদ্দেশ্য নর্ডিক শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা বাজানো।

মনে করা হয় অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন জাতিও একই রকম দেখতে। কিন্তু না। ইতিহাস বলছে, টিউটন আক্রমণকারীরা ইংল্যান্ডের স্থানীয় অধিবাসীদের উৎখাত করেছিল। সেই ঘটনাকে এখনও গৌরবান্বিত বিশ্ববিখ্যাত হত্যা হিসেবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। আসল ব্যাপার, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণকারী টিউটনরা ছিল সম্পূর্ণ নতুন একটি জাতিগত উপাদান এবং তারা নিজেরাও রক্তের দিক দিয়ে একরূপ রক্তধারী নয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলতে গেলে সন্দেহাতীত ভাবে এটাই বলা যায়, নিউ ইংল্যান্ডে প্রথম পদার্পণ করেছিল যে অভিবাসীর দল তাদের মধ্যে ছিল ইংরেজ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন জাতের লোকেরা। তাদের দৈহিক পার্থক্য ছিল চোখে পড়ার মতো। দৈহিক গঠন এবং সেফালিক ইনডেক্স প্রভৃতির দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে ইংরেজ জাতির মধ্যে বিরাট ব্যবধান চোখে পড়ে। পারসন ১৯২০ পরিসংখ্যান বিচারে এইটেই প্রমাণিত যে ইংরেজদের মধ্যে শতকরা ২৫ জনের কালো গভীর চোখ, বাদামি অথবা কালো চুল, শতকরা ২০ জনের হালকা রঙের চোখ, ব্রন্ড বা স্বর্ণাভ চুল। সাধারণত যা চোখে পড়ে তা হল—হালকা রঙের চোখ এবং কালো চুল। কিছু কিছু ব্রিটিশ বা ইংরেজ-এর চোখ কালো, চুল স্বর্ণাভ। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোনো প্রমাণ মেলে না যার সাহায্যে এইটা প্রমাণ করা যায় যে, উভয় দেশ অবিমিশ্র 'অ্যাঙ্গলো-স্যাক্সন' জাতির বাসস্থান ছিল।

এবার আসা যাক কেল্টিজ তত্ত্বে। আর্যতত্ত্বের অন্য একটি শাখার নাম কেল্টিজম্। এই তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে ১৮৭০ সালের যুদ্ধ শেষের পর। ফ্রান্সে তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে ; যুক্তিতর্কের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হল, ফ্রান্সের অধিবাসীদের জাতিসত্তা কেল্টিক। শ্বেতকায়দের মধ্যে কেল্টিকরাই শ্রেষ্ঠ। গোবিযনও, ল্যাপোওজ, আয়েথান চেম্বারলেইন, ওয়াল্টম্যান প্রভৃতি লেখকরা ফরাসিদের আর্য বা টিউটেনিক হিসেবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেও ফরাসিরা সাধারণভাবে তা মানতে রাজি নন।

তারা নিজেদের কেল্টিকসত্তায় বিশ্বাসী ছিল এবং বিরাট শোরগোল তুলে দিল।

কেল্ট কারা, গল কারা? এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা দিল বিভ্রান্তিকর অবস্থা। জোসেফ ওয়াইডানি ১৯০৭, বললেন, দু-ধরনের কেল্টিক জাতিসত্তার কথা। প্রথমটি দীর্ঘাকায় ব্রন্ড এবং ডোলিচোসেফালিক যেমন, থাইল্যান্ডের স্কট এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের লোকেরা। দ্বিতীয়টি হল, খর্বকায় কৃষ্ণকায় এরা ব্রাচিসেফালিক যেমন, দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডের লোকেরা। তাঁর মতে, প্রথমোক্তটিই খাঁটি কেল্ট। দ্বিতীয়টি বিজিত ভূমিসন্তানদের বংশধর। তারা শুধু ভাষাটিই ধার করেছে, অন্য কিছু নয়। কিন্তু কেল্টরা কখনো বিশুদ্ধ রক্তধারী হয়ে থাকেনি। "কেল্টরা বরাবরই বর্ণসংকর প্রজননকে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং এটাই তাদের সর্বনাশের কারণ।" ওয়াইডনির দাবি, ফ্রান্সের ব্রন্ড ডোলিচোসেফালিক কেল্টদেরই প্রাধান্য।

কিন্তু ফরাসিদের দাবি কেল্ট বা ব্রাকিসেফালিক আলপাইন। ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ বললেন, ফ্রান্স বরাবরই ছিল কেল্টদের দখলে, অন্যরা বলেন গলদের। কোনো ব্যাপারটা যে কি তার সঠিক কোনো মীমাংসা দিতে পারলেন না ফরাসি তাত্ত্বিকগণ।

তাহলে এতদূরে যে সংক্ষেপ আর্য কাহিনী বা নর্ডিক তত্ত্ব বলা হল তা বিশেষ অনুধাবন করতে অনুরোধ জানাই। পৃথিবীতে এই জাতিসত্তা ও ধর্ম নিয়ে যত রক্ত ঝরেছিল তা আর কোনো ক্ষেত্রে ঘটেনি।

এই প্রসঙ্গে বলা অবান্তর হবে না যে, হিটলার মানে জার্মানির হিটলার। তাঁর সম্পর্কে এমন ইতিহাস আছে যে, ঐ আর্যতত্ত্ব প্রমাণের জন্য এবং খাঁটি জার্মান রক্ত কিনা তা দেখার জন্য তৎকালীন অন্তসত্ত্বা বা গর্ভবতী মেয়েদের পেট চিরে সেই সন্তানের পরীক্ষা করার মতো নৃশংস কাণ্ডকারখানা করে ছেড়েছেন। এইসব কারণে হিটলার জগৎ কাঁপানো একটি নাম।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং ভারতীয় বিদ্যাভবনের বক্তব্য— ভারতবর্ষে আর্যতত্ত্ব বিষয়ক সমগ্র ব্যাপারটা নির্ভর করে মূলত ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর শিষ্য বি. কে. ঘোষ মহাশয়ের ওপর। আশ্চর্যের ব্যাপার ভারতীয় ঐতিহাসিকরা এবং অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা এ-ব্যাপারে, বিনা প্রশ্নে নির্দ্বিধায় এঁদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এই দুজন ছাড়া ভারতবর্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির যেন এ ব্যাপারে কোনো কিছু বলার অধিকার নেই বা যোগ্যতা নেই। আর্যদের ব্যাপারে কোনো কিছু বলার অধিকার কি তৃতীয় ঐ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার কর্তৃক প্রকাশিত "দা কালচারাল হেরিটেজ অব ইন্ডিয়া" এবং মুম্বাই এর ভারতীয় বিদ্যাভবন হতে প্রকাশিত "দ্য ভেদিক এইজ" প্রথমোক্ত গ্রন্থটার প্রথম খণ্ডে আর্যতত্ত্বের ওপর আলোকপাত করেছেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ড. বি. কে. ঘোষ। দ্বিতীয় বইটিতে একই তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন একমাত্র ডা. বি. কে. ঘোষ।

দু-দুটো বিরাট পরিচ্ছেদ লিখেছেন তিনিই। তাহলে ভেবে দেখুন, পূর্ব থেকে পশ্চিম দিঙ্‌মণ্ডল পর্যন্ত দুজন ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি আর্যতত্ত্বের ওপর আলোচনা করার জন্য।

ডক্টরেট ডিগ্রি থাকলেই কি এমন হয়? ভারতে তো তেত্রিশটি রাজ্য আছে ; সেসব রাজ্যে এমন বিশেষজ্ঞ কেউ কি ছিল না? হায় ভারত! তোমার কপাল পুড়েছিল তো এই জন্যই! আধুনিক যুগে, এই বিজ্ঞানের যুগে তেমন এক জ্ঞানযোগীর উদয় প্রমাণ করেছে যে শত্রুর শেষ নিশ্চিহ্ন করবই ; তিনি হলেন পরমেশ চৌধুরী। শ্রীচৌধুরী মহাশয় বিশ্ব তোলপাড় করে যে তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন তাহা অভাবনীয়, অদৃষ্টপূর্ব এবং অকল্পনীয়। তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করে পরের বক্তব্যে আসছি।

নর্ডিক (ইউরোপীয়) আর্যতত্ত্ব নিয়ে এতটা লিখলাম কেন? যারা আর্য তারাই বেদের রচয়িতা এই হল ঘটনা! আর্য নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় হয়েছে, সে-কথা যথাসম্ভব বলেছি। দিকগুলো দেখিয়েছি। এখন বলব ঋগ্‌বেদ সম্পর্কে এই ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সারথি করে চলতে চাই। আসুন দেখা যাক। জরথুস্ত্র এবং তাঁর শিষ্যরা ভারতবর্ষে থেকে

ইরানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর্যরা যে ইরান হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেনি তার অন্যতম প্রমাণ হল, জরথুস্ট্র যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন তা একেশ্বরবাদী। কিন্তু ঋগ্‌বেদে যে ধর্ম তা মূলত বহুত্ববাদী। ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাসে কোন্‌টা প্রাচীন? একেশ্বরবাদ না বহুত্ববাদ? তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বহুত্ববাদ। ঋগ্‌বেদের ধর্মের প্রাচীনত্বের এটাও আর একটা প্রমাণ। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় আমরা পাশ্চাত্য লেখকদের সাহায্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ইংরেজ ভক্ত-পাঠকদিগের তুষ্টির জন্য দু-একবার আপন মতের পোষকতায় পাশ্চাত্য লেখকের মত উদ্ধৃতি করিয়াছি বটে, কিন্তু সে অনিচ্ছাপূর্বক এবং আপনার মতের সঙ্গে তাহাদিগের মত না মিলিলে সেরূপ সাহায্য গ্রহণ করি নাই।" প্রচার ১ম বর্ষ, পৃ. ৩০১-১০।

এবার তিনি অন্য সমস্যার সাথে ভারতবর্ষের যে একেশ্বরবাদের জন্ম হল কি করে তাব প্রেক্ষিতে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেদের তিনটি অবস্থার কথা বলেছেন। প্রথম, দেবোপাসনা অর্থাৎ জড়ে চৈতন্য আরোপ এবং তার উপাসনা। দ্বিতীয়, ঈশ্বরোপাসনা এবং তৎ সঙ্গে দেবোপাসনা। তৃতীয়, ঈশ্বরোপাসনা এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়। বেদেব আলোচনায় বলা হয়েছে ইন্দ্র, অগ্নি, আকাশ প্রভৃতি দেবতা'—যেখানে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানেই এক একটা উপাস্য দেবতা কল্পনা করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এটা না করা হলে কোনো কিছুর প্রতি আন্তরিক ভক্তির উদয় হইবে না। আর যদি চিত্তরঞ্জনী বৃত্তিগুলির মূর্তি সুখের হয়, তবে জগতে যাহা মহৎ, যাহা সুন্দর যাহা শক্তিমান তাহার, তাহার উপাসনা করিতে হয়। যদি এ সকলের প্রতি ভক্তিমান না হইব, তবে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তিগুলি লইয়া কি করিব? এ উপাসনা ভিন্ন হৃদয় মরুভূমি হইয়া যাইবে। এগুলি বাদ দিয়া যে উপাসনা, সে পত্রহীন বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গহীন হইয়া যাইবে তা অঙ্গহীন উপাসনা। হিন্দুধর্মে এই উপাসানা আছে। ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ। তবে দুর্ভাগ্যবশত, ক্রমে হিন্দুধর্মের বিকৃতি হইয়াছে। ইন্দ্র যে বর্ষণকারী আকাশ তাহা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে স্বয়ং সুখ-দুঃখের বিধাতা অথচ ইন্দ্রিয় পরবশ কুকর্মকুশলী, স্বর্গস্থ একটা জীব ভেবে নিয়েছি।" প্রচার ১ম বর্ষ, পৃ. ১৫৬

কৌতূহলী জিজ্ঞাসু পাঠকদের আর একবার ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতাব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটু আগে যা বলেছি তা অনুধাবন কবতে অনুরোধ কবি। তাহলে দেবোপাসনাব উৎপত্তি সম্বন্ধে ধারণাটা পরিষ্কাব হয়ে উঠবেই। ঋগ্‌বেদের ধর্মের এই প্রাথমিক অবস্থা বা জড়ে চৈতন্য আরোপমূলক যে উপাসনা তা কি মঙ্গলজনক? বঙ্কিমচন্দ্র কি বলেছেন দেখুন, "যাহা হিতকর শক্তিশালী হউক বা না হউক, কেবল হিতকর, ঊনবিংশ শতাব্দী তাহার নাম দিয়াছে "শিব"। সুন্দর বা সৌম্যের নতুন নাম, কিছু নতুন ভাবে হয় নাই বটে। সুন্দর! সুন্দরই আছে। সৌম্য সৌম্যই আছে। এই সত্য 'The truth' শিব 'The god, এবং সুন্দর The beautiful ত্রিবিধ ভাব মানুষের উপাস্য। এই উপাসনা দ্বিবিধি হইতে পারে। উপাসনার সময় অচেতন উপাস্যকে সচেতন মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে। উপাসনার সময় আদিম মানুষ তাহাই করিয়া থাকে। এই উপাসনা পদ্ধতি ভ্রান্ত, কাজেই অহিতকর। দ্বিতীয় বিধি উপাসনায় অচেতনকে, অচেতন বলিয়াই জ্ঞান থাকে। গ্যেটে, Goethe বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ Wordsworth এই জাতীয় জড়োপাসক। ইহা অহিতকর ; কেন-না, ইহার

দ্বারা কতকগুলো চিত্তবৃত্তির স্ফূর্তি বা পরিণতি সাধিত হয়। ইহা অনুশীলনবিশেষ। এখনকার দেশি পণ্ডিতেরা (বিশেষ বালকেরা) তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিয়া উঠে না। কিন্তু কতকগুলি বৈদিক ঋষিরা তাহা বুঝিতেন। বেদে উপাসনাই আছে। এই কথা শুনিয়া আলফ্রেড লয়েন লিখিলেন, "কি ভয়ানক উপধর্ম। এমন নিকৃষ্ট জাতির কি গতি হইবে।" কাজেই বুদ্ধির জোরে ইনি গভর্নর হইয়াছিলেন। পরিচয় ১৪ বর্ষ. পৃ-৩৮৩

এইবার বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের ঋগ্‌বেদের উপাসনায় কি বোঝাতে চেয়েছেন? "সর্বাপেক্ষা বৈদিক হিন্দুরাই অল্পকালে সভ্যতার পদবিতে আরূঢ় হইয়া ঈশ্বর জ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা এ পর্যন্ত বৈদিক ধর্মের কেবল দেবতাতত্ত্বই সমালোচনা করিয়াছি। কেন না সেইটা গোড়া, কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে পরিপক্ব যে বৈদিক ধর্ম, তাহা অতি উন্নত ধর্ম এবং এক ঈশ্বরের উপাসনাই তাহার স্থূল মর্ম। তবে বলিবার কথা এই যে, প্রথম হিন্দুরা, একেবারে গোড়া হইতেই ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই। জাতিকর্তৃক ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্তির সচরাচর ইতিহাস এই যে, আগে নৈসর্গিক পদার্থ যা শক্তিতে ক্রিয়মাণ, চৈতন্য আরোপ করে, অচেতনে চৈতন্য আরোপ করেন, তাহাতে কি প্রকার দেবোৎপত্তি হয় তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। এই প্রণালী অনুসারে বৈদিকরা কি প্রকারে ইন্দ্রাদিদেব পাইয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়াছি। এই অবস্থায় জ্ঞানের উন্নতি হইলে উপাসকেরা দেখিতে পান যে, আকাশের উপাসনা করি, বায়ুরই উপাসনা করি, মেঘেরই উপাসনা করি, আর অগ্নিরই উপাসনা করি, এই সকল পদার্থই নিয়মের অধীন। এই নিয়মেও সর্বত্র এক ও, এক স্বভাব দেখা যায়। খোল মউনির তাড়ান খোল আর বাত্যাতাড়িত সমুদ্রে এক নিয়ম বিলোড়িত হয়; যে আমার হাতের গণ্ডুষের জল পড়িয়া যায়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। এক নিয়তি সকলকে শাসন করিতেছে। সকলেই সেই নিয়মের অধীন হইয়া আপন আপন কর্ম সম্পাদন করিতেছে। কেহই নিয়মকে ব্যতিক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। তবে ইহাদেরও নিয়মকর্তা শাস্তা এবং কারণস্বরূপ আর একজন আছেন। এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে সকলেই সেই এক নিয়মে চালিত; অতএব এই বিশ্বজগতের সর্বাংশই সেই নিয়মকর্তার প্রণীত এবং শাসিত। ইন্দ্রাদি হইতে বেণুকণা পর্যন্ত সকলই এক নিয়মের অধীন সকলেই একজনের সৃষ্ট ও রক্ষিত এবং একজনই তাহার লয়কর্তা। ইহাই সরল ঈশ্বর জ্ঞান। জড়ের উপাসনা হইতেই ইহা অনেক সময়ে উৎপন্ন হয়, কেন-না জড়ের একতা ও নিয়মাধীনতা ক্রমশ উপাসকের হৃদয়ঙ্গম হয়।

তবে ঈশ্বরজ্ঞান উপস্থিত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে এমন নহে। যাহাদিগকে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া পূর্বে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানের আরও অধিক উন্নতি না হইলে বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ব্যতীত, তাহাদিগকে জড় ও অচেতন বলিয়া বিবেচনা হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রতিষেধক হয় না। ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা হউন, কিন্তু ইন্দ্রাদিও সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট, এবং তাঁহার নিয়োগানুসারে স্ব স্ব ধর্ম পালন করে মাত্র। ঈশ্বর যেমন মনুষ্য ও জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি ইন্দ্রাদিকেও সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মনুষ্য ও জীবগণকে যেমন পালন করেন ও কল্পে কল্পে ধ্বংস করেন, ইন্দ্রাদিকেও সেইরূপ করিয়া থাকেন। তবে ইন্দ্রাদিও মানুষের উপাস্য এবং এ জগতের সৃষ্টির নিয়ম আছে এই বিশ্বাস

লব্ধ হইয়াছে। এই কারণে বলা যায় ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিলেই কি দেবদেবীর উপাসনা উঠিয়া যায়? বরঞ্চ অধিক হইতে পারে। হিন্দুধর্মে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাই প্রচলিত সাধারণ হিন্দুধর্ম। অর্থাৎ লৌকিক হিন্দুধর্ম, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম নহে। লৌকিক হিন্দুধর্ম এই যে একজন ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বকর্তা ; এবং দেবগণও আছেন এবং দেবগণকে ঈশ্বর নিযুক্ত করিয়াছেন লোক রক্ষার জন্য। বেদে এবং হিন্দুশাস্ত্রের অন্যান্য অংশে স্থানে স্থানে এই ভাবের বাহুল্য আছে। তারপর, জ্ঞানের আর একটু উন্নতি হইলে, দেবদেবী সম্বন্ধে ভাবান্তরের উদয় হয়। জ্ঞানবান উপাসক দেখিতে পান যে ইন্দ্র বৃষ্টি করেন না, ঈশ্বরশক্তিতে বা নিয়মে বৃষ্টি হয় ; ঈশ্বরই বৃষ্টি করেন, বায়ু নামে কোনো স্বতন্ত্র দেবতা বাতাস করেন না ; বাতাস ঐশিক কার্য। সূর্য চৈতন্যবিশিষ্ট আলোককর্তা নহেন। সূর্য জড় বস্তু সৌরলোক ও ঐশিক ক্রিয়া। যখনই ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য এ সকল উপাসনাকালে ঈশ্বরেরই নামান্তর বলিয়া গৃহীত হইল। তিনি এক, কিন্তু তাঁহার বিকাশ ও ক্রিয়া অসংখ্য কার্যভেদে, শক্তিভেদে এবং বিকাশভেদে তাঁহার নাম অসংখ্য। উপাসক যখন ইন্দ্র বলিয়া ডাকে তখন তাঁহাকেই ডাকে, যখন বরুণ বলিয়া ডাকে তখন তাঁহাকেই ডাকে, যখন সূর্যকে বা অগ্নিকে ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে।"

বেদের এ নিগূঢ় তত্ত্বটা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ছিল না। তাই তারা উলটাপালটা বক্তব্য রাখছে। ভারত তত্ত্ববিদ ম্যাক্সমূলার অনেক ক্ষেত্রে অসহায় বোধ করেছেন।

ভারতবাসীরা তাঁদের দৃষ্টিতে ধর্ম-দর্শন ইতিহাসের ব্যাখ্যা করছে এবং আরও করবে বলার কি আছে। ম্যাক্সমূলার হতাশ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ৮১, ৮২ সূক্ত দেখুন। ঈশ্বর বহু নয়। তিনি এক। ঋগ্‌বেদে এই এক ঈশ্বরের স্মৃতি দেখা যায়। 'এই বিশ্ব তিনি একাই নির্মাণ করেছেন। এইজন্যই তাঁর নাম বিশ্বকর্মা। ১২১ সূক্তে তাঁকে বলা হয়েছে হিরণ্যগর্ভ।' ঋগ্‌বেদের ৯০ সূক্তকে পুরুষ সূক্ত বলে। এতে এক সর্বব্যাপী পুরুষের বর্ণনা আছে। এ যুগেও বিষ্ণুপূজায় পুরুষ সূক্তের প্রথম ঋক্ ব্যবহৃত হয়,

"সহস্রশীর্ষঃ পুরুঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বে তো বৃত্বা অত্যাতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অতি প্রাচীনকালেই ঋগ্‌বেদের ঋষিরা জড়োপাসনা থেকে শুরু করে ক্রমশ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপস্থিত হয়েছিলেন। বৈদিক ধর্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। এখানে দেবতাদের কোনো কথাই নেই।

তাহলে দেখা যায়, জরথুস্ট্র প্রবর্তিত ধর্ম বেদের পরবর্তী ক্রমঃবিবর্তিত ধর্মের অনুসারী। বেদের পরবর্তী যুগের যে ধর্ম উপনিষদের যেধর্ম, তাই জরথুস্ট্র প্রচার করেছেন। জৈনদের মতো জরথুস্ট্র-ধর্মও ইহকাল থেকে পরকালকেই প্রাধান্য দিয়েছে। জরথুস্ট্র-ধর্ম যে ঋগ্‌বেদের পরবর্তী যুগের এটাই তার একটা প্রমাণ। ঋগ্‌বেদে ইহকাল যতটা গুরুত্ব পেয়েছে পরকাল ততটাই নয়।

"জরথুস্ট্রের উপাখ্যান"।

এই সম্পর্কে সঠিক আলোকপাত না করলে ঋগ্‌বেদ রচনাটি কাদের পরিষ্কার হবে না। তাই জরথুস্ট্র উপাখ্যান। উপাখ্যান কেন? এ তো রূপকথা। যেহেতু জরথুস্ট্র ভারতীয়

বংশোদ্ভূত সেজন্য অনেক কাহিনী তার পশ্চাতে থাকবে। আরবীয় সূত্রের থেকে জানা যায় তিনি আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ২৫৮ বছর থেকে ৩০০ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম ১০০০ খ্রি. পূ.। যেসব পণ্ডিতবর্গ ভারতে আর্যতত্ত্ব প্রবেশ করালেন তাঁদের মত হল, খ্রি. পূ. ১৫০০ শতকে জোরস্ট্রীয় ধর্মগ্রন্থ অ্যাভেস্তার সঙ্গে ঋগ্‌বেদের প্রচুর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন এবং এর ওপর ভিত্তি করেই দাবি তুলেছেন যে আর্যরা ইরান থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন। জরথুস্ট্র সম্বন্ধে যারা যথেষ্ট জেনেছেন বা জানবার চেষ্টা করেছেন তারা নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলবেন জরথুস্ট্রের জন্ম যদি ১০০০ খ্রিস্ট পূর্বে হয়ে থাকে তাহলে তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল প্রায় আরও একশত বছর পরে, অর্থাৎ ৯০০ বছর খ্রি. পূর্বাব্দে। এইযুক্তি থেকে এটাই মেনে নিতে হয় যে, ঋগ্‌বেদ গ্রন্থ 'অ্যাভেস্তা' থেকে অন্যূন ৭০০ বছরের বেশি প্রাচীন, এবং অ্যাভেস্তা ঋগ্‌বেদের কাছে তার ভাষা, ধর্মমত প্রভৃতির জন্য ঋণী। ঋগ্‌বেদের ভারতবাসীরা জরথুস্ট্র অনুগামী পারস্যবাসীদের পূর্বসূরি ছিলেন। সুতরাং, আমরা বেশ সহজভাবে এ কথাটা বলতে পারি যে, পারস্যবাসীরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেনি, ভারতবাসীরাই ইরানে প্রবেশ করেছিল।

জরথুস্ট্রের জন্মভূমির সন্ধান আমাদের এ ধারণা জোগায় যে তিনি এসেছিলেন পূর্বদেশ থেকে। তাহলে ভাষাগত এবং ঐতিহাসিক প্রমাণও এই মতবাদের সপক্ষে। পাশ্চাত্য জীবনীকারগণ তাঁর জন্মস্থান নির্ধারণ করেছেন, হিন্দুকুশ পর্বতমালার বিস্তার থেকে দক্ষিণ দিকের পিল্টান এর মধ্যবর্তী ভূভাগকে। এই অংশ পড়ে ব্যাকট্রিয়া, কান্দাহার এবং ড্রাঙ্গিয়ানা। অর্থাৎ তাঁদের মতে, আফগানিস্তান এবং সন্নিহিত অঞ্চলই ছিল জরথুস্ট্রের জন্মভূমি। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তাঁরা ভারতবর্ষকে সমস্ত হিসেব থেকে বাদ দিয়েছেন। যদিও ভারতবাসীরা ও পারস্যবাসীরা একই মুদ্রার এপিঠ, ওপিঠ।

জরথুস্ট্র নিজেই বলেছেন, তাঁর জন্ম একটা পুরোহিত পরিবারে। যচনা ৩৩.৬ / ১৩.৯৪ দ্রষ্টব্য। 'আথরবণ' অর্থাৎ যারা কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন তেমনই এক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। সুতরাং তাঁর জ্ঞানের উৎস কোনো একটা মহান প্রাচীন ঐতিহ্য বোঝা গেল।

ঋগ্‌বেদের ঐতিহ্য থেকে প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী কোনো পরিচয় মেলে না। ঋগ্‌বেদের ধর্মীয় ঐহিত্য কত প্রাচীন? ঋগবেদের বয়স ২০০০ থেকে ১১০০ খ্রি. পূর্বাব্দের বেশি। এই ঋগ্বেদের উদ্ভবকাল নিয়ে যেসব মত আছে তা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। ম্যাক্সমূলারের মতে ঋগ্বেদের বয়স ১২০০ খ্রি পূ.।
২। কীথের মতে ১৪০০ খ্রি. পূ.।
৩। পাগিটার সাহেব ১৫০০ খ্রি. পূ.।
৪। ওয়েবারের মতে ২০০০ খ্রি. পূ.।
৫। জাকবির মতে ৪০০০ খ্রি. পূ.।
৬। তিলকের মতে ৫০০০ খ্রি. পূ.।

আধুনিক আবিষ্কার বা অতি সম্প্রতি প্রাপ্ত তথ্য জ্যাকবি এবং তিলককেই সমর্থন করেছেন। ঋগ্‌বেদের অন্যতম রচয়িতা বশিষ্ঠ মুনির একটা ব্রোঞ্জ নির্মিত মস্তক পাওয়া

গেছে। ধাতু প্রযুক্তিবিদরা এর বয়েস নির্ণয় করেছেন। বলেছেন ওটা ৪০০০ বছরের বেশি প্রাচীন। এ সম্বন্ধে যাঁরা বেশি জানতে উৎসুক তাঁরা উৎস জেনে নিতে পারেন।

জরাথুস্ট্র যে ভারতীয় পুরোহিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তা অন্য সূত্র থেকে জানা যায়। 'অশবন' বা অশের অধিকারীর প্রশস্তিকেন্দ্রিক ছিল তাঁর ধর্মপ্রচার। 'অশবন' বলতে তাকেই বোঝায় যিনি "সত্য সন্ধানী" এবং তাকে আয়ত্ত করতে সক্ষম। অশবনরা এই পৃথিবীতে অমর হন। বৈদিক ভারতবর্ষে এমন সাধক ছিলেন যাঁদের লক্ষ ছিল সূর্যের মতো ধীশক্তির অধিকারী হওয়া। তাঁরা ছিলেন সত্য পথের পথিক। কোনোমতেই সত্য থেকে বিচ্যুত হতেন না তাঁরা। বেদে এদের বলা হয়েছে ঋতা-র সাধক।

একে বিশেষজ্ঞরা ইন্দো-ইউরোপীয় অতীন্দ্রিয়তাবাদ বলে থাকেন।

জোরাস্ট্রীয় ধর্ম ভারতীয় ধর্মপ্রজাতির (চর্চা) একটি শাখা মাত্র, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের মতো। বুদ্ধ এবং মহাবীরের মতো জরথুস্ট্রও একটা ধর্মপথের সন্ধান দিয়েছিলেন। এ ধর্মগুলো যেন ভারতীয় ধর্মেরই বিশেষ রূপ। বৈদিক ধর্মের মতো কোনো বিশেষ প্রবক্তা নেই। কিন্তু এসব ধর্মের মধ্যে আছে। সাধারণ বিজ্ঞান শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে জন্ম দিয়েছে যেমন পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতির। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, জোরাস্ট্রীয় ধর্ম মূল ভারতীয় ধর্মের শাখাপ্রশাখা মাত্র।

অতএব এই তিন ধর্মই ঐতিহ্যবিরোধী প্রাচীনপন্থী নন। এঁরা বৈদিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী ধর্মাচরণ প্রচার করেছিলেন। এঁদের ধর্মাবলম্বীদের মনু, বোধায়ন প্রভৃতির টীকাকারগণ অনার্য, অশিষ্ট, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেছেন। কারণ হিসেবে দেখা যায় তন্ত্রসাধকদেরও বৈদিকপন্থীরা ম্লেচ্ছ অনার্য বলেছেন।

একদা সর্বত্র ভারতের তন্ত্রসাধনার খুবই বিস্তার ছিল। আচার্য শংকরের আবির্ভাবের পর এঁরা উৎখাত হয়ে যান। এখন চীন-তিব্বত শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রধান এলাকায় তন্ত্রের খুবই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

জরথুস্ট্র এবং তাঁর শিষ্যরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করেছিলেন ; এ সম্বন্ধে একটা উপাখ্যান আছে। একটা পল্লবী গ্রন্থে, তাঁর মাতাপিতার নামও উল্লেখ করেছেন। পৌরসশপা, সুখদোভা, ছিলেন তাঁর পিতা-মাতা। তাঁর চার ভাইয়ের নামও আছে। তাঁর বয়স তখন ২০ বছর ছিল। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন ৩০ বছর বয়সের অধিক হবে না। তিনি শুরু করেন ধর্মপ্রচার। কিন্তু ; একাজে ভীষণভাবে বাধা পান। করপণ, উসিজ, কাভস প্রভৃতি সনাতনপন্থী গোঁড়া সম্প্রদায়গুলোর কাছ থেকে ; তাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

ঋগ্‌বেদীয় ভারতবাসীর সাথে ইরানীদের 'আভেস্তার' রেষারেষি ঋগ্‌বেদ রচিত হওয়ার অনেক আগে থেকে। আভেস্তায় (ইয়াস ৩০.১১.৮) লেখা আছে—

"ইয়াৎ যুস্তা ফ্রমীমথা ইয়া মস্যা অচিসতা দানতো ভক্ষকোনটো দীবো জুশতো।"

অর্থাৎ, তোমার ইচ্ছাতেই সবচেয়ে জঘন্য পাপীদেরও ঈশ্বরের পরম ভক্ত বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য, এখানে ভারতীয় দেবতাদের লক্ষ্য করেই এই কথাটি বলা হয়েছে। প্রফেসর বার্থোলেমের অনুসরণ করেই এই কথাটি বলা যায়। মাওলস্টিয়ন বলেন, ঋগ্‌বেদের ৩. ৪০.

১. ২ সূক্তে, "দাবি জুসর্ট" যৌগিক শব্দটা পাওয়া যায়। এর অর্থ যা কিছু দেবতাদের কাছে গ্রহণীয় প্রাচীন যুগে দেবতাদের একটা সুনাম ছিল, গ্রহণীয় এই শব্দটায় তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে অসুর-দেব এই দুটো শব্দে। দুটো সমগোত্রীয় ভাষায় এ দুটো শব্দের অর্থ দাঁড়াল বিপরীত। অর্থাৎ যিনি দেব তিনি অসুরের শত্রু। আবার যিনি অসুর তিনিই দেবতার শত্রু।

আভেস্তা এবং বেদের ভাষা বলার ধারা নিয়ে দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে এভাবে দেখা দিল ধর্মীয় বিরোধ। বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত Bournous বলেন, বৌদ্ধশাস্ত্রতে দেখা যায়, কৃষ্ণ নাম নেই অথচ ঐ শাস্ত্রের প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্তিত হয় ; কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে ললিত বিস্তারে কৃষ্ণের নাম আছে। (ললিত বিস্তার) একটি বৌদ্ধ শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলির মধ্যে 'সূত্রপিটক' সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ।

তাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসুর বলা হয়েছে। কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধর্ম বিরোধী বৌদ্ধরা কৃষ্ণকে যে অসুর বিবেচনা করবেন ইহা বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য যে বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অসুর বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের যে প্রধান শত্রু প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়েছেন 'মার'। কৃষ্ণ প্রচারিত অপূর্ব নিষ্কাম ধর্ম তৎকৃত সনাতন ধর্মের অপূর্ব সংস্কার স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল বোঝা যায়। অতএব তাঁরা কৃষ্ণকে অনেক সময়ে 'মার' বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। (কৃষ্ণচরিত অষ্টম—পরিচ্ছেদ দ্রঃ)

জরথুস্ত্র যে ভারতবর্ষ থেকে ইরানে পালিয়ে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ তাঁর ভাষা। আভেস্তার ভাষা সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ মাত্র। ভারতবর্ষে যেমন প্রাকৃতভাষা। কোন বিশুদ্ধ ভাষার এইরকম অপভ্রংশ রূপের হেতু ভৌগোলিক দূরত্ব। যারা ভারতবর্ষ থেকে ইরানে গিয়েছিল তারা মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। ভৌগোলিক দূরত্ব ছাড়াও সময়টাও ভাষা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা বড়ো উপাদান ছিলই। আমাদের বাংলা ভাষার কথাই ধরা যাক না কেন! বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের তুলনায় এখনকার বাংলা ভাষার অনেক ফারাক। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকগণ কিন্তু তবুও একথাটা মেনে নিলেন না যে, আভেস্তার ভাষা ঋগ্‌বেদের তুলনায় নবীন মনে হলেও, আভেস্তার চেয়ে ঋগ্‌বেদ অনেক প্রাচীন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের যুক্তি ঃ একটা ব্যাপার মনে রাখা অবশ্যই জরুরি ভাষা এবং বিন্যাস নতুন হলেও বিষয়বস্তু বহু প্রাচীন হতে পারে। তাছাড়া যশট ভেনডিডাড, যশ্যনা প্রভৃতি অংশের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের রচনাকালের বয়স ব্যবধান রয়েছে। এখানে ভাষার ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে এই বিষয় অনুধাবন করা চাই।

জরথুস্ত্র যে ধর্মপ্রচার করেছিলেন তা একেশ্বরবাদী। কিন্তু ঋগ্‌বেদ হতে বোঝা যায় তা বহুত্ববাদী। নিশ্চিতভাবে বহুত্ববাদী ঋগ্‌বেদের ধর্মের প্রাচীনত্বের এটাও আর একটা প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উদ্ধৃতি দেখুন, এ ব্যাপারে কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিতের উদ্ধৃতি থেকে ও তাঁর বক্তব্যই বেশি প্রাধান্য পাওয়া উচিত। মূল বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়ার আগে তাঁর বক্তব্যের আরও একটা ছোট্ট উদ্ধৃতি হল, "আদি পাশ্চাত্য লেখকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক। ইংরেজভক্ত পাঠকদের তুষ্টির জন্য দুই-একবার আপন মতের পোষকতায় পাশ্চাত্য লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু! সে অনিচ্ছাপূর্বক এবং

আপনার মতের সঙ্গে তাহাদিগের মত না মিলিলে সেরূপ সাহায্য গ্রহণ করি নাই।" তাঁর মতে অবশ্য খ্রিস্ট, বুদ্ধ, মুসা প্রভৃতি কেউই ধর্মের সৃষ্টি করেননি। এঁদের কাউকে নতুন ধর্মের প্রণেতা বলা যায় না। কদাচিৎ ধর্মের সংস্কারক দেখা যায়, কোথাও ধর্মের দ্রষ্টা দেখা যায় না। সৃষ্ট ধর্ম নাই, সকল ধর্মই পরম্পরাগত, কদাচিৎ বা সংস্কৃত। তাহলে ধর্ম কোত্থেকে এল? বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এভাবে! "খ্রিস্টীয়ান বলিলেন, (মুসা বা যীশু) ধর্ম আনিয়াছেন। মুসলমান বলিবেন (মহম্মদ) ধর্ম আনিয়াছেন, বৌদ্ধ বলিবেন তথাগত! কিন্তু তাহা ছাড়া আরও ধর্ম আছে। প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির ধর্মের মুসা, মহম্মদ কেহই নেই। পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে তাহার সংখ্যা না বলিলেও হয়।

সকলেরই এক একটা ধর্ম আছে, এমন কোনো জাতি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাদের কোনো প্রকার ধর্মজ্ঞান নাই। এই অসংখ্য জাতিদিগের ধর্মে প্রায় মহম্মদ. মুসা, খ্রিস্ট ও বৌদ্ধের তুল্য কেহই ধর্ম স্রষ্টা নাই। তাহাদের ধর্ম কোথা হইতে আসিল? আর যাঁহারা বলেন যে, খ্রিস্ট বা বুদ্ধ, মুসা বা মহম্মদ ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের কথায় একটা ভুল আছে। ইঁহারা কেহই ধর্মের সৃষ্টি করেন নাই, কোন প্রচলিত ধর্মের উন্নতি করিয়াছেন মাত্র। খ্রীস্টের পূর্বে ইহুদায় ইহুদি ধর্ম ছিল, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সংস্করণ মাত্র। মুসার ধর্মপ্রচারের পূর্বেও এক ইহুদি ধর্ম ছিল ; মুসা তাহার উন্নতি করিয়াছিলেন। সেই সকল আদিম ধর্ম কোথা হইতে আসিল?"

তাহার প্রণেতা কাহাকেও দেখা যায় না কেন? জরথুষ্ট্র কোন্ ধর্ম সংস্করণ করেছিলেন? স্পষ্টতই বৈদিক ধর্মের। এদিক দিয়ে তিনি, মহাবীর বুদ্ধদেবের সমগোত্রীয়। এইখানে জরথুস্ট্র উপাখ্যান সংক্ষেপে সমাপ্ত করলাম।

৫। "আমার ধর্ম হিন্দুধর্ম"

হরিরুবাচ

"যাজ্ঞবল্ক্য নমস্কৃত্য মিথিলায়ং সমাস্থিতম্।
অপৃচ্ছণ্ ঋষয়ো গত্বা বর্ণধর্মাণশেষতঃ।
তেভ্যঃ স কথয়ামাস বিষ্ণুঃ ধ্যাত্বা জিতেন্দ্রিয়ঃ।।"

ইহার উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যাহা যাহা বলিয়াছিলেন পরম্পরা তাহা পরিবেশনই আমার এই ধর্মগ্রন্থখানি, পরিশীলিত মতে নিবেদিত হইল। গরুড় পুরাণের ৯৩ অধ্যায় পূর্ব খণ্ডমত—১৩ শ্লোকের বাংলা উল্লেখ করত আমি 'আমার ধর্ম হিন্দুধর্মে' প্রবেশ করিতে চাই।

যাজ্ঞবাক্য বলিলেন, যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে, সেই দেশে ধর্ম আছে জানিবে। পুরাণ ও ন্যায়, মীমাংসা এই সকল ধর্মশাস্ত্র। বেদ ও চতুর্দশ বিদ্যাই ধর্মের আশ্রয়। মনু—বিষ্ণু—যম—অঙ্গিরাস—বশিষ্ঠ—দক্ষ—সম্বর্ত—শতাতপ—পরাশর—আপস্তম্ব—উশনা— ব্যাস—কাত্যায়ন—বৃহস্পতি—গৌতম—শঙ্খ—লিখিত—হারীত—অত্রি—যাজ্ঞবাল্ক্য আমরা ধর্মবক্তা। ইহারা সকলেই বিষ্ণুর ন্যায় সেবনীয়।

দেশ ও কাল বিশেষ বিবেচনাপূর্বক যোগ্য পাত্রে কোনো দ্রব্য প্রদান করাই ধর্মের লক্ষণ।

শম-দম নীতিই পরম ধর্মের সহায়।

আত্মজ্ঞান পরিজ্ঞান ধর্মের উদ্দেশ্য।

মনু—বিষ্ণু—যম—অঙ্গিরাস ইঁহারা বেদধর্মজ্ঞ অপার সকলেই ত্রিবিধ বিদ্যাতত্ত্বজ্ঞ।

ইঁহারা সকলে এবং আত্মাবৎ (তত্ত্বজ্ঞানী) মানব, যাহা উপদেশ করেন তাহাই ধর্ম।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার প্রকার জাতি আছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন জাতির দ্বিজ সংজ্ঞা।

দ্বিজ কেন?

যেহেতু সংস্কার দ্বারা উপবীত ধারণ।

তথাকথিত আর্য তকমা নিয়ে ভারতীয় হিন্দুর উদ্ভব হয়েছে। এই হিন্দুধর্মের প্রাণপুরুষগণ পাঞ্জাবে সিন্ধু নদীর তীরে তাঁদের আর্যসভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। যার নাম হল সিন্ধুসভ্যতা। ভারতবর্ষকে আরবরা বলত সিন্ধু হিন্দি। তুর্কিরা বলত হিন্দলি, India-কে এই নামে তারা বলত। এই ইন্ডিয়া থেকে হয় হিন্দুস্তান। এইভাবে ভারত হয়ে গেল হিন্দুস্তান। সিন্ধুকে ইউরোপীয়ান, আরবগণ (স কে হ উচ্চারণ করত) তাই হ থেকে ইন্দু—হিন্দু, হয়ে যায় হিন্দুস্থান।

ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন **বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ**। তাঁর শিকাগো মহাধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার মুহূর্ত থেকেই হিন্দুস্থান তথা ভারতীয় হিন্দুধর্মের মহামন্ত্র বিশ্বময় ব্যাপ্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তিই আরো মহিমান্বিত করেছে হিন্দুধর্ম তথা সমগ্র ভারতবাসীকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, ঋগ্বেদ হল পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের সূতিকাগার।

বেদের মন্ত্রগুলিকে ঋক্ বলা হয়। কয়েকটি ঋক্ নিয়ে হয় সূক্ত। বেদের মূলত ২টি ভাগ—**জ্ঞানকাণ্ড** ও **কর্মকাণ্ড**। কর্ম আবার দুভাগে বিভক্ত। **যজ্ঞকর্ম** ও **ক্রিয়াকর্ম**। জ্ঞান কাণ্ড বা উপনিষদ ইহা দর্শনেরই আলোচ্য বিষয়। কর্মকাণ্ড তথা স্মৃতি শাস্ত্রাধীন বিষয়।

ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এই তিন ভাগে বেদ বিভক্ত। অথর্ব বেদের কোনো ব্যবহার যজ্ঞকর্মে হয় না। ইহা কেবলই বৈষয়িকী মাত্র। বেদ চতুষ্টয়ের ব্রাহ্মণ আরণ্যকগুলি কেবল কর্মকাণ্ডের অধীন। উপনিষদগুলি জ্ঞানকাণ্ড হিসাবে চিহ্নিত আছে। বেদ অবলম্বনে বিভিন্ন ঋষিগণ সংহিতা রচনা করেছেন। সংহিতা অনুসারে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা প্রতিপন্ন হয়। হিন্দু শাস্ত্রে **২০টি সংহিতা** গ্রন্থ আছে ; ইহা **ধর্মসংহিতা** নামেও বিদিত।

কল্প—শিক্ষা—ছন্দঃ—ব্যাকরণ—নিরুক্ত ও **জ্যোতিষ** এই ৬টি শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলা হয়। **কল্পসূত্রের** ৩টি ভাগ দেখা যায়। যথা—**শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম**। ধর্ম দু-ভাগে বিভক্ত—**শ্রৌত ও স্মার্ত**। যজ্ঞাদি বিষয়গুলি শৌত কর্মের অধীন ; গৃহকার্য সম্পন্ন করার জন্য স্মার্ত; ইহা চির স্থাপিত বা সময়ে সময়ে স্থাপিত হয়েছে। এই সময়ে সময়ে স্থাপিত সূত্রগুলি **গৃহ্য সূত্র** নামে বিদিত আছে।

পারমার্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কর্তব্য বিষয়ক সূত্রগুলিকে ধর্মসূত্র বলা হয়।

বৈদিকযুগে আর্যরা বেদ রচনা করেছেন বলে সবাই মান্য করে। আর্য কারা?

কর্তব্যম্ আচরণ কামম্, অকর্তবাম্ অনাচরণ্। তাই বলা হয়—"তিষ্ঠতিপ্রকৃতাচারে যঃ স আর্য।" ইতি স্মৃতঃ।

আচার কী? এই আচার কী—এই নিয়েই তো ২০টি সংহিতার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন ঋষিগণ তাঁরা নিজ নিজ ধ্যানধারণার প্রেক্ষিতে ওই সংহিতাগুলি রচনা করেছেন। ২০টি সংহিতার মধ্যে মনুসংহিতা সব চেয়ে নিরপেক্ষতা হেতু শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। মনুসংহিতা সর্বস্বীকৃত এবং পালনীয়।

বোঝা যায়, ধর্মের ইতিহাসে 'আর্য' শব্দটি নিয়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তা অন্যত্র আলোচনা করেছি। আলোচনার কারণ হল, ইউরোপীয়গণ দাবি করেন ঋগ্‌বেদ আর্যদের রচনা এবং আর্যরা বহিরাগত, সবাই এরা ইউরোপীয়। সেই সকল দাবিকে নস্যাৎ করে আমাদের মতো করেই ধর্ম আলোচনায় ব্রতী হলাম। দেখা যায়, আর্য সংস্কৃতি কেবল ঋগ্‌বেদ ও অথর্ব বেদ সাপেক্ষে এবং সম্ভাব্য পরিণতি বুঝে সেই চিরন্তন ঐতিহ্যকে বেঁধেছেন। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ইহা সর্বৈব অনস্বীকার্য। শাস্ত্র-পুরাণ-স্মৃতি-শ্রুতি সেই চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রতীক বুঝতে হবে।

শাস্ত্রে বেদকে ত্রয়ী বলা হয়। ৪টি বেদকে ত্রয়ী বলার অর্থ তিনের সমষ্টি মাত্র। অথর্ববেদ হিসাবের বাইরে। কিন্তু অথর্ববেদের মন্ত্রগুলি কোনো উপাসনা যজ্ঞে ব্যবহার হয় না। তবে, ঐহিক কল্যাণে ও মারণ উচাটন দৈবী আধিদৈবী কার্যের নিমিত্ত ব্যবহার হত। অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদ খুবই জ্ঞানগর্ভ অধ্যায়।

বেদব্যাস, বেদ বিভাগ করেছিলেন। আচার্য শংকর কিংবা রামানুজ—এঁরা বেদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। ৪টি উপপাদ্যে ঐ ভাষ্য রচিত হলেও বেদকে শারীরিককরণের নিমিত্ত পঞ্চম উপপাদ্য রচনা করেন আচার্য শংকর। এগুলি মীমাংসা রূপে সর্বজনস্বীকৃত। ঋষি জৈমিনী পূর্ব মীমাংসা করেছেন—ইহা সর্বস্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে।

বেদের আরণ্যক (ইহা অরণ্যে পাঠ করা হত তাই) ও ব্রাহ্মণ মুখ্যতই কর্মকাণ্ড। এতে যজ্ঞাদির কর্মসমূহ প্রযুক্ত আছে। কর্মকাণ্ড জীবকে অভ্যুদয় অর্থাৎ স্বর্গাদি অলৌকিক ফল ধনরত্নাদি লৌকিক ফলের অধিকারী করে। জ্ঞানকাণ্ড চিত্তশুদ্ধিক্রমে মুক্তির ভাগী করে। বেদের ব্রহ্মপাদক বিষয়সমূহ নিয়ে রচিত হয় উপনিষদসমূহ।

রাজা রামমোহন রায় ৬টি উপনিষদ ভাষ্য রচনা করে গেছেন।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, আচার্য শংকর ব্রহ্মোৎপাদনের নিমিত্ত বাড়তি পঞ্চম উপপাদ্য রচনা করেছিলেন। কারণ? সাংখ্যের পদার্থনিচয় চতুর্ধা বিভক্ত। যথা—মূলপ্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, কেবল-বিকৃতি ও অনভয়রূপ।

আবার অবান্তর বিভাগও আছে। কপিল দেখিয়েছেন—স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য মহতত্ত্ব। অহংকারত্ব ও পাঁচ তন্মাত্র এই ৭টি প্রকৃতি বটে; বিকৃতিও বটে। মহতত্ত্ব মূল প্রকৃতির বিকার ও অহংতত্ত্বের প্রকৃতি।

অহংতত্ত্ব মহতত্ত্বের বিকৃতি ও তন্মাত্র পঞ্চকের বিকৃতি। একাদশ ইন্দ্রিয়, পাঁচ স্থূলভূত

পৃথিব্যাদি পঞ্চম অহংতত্ত্বের বিকার। এইরূপে মহামুনি কপিল তাঁর সাংখ্যদর্শনে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে ব্রহ্মের প্রতিপাদ্য স্পষ্ট হয় না।

আবার কপিল-মতকে অস্বীকারও করা যায় না—যেহেতু কপিলভাষ্য অতি প্রাচীন। ন্যায় ও বৈশেষিক বলেছে—পরমাণু জগৎকারণ। অন্যান্য দর্শনে অন্যান্য কারণের কথা থাকলেও ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা অন্য দর্শনে বর্ণিত হয়নি। সেই সকল মত জাগরূক থাকতে ব্রহ্মকারণ আত্মলাভ বা স্থিতিলাভ করতে পারে না। এসব কারণে আচার্য শংকর পঞ্চমাদি সূত্র প্রণয়ন করে ব্রহ্মের স্থিতি নির্ণয় করেছেন। সেই সিদ্ধান্তই কালজয়ী মতবাদ রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মতবাদ অভ্রান্ত অবিনশ্বর। এই কারণে তিনি জগৎগুরু।

প্রত্যেকটি বেদের কয়েকটি করে উপনিষদ আছে। মনে রাখতে হবে উপনিষদ হল বেদের সারাংশ।

সেইমতো কয়েকটি উপনিষদ কোন্ বেদের অন্তর্গত তা দেখুন—

১। ঈশোপনিষদ = শুক্লযজুর্বেদীয়
২। কেনোপনিষদ = সামবেদীয়
৩। কঠোপনিষদ = কৃষ্ণযজুর্বেদীয়
৪। প্রশ্নোপনিষদ = অথর্ব ,,
৫। মুণ্ডকোপনিষদ = ,,
৬। মাণ্ডুক্যোপনিষদ = ,,
৭। তৈত্তিরীয়োপনিষদ = কৃষ্ণ যজর্বেদীয়
৮। ঐতারেয়োপনিষদ = ঋগ্‌বেদীয়
৯। ছান্দোগ্য উপনিষদ = সামবেদীয়
১০। কৌষিতকী উপনিষদ = ঋগ্‌বেদীয়
১১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ = শুক্লযজুর্বেদীয়
১২। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ = কৃষ্ণ যজুর্বেদীয়

প্রকাশ থাকে যে, অথর্ববেদের ১২টি উপনিষদ আছে। এবং অন্যান্য আরো ২০০টি উপনিষদ আছে। এদের অনেকগুলিতে সাম্প্রদায়িকতা পূর্ণ রহস্য দেখা যায়। উপনিষদের আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব এতেই দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপত্তি লাভ ঘটেছে। দর্শনের প্রতিপাদ্য হল—জীবাত্মা শরীরী, পরমাত্মা ঈশ্বর। ঈশ্বর অশরীরী। সর্বদর্শন সংগ্রহকার মাধবাচার্য মহাশয় ইহা স্বীকার করে নিয়েছেন। অতএব সর্বতো বলবত আছে ঐ মতই।

এই ভিন্নতা সম্পর্কে শিবস্তোত্রে আছে—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পাশুপতিমতম্ বৈষ্ণবামিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গমস্ত্বমসি পয়মার্ণব ইব।।

অর্থ ঃ

বেদ সাংখ্য যোগ পাশুপতশাস্ত্র বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রচারিত আছে। ঐ সকল পথের পথিকরা

মনে করেন, আমরা যে পথের পথিক সেই পথই সঠিক বা ভালো। মানুষের রুচির বিভিন্নতার কারণে এইরূপ ঘটেছে। কিন্তু গম্য "তুমি"। অর্থাৎ যে যে পথেই যাক—লক্ষ্য সেই তুমি, তোমাকে সকলের লক্ষ্য। সেই পরব্রহ্মে সকলের স্থিতি কাম্য। তুমিই সত্য। তুমিই সুন্দর। তুমিই শিব।

দর্শন ও দর্শনকারগণ

গৌতম — ন্যায় = গৌতম
কপিল — সাংখ্য = কাপিল
কণাদ — বৈশেষিক = ঔলুক্য
পাতঞ্জল — যোগ = পতঞ্জলি
জৈমিনী — মীমাংসা = জৈমিনী
ব্যাস — বেদান্ত = ব্যাস

ব্যাস কর্তৃক বেদের রচিত ভাষ্য বেদান্ত নামে পরিচিত আছে।

সকল দর্শনের মূল লক্ষ্যই মোক্ষ লাভ করা। মোক্ষ কী? মোক্ষ আত্যন্তিক সুখই হল মোক্ষ। এখানে দুঃখের কণামাত্রের স্থান নেই। দর্শনকার সকলেই অতি মাত্রায় আত্মজিজ্ঞাসু ছিলেন। স্বকৃত কর্মের প্রতি অনিবার্য শক্তির প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের জন্যই এতগুলি দর্শন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলা যায়।

এবার মীমাংসা দর্শন নিয়ে কিছু আলোচনা দরকার। কারণ শবর স্বামী নামে এক ঋষিকে মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার বলা হয়। এ সম্পর্কে বলা হয় উপবর্ষ মুনি পূর্বে বৃত্তিকার শবর স্বামী ছিলেন। ইনি শকাব্দ প্রারম্ভের পূর্বের লোক যেহেতু মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতির **'পুরুষপরীক্ষা'** নামক গ্রন্থে এঁর পূর্ণ পরিচয় আছে। আচার্য শংকর ইহা স্বীকার করেছেন এবং জৈমিনী যে পূর্ব মীমাংসক তাহার বিরোধ নেই বোঝা গেল।

বৈশেষিক দর্শনকে অনেকে ঔলক্য দর্শন বলেন। সর্বদর্শন সংগ্রহকার মাধবাচার্যও তাই বলেন। এবং তিনি আরো বলেছেন, ঔলক্য ও কণাদ একই ব্যক্তি ছিলেন।

গৌতম একেশ্বরবাদী ছিলেন না। গৌতম-সূত্রে ঈশ্বর প্রাপ্তি কিছুই নেই। জগৎ যে আকস্মিক নহে, অকারণোৎপন্ন নহে।

স্বয়ং জাত তিনি দেখিয়েছেন।

কণাদ অনুমান করেন, প্রত্যেক শ্রেণীর পরমাণুতে বা পরমাণুরূপ আশ্রয়ে এমন এক পদার্থ আছে যা থেকে বায়বীয় জলীয় পার্থিব অর্থাৎ পরমাণুষ্ট প্রভেদ-বিশেষ। পদার্থ ব্যতীত অন্য কোনো কারণ হতেই পারে না। কণাদ বলে, মোক্ষ বিবেক হল জ্ঞানের অধীন। বিবেক-জ্ঞানের বিষয়—পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতি দুই পদার্থের তত্ত্ব বা স্বরূপ সাক্ষাৎকার হলে জীবের প্রাকৃতিক বন্ধন থাকে না। সাংখ্যেয় পদার্থনিচয় চতুর্ধা—তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কপিল দেখিয়েছেন যে, তা স্বতঃসিদ্ধ ও নিত্য।

ধর্মের লক্ষণ ও প্রমাণাদি নিরূপণেই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে শবরস্বামী ও জৈমিনীমীমাংসাই স্বীকার্য।

'মোক্ষ' কথাটি জীব-স্বভাবসুলভ। সুখ হোক দুঃখ হোক কেউ চাই না। **এই যে আত্যন্তিক সুখস্পৃহা তারই পরাকাষ্ঠা মোক্ষ**। সকলের উদ্দেশ্য দুঃখ নিবারণ করা।

মোক্ষ ও মোক্ষের উপায় স্থির করে সাংসারিক ব্যবহারিক বিষয় বিভাগের বিচার প্রণালী প্রচলিত আছে।

গৌতম, কণাদ, কপিল ও পতঞ্জলি এঁরা দুঃখের প্রতি বড় বিদ্বেষী ছিলেন। অতএব তাঁদের দর্শনে আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তিই মোক্ষ।

জৈমিনী ও ব্যাসকে শিষ্য ও গুরু বলা হয়। এঁরা ছিলেন সুখবাদী। এঁদের সুখের প্রতি ছিল অত্যন্ত মোহ। তাঁদের দর্শনে তত্ত্ব অপেক্ষা মোক্ষই অধিক প্রতিপাদ্য হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ। অতএব যত বিরোধ পদার্থে—মূলে নহে। মূল অর্থাৎ "জ্ঞান"। বেদান্ত দর্শন, ব্যাস প্রণীত। আচার্য মাধব একে সর্বদর্শন চূড়ামণি বলে আখ্যা দেন।

আচার্য শংকর, রামানুজ ভাষ্যকারগণ এই বেদান্তদর্শনের সূত্রসংখ্যা ৫৫৭টি দ্বারা জীবের পাপপূর্ণ্য তার ফলাফল বিচার করেছেন। জন্ম, মৃত্যু, ব্রহ্ম—**জগৎকারণ স্থিতি, লয় ও তার কারণ বলেছেন।**

জগৎ কারণ ব্রহ্ম হলেন ঐ বেদ চতুষ্টয়।

যোনি উৎপত্তি স্থান বা জানবার উপায়। স্থিতি ও প্রলয় কারণব্রহ্ম ঃ ইহা শাস্ত্রগম্য কিনা? এই সমস্তই বেদান্তের বিষয়। এবং আচার্য শংকর ও রামানুজ সবিশেষ বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

বেদ অবলম্বন করে বিভিন্ন ঋষিগণ তাঁরা নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে সংহিতা রচনা করেছেন। এই সংহিতা অনুসারে সমাজব্যবস্থা প্রতিপন্ন হত। হিন্দুশাস্ত্রে ২০টি সংহিতা দেখা যায়। এসব ধর্মসংহিতা নামেও পরিচিত।

স্মৃতিকারদের নামগুলি যথা—১। ব্যাস, ২। দক্ষ, ৩। পরাশর, ৪। যাজ্ঞবল্ক্য, ৫। বিষ্ণু, ৬। মনু, ৭। অত্রি, ৮। হারীত, ৯। উশনা, ১০। অঙ্গিরা, ১১। যম, ১২। সম্বর্ত, ১৩। কাত্যাযন, ১৪। বৃহস্পতি, ১৫। লিখিত, ১৬। শতাতপ, ১৭। গৌতম, ১৮। বশিষ্ঠ, ১৯। আপস্তম্ভ ও ২০। সাংখ্য।

প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলি—বশিষ্ঠ, গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব লিখেছেন। প্রাচীনকালে এক একটি বেদের শাখার এক একখানি ধর্মসূত্র ছিল। সমগ্র আর্যজাতির ব্যবহারোপযোগী কোনো একখানি ধর্মসূত্র ছিল না। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ক্রমশ জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় হানি ঘটতে থাকায়, আধুনিক ধর্মসংহিতাগুলি গৃহীত হয় বলে শাস্ত্রকারগণ একমত হলেন। বৈদিক শাখার সাথে প্রায় এদের সম্বন্ধ নেই। এগুলি সকল আর্যজাতির জন্য লিখিত বলে মন্তব্য করেছেন। তবে গৌতম ধর্মসূত্র সামবেদীয়দের জন্য। বশিষ্ঠ ঋগ্‌বেদীয়দের জন্য। কিন্তু মনুসংহিতা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। এই সংহিতা সকল আর্য জাতি দ্বারা গৃহীত বলে শাস্ত্রকারগণ একমত, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসংহিতাগুলির মধ্যে বেশ লক্ষণীয় বিভেদ দেখা যায়, যেমন—

প্রাচীন ধর্মসংহিতাগুলিতে বৈদিক ঋষিগণ আকাশ, সূর্য, ইন্দ্র, বৃত্র, বজ্র, বর্ষণ, গাভী এসব নাম উচ্চারণ করে যজ্ঞকার্য সম্পাদন করতেন।

মনুসংহিতায় তাই দেবতারূপের বা গুণের কোনো বর্ণনা নেই ; কোনো পূজা-অর্চনার কথা বলা হয়নি। আধুনিক সংহিতাগুলিতে পৌরাণিক ত্রিমূর্তি পূজাবিধির বিস্তার এবং আচার-ব্যবহার ধর্মানুষ্ঠানের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রচলন হয়েছে ধর্মশাস্ত্রের।

যে সকল আচার-বিচার-বিধি অবলম্বন দ্বারা মানুষের যথার্থ পরিচয় বহন করে সেরূপ পুস্তককেই ধর্মপুস্তক বা ধর্মশাস্ত্র বলা হয়। কার্যত, স্মৃতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রগুলিকে একই গ্রন্থের দ্যোতক বলা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ 'সংহিতা' নামে পরিচিত। **২০টি সংহিতার মধ্যে মনুসংহিতা সর্বজনগ্রাহ্য বলা হয়।** মনুর নাম হতে 'মানব' শব্দের উৎপত্তি। মনুর উপদেশ মানবতার উপদেশ বলা হয়। মনুসংহিতায় সকল জাতের কথাই বলা হয়েছে।

হিন্দুধর্মের তথা আর্যধর্মের স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে যে মূল্যবোধ তা স্বাগত ; সেজন্য পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই ঋষিগণ এরূপ প্রয়াস নিয়েছিলেন বোঝা যায়। আবার এও দেখা যায়, রাজশক্তি কুমতিসম্পন্ন সমাজপতিগণ, প্রতিপত্তির কারণে সমাজের আচার-কানুন পরিবর্তন পরিবর্ধন করে অনেক স্বেচ্ছাচারিতা ও শাসন-শোষণ করেছেন। যাইহোক এখন ধর্মসূত্র গৃহ্যসূত্রাদি নিয়ে কিছু বলছি শুনুন।

আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রম্। প্রথম অধ্যায় প্রথম কাণ্ডকা হতে—নিবীতী। যজ্ঞোপবীতি ও প্রাচীনবীতী। যজ্ঞকার্যে যজ্ঞোপবীতী ধারণ করবে। বামস্কন্ধ হতে ডান পার্শ্বদেশ পর্যন্ত ; অন্য সময় মালার ন্যায় গলায় ধারণ করবে ইহাই নিবীতী। পিতৃকার্যে প্রাচীন বীতী হতে হয়। তখন দক্ষিণ স্কন্ধ হতে বামপার্শ্বদেশ পর্যন্ত যজ্ঞোপবীতী ধারণ করবে। আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্র দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত আছে।

গোভিল গৃহসূত্রমে আছে বিবাহ, জাতকর্ম নিষ্ক্রমণ, অবুৎসর্জন, মূর্ধঘ্রাণ, পৌষ্টিকর্ম বা জন্মতিথিকৃত্য, চূড়াকরণ, উপনয়ন, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে আছে। প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞ অবশ্য সম্পাদন করবে। যেমন—দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম. ভূতযজ্ঞ এইরূপ।

অশ্বলায়নে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। পিতাদির শবদেহেব সৎকারাধিকারী পুত্রাদি নিজ পুরোহিতকে আদেশ করবে আহ্বানীয়াদি সকল অগ্নি এক কালে প্রজ্বলিত করো মৃতদেহকে প্রথম যদি আহ্বানীয় অগ্নি স্পর্শ করে তাহলে জানবে যে, তার কর্মফল, তাকে স্বর্গলাভ করাল ; তিনি সেই স্থানে সমৃদ্ধ হবেন। ইহজগতে পুত্রাদি ও সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, যদি মৃতদেহকে প্রথমে দক্ষিণ অংশে স্পর্শ করে (অগ্নি) তাহলে জানবে মৃতব্যক্তির কর্মফল তাকে মনুষ্যলোক করাবে। সেই স্থানে তিনি সমৃদ্ধ হবেন। সকল অগ্নি এককালে যদি মৃতদেহ স্পর্শ করে তিনি পরম সমৃদ্ধি লাভ করেন। দেহ যখন দগ্ধ হচ্ছে, সেই সময় সৎকার করা এইরূপ মন্ত্র মনে মনে পাঠ করবেন—

"প্রেহি প্রেহি পথিভি ঋগ্বেদ ১০/১০/৭ দ্রষ্টব্য বাংলা। পূর্বপুরুষ যে পথে গমন করেছেন তুমিও সেই পথে যাও, গমন করো।

এইরূপ অনুষ্ঠানাবৎ ক্রিয়া দ্বারা মৃতদেহ সৎকার হলে, মৃত ব্যক্তির আত্মা ধূমের সঙ্গে স্বর্গলোক গমন করেন। এইরূপ বিধান দেখা যায়। বৌধায়নের শ্রৌত সূত্রের ঊনবিংশ প্রশ্নে সমাপ্ত এবং তাঁর গৃহ্যসূত্র চারি প্রশ্নে সম্পূর্ণ। তাঁর ধর্মসূত্রও চারটি প্রশ্নে সম্পূর্ণ দেখা যায়। আপস্তম্ব কল্পসূত্র ৩০০ প্রশ্নযুক্ত। ২৪টি শ্রৌতসূত্র ৫০টি পরিভাষা, ২৭টি গৃহ্যসূত্র। ১৯টি ধর্মসূত্র আছে। এইভাবে দেখা যায়—সাংখ্য, গৌতম, কাত্যায়ন—পরিষ্কার এঁদের স্ব-স্ব রচিত গৃহ্য, ধর্ম, শ্রৌত ও সূত্রাদি আছে।

ঋগ্‌বেদীয় কল্পসূত্রসমূহের মধ্যে আমরা বশিষ্ঠে ধর্মসূত্রের যে পরিচয় পাই তা বেশ উল্লেখযোগ্য।

সামবেদীয় কৌথুকী শাখার প্রসিদ্ধ হল গোভিল গৃহ্যসূত্র। সামবেদীয় গৌতমীয় ধর্মসূত্র বিখ্যাত বটে ; গৌতম আট প্রকার বিবাহের কথা বলেছেন—ব্রাহ্ম—আর্য—দৈব—গান্ধব—রাক্ষস—পৈশাচ—প্রাজাপাত্য—ও অসুর। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ—দৈব—আর্য প্রাজাপত্য উৎকৃষ্ট বলে অভিমত আছে। দেখা যায় যে, বেদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এর সকলগুলি যে সকলের জন্য প্রচলিত ছিল তা বলা যাবে না। তবে আজও কোনো কোনো প্রদেশে কিছু প্রচলিত আছে। কৃষ্ণা, গোদাবরী তীরস্থ অধিবাসীবৃন্দ ও অন্ধ্রপ্রদেশে আশ্বলায়নী শাখা, আপস্তম্বী শাখা, হিরণ্যকেশী শাখার প্রচলন আছে। ভিন্ন প্রদেশের অনুষ্ঠান বিধানে সেইজন্য ভিন্নতা বিদ্যমান। তারা ঐসব অঞ্চলে বা অন্যত্র অন্য ঋষিদের বেদানুসারী অনুশাসন যে মান্য করতেন সেটিই বড়ো কথা। এই হেতু উদ্ধৃতিগুলি দর্শালাম মাত্র। অতএব কল্পসূত্রের যে ৩টি ভাগ তা কমবেশি সকলের কাছে গ্রহণীয় ছিল এবং আছে। একে বেদানুসারী ধর্ম বলা হয়। সাক্ষাৎ শ্রুতিতে বিহিত যজ্ঞাদি বিষয়সমূহ গৃহস্থের সম্পাদনীয় যজ্ঞগুলি, নিত্যকর্ম অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় যা উহা শ্রৌতযজ্ঞ অপেক্ষাও প্রধান বলা হয়। সেইজন্য একে **পাকযজ্ঞ** বলে। পাকযজ্ঞ মানে? যা অবশ্য পালনীয়। এই পাকযজ্ঞগুলি যাযাবৎ বা রূপান্তরিত মতে এখনও হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

সূত্রকারগণ সপ্তপ্রকার গৃহ্য বা পাকযজ্ঞের নির্দেশ দিয়েছেন, যথা—পিতৃগণের শ্রাদ্ধ, পূর্ণিমায় ও অমাবস্যায় সম্পাদনীয় পার্বণ। মাংস দ্বারা আগে অষ্টকা শ্রাদ্ধ সম্পাদিত হত, এখন হয় না। কোথাও শুনি নামমাত্র অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আশ্বিন মাসের পার্বণ—আশ্বজয়ী যজ্ঞ, এটা মনে হয় আমাদের কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হবে। অগ্রহায়ণ মাসে একটি যজ্ঞ এখনকার নবান্ন উৎসব হতে পারে।

চৈত্রমাসে একটি যজ্ঞের কথা বলা আছে। ধরুন আমাদের চৈত্রসংক্রান্তি।

আরো ৭টি অনুষ্ঠান ছিল। যা এখন অচল। সেগুলি এইরূপ দেখুন—সৌত্রামণী, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথা, ষোড়শী, বাজপেয়ী, আপ্তোর্থাম, এই ৭টি সোমরস প্রধান বলে বাদ হয়ে গেছে।

অতএব তখনকার দিনে ১৪টি শ্রৌত যজ্ঞ, ৭টি পাকযজ্ঞ আর ৫টি মহাযজ্ঞ উদ্‌যাপন করার নিয়ম ছিল।

বলতে গেলে সমূহ নিয়ম এইরূপ দাঁড়ায়—১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন অর্থাৎ পুত্রজনন

অনুষ্ঠান, ৩। সীমন্তোন্নয়ন অর্থাৎ গর্ভবতীর কেশবিন্যাসকরণ, ৪। জাতকর্ম বা সন্তান হলে আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান, ৫। নামকরণ, ৬। অন্নপ্রাশন, ৭। চূড়াকরণ, ৮। উপনয়ন।

৯/১২ উপনয়ন হতে বেদাধ্যয়ন পর্যন্ত কাজ মহানাম্নীব্রত মহাব্রত—উপনিষদব্রত প্রভৃতিতে সমাপ্ত।

১৩। **সমাবর্তন**। সমাবর্তন সমাপ্ত হলে বিবাহ করে সংসারী হওয়া অথবা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন—খুশিমতো যে-কোনো পথ ধরতে হবে। ১৪ প্রকার শ্রৌতযজ্ঞ। ৭ প্রকার পাকযজ্ঞ ৫ প্রকার মহাযজ্ঞ ষোলো প্রকার সংস্কারযজ্ঞ একুনে মোট ৪২ প্রকার অবশ্য পালনীয় কর্মযজ্ঞ। অবশ্য ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে এগুলি অপরিহার্য ছিলই। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম—ছিলই-ছিল। মনু সংহিতা সকল জাতপাতের ঊর্ধ্বে বলেছি। মনুসংহিতা ২। ১৭।১৮ দ্রষ্টব্য।

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর অর্থাৎ প্রশস্ত নদীর মধ্যবর্তী যে দেবনির্মিত দেশ অর্থাৎ প্রশস্ত দেশ তাকে ব্রহ্মাবর্ত বলে। এই ব্রহ্মাবর্তে চার বর্ণের ও সংকর জাতির পুরুষ পরম্পরা ক্রমে যে আচার প্রচলিত আছে তাই সদাচার বলে প্রসিদ্ধ। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরাকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে। উহা ব্রহ্মাবর্ত হতে কিছু হীন। পৃথিবীতে যাবতীয় লোক এই সমুদয় দেশদ্রুত ব্রাহ্মণদিগের নিকট হতে স্বীয় স্বীয় আচার শিক্ষা করবেন। মনুসংহিতা ২।১৯।২০।২।২৬।২৭।২৮ দ্রষ্টব্য শ্রৌতযজ্ঞ পাকযজ্ঞগুলি বলা হয়েছে। দ্বিজাতিদিগের বেদোক্ত পবিত্র মন্ত্রপূত কর্ম দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সমুদয় কার্য পবিত্রতাবদ্ধক গর্ভধানাদি শারীরিক সংস্কার করবে। গর্ভাধান জাতকর্মা অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন কর্ম দ্বারা দ্বিজগণের পৈতৃক বীজদোষ ও গর্ভবাস জন্য পাপ ক্ষালিত করবে। সকল মনুষ্য বেদাধ্যয়ন মদ্য মাংসাদি বর্জন, হোমকার্য সম্পাদন ও ত্রৈবিদ্য নামক বিশেষ ব্রত পালন করবে। দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ দান পবিত্র পালিত কর্ম করবেন। পুত্রোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞাদি, পঞ্চমহাযজ্ঞ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য করবেন। এই নিয়ম তখন ছিল। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি—চতুরাশ্রম গৃহস্থ হতে ভিন্ন ভিন্ন উক্ত চার আশ্রমিককে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। মাধুকরী দ্বারা আশ্রমিকগণ জীবন যাপন করেন। তাছাড়া পশুপাখি জীবজন্তু সকলেই ঐ গৃহস্থের মুখপানে তাকিয়ে থাকে। তাই গৃহস্থশ্রেণী সকলেরই শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য সংসারধর্মকে সকলের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় সাংসারিক নিত্যকর্মাদি বিধান যেমন আছে, আছে সামাজিক দায়বদ্ধতার বিধান, ব্যবসায়িক নিয়মকানুন আছে। ঋত্বিক, কৃষিজীবী ও শিল্পকর্মোপজীবীদিগের নিয়ম প্রকটিত আছে। মুনিঋষিগণ সৃষ্ট সমাজের মঙ্গলের জন্য একাধারে গুরুর আসন দেবতার আসন গ্রহণ করেছেন মানা যায়।

বেদান্তসার

মঙ্গলাচরণ এরূপ—

সর্বব্যাপী নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আনন্দময় এবং বাক্য-মনের গোচর অথচ জগতের আধার সেই পরমাত্মাকে (ব্রহ্মকে) আমি অভিশাপ করি ; সিদ্ধির নিমিত্ত আশ্রয় করি।

প্রতিজ্ঞা

আমি জীবব্রহ্ম। আমার অতিরিক্ত ইত্যাকার ভেদজ্ঞান বিদুরিত হওয়াতে যার অদ্বয়ানন্দ নাম হয়েছে সার্থক ; সেই অদ্বয়ানন্দ গুরুকে সেবা করে আমি যথাবুদ্ধি বেদান্তসার অর্থাৎ মুখ্য সিদ্ধান্ত বর্ণনা করতে চাই। .

বেদান্ত কী?

প্রত্যেক বেদের অন্তে অর্থাৎ শেষ ভাগে যে ব্রহ্মাত্ম প্রতিপাদক বাক্যরাশি আছে তার নাম "উপনিষদ"। সেই উপনিষদ-ভাগই বেদান্ত। এবং তার উপকারী বলে শারীরিক সূত্র ও অন্যান্য গ্রন্থও বেদান্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে। যে বিদ্যা অনুশীলন করলে দুঃখ, জন্ম, মৃত্যুর মূলীভূত অজ্ঞান নাশ হয় ; সেই ব্রহ্মবিদ্যা হল উপনিষদ।

ব্রহ্মজ্ঞান কী?

বেদান্তের যে "অনুবন্ধ" "জীবব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব" বোঝায়।

অনুবন্ধ কী?

অধিকারী বিষয় সম্বন্ধও প্রযোজন। এই চার প্রকার অনুবন্ধ বা নিমিত্ত শাস্ত্রমতে দেখা যায়। অধিকারী বিষয় ও সম্বন্ধ থাকলে হবে না। প্রয়োজন থাকা চাই।

প্রয়োজন কী?

আত্মা হতে অপৃথক ব্রহ্মচৈতন্য যে অজ্ঞান সম্বন্ধ থাকে জীব আপনার কী দুঃখ তা জানে না। সেই কারণে ব্রহ্মভাবও জানে না। আপনাকে সে সুখদুঃখের মরণশীল জীব বলেই জানে ; সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও আপনার আনন্দময়ত্ব অনুভব ; এই দুই প্রকার হল প্রয়োজন।

মুক্তির উপায় কী?

শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান অর্থাৎ আত্মাতে চিত্তের একতানতাকরণ আর শ্রদ্ধা।

কর্ম কী?

কর্ম হল—কাম্যকর্ম, নিত্যকর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম।

নিত্যকর্ম কখনও ত্যাগ কবা যায না। আমবা যেমন খাওযা ত্যাগ কবতে পাবি না তেমনি নিত্যকর্মও ত্যাগ কবা যায না।

কাম্যকর্ম—যা মনের উচ্চকাঙ্ক্ষাজাত কর্ম তাই কাম্যকর্ম। কোনো বড়ো উৎসব অনুষ্ঠান আরম্ভ করা কাম্যকর্মের অধীন।

নিষিদ্ধ কর্ম কী?

যা শাস্ত্রসম্মত নয় সেই কাজই নিষিদ্ধ কর্ম, মানে অনাচার।

নৈমিত্তিক কর্ম কী বা কেমন?

বিবাহের উদ্দেশ্য পুত্র উৎপাদন। ইহা নৈমিত্তিক কর্মমাত্র।

ভ্রম কী?

শাস্ত্রে আরোপ ও অধ্যারোপ তুল্যার্থ। অধ্যারোপ হল ভ্রম।

ভাব ও অভাব। বস্তু ও অবস্তু এ দুইয়ের বহির্ভূত হল অজ্ঞান। ক্লীব যেমন, স্ত্রী-পুরুষ বহির্ভূত তেমনিই শাস্ত্রে চৈতন্যকে জ্ঞান বলে।

কেউ কেউ জ্ঞানকে আত্মার গুণ বলেন।

সকল লোক আমি অজ্ঞ, আমি জানি না, আমি কে ইত্যাদি বলে থাকেন। অজ্ঞানকে অনির্বচনীয় যৎকিঞ্চিৎ পদার্থ বিশেষ।

শাস্ত্রকারগণ এইরূপই বলেন।

সূক্ষ্ম শরীরকে সপ্তদশ অবয়ব বলা হয়।

সূক্ষ্মরূপ শরীরি "শিবলিঙ্গ পূজা" এই মরমীয় শাস্ত্রীয় বিচার ভালো লাগবে দেখুন।

৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্মেন্দ্রিয়, ৫ বায়ু, বুদ্ধি ও মন এই ১৭ উপেত-জাত মানব শরীর। লিঙ্গ প্রতীক রূপ।

পঞ্চবায়ু কী?

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। এই পঞ্চবায়ু।

প্রাণ অর্থাৎ অগ্রনিঃসরণ স্বভাব—নাসাগ্রবায়ু অপান—অধোগমনশীল বায়ু। ব্যান—ইহা নাড়িসঞ্চারী বায়ু যা সমগ্র শরীরব্যাপী চলাচল হয়। এই বায়ু দ্বারা সর্বাঙ্গতে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে। উদান বায়ু এই বায়ু উর্ধ্বগতিশীল, কণ্ঠস্থ বায়ুও বলা হয়।

স্থূলভূত কী? চতুর্বিধ স্থূল শরীর ও আত্মা সম্পর্কে বেদান্তে ব্যাখ্যা আছে।

আত্মা কী?

চার্বাক প্রভৃতি যুক্তিবাদীগণ বলেন, পুত্রই মানুষের বহিশ্চর আত্মা। আপন আত্মা যেমন প্রীতির আধার, পুত্রও তেমনি। পুত্র ভালো থাকলে আমি ভালো থাকি। পুত্র মন্দ হলে আমি ক্লেশ অনুভব করি। কেউ কেউ বলেন, গৃহে আগুন লাগলে পুত্র পরিত্যাগ করেও আপনাকে রক্ষা করা হয়। দেহ স্থূল বা কৃশ হলে, আমিও স্থূল বা কৃশ হয়ে যায়। অতএব শরীরই আত্মা।

অপরপক্ষ শ্রুতি বলেন, ইন্দ্রিয়ের অভাব হলে শরীর নিস্পন্দন বিধ্বস্ত হয়ে যায়। চক্ষুর অভাবে কানা, শ্রবণের অভাবে বধির এইরূপ বৈক্লব্য ঘটে জীবন মূল্যহীন হয়ে যায়। অতএব ইন্দ্রিয় আত্মা।

অন্য মতে—ইন্দ্রিয় আত্মা নয়, প্রাণই আত্মা। প্রাণ না থাকলে সকল ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। প্রাণ থাকতে আমি ক্ষুধার্ত, আমি তৃষ্ণার্ত এইরূপ প্রাণধর্ম অনুভব হয়। ইহা যথার্থ কি না?

অন্য যুক্তিবাদীগণ বলেন, মনের লয় হলে প্রাণের অভাব হয়। আমি কল্পনা করি, মনে করি, অনুভব হয় না। সুতরাং মন-ই আত্মা। প্রাণ আত্মা নহে। অন্তরাত্মা ইন্দ্রিয়াদি হতে ভিন্ন। ইনি মনস্বরূপ বলে, শ্রুতি প্রমাণ আছে এইরূপ বলেন। কেউ বলেন, মন আত্মা নহে। বিজ্ঞানই আত্মা। যুক্তি হল, মন ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কারণ। কর্তা না থাকলে কে করণ? প্রয়োগ করায় কে? সেক্ষেত্রে মনই করণ। তাকে সেই প্রেরণ করতে পারে। তাই বিজ্ঞানরূপ বলা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা মন পরিচালিত—তাই বুদ্ধিই আত্মা। আবার অজ্ঞানই আত্মা বলে ব্যাখ্যা দেখা যায়। সুষুপ্তিকালে যখন বুদ্ধি থাকে না, বুদ্ধিজ্ঞানের লোপ হয়, তখন তো আমি অজ্ঞ। সুতরাং অজ্ঞানই আত্মা।

ভট্ট নামক একজন মীমাংসক বলেন, অজ্ঞান ও চৈতন্য উভয়েই আত্মা। তিনি বলেন, সুষুপ্তিকালে অজ্ঞান সহ আত্মায় যদ্যোতিকার ন্যায়, চিৎ, উচিত উভয় রূপ প্রকাশ পায়।

এক বৌদ্ধ পণ্ডিত বলেন, আত্মা সর্বশূন্যরূপী। নামরূপাত্মক জগৎ পূর্বে অসৎ বা শূন্য ছিল। তাই শূন্যকে আত্মা বলা যায়।

এক্ষণে বেদান্ত অনুভব সিদ্ধ হল।

পুত্র-দেহ-মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-শূন্য কোনোটিই আত্মা নয়। আত্মা হল সৎ। বিশুদ্ধ চৈতন্য আত্মা সেই। সেই পদার্থের প্রকাশ নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্ত ও সৎস্বরূপ চৈতন্যই আত্মা। আর সব অনাত্মা।

বেদান্ত ৫৫-৫৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এরপর অন্য পর্যায় চলুন। বিশ্বমনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ শ্রীমদ্ভাগবতগীতা কী বলছে?

বহুদিন পূর্বে ইংরেজ মনীষী কার্লাইল, মার্কিন পণ্ডিত "এমারসন"-কে গীতা উপহার দেওয়া হয়েছিল। এতে গভীর প্রীতি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়েছিল ভারত সরকারের সঙ্গে আমেরিকার। ভারতীয় সংস্কৃতির মহাবৈভব অর্পিত হয়েছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে মেলবন্ধনের জন্য। বিশ্বের ৬৩টি ভাষায় গীতা গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে জানা যায়। বিশ্ব ইতিহাসে গীতা একখানি "গণসাহিত্য" বলে পরমাদৃত হয়েছে।

মনীষী রবীন্দ্রাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাকে বলেছেন ভারতের কুটিরে "বিনা তৈলের প্রদীপ"।

মহাত্মা গান্ধির মতে, "গীতা হচ্ছে শান্তির প্রতীক" এবং "শক্তিপ্রদায়িনী মাতা"।

অধ্যাত্ম সাধনায় গীতার স্থান সুবিদিত। দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে, মুক্তিসংগ্রামের বীরগণ গীতা থেকে অনুপ্রাণিত হতেন। আন্তর্জাতিক মৈত্রীস্থাপনের কথা তো আগে বলেছি। অহিংস আন্দোলনেও গীতার ভূমিকা একটা ইতিহাস হয়ে আছে মহাত্মা গান্ধির মাধ্যমে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বিনয়, বাদল—এঁরা সবাই মৃত্যু বরণ করেছেন গীতার বাণী স্মরণ করে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র সর্বদা গীতা স্মরণে রেখেছিলেন। এ হেন গীতা সম্বন্ধে আর নতুন করে বলার কী আছে?

> "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সত।
> উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত নয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।"

বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়—অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নেই। সদবস্তুর বিনাশ নেই। দেহ হল অসদ্‌বস্তু। আত্মা সদ্ বস্তু। যাঁরা তত্ত্বদর্শী তাঁরা উভয় বস্তুরই স্বরূপ দর্শন করেন।

এই হল আমার ধর্ম হিন্দুধর্মের সারকথা।

এই হিন্দুধর্ম অবগতির মূলকথা এই যে,

> "অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যসেক্ত শরীরিণঃ।
> অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মদে যুদ্ধস্য ভারত।"

গীতা ২।১৬।২।১৮ এখানে দুটি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "আত্মা যে দেহে অবস্থান করেন সেই দেহ নশ্বর। কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও নিত্য এবং স্বপ্রকাশিত। অতএব হে অর্জুন যুদ্ধ করো।"

মানব জীবন তো সংগ্রামময়। সংসার সেও সমরক্ষেত্র আবার সাধনমার্গ সেও সমর।

গীতায় "বিনাশায় দুষ্কৃতাম্" এই বাক্যটি বিপ্লবীদের কাছে মহাপ্রেরণার উৎস ছিল। বালগঙ্গাধর তিলক কারাগারে বসেই গীতাভাষ্য রচনা করে গেছেন। মহাবিপ্লবী ঋষি অরবিন্দ আলিপুর কারাগারে বসে গীতা প্রবক্তা বাসুদেব দর্শন করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে।

গীতার প্রথম অধ্যায় ৩৯ শ্লোকে বলা হয়েছে—

"কুলক্ষয়ে প্রণস্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভি ভবত্যুত।।

মনে আছে কি? গৌতম ৮ প্রকার বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ কী? জীবনের সমাজের এমনকি রাষ্ট্রেও ভালোমন্দ নির্ভর করে বিবাহ বন্ধনের উপর। হিন্দুর বিবাহকে শুভবিবাহ বলা হয়; কত আয়োজন করতে হয় কত দেখাদেখি হয়, বংশ-কুল-মর্যাদা ইত্যাদি।

পাকা দেখা, আশীর্বাদী, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, গুণীমানি, পুরোহিত সম্মুখে যজ্ঞ করে, দুটি জীবনের মিলন সূত্র বাঁধা হয়? যৌন সুখলালসার জন্য বা পুত্র কামনার জন্য মাত্র—তা নয়, সেই শাশ্বত কুলমর্যাদা সহ সুপ্রজনন বজায় রাখার জন্য তারই আহ্বান শুভবিবাহ।

সেই বিবাহ আছে কি? বিবাহে জাতপাত মান্য করা হয় কি? বর্তমান যুগের এই চুক্তির বিবাহতে কী হবে পরিণতি তা ভেবেছে কী কেউ কখনো।

ঐ যে বর্ণসংকর কথা বলা হয়েছে—এখানে সেই একই বর্ণসংকর হচ্ছে না কি?

অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও ভয়াবহ। এই বর্ণসংকর কারণেই পিতৃপুরুষের অধোগতি প্রথম বিপদ। দ্বিতীয়ত, কুল ও বংশের হানি হয়। এই বর্ণসংকর উৎপাদনের জন্যই পৃথিবীখ্যাত রোমসাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এবার গীতার কয়েকটি শ্লোকের বাংলা তর্জমা দিয়ে শেষ করব।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, রজোগুণ হতে সমুৎপন্ন অতীব অতৃপ্ত নিতান্ত উগ্রকাম ক্রোধকে যুক্তিপথের শত্রু বলে জানবে। অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন মালিন্য দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং গর্ভ যেমন জরায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, সেইরূপ কাম দ্বারা আত্মজ্ঞান সমাচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয় জয় না করলে যোগ-সাধন-ভজন বৃথা হয়ে যায়। যোগ দ্বারাই আত্মজ্ঞান সম্ভব। আত্মজ্ঞান হলে নিখিল বিশ্ব আনন্দময় ও ব্রহ্মময় হয়ে যায়।

সৃষ্টির পালন ও রক্ষার্থে ঈশ্বর নানারূপে নানা সময়ে ধরায় অবতীর্ণ হন ; এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজে নানা মহাপুরুষের আবির্ভাবকে আমরা সেই মতো মেনে নিয়েছি। গীতা ৪।৬ দ্রষ্টব্য গীতা সেই কথাই বলে—

"অজোঽপি সন্নব্যায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন,
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।

বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়—"আমি জন্মরহিত বিনাশহীন এবং সকল ভূতের ঈশ্বর হলেও স্বকীয় প্রকৃতিতে বশীভূত করে নিজ মায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করি।"

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষেণ মতো মে।।

১১।১৮ গীতা

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে বিমূঢ় হয়ে যেমন অর্জুন হতচেতন হয়ে পড়েছিলেন তেমন অতঃপর সম্বিত ফিরে এলে ভাবের জড়তাকণ্ঠে উপরোক্ত শ্লোকটি উচ্চারণ করেন।

শ্লোকটির বাংলা তর্জমা হল, তুমি অক্ষর, তুমি পরম জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, তুমি অব্যয় ও সনাতন ধর্মবৃক্ষবৎ, তুমিই সনাতন পুরুষ। ইহাই আমার মত।

বেদের কর্মকাণ্ড, উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড স্মৃতির সদাচার, দর্শনের তত্ত্ববিচার পুরাণের ইতিবৃত্ত, নীতির লোকতত্ত্বে যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ হয় তেমনি আত্মসচেতন করার গীতাকে একটি জনসাহিত্য ও মধুর কাব্য বলে আমার অভিজ্ঞান জন্মে।

পুরাণ কী?

পুরানোঽপি এবং পুরাণম্

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—

"কোন্ সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই সুর (স্বর)
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।"

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেন—

"A Leader should be the embodiment of the past, product of the present and prophet of the future".

ভারতের বৈদিক প্রজ্ঞায় লৌকিক রূপ হচ্ছে পুরাণ। প্রাচীন ভারতের লোকজীবন তথা গণজীবন-এর প্রতিচ্ছবি হল পুরাণ। ভৌগোলিক, আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় বহন করে পুরাণসমূহ। পুরাণগুলি অবলম্বনে ধর্ম, দর্শন, ও সাহিত্য যেন ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রবাহিত ; ইচ্ছা করলে অবগাহন করুন।

অপাব আনন্দ, অপার বিস্ময়!

শ্রবণ—মনন—নিধিধ্যাসন দ্বারা ইহার অতল তলে যদি পৌছে যান ; দেখবেন, আপনি যেন অন্য জগতের মানুষ। আমাদের ধর্মে ১৮টি মহাপুরাণ ১৮টি উপপুরাণ ও ১৮টি অতিরিক্ত পুরাণ আছে। একে একে তাদের নাম বলছি।

পুরাণগুলির নাম স্মরণে রাখার জন্য একটি আর্জি আছে। যেমন—

**"মদ্বয়ং ভদ্বয়ং চৈব ব্রত্রয়ং ব চতুষ্টয়ম্
অ না প লিং গ কূ স্কানি
পুরাণাণি পৃথক পৃথক।"
মৎস্য, মার্কণ্ডেয় ভাগবত ভবিষ্য
ব্রহ্ম ব্রহ্মবৈবর্ত ব্রহ্মাণ্ড**

বিষ্ণু বরাহ ব্রাহ্মণ বায়
অগ্নি নারদ পদ্ম লিঙ্গ
গরুড় কূর্ম স্কন্দ।

এই হল—১৮টি মহাপুরাণ।

এই পুরাণগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত আছে। যেমন—

ভাগবত—গরুড়—বরাহ—পদ্ম—সাত্তিক পুরাণ।

ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মবৈবর্ত = রাজস্

"মৎস্য, কৌর্মং লৈঙ্গম শৈব, স্কন্দং তথৈব চ!
অগ্নেয়ংশ্চ ষড়েতাণি তামসানিবোধিতমে।।

আর একপ্রকার ভাগ আছে, যথা—ব্রহ্মার ৬টি, বিষ্ণুর ৬টি, শিবের ৬টি এইরূপ ভাগ আছে।

ব্রহ্মার পুরাণগলি = ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, ভবিষ্য, ব্রহ্ম।

বিষ্ণুর পুরাণগুলি = বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ।

শিবের পুরাণগুলি = মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, বায়ু, স্কন্দ, অগ্নিপুরাণ।

উপ-পুরাণগুলি হল—ভাগবত, মহেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড, আদিত্য, পরাশর, সৌর, নান্দিকেশ্বর, শাম্ব, কালিকা, বরুণ, উশ-নস, মানব, কপিল, দৌবাসম শিবধর্ম, বৃহদ্নারদীয়, নরসিংহ, সনৎকুমার।

অতিরিক্ত পুরাণগুলির নাম এইরূপ—

বৃহদবিষ্ণু, শিব উত্তর খণ্ড, লঘু-বৃহদ্নারদীয় মার্কণ্ডেয়, বহ্নি, ভবিষ্যোত্তর, বরাহ, স্কন্দ, বামন, বৃহদ্বামন, বৃহনমৎস্য, স্বল্পমৎস্য, লঘুবৈবর্ত এবং ৫টি ভবিষ্যপুরাণ। ৫টি ভবিষ্যপুরাণ যথা—দৌবাসম, শিবধর্ম, বৃহদ্নারদীয়, নরসিংহ, সনৎকুমার ১৮টি অতিরিক্ত পুরাণ বলা হয়।

এখন ১৮টি মহাপুরাণ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই। এ থেকে কোন্ পুরাণের কি বক্তব্য তা সম্যক্ জ্ঞান হবে। পরবর্তীকালে পাঠক তাঁর রুচি অনুসারে তা সংগ্রহ করে বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন।

পুরাণ সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রে কীরূপ ধারণা আছে তা জানা দরকার।

অষ্টাদশ পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনস্বয়ং।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম।।

১৮টি পুরাণের মূল বক্তব্য হল, পর-উপকারে পুণ্য। পর-পীড়নে পাপ।

পদ্মপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ বলছে—

পুরাণাং সর্বশাস্ত্রানং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্

অথর্ব বেদে আছে—

ঋচঃ স্যাথানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।।
উদ্দিষ্টাজ জাউরে সর্ব দিবি
দেবাদিভিশ্চিতাঃ।।

অর্থাৎ বেদাদির সঙ্গে পরব্রহ্মাই পুরাণের সৃষ্টিকর্তা।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য চতুর্দশ বিদ্যার তালিকায় পুরাণকেই প্রথম স্থান দিয়েছেন।

পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা-ধর্মশাস্ত্রাদিমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্মস্য চ চতুর্দশ।

তাই যাঃ সাঃ ১।৪৫ দ্রঃ।

অগ্নিপুরাণে আছে—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে।

বিষ্ণু পুরাণে

উত্তরং যত সমুদ্রস্য হিমাদ্রি শ্চৈব দক্ষিণম্।
—বর্ষং ত্যভারতং নাম ভারতী তত্র সন্ততিঃ।।

ভাগবতে মেলে—সমাজতন্ত্রের জীবনচর্যা। যেমন—

যাবদ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং ধি
দেহিনাম। অধিকং যোহাভমন্যেত
স স্তনো দন্ডমর্হতি।।

অর্থাৎ উদর পূর্তির জন্য—জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম বস্তু ভোগ করতে হবে। অধিক ভোগ করলে সে হবে চোর এবং দণ্ডনীয়। ভারতীয় জীবনচর্যার অমর গ্রন্থ এই পুরাণ বা পুরাণগুলি সাদরে গঠিত হয়ে চলেছে। ধর্মের সাধনায়!

পুরা নবং ভবতি ইতি পুরাণ। প্রাচীন যাতে নবীন হয় তাই পুরাণ।

পুরা হনাক্তীতি পুরাণম্ = পুরাকালের ঘটনা যিনি বলেন তিনিই পুরাণ। যাঃ সং গাতিকা ১।৪৫ দ্রঃ।

পুরাণ সম্পর্কে এই ধারণা হয় যে, অতীতকে পাথেয় করে এগিয়ে চলাই শ্রেয়ঃ। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" ঐতিহ্য হারিয়ে ফেললে সে তো উচ্ছৃঙ্খলের নামান্তর। সুতরাং, একে একে আঠারোটি পুরাণের বিষয় এখন আলোচনা করা যাক।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

সপ্তম অধ্যায় ১।২।৩ বাংলা দেখুন—

শতমুখ নিঃসৃত প্রক্রিয়ার্থ নামক প্রথম পাদ শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া কাশ্যপপুত্রে সনাতন যথোচিত বাক্য দ্বারা সম্বোধন করিয়া শেষ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কল্পজ্ঞ, যেহেতু আপনি এ বিষয়ে বিশেষ সুদক্ষ এজন্য আপনার নিকট আমরা অতীত ও বর্তমান কল্পের অন্তর (প্রতিসন্ধির) বিষয় জানিতে অভিলাষী, অতএব আপনি এখন হইতে তাহাই কীর্তন করুন। পরের ৬ নং শ্লোকে তিনি (লোমহর্ষণ) বরাহকল্প-কে বর্তমান এবং ইহার পূর্ব অতীত যে সনাতন কল্প এই উভয়কল্পের মধ্যাবতার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন।

তাঁর কথায়—জনলোক থেকে পুনর্বার অন্য কল্প প্রবৃত্ত হয়। এই কল্পারম্ভ পুনঃপুন হয়ে থাকে। এই পুরাণের অষ্টম অধ্যায়ে চারি আশ্রম-এর বর্ণনা আছে, যথা—

গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম হল—দার পরিগ্রহ, অগ্নিস্থাপন, অতিথি সৎকার, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি।

কৌপীন, পত্র অথবা মৃগচর্ম পরিধান ও ফলমূলাদি আহার, উভয় সন্ধ্যায় অবগাহন ও হোম, এই কয়েকটি বানপ্রস্থদিগের ধর্ম।

ব্রহ্মচারীদের ধর্ম হল—দণ্ড, মেখলা ও জটাধারণ, ভূমিতে শয়ন, গুরুশুশ্রূষা এবং ভিক্ষা।

ভিক্ষুকের ধর্ম দশটি। যথা—স্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস, বস্ত্রে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগ্রহণ, চৌর্যাদি পরিত্যাগ, শৌচাচার, অপ্রমাদ, স্ত্রীসম্ভোগত্যাগ, ক্রোধত্যাগ, সর্বজীবে দয়া, গুরুশুশ্রূষা ও সত্যানুসরণ ইত্যাদি।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

চারখণ্ডে বিভক্ত। ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণ খণ্ড অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড। ১১৩টি অধ্যায় যুক্ত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সম্পূর্ণ। ব্রহ্মখণ্ডে চন্দ্রের উপাখ্যান অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ। অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, মৃগশীর্ষা, আদ্রা পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব ভাদ্রপদ, রেবতী—এই সাতাশটি নক্ষত্র চন্দ্রের প্রিয়পত্নীগণ। সর্বাপেক্ষা রোহিণী ছিলেন চন্দ্রের প্রেমের পাত্রী। সর্বদা চন্দ্র রোহিণীকে ঘিরে থাকতেন। তাই সপত্নীগণ পিতা দক্ষের কাছে তাঁদের মনের বেদনা প্রকাশ করেন। দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে চন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করলেন। চন্দ্র যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পরে শিবের সহানুভূতিতে চন্দ্র রোগমুক্ত হয়। এইভাবে এইখণ্ডের পরিসমাপ্তি। এরপর পতিবিয়োগে মালাবতীর বিলাপ খুবই সুন্দর উপাখ্যান।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ

১৩৮টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ।.ইহার শ্লোক সংখ্যা ৯০০০। এই পুরাণ অতি প্রাচীন। ইহা কোনো সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলে মনে হয় না। বর্তমান যে পুরাণ তা কিন্তু দু-খণ্ডে পাওয়া যাবে। কথিত আছে, এই পুরাণ প্রথম ব্রহ্মাকর্তৃক মার্কণ্ডেয়র কাছে কথিত হয়। মার্কণ্ডেয় জৈমিনীর নিকট বলেন। তারপর ব্যাসশিষ্য সূত কর্তৃক ঋষি সমাজে ইহা কথিত হয়। ইহাতে যে বিষয়গুলি আছে তা এইরূপ—মার্কণ্ডেয়র নিকট জৈমিনির মহাভারতের চারটি প্রশ্ন, পক্ষিগণ কর্তৃক যথাক্রমে সে সবের উত্তর। বলরাম কর্তৃক ব্রহ্মহত্যার কারণ কথন, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, পিতা পুত্রের সংবাদ, মহারৌরবাদি নরক বৃত্তান্ত কথন, বৈশ্য ও যম পুরুষ সংবাদ, পতিব্রতা মাহাত্ম্য, দত্তাত্রয়োৎপত্তি, দত্তাত্রেয়—কার্তবীর্য সংবাদ, কুবলয়াশ্চরিত ও মদালাসোপাখ্যান, গার্হস্থ ধর্মনিরূপণ, শ্রাদ্ধকল্প, সদাচারাণি ব্যবস্থা নিরূপণ যোগাধ্যায় সুবাহু ও কাশীরাজের কথোপকথন, কাল নিরূপণ ও তার প্রমাণাদি কথন, রুদ্রসর্গ, স্বয়ম্ভুব মন্বন্তর কথন, ভুবনকোষ কথন প্রসঙ্গে জম্বুদ্বীপের বর্ণনা, গঙ্গাবতার, ভারতবর্ষ বিভাগ, কূর্মসংস্থান, বর্ষ বর্ণনা, স্বারোচিক মন্বন্তর কথন। যথাক্রমে অবশিষ্ট মন্বন্তরগুলির বর্ণনা সাবর্ণিক মন্বন্তর প্রসঙ্গে "দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা"।

রুচির প্রতি পিতৃদিগের গার্হস্থ্যোপদেশ।

পরিশেষে অষ্টাদশ পুরাণের মাহাত্ম্য ও মহিমা বর্ণনা আছে।

বামন পুরাণ

একখানি মহাপুরাণ। ইহা ৫৫ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ভাগবতে পুরাণের মতে বলা হয়, এর শ্লোকসংখ্যা ১০,০০০। এই পুরাণের নারদ হলেন রচয়িতা এবং পুলস্ত্য দ্বারা কথিত। ইহাতে আছে—হরপার্বতীর দারিদ্র্য অবস্থার বর্ণনা। দক্ষযজ্ঞ প্রসঙ্গ। মহাদেব কর্তৃক সূর্য নিগ্রহ। নারায়ণের সঙ্গে প্রহ্লাদের যুদ্ধ ও প্রহ্লাদের রাজ্যে চ্যবন ঋষির গমন, সুকেশী রাক্ষসের কথা, কাত্যায়নীর মাহাত্ম্য। অন্ধকাসুরের কথা। অসুরদের সঙ্গে দেবগণের যুদ্ধ। বায়ুদিগের উৎপত্তি। বামন-অবতার। বামন পুরাণ পাঠ করলে ইহা স্বতন্ত্র একখানা পুরাণ বলে মনে হয় না। কারণ এতে পৌরাণিক উপন্যাস কিছু বিকৃত করে লেখা হয়েছে মাত্র। পুরাণটি এখন যে অবস্থায় আছে তাতে এটি যে একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ বলে বোঝা যাবে যে সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

ব্রহ্মপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি যে-সকল পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকায় আছে তাতে ব্রহ্মপুরাণেব প্রথম গণনা আছে, এইজন্য এই পুরাণ আদি পুরাণ নামে অভিহিত হয়।

মৎস্য পুবাণের মতে, ব্রহ্মপুরাণ প্রথমে ব্রহ্মাকর্তৃক মবীচির নিকট কথিত হয়, কিন্তু বস্তুত ইহা ব্রহ্মা দক্ষের নিকট প্রকাশ করেন। এর শ্লোক সংখ্যা দশ হাজার।

আজকাল যে ব্রহ্মপুরাণ দেখা যায় তার শ্লোকসংখ্যা ৭-৮ হাজারের বেশি হয় না। ব্রহ্মোত্তর পুরাণ নামে এর একটি পরিশিষ্ট ভাগ আছে, তা স্কন্দপুরাণান্তর্গত ব্রহ্মোত্তর খণ্ড হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উহার শ্লোকসংখ্যা ৩০০ হাজার।

ব্রহ্মপুরাণের বক্তা লোমহর্ষণ মুনি। শ্রোতা নৈমিষ্যারণ্যবাসী ঋষিগণ। অনেকে বলেন, এই পুরাণে ব্রহ্মার মহিমার অধিক বর্ণনা আছে। ইহার অনেক স্থলে কৃষ্ণকে জগন্নাথ বলে—তাঁরই পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের বিস্তৃত বর্ণনা এবং এই স্থানে যে-সকল দেবমন্দির আছে তাদেরও বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরগুলি অধিক পুবাতন নয়, সুতবাং ব্রহ্মপুবাণের অন্তর্গত মন্দিব বর্ণনাও যে আধুনিক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ব্রহ্মপুরাণে বিশ্বকর্মা কন্যা সংজ্ঞা ও সূর্য ছায়া তাদের ছেলে যম-কন্যা যমুনার কাহিনী আছে। সূর্যের তেজ কমিয়ে সেই তেজ দ্বারা বিশ্বকর্মা কর্তৃক দেবতাদের জন্য বিভিন্ন অস্ত্র নির্মাণ ইত্যাদি বিষয় আছে। বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁর পুত্র দেবরাত বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শুনঃশেফ হরিদশ্ব রাজার যজ্ঞবৃত্তান্ত আছে। বুধের একমাত্র পুত্র পুরুরবা উর্বশীর কাহিনী এই পুরাণে কিছু উল্লেখ দেখা যায়। ইলার পুত্র নরশ্রেষ্ঠ পুরুরবা উর্বশীকে নিয়ে রম্য চৈত্ররথ বনে পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, বনশ্রেষ্ঠ নন্দনে অষ্টাদশ বৎসর বাস করেছিলেন। উর্বশীর গর্ভে পুরুরবার দেবপুত্র সদৃশ অধোলিখিত পুত্রসকল উৎপন্ন হয়েছিল, তারা সকলেই মহাত্মা, বুদ্ধিমান, ধর্মাত্মা এই সকল বর্ণনা ব্রহ্মপুরাণে আছে।

বিষ্ণুপুরাণ

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় বিষ্ণুপুরাণও বৈষ্ণবভক্তের প্রধান পুরাণ। এটি অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। এর রচনার প্রাঞ্জলতা এবং বিশুদ্ধতা দেখে সর্বদেশীয় পণ্ডিতগণ অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা এর প্রাচীনত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। তাছাড়া এতে পুরাণের সমুদয় লক্ষণ বিদ্যমান।

এই বিষ্ণুপুরাণ দুই অংশে বিভক্ত।

ভাগবত পুরাণ অনুসারে এর শ্লোকসংখ্যা ২৩ হাজার। মৎস্য পুরাণেও একথা স্বীকার করা হয়। এই পুরাণে যা আছে তা হল—স্বর্গ, প্রলয়, পৃথিবীর বিস্তার, দ্বীপ, বর্ষ ও দেশবিভাগ, সমুদ্র, পর্বত, নদনদীর সংস্থান, সর্বগ্রহের সংস্থান, সূর্যাদি গ্রহের সংস্থান ও প্রমাণ, দেব ও রাজর্ষিদিগের বংশ বর্ণনা। মনু ও মন্বন্তর কথন, কল্প ও বিকল্প, যুগবিভাগ, "যুগধর্ম" কল্পান্তস্বরূপ, দেব ঋষি ও রাজাদিগের চরিত, বেদ ও তার শাখাপ্রশাখা বিভাগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম ইত্যাদি সমুদয় পৌরাণিক বিষয় বিশেষত দেখা যায় ভাগবতের দশমস্কন্দের মতো এর পঞ্চম অংশটি কেবল কৃষ্ণচরিত বর্ণনাই সারকথা।

প্রথম অংশে প্রহ্লাদ চরিত্র সর্ববিদিত কাহিনী। এই অংশে দেখা যায়, হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ হলেন বিষ্ণুভক্ত, হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর নাম সহ্য করতে পারেন না। যত রকম শাস্তি শাসন আছে সকল ব্যর্থ হয়ে গেল বিষ্ণুর ইচ্ছায়। এইভাবে প্রহ্লাদ ভক্ত চূড়ামণি হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠিত হল এইভাবেই। এই অংশের কথক হলেন স্বয়ং মহর্ষি ব্যাসের পিতা পরাশর ঋষি।

নারদীয় পুরাণ

নারদীয় পুরাণের নাম অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকায় আছে। এর শ্লোকসংখ্যা ২৫০০ হাজার। কেউ কেউ বলেন, নারদীয় পুরাণ এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণ একই, অপর ব্যক্তিগণ নারদীয়কে মহাপুরাণ বলেন।

এই পুরাণে সগর রাজার জন্মবৃত্তান্ত আছে। সূর্যবংশের বৃকের পুত্র 'বাহু'। ইনি ৭০টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। সপ্তদ্বীপে সপ্ততি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং এই হল সগর বংশের ভিত্তি। এই রাজা বাহু একদা নিখাত দ্বারা দীক্ষিত হয়ে ভীষণভাবে অসূয়াবিশিষ্ট চিত্ত হয়ে পড়েন এবং অহঙ্কারের অনুগামী হয়ে রাজ্যচ্যুত হন। অতঃপর সস্ত্রীক বনে গমন করেন অর্থাৎ প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন। এইভাবে—ঊর্ব ঋষির কৃপায় "ঔর্ব" অনেকে বলতেন। বাহু-র অন্তসত্ত্বা স্ত্রীর গর্ভরক্ষা করেন ওই ঋষি। কেননা সহসা রাজা বাহু-র মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী বিষপান করেছিলেন আত্মহত্যার জন্য। ঋষি ঔর্ব ওই গর্ভরক্ষা করায় 'স্ত্রী' স-গর পুত্র প্রসব করেন। ইনিই স-গর।

শ্রীমদ্ভাগবত

অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত এটি সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের অনর্ঘ রত্ন বলে বর্ণিত আছে।

ধর্মের পবিত্রতা, জ্ঞানের বিকাশ, যোগের গাম্ভীর্য, প্রেমের উচ্ছ্বাস, নীতির দূরদর্শিতা এবং ভক্তির প্রবাহ বিদ্যমান। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করলে যেমন বেদের কর্মকাণ্ডে, উপনিষদের

জ্ঞানকাণ্ডে, স্মৃতির সদাচারে, দর্শনের তত্ত্ববিচারে, পুরাণের পুরাবৃত্তে, নীতির লোকতত্ত্বে যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি হয় তেমনি এতেও অনুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের আছে দ্বাদশ কাণ্ড। প্রথম কাণ্ডে সর্ববিধ শাস্ত্র অপেক্ষা ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব, ঈশ্বরের অবতার বর্ণনা আছে। অশ্বত্থামার নিগ্রহ, ভীষ্মের দেহত্যাগ, যদুবংশ ধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারীর বনে গমন, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি। পরীক্ষিতের রাজ্য প্রাপ্তি, কলির নিগ্রহ, পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ এবং ব্যাসপুত্র শুকদেবের নিকট থেকে ভাগবত শ্রবণ কাহিনী আছে।

দ্বিতীয় কাণ্ডে বিষ্ণু মাহাত্ম্যাদি কথন আছে।

তৃতীয় কাণ্ডে সৃষ্টি প্রকরণ আছে।

চতুর্থ কাণ্ডে যজ্ঞসমূহের বর্ণনা আছে।

পঞ্চম কাণ্ডে প্রিয়ব্রতের বংশ, ভরত বংশ, ভূগোল ও খগোলের সবিস্তার বর্ণনা আছে

ষষ্ঠ খণ্ডে অজামিল কথা, দক্ষপুত্রাদির বৃত্তান্ত, দক্ষকন্যাদিগের বংশকীর্তন, বৃত্রাসুরকথা ও বধ, চিত্রকেতুর ইতিহাস, দিতির গর্ভে বায়ুদিগের উৎপত্তি ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

সপ্তম খণ্ডে প্রহ্লাদ চরিত্র বর্ণনা আছে।

অষ্টম খণ্ডে সমুদ্রমন্থন, দৈত্যদের বিনাশ।

নবম কাণ্ডে শর্য্যাতি, নভস, অম্বরীষ, মান্ধাতা, রোহিতাশ্ব, অংশুমান, খট্টাঙ্গ নহুষ ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

দশম খণ্ডে আছে সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণচরিত।

একাদশ খণ্ডে আছে যদুবংশ বর্ণনা।

দ্বাদশ খণ্ডে আছে মগধ বংশীয় ভাবী রাজাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য অশোক বর্দ্ধন।

গরুড় পুরাণ

গরুড় পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণ অন্তর্গত।

ইহাও একখানি বৈষ্ণব পুরাণ। বর্তমানে যে গরুড় পুরাণ আমরা বাজারে দেখছি তা অবিকৃত নহে। প্রাচীন ও আধুনিক মিলে মিশে একেই গরুড় পুরাণ বলে, পণ্ডিতগণ বলেন। যেহেতু এতে প্রাচীন মহাভারতাদির শ্লোক আছে। এতে চাণক্যশ্লোক, বাণরাষ্ট্রক, বাণভট্টের কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থের অংশ নিবন্ধ দেখা যায়। আবার অগ্নিপুরাণের ন্যায় ছন্দ, ব্যাকরণ ইত্যাদিও আছে, পৌরাণিক বিষয় অপেক্ষা পূজা পাঠের কানুন আধিক্য আছে।

গরুড় পুরাণে নিম্ন বিষয়সমূহ ক্রমশ বিকৃত দেখা যায়—

সূত কর্তৃক গরুড় পুরাণের কথন প্রতিজ্ঞা আছে। পুরাণোৎপত্তির কথা, রুদ্র, বিষ্ণু সংবাদ সৃষ্টির কথন, দক্ষের প্রচেতস্বরূপে উৎপত্তি, কশ্যপসৃষ্টি সূর্যাদিপূজা, দীক্ষাবিধি, বিষ্ণুপূজার কথন। সংক্ষেপে যোগোপদেশ, বিষ্ণু সহস্র নাম, মৃত্যুঞ্জয় পূজা, গরুড়বিদ্যা, শিবোক্ত সর্পমন্ত্র, পঞ্চবস্ত্র পূজা, সুদর্শনাদি পূজন, হয়গ্রীবপূজা, গায়ত্রী মাহাত্ম্য, দুর্গাপূজা, মহেশ্বরপূজা, নানাবিদ্যার কথা, মুক্তামুক্তধ্যান, শালগ্রাম লক্ষণ কথা, আহ্নিককৃত্য দানধর্ম, প্রায়শ্চিত্ত বিধি,

প্রিয়ব্রতবংশ বর্ণনা, সপ্তদ্বীপ বর্ণনা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সামুদ্রিকলক্ষণ, রত্ন পরীক্ষা, গয়া মাহাত্ম্য, মন্বন্তর, উপনয়ন, গৃহস্থ্যধর্ম, অশৌচ নির্ণয়, নীতিসার, নানা ব্রত, রামায়ণকথা বস্তুনির্ণয়, রোগের নিদান, ঔষধ ইত্যাদি ; বিষ্ণুকবচ, বিষ্ণুবিদ্যা, ত্রিপুর কথা, প্রশ্নকল্প, অশ্বচিকিৎসা, ঔষধের নাম, ব্যাকরণ-নিয়ম, ছন্দশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র যুগধর্ম কথন। নৈমিত্তিক প্রলয় কথন, সংস্কার কথন, প্রস্তাবে আছে পাপের পরিণাম কথা, অষ্টাঙ্গ যোগ, বিষ্ণুভক্তি, নারায়ণ নমস্কার ও আরাধনা, বিষ্ণুমাহাত্ম্য কথন। ব্রহ্মজ্ঞান কথন, আত্মজ্ঞান কথন, গীতাসার। উত্তর খণ্ডে প্রেতকৃত্য ও যমালয় প্রভৃতির বর্ণনা আছে।

গরুড় পুরাণ নিঃসন্দেহে একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ। মহামাহিম সদাচার ও কৃতার্থবোধক ; এমন গ্রন্থ বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না।

পদ্মপুরাণ

অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম এই পুরাণ। যে সময়ে জগৎ সুবর্ণময় পদ্ম আকার ধারণ করেছিল, এই পুরাণে তাদৃশ পদ্মের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে ; তাই নাম পদ্মপুরাণ। শ্লোকসংখ্যা ৫৫ হাজার। এর আদি খণ্ডে সূত ঋষিগণের নিকট যেরূপ প্রস্তাবনা করেছিলেন তা এইরূপ—"আমি আপনাদের নিকট অতি পবিত্র পদ্ম নামে প্রসিদ্ধ পুরাণ পাঠ করিতেছি"।

এর আদিখণ্ড, পাতাল খণ্ড, ভূমিখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, ক্রিয়াখণ্ড এবং উত্তরখণ্ড আছে।

এই পুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় এর পবিত্রতা বৃদ্ধি হয়েছে একশত গুণ।

প্রথমে—দেবদেব নারায়ণ ব্রহ্মার নিকট পরে ব্রহ্মা নারদকে এবং নারদ মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রকাশ করেছিলেন। পরে শিষ্যদের প্রথম আমাকে 'সূত' প্রিয় পাত্র জ্ঞানে ইতিহাসের সঙ্গে নিখিল পুরাণ ও সংহিতা অধ্যয়ন করিয়েছিলেন।

উক্ত বক্তব্য থেকে বোঝা যায় এটিও একটি বৈষ্ণবীয় পুরাণ। বাস্তবে পদ্মপুরাণ একটি দুর্লভ গ্রন্থ। মুম্বাই নিবাসী স্বর্গবাসী মহাত্মা নারায়ণ বিশ্বনাথ মাণ্ডলিক মহাশয় এই পুস্তকের সংস্করণ করিয়েছিলেন বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে। তাঁর প্রচেষ্টা ছাড়া এই পুরাণ কখনই পাওয়া যেত না। তিনি এজন্য সমগ্র ভারতবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন।

এই গ্রন্থের শ্লোক ৫৫ হাজার। কিন্তু মাণ্ডলিক মহাশয় বলেছেন ৪৮,৪৫২। পদ্মপুরাণে আছে ৬২৮ অধ্যায়।

আদিখণ্ডে ৬২, ভূমিখণ্ডে ১২৫, ব্রহ্মখণ্ডে ২৬, পাতাল খণ্ডে ১১৩, ক্রিয়াখণ্ডে ৮২, উত্তরখণ্ডে ২৮২, আদিখণ্ডে নদী ও পর্বতদিগের সংস্থান আছে এবং আছে বর্ষ, দ্বীপ, বর্ণনা।

আছে পৃথিবীর পরিমাপ, নানা তীর্থের বর্ণনা, বর্ণাশ্রম।

ভূমিখণ্ডে—কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে।

বৃত্রাসুরের উপাখ্যান, পৃথুচরিত, বেনোপাখ্যান ইত্যাদি প্রধান।

ব্রহ্মখণ্ডে কার্তিক মাহাত্ম্য প্রসঙ্গ, নানাব্রত, অনুষ্ঠান প্রণালী আছে।

পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধ প্রসঙ্গ, ভারতবর্ষের নানাবিধ উপাখ্যান, কৃষ্ণচরিত, রামের পূর্ববৃত্তান্ত, বৈশাখ মাহাত্ম্য ইত্যাদি।

ক্রিয়াখণ্ডে, সৃষ্টি প্রকরণ, জলদ্ধ উপাখ্যান, শ্রীশৈল মাহাত্ম্য, হরিদ্বার মাহাত্ম্য, গঙ্গামাহাত্ম্য, তুলসী মাহাত্ম্য, দ্বীপব্রত, জন্মাষ্টমীব্রত ইত্যাদি আছে।

একাদশীব্রত, পুণ্ডরীকাখ্যান, আরো অনেক উপাখ্যান আছে। রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গের সাথে পদ্ম পুরাণের মিল আছে। শিব পুরাণের কুমারসম্ভবের তুল্যার্থক শ্লোক দেখা যায়। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে ও কালিদাসকৃত অভিজ্ঞানশকুন্তলমের সমভাবে শ্লোক দেখা যায়। পদ্মপুরাণের যে দিলীপের কথা আছে রঘুবংশের দ্বিতীয় স্বর্গের তার মিল দেখা যায়।

এ থেকে বোধহয় এখন যে পদ্মপুরাণ তা বিকৃত অবস্থায় আমরা পেয়েছি।

পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে ৬৬ অধ্যায় ৫-১০ শ্লোকে বেন রাজা ও জৈন পরিব্রাজক কাহিনীটি দ্রষ্টব্য ঃ

সুত-উবাচ।

নগ্নরূপো মহাকায়ঃ সিতমুণ্ডো মহাপ্রভঃ।
মার্জনীং শিখিপত্রানাং কক্ষায়াং স হি ধারয়ণ।।
গৃহীত্বা পানপাত্রঞ্চ নারিকেলময়ং করে।
পঠমানো মরুচ্ছাস্ত্রং বেদশাস্ত্র বিদুষকম্।।
যত্র বেনো মহারাজস্তত্রোপায়ত্ত্ববাদ্বিতঃ
সভায়ামস্য বেনস্য প্রবিবেশ স পাপবান।।
তং দৃষ্টা সমনুপ্রাপ্তং বেনঃ প্রশ্নং তদাকরোৎ।
ভবান কো হি সমায়াত ঈদৃশরূপধর মখ্।।
সভায়াং বদ মামত্র তূর্ণং কস্মাৎ সমাগতঃ।
কো বেশং বিষ্ণু-তে নাম কো ধর্ম কর্মকিন্তব।।
কো বেদস্তে ক আচারঃ কো নয়ঃ কা প্রভাবনা।
কিং জ্ঞানং কঃ প্রভাবস্তে কিং সত্যং ধর্মলক্ষণম্।।
তত্ত্বং সর্বং সমাচক্ষ্ব মমাত্রে সত্যমেব চ।
শ্রুত্বা বেনস্য তদ্বাক্যং পাপো বাক্যমুদাহরৎ।।
১১—১৩। কবো ষ্যবং বৃথাভাবং মহামুচো ন সংশয়ঃ।
অহং ধর্মস্য সর্বস্বমহং পূজ্যতমঃ সুরৈঃ।
অহং জ্ঞানমহং সত্যমহং ধাতা সনাতনঃ
অহং ধর্মোঃ অহং মোক্ষঃ সর্বদেবময়ো হ্যহম্।।
ব্রহ্মাদেহাৎ সমুদ্ভুতঃ সত্য সঙ্কোঽস্মি নান্যথা।
জিনরূপং বিজানীহি সত্যধর্মকলেবরম্।।
ধ্যায়ন্তি মম রূপং হি যোগিনো জ্ঞানতৎপরাঃ।।

বেন উবাচ

তবৈব কীদৃশো ধর্মঃ কিন্তে দর্শনমেব চ।
কিমাচারো বদস্বৈতদিত্যুক্তং তেন ভূভূজা।।

পাপউবাচ

অর্হন্তো দেবতা যত্র নির্গ্রন্থো গুরুরুচ্যতে
দয়া বৈ ধর্মস্তত্র মোক্ষঃ প্রদৃশ্যতে।।
ঈদৃশোঽস্মিন্ন সন্দেহ আচারং প্রবদাম্যহম্।
যজনংযাজনাং জাপি বেদাধ্যয়নমেব চ।।

আর্যৎ ঐ পাপ পুরুষের বক্তব্য হল—আমার যজন-যাজন বেদাধ্যয়ন সন্ধ্যা তপ দান এ সকল কিছুই নেই আমার আচার স্বধা ও স্বাহাবর্জিত, উহাতে হব্য কব্য যজ্ঞাদি ক্রিয়া পিতৃদিগের তর্পণ অতিথি সেবা বা বৈশ্বদৈবিক ক্রিয়া নেই। ইহাতে কৃষ্ণের পূজা নেই। কেবল অর্হন্তের ধ্যানই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত। এর পর বেনের অনেক প্রশ্ন ছিল। ঐ পাপ পুরুষ একে একে উত্তর দিয়েছেন। শেষের দিকে, পাপ পুরুষ বললেন, এই কথাগুলি—

মানুষ মোহবশে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করে তর্পণ করে, এবং পিতৃগণের উদ্দেশ্যে নানারকম অনুষ্ঠান করে। মৃত ব্যক্তি কোথায় থাকে, কী ভোজন করে এবং কীরূপ অবস্থাতেই বা থাকে? উহার জ্ঞান কীরূপ, কার্যই বা কীরূপ কে বা তা দেখেছে। কেবল ব্রাহ্মণগণ মিষ্ট অন্ন ভোজন করে পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য এই বিধান। শ্রদ্ধা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিরর্থক। গৃহে অতিথি আগমন করলে ভোজ্যবস্তু লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু হে রাজন কি নিমিত্ত জীবহত্যা করে অতিথিভোজনের বিধান? আর কিজন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে সুন্দর অশ্বের, গোমেধ যজ্ঞে বৃষদের বধ করা হয়? বাজপেয় যজ্ঞে ছাগ বলি দেওয়া হয়। রাজসূয় যজ্ঞে প্রাণীদের এবং পুণ্ডরীক যজ্ঞে গজের বলি দেওয়া হয়। গজমেধ যজ্ঞে কুঞ্জরের বধ বিহিত আছে। এইরূপ সৌত্রমণী যজ্ঞে পশুর বধ হয়।

হে নৃপবর আরও শ্রবণ করুন, নানারূপ যজ্ঞে এইরূপ বলি দ্বারা পশুদের প্রতিহিংসা করার জন্য আর নিজেদের ভোজন করার জন্য দেবতাদের উদ্দেশ্য করে বলি দেওয়া এ কাজ হিংসা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যে নিরপরাধ পশুদের বধ করা হয় এতে কি ধর্ম হবে? যে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ পশু হিংসার বিধান দিয়ে থাকেন তার কীরূপ ফল হবে?

ক্রিয়াতে জীবদিগের পালন করার বিধান আছে, অথচ এই দয়াশূন্য কাজ কেন? এই সব নিষ্ফল দয়াশূন্য কাজ করে ধর্ম হবে, কি করে সম্ভব? যে সকল বেদে দয়ার উল্লেখ নেই কতকগুলি বাক্যপূর্ণ নিরর্থক জ্ঞানশূন্য কর্মমাত্র।

তাই আমার মতে, হে রাজন দয়াহীন বেদ এবং ব্রাহ্মণের সত্যক্রিয়া আদৌ নেই, উহা পরিত্যাগ করাই উচিত। হে রাজন, ব্রাহ্মণগণ বেদ বলে যাদের শ্রদ্ধা করেন, তা প্রকৃত বেদ নহে। সত্যহীন দান কর্মেও কোনো ফল হয় না। হে রাজন! জিনপ্রদর্শিত ধর্ম বলছি শুনুন, প্রথমে প্রশান্ত চিত্তে সকল ভূতের প্রতি, জীবের প্রতি দয়া কর্তব্য এবং হৃদয় দ্বারা চরাচরাত্মক অদ্বিতীয় জিনদের আরাধনা, এবং শুদ্ধভাবে মন দ্বারা তাঁর পূজা করবে। কেবল তাঁকেই নমস্কার করবে। হে রাজন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কদাচ মাতার পিতার চরণ ও বন্দনা করা উচিত নয়।

হে রাজন! আকাশ থেকে মেঘ বৃষ্টি দান করে। ঐ জল প্রবাহিত নদনদীরূপে জলপ্রবাহ মাত্রা উহা কিরূপে তীর্থ হতে পারে! তাড়াগ, সাগর জলাশয় মাত্র। পৃথিবীর প্রস্তররাশি

যা পর্বত নামে বিদ্যমান আছে ওখানে কি তীর্থ হয়? জলের প্রবাহ যদি তীর্থ হয় তবে মেঘই ত উত্তম তীর্থ। স্নানের দ্বারা যদি সিদ্ধিলাভ হয় তবে—মৎস্যগণকে নিশ্চয়ই সিদ্ধ বলা যায়। তাদের তো আপনারা মেরে ফেলেন। এটা কিরূপ কাজ হয়? যেখানে জীব সেখানে তীর্থ, সেইখানে সনাতন ধর্ম। এবং তপঃদানাদির জন্য পুণ্য প্রতিষ্ঠিত নিশ্চিত কেন? হে রাজন, একমাত্র জিনদের জন্য সর্বভক্তি শ্রদ্ধা দান করাই ধর্ম। তিনি ভিন্ন ধর্ম বা তীর্থ আর কিছু নেই। তাঁহাকে ধ্যান করুন উত্তম সুখলাভ হবে।

রাজা বেনগোচরে জৈন পরিব্রাজক তাঁর ধর্মের যে ব্যাখ্যা দান করলেন তা বলা হল।

ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে সুত বললেন, জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ যেরূপ শুভাশুভের নির্দেশ করেন, "এই সংসারে তাহার কখন অন্যথা হয় না।"

এইজন্য শাস্ত্র-পুরাণ-বেদ সমুদয় মান্য করবে। 'বেনের' পাপাচারের কি পরিণতি বলছি শোন—প্রথমোক্ত শ্লোকগুলিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাজা বেন ধর্মচ্যুত হয়ে নরকগামী হলেন। তাঁর সবই নষ্ট হয়ে গেল, রাজ্যপাট সবই চলে গেল। এই তাঁর পরিণতি হয়েছে জানলাম।

বরাহ পুরাণ

এই পুরাণটি অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। শ্লোকসংখ্যা ২৪ হাজার। অন্যান্য পুরাণের ন্যায় বরাহপুরাণ প্রাচীন। কিন্তু সেই প্রাচীনত্ব অনেকাংশে নেই।

১৬২১ বিক্রমাব্দের পর মাধব ভট্ট কাশীধামে এই বরাহপুরাণ লিখেছেন জানা যায়। ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম বহুব্যাপী ও বদ্ধমূল হওয়ার পর যে ইহা বর্তমান আকারে সংকলিত তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। এর প্রতি অধ্যায়ে প্রতি উপন্যাসে অপরাপর দেবদেবী অপেক্ষা বিষ্ণুমাহাত্ম্য অধিক। সেই কারণে দেখা যায়। বরাহপুরাণের বিষয়সূচি এইরূপ—

প্রথমে মুনিগণ সুতের নিকট হরিকথা প্রশ্ন করেছেন। সুতঃ সনৎকুমার নারদের সংবাদ বর্ণনা করেন এবং মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান, প্রয়াগ মাহাত্ম্য, গঙ্গানায়ন বাহুরাজার উপাখ্যান, সগর রাজার উপাখ্যান, সৌদাস্যের উপাখ্যান, গঙ্গা মাহাত্ম্য, কলিরাজার উপাখ্যান, বামনোপাখ্যান, ভূমিদান বলির বন্ধন, দানফল, ভগীরথ কথন, সগর সুতদের উদ্ধার, কতিপয় ব্রত, গালব ও ভদ্রশীলের উপাখ্যান, বর্ণাশ্রম বিধি, সমুদ্রযাত্রা নিষেধ, শ্রাদ্ধবিধি, ব্রত ও দানাদির যোগ তিথির ফল প্রায়শ্চিত্ত ও পাপের স্বরূপ নির্ণয় বলেছেন। মদ্যভেদাদি নিরূপণ ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয় ও চৌর্যস্বরূপ কথন ইত্যাদি আছে। নানাবিধ পরিণাম নির্ণয়, নানাবিধ চৌর্য ও তার প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ, অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত কথন আছে। বিষ্ণু স্মরণের ফল, পাপ ভোগ মোক্ষোপায়, নারায়ণের তুষ্টি, নারায়ণ মাহাত্ম্য, দেবমালীর উপাখ্যান, যজ্ঞমালী ও সুমালীর উপাখ্যান, বিষ্ণুচরণামৃত ধারণের ফল, বণিক ব্যাধের উপাখ্যান, যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যান, ইন্দ্র বৃহস্পতি সংবাদ, যুগবাঞ্ছা আকাঙ্ক্ষার বর্ণনা, কলির স্বরূপ কীর্তন আছে।

মৎস্যপুরাণ

মৎস্য একটি অন্যতম মহাপুরাণ। এর চতুঃপঞ্চশতম অধ্যায়ে অন্যান্য পুরাণের উল্লেখ আছে। অতএব ইহা প্রাচীন। অত্র পুরাণে কল্প আরম্ভে বেদের প্রবৃত্তির জন্য ভগবান নারায়ণ

মৎস্যরূপ ধারণপূর্বক বৈবস্বত মনুর নিকট নরসিংহ কল্প অধিকার করে সুপ্ত কল্পের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। মৎস্যপুরাণ স্বয়ং নারায়ণ কীর্তন করেছেন। সূর্যপুত্র বৈবস্বত মনু নিজ পুত্রের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে অরণ্যে গমন করেন। এবং তপস্যারত হন।

অযুত বর্ষ তপস্যার পর ব্রহ্মা প্রীত হয়েন এবং বরদান করেন। মনু তাঁকে প্রণাম করে বললেন, "আমি এই বর প্রার্থনা করি যে প্রলয় উপস্থিত হলে আমি যেন শিথিল স্থাবর এবং জঙ্গম পদার্থের রক্ষা করতে পারি।" ব্রহ্মা তথাস্তু বলে চলে গেলেন। অতঃপর প্রলয়কালে একটি সুবিশাল মৎস্য মনুর নিকট হাজির। পূর্ব কথা মতো এবং পরিকল্পনানুযায়ী ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে সেই নৌকাখানি বেঁধে নিজে তার উপর চড়ে বসেন এবং অবস্থান করেন। মনু সেই মৎস্যের নিকট যে যে প্রশ্ন করেছেন তদুত্তর এই মৎস্য পুরাণের অন্তর্গত।

এতে আছে মনু ও মৎস্য বৃত্তান্ত।

ব্রহ্মাণ্ড কথন, দেব ও অসুরদিগের উৎপত্তি, বায়ুদিগের উৎপত্তি, মদন দ্বাদশী, লোকপাল পূজা, মন্বন্তবরদিগের উল্লেখ, বৈন্যচরিত্র, সূর্য হতে বৈবস্বত মনুর উৎপত্তি, পিতৃবংশ কীর্তন, শ্রাদ্ধকাল বর্ণনা, পিতৃতীর্থ, চন্দ্রোৎপত্তি, চন্দ্রবংশ কীর্তন, যযাতি চরিত, কার্তবীর্যার্জুনের মাহাত্ম্য, বৃষ্ণিবংশ, অগ্নিবংশ, পুরাণদিগের স্বরূপ ও শ্লোকসংখ্যা বর্ণনা, ক্রিয়াযোগ, নক্ষত্রাদিগের সংস্থান, মার্তণ্ডশয়ন, বুধাষ্টমী কতকগুলি ব্রত, তড়গোৎসর্গ, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, সৌভাগ্যশয়ন, অন্ন মেরু প্রভৃতি, দশবিধ মেরুপ্রদানের ফল, গ্রহশান্তি, দ্বীপ ও লোকসমূহের কীর্তন, বারাণসী মাহাত্ম্য, নর্মদা মাহাত্ম্য, প্রবর কথন, পিতৃগাথা, উভয়মুখী গোদান ফল, সাবিত্রীউপাখ্যান, রাজধর্ম, যাত্রার শুভাশুভ নিমিত্তের কথন, বামন মাহাত্ম্য, সাগরমন্থন, দেবাসুর যুদ্ধ, ভবিষ্যৎ রাজাদের বর্ণনা। চন্দ্র সূর্যের গতি নিরূপণ, ধ্রুবমাহাত্ম্য, ত্রিপুরাসুরেব বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে পার্বতীর জন্ম প্রভৃতি বর্ণনা আছে। ত্রয়োবিংশাধ্যায়—ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় পর্যন্ত চন্দ্রবংশ উপাখ্যান ও কার্তবীর্যার্জুন চরিত্র খুবই মনোরম সুখপাঠ্যও বটে।

ঘটনা এইরূপ। চন্দ্রকর্তৃক বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে অপহরণ করার পর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চন্দ্র এবং মহাদেবের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। কিন্তু জয়-পরাজয়ের আগে পিতামহ ব্রহ্মা এসে মীমাংসা করেন। বৃহস্পতির হাতে তারাকে প্রত্যর্পণ করেন। এর ঠিক এক বৎসর পরে তারার গর্ভে একটি সন্তান হয়। ঐ পুত্রের নাম 'বুধ' রাখা হয়। তার জাতকর্মের সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ বৃহস্পতির গৃহে এলেন। সমবতে দেবতাগণ তারাকে জিজ্ঞেস করেন, "এ পুত্র কার?"

বার বার জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর তারা অধোবদনে বলেন,—"চন্দ্রের ঔরসজাত সন্তান বুধ।"

এরপর চন্দ্র নিজে এসে সেই পুত্র নিয়ে গেলেন। এই বুধ রাজা হয়েছিলেন; রাজ্যপাট পেয়েছেন এবং ইলার গর্ভে সর্বলোকমান্য ধর্মিষ্ঠ পুত্র পুরুরবার জন্ম দেন।

একদা রূপবান পুরুরবাকে দেখে উর্বশী ইন্দ্রসভায় নৃত্যগীতে তাল ভঙ্গ করে ফেলেন। এই ঘটনায় ভরতমুনি অভিশাপ দিলেন। এই সভায় সেদিন লক্ষ্মীয় স্বয়ম্বর সভা নাটক হচ্ছিল। এই ঘটনার পর উর্বশী দিনে ঘোটকী রাত্রে মানবী রূপে রাজা পুরুরবার প্রেম লীলায় আটটি সন্তান উৎপন্ন হয়। উর্বশীর গর্ভে জন্ম তাদের নাম—আয়ু, দৃঢ়ায়ু, আগায়ু,

ধনায়ু, বসু, ধৃতিমান, শুচিবিদ্যা ও শতায়ু। আয়ুর ৫টি পুত্রের নাম পাওয়া যায় যথা—নহুষ, বৃদ্ধশর্মা, রাজদম্ভ, বিপাপ্মা।

কূর্মপুরাণ

একখানি মহাপুরাণ। কূর্মরূপধারী ভগবান বিষ্ণু এই পুরাণের আদি বক্তা। ভাগবত পুরাণ অনুসারে এর শ্লোকসংখ্যা ১৭,০০০ হাজার। মৎস্য এবং বৈবর্ত বা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে এই শ্লোকসংখ্যা ১৮,০০০ হাজার বলা হয়েছে।

এখন যে কূর্মপুরাণের কথা আমি বলছি এর শ্লোকসংখ্যা ৬০০০ বেশি নয়। কূর্মরূপধারী ভগবান নারায়ণ কর্তৃক এই পুবাণ বর্ণিত। ইহা একখানি শৈব সম্প্রদায়ানুগত পুরাণ। এতে শিব ও তাঁর শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হতে দেখা যায়। এতে বৈষ্ণব বা অন্য সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতার প্রতি কোনো অবজ্ঞাসূচক বা হীনত্ব প্রতিপাদক কোনো ভাষা ব্যবহার হয়নি। মাঝে মাঝে কৃষ্ণকে বেশি মর্যাদা দেওয়া আছে, তাতে বৈষ্ণব পুরাণ মনে করার যুক্তি আছে। বাস্তবে ইহা শৈব পুরাণ। তাছাড়া বিভিন্ন স ম্প্রদায়েব মধ্যে যেন একটি সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তার প্রযত্ন আছে।

এত ভাগবতাদি পুরাণের ন্যায় দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদ চরিত্র প্রভৃতি উপন্যাসের কথিত বিষয়, ঐ উপন্যাসগুলির বহু পরিবর্তন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দক্ষযজ্ঞের ঘটনাটি এইভাবে আছে—দক্ষ প্রচেতসদিগের পুত্র, তাঁর সতী নাম্নী কন্যার সাথে কপটক্রমে মহাদেবের বিবাহ হয়। সেজন্য সতী পিতৃগৃহে এলে, দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং ভর্তার সঙ্গে তাঁর বহু নিন্দা করা হয়। আদরের পরিবর্তে কন্যাকে ভর্ৎসনা করে দক্ষআরও বললেন, "তোমার স্বামী অপেক্ষা আমার সব জামাই খুব ভালো। তুমি আমার অসৎ কন্যা, অতএব অবিলম্ব আমার বাড়ি হতে চলে যাও।"

সতী পিতার কথায় দুঃখিত হয়ে অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করেন এবং হিমালয়ের ঘরে জন্ম নিলেন। সতীর মৃত্যুসংবাদ শুনে মহাদেব দক্ষকে অভিশাপ দিলেন যে অবিলম্বে ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ করে ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করো এবং নিজ পুত্রীর গর্ভে পুত্রের জন্ম দাও।

এবার দক্ষ শিবকে অপমানিত কবার জন্য হরিদ্বাবেব কনখলে একটি যজ্ঞ আরম্ভ কবেন। ঐ যজ্ঞে শিবকে বাদ দিয়ে সকলকে নিমন্ত্রণ করা হল। বিষ্ণু স্বযং সেই যজ্ঞের বক্ষক ছিলেন। যজ্ঞে যে যেখানে ছিলেন সকলে উপস্থিত ছিলেন।

পার্বতী মহাদেবকে বললেন, আমাব পূর্বজন্মের পিতা দক্ষ যজ্ঞ করছেন, "আপনাকে বাদ দিয়ে। আমার সবিশেষ অনুরোধ এই যে, আপনি ঐ যজ্ঞ ধ্বংস করে দিন।"

এই কথা শুনে মহাদেব ক্রোধে অধীর হয়ে বীরভদ্রকে উৎপাদন করেন এবং দক্ষ যজ্ঞ বিনাশের জন্য তাকে প্রেরণ করেন। এবং দলবলের সাথে মহাদেব-পার্বতী সেখানে হাজির হলেন। বীরভদ্র যখন ধ্বংস কাজে রত হল, তখন ব্রহ্মা, দক্ষ এবং দেবগণ পার্বতীর স্তব আরম্ভ করলেন।

ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত প্রহ্লাদ চরিত্র যেমন আছে তা সম্পর্ণ ভিন্নরূপ। এই কূর্মপুরাণে প্রহ্লাদ আজন্ম বিষ্ণুভক্ত নয়। অসুরের ন্যায় দেববিদ্বেষী ও দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল।

বিষ্ণুকে ভক্তি করা দূরে থাক সর্বদা তাঁর উপর দ্বেষভাব প্রকাশ করত। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর প্রহ্লাদ স্বীয় অনুজবর্গের সাথে বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি জন্মে। সীতার ব্যাপারে অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সেই ঘটনা এইরকম—

রাবণ সীতাকে হরণে প্রবৃত্ত হলে সাধ্বী সীতাদেবী পরপুরুষ স্পর্শভয়ে আপনার প্রকৃত স্বরূপ অগ্নির মধ্যে লুকিয়ে নিলেন আর একটি সীতার প্রতিরূপ স্থাপিত হল। রাবণ সেই মায়া সীতা অপহরণ করল।

রাবণবধের পর অগ্নিপরীক্ষার সময় অগ্নি সেই প্রকৃত সীতাকে রামচন্দ্রের হাতে অর্পণ করেন।

কূর্মপুরাণের উত্তরভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে ঈশ্বর কর্তৃক মহেশ্বরের যে মাহাত্ম্য আছে ; তার অধিকাংশ শ্লোকে ভগবদ্‌গীতার সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়।

এখন যে কূর্ম পুরাণ আছে, তার ২টি মাত্র ভাগ—পূর্বভাগ এবং উত্তর ভাগ। পূর্ব ভাগে ৫৩টি, উত্তর ভাগে ৪৩টি অধ্যায়ে আছে।

মোট ৯৬টি অধ্যায় আছে। এতে যে বিষয়সূচি তা এইরূপ। যথা—লক্ষ্মীর জন্ম, প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি, বর্ণধর্ম, বৃত্তিভেদ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও তার লক্ষণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের একত্ব, পৃথকত্ব, বিশেষত্ব প্রদর্শন। ভক্তির লক্ষণ, আচার ও ভোজন, বর্ণাশ্রম লক্ষণ আদিসর্গ, হিরণ্যগর্ভ-সর্গ, কার্লসংখ্যা, ঈশ্বর মাহাত্ম্য, ব্রহ্মার জলে শয়ন, বরাহরূপে ভূমির উদ্ধার, মুখ্যাদিসর্গ, মুনিসর্গ, রুদ্রসর্গ, ঋষিসর্গ, ধর্মকর্তৃক প্রজাসর্গ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ, মহাদেব কর্তৃক সেই বিবাদভঞ্জন, এবং উভয়কে বরদান। মধুকৈটভ বধ, নাভিপঙ্কজ হতে ব্রহ্মার আবির্ভাব, ললাট হতে মহাদেবের প্রাদুর্ভাব, রুদ্রসৃষ্টি, ব্রহ্মার তপশ্চরণ, অৰ্দ্ধনারীশ্বর প্রদর্শন, মহাদেবের শরীর হতে দেবীর পৃথকভাব, দক্ষ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ, ভৃগু প্রভৃতি প্রজা সৃষ্টি, রাজাদিগের বংশাবলী বর্ণনা, কৃষ্ণচরিত, ব্যাসকর্তৃক যুগধর্ম কথন, বারাণসী মাহাত্ম্য, প্রয়াগ মাহাত্ম্য, ভুবনবৃত্তান্ত, গ্রহনক্ষত্রাদি নিরূপণ, ভূখণ্ডস্থিত, বর্ষ নদী পর্বত ও দ্বীপাদির বর্ণনা, বিষ্ণুর শয়ন ও মাহাত্ম্য বর্ণনা, ব্যাসগণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরের ও বেদের বিভাগ, যোগাচার্য ও তদীয় শিষ্য পরম্পরার কীর্তন, নানাবিধ গীতার উল্লেখ, প্রায়শ্চিত্তবিধি, রুদ্রের কপালিতত্ত্ব সংগঠন এবং পতিব্রতার প্রভাব কথন ইত্যাদি বিষয়সকলের সুন্দর বর্ণনা আছে। চারিযুগের পরিচয়ে দেখা যায় যথা—

বক্ষ্যামি তে সমাসেন যুগধর্মানুবেশ্বর।
ন শক্যতে ময়া রাজন, বিস্তারেনাভিভাষিতুম।। ১
আদ্যং কৃতযুগে প্রোক্তং ততস্ত্রেতাযুগং বুধৈঃ।
তৃতীয়ং দ্বাপরং পার্থ চতুর্থং কলিরুচ্যতে।। ২
ধ্যানং তপঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে।। ৩
ব্রহ্মা কৃতযুগে দেবস্ত্রেতায়াং ভগবান রবি।
দ্বাপরে দৈবতং বিষ্ণু কলৌ দেবো মহেশ্বরঃ।। ৪

ব্রহ্মাবিষ্ণুস্তথা সূর্যঃ সর্ব এব কলিস্বপি।
পূজ্যতে ভগবান রুদ্রশ্চ তুস্বপি পিনাকধৃক।। ৫
আদ্যে কৃতযুগে ধর্মশ্চতুষ্পাদঃ প্রকীর্তিতঃ।
ত্রেতাযুগে ত্রিপাদঃ স্যাদদ্বিপাদোদ্বাপরে স্থিত।। ৬

অর্থাৎ কলিযুগে দানই একমাত্র প্রশস্ত ধর্ম। এই যুগে ব্রহ্মা বিষ্ণু সূর্য এই তিন দেবের পূজা হয় ; এবং ভগবান পিনাকপাণি মহাদেব চারিযুগে পূজিত হন। এই মতের অভিমত আছে।

লিঙ্গপুরাণ

লিঙ্গপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। এতে দেবদেবী অপেক্ষা শিবেরই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করা হয়েছে। লিঙ্গপুরাণ দুভাগে বিভক্ত আছে—পূর্ব ভাগ ও উত্তর ভাগ। পূর্ব ভাগে ১০৮টি অধ্যায় এবং উত্তর ভাগে আছে ৫৫টি অধ্যায়। লিঙ্গপুরাণের ক্রমশ বিষয়গুলি যথা—শ্লোকসংখ্যা ১১ হাজার।

প্রাকৃত এবং বৈকৃত সর্গ, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। অণ্ড হতে রজোগুণাশ্রয়ে মহাদেবের জন্ম। ব্রহ্মারূপে এবং তাঁরই বিষ্ণুত্ব ও সংহারক এবং প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি, ব্রহ্মার দিবারাত্র ও আয়ুর গণনা, পিতৃদিগের সম্ভূতি আশ্রমিকদের ধর্ম, দেবীর শক্তিরূপে উদ্ভব, ব্রহ্মার স্ত্রী পুত্রার সৃষ্টি, ব্রহ্মা বিষ্ণুর বিবাদ, পুনর্বার লিঙ্গের উৎপত্তি, শিলাদের তপস্যা ও ইন্দ্রের সহিত তাহার বিসম্বাদ, ব্যাসের অবতারকল্প, মন্বন্তর এবং কল্পভেদে তাদের সংজ্ঞা, বরাহ কল্প, বিষ্ণুর বরাহরূপ, মেঘবাহন কল্পের বৃত্তান্ত, রুদ্রের গৌরব, ঋষিদের মধ্যে শিবলিঙ্গের উদ্ভব, লিঙ্গের আরাধনা, স্নানবিধি, শৌচলক্ষণ, বারাণসীর মাহাত্ম্য, রুদ্র ও বিষ্ণুর পীঠস্থানের সংখ্যা, স্বারোচিষ মন্বন্তর, দক্ষের ভূমিতে পতন, দক্ষের প্রতি শাপ ও তার মোচন, কৈলাসের বর্ণনা, পাশুপতযোগের স্বরূপ নির্দেশ, চতুর্যুগের পরিমাণ, যুগধর্ম, যুগসন্ধ্যার পরিমাণ। সন্ধ্যার বৃত্ত, মহাদেবের শ্মশানাশ্রয়, চন্দ্রলেখার উৎপত্তি, মহাদেবের বিবাহ, পুত্রোৎপাদন। দেবতাদের প্রতি পার্বতীর শাপ, কার্তিকেয়ের উৎপত্তি, গ্রহণকালে শিবলিঙ্গ স্থাপনের ফল। পতিব্রতার আখ্যান, পশু ও পাশের বিচার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির জন্য জ্ঞান, বশিষ্ঠতনয়দের উৎপত্তি ও তাদের বংশ বিস্তার, কৌশিক রাজা দ্বারা শক্তির বিনাশ, কৌশিকের উদ্ভব, সুরভিব বন্ধন, বশিষ্ঠের পুত্রশোক, পরাশরের উৎপত্তি. ব্যাস ও শুকের উৎপত্তি, শক্তিপুত্র কর্তৃক রাক্ষসদের বিনাশ, সমুদয় ভুবনের পরিমাণ, গ্রহণ ও জ্যোতির্ময় নক্ষত্রাদিব গতি, নানাবিধ শ্রাদ্ধের বর্ণনা, অধ্যয়নের লক্ষণ কেমন, পঞ্চযজ্ঞের প্রভাব ও অনুষ্ঠানবিধি, রজঃস্বলাদিগের নিয়ম, স্ত্রী, পুরুষের আচরণ, ভোজ্যাভোজ্য বিচার, সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত, নরক বর্ণনা, কর্মানুরূপ দণ্ড, জন্মান্তরে স্বর্গীয় নারকীয় পুরুষের চিহ্ন, নানাবিধ দান, যমপুরের বর্ণনা, পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের সাধন প্রণালী, রুদ্র মাহাত্ম্য, বৃত্র ও ইন্দ্রের যুদ্ধ, শ্বেত ও মৃত্যুর সংবাদ, মহাদেবের দেবদারু বনে প্রবেশ, সুদর্শনের আখ্যান, ক্রম সন্ন্যাস লক্ষণ, মধু ও কৈটভ কর্তৃক ব্রহ্মার গতি হরণ, হরির মৌনাবলম্বন, লীলাহেতু সর্বাবস্থায় উৎপত্তি, রুদ্রের প্রসাদে বিষ্ণু ও বিষ্ণুর উৎপত্তি, সমুদ্রমন্থন, হরির কূর্মরূপ ধারণ, সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি, যদুদিগের সম্ভূতি, হরির যাদবরূপে

অবতার, কংসের দৌরাত্ম্য, হরির জলক্রীড়া, ভূভার হরণ, হরিকর্তৃক শংকরের আরাধনা, বেনতনয় পৃথু কর্তৃক পৃথিবী দোহন, বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপ, দুর্বাসা ও পিণ্ডারকবাসীদিগের শাপ, যদুবংশ ধ্বংস, জলন্ধর দৈত্যের বধ এবং মহাদেবের নানাবিধ চেষ্টা ও প্রভাবের বর্ণনা আছে এই লিঙ্গপুরাণে।

লিঙ্গপুরাণের ভাষা কর্কশ ও দুর্বোধ্য!

বায়ুপুরাণ

বায়ুপুরাণ ও শিবপুরাণের কোন্‌খানিই মহাপুরাণের অন্তর্গত এই প্রশ্নের এখনও পণ্ডিতগণ মীমাংসা দিতে পারেননি।

মৎস্যপুরাণে বায়ুপুরাণেরই মহত্ত্ব স্বীকৃত বটে। কথিত আছে, শ্বেতকল্পে রুদ্রমাহাত্ম্য সম্বলিত গ্রন্থই বায়ুপুরাণ। এর শ্লোক সংখ্যা ২৪ হাজার। ভাগবত পুরাণে শিবপুরাণকে মহাপুরাণ বলে। শ্লোকসংখ্যা ২৪ হাজার। এই পুরাণ কোনো কোনো স্থানে "বায়বীয়" পুরাণ নামে অভিহিত হয়।

পণ্ডিত উইলসন শিবপুরাণের শ্লোক সংখ্যা ৭০০০ নির্দেশ করেন। সেই অর্থে বায়ুপুরাণই মহাপুরাণ।

এই বায়ুপুরাণ নৈমিষ অরণ্যে ঋষিদের নিকট বায়ু কর্তৃক কালান্তরে সূত কর্তৃক কথিত হয়। এতে সংক্ষেপে নানাবিধ সৃষ্টির কথা আছে। উপোদঘাতপাদে প্রথমে সৃষ্টির বিষয়, পরে কল্পসকলের সামান্যভাবে বর্ণনা আছে। শ্বেতকল্পের কথা আছে। দক্ষযজ্ঞ অনুযঙ্গপাদে সপ্তর্ষিদের কথা আছে। উপসংহারে বা শেষ পাদে ভবিষ্যৎ মন্বন্তর সকল, সময় ও কালের পরিমাণ, পৃথিবীর ধ্বংস, যোগসিদ্ধি, শিবপুরের সৌন্দর্য ইত্যাদি বর্ণনা আছে।

স্কন্দপুরাণম্‌

এই পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। শৈব সম্প্রদায়ের নিকট এই পুরাণ পবিত্রতম গ্রন্থ। এতে ৮১০১০০ শ্লোক আছে। স্কন্দপুরাণ সম্পর্কে এইরূপ বলা হয় যে—প্রকৃত পক্ষে কত খণ্ডে, কত সংহিতায় কত মাহাত্ম্যে বিভক্ত আছে তাঁ বলা যায় না। সে সকল একত্র করলে শ্লোকসংখ্যা আরো অনেক বেশি হতে পারে। স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ড, উৎকলখণ্ড, রেবাখণ্ড, শিবরহস্য খণ্ড, হিমবৎখণ্ড, অতি প্রসিদ্ধ। সংহিতার মধ্যে সূতসংহিতা, সনৎকুমার সংহিতা, সৌরসংহিতা এবং কল্পসংহিতা সচরাচর এগুলিই পাওয়া যায়। গ্রন্থের মাহাত্ম্য মধ্যে প্রয়াগ মাহাত্ম্য, মাঘ মাহাত্ম্য, কার্তিকমাহাত্ম্য, গঙ্গামাহাত্ম্য, গয়া মাহাত্ম্য, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। উৎকল খণ্ডে আছে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য। এই অংশটি নিশ্চয়ই পরে সংযোজিত হয়েছে বোঝা যায়। কাশীখণ্ডে আছে কাশীর মাহাত্ম্য।

কাশীখণ্ডে লোপামুদ্রার পরিচয় আছে। এই লোপামুদ্রা সম্পর্কে স্বয়ং বৃহস্পতি বলেছেন, হে মহাভাগ অগস্ত্য দেবগণের আগমনের কারণ শ্রবণ করুন। আপনি যথার্থ কর্তব্য কর্ম দ্বারা সংসারে কৃতকৃত্যতা লাভ করেছেন এজন্য জগতে আপনিই ধন্য। হে মুনিবর প্রত্যেক আশ্রমে কত কত তপোবন আছে। কিন্তু আপনার এক অদ্ভুত আশ্রম দেখছি। এই সংসারে

ব্রহ্মতেজ এবং তপঃফল কেবল আপনাতেই আছে। আপনি অদ্বিতীয় উদার। আপনার সহধর্মিণী লোপামুদ্রা আপনার অঙ্গের ছায়াতুল্যা। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অত্রিপত্নী, অনসূয়া, শাণ্ডিল্যপত্নী, লক্ষ্মী, মনুজায়া, শতরূপা, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা এঁদের যে গুণবর্ণনা করা হয়, আপনার সহধর্মিণীর ন্যায় সংসারে আর কেহ নাই। আমি অবগত আছি ইনি স্বামী ভোজন করলে, তৎপর উনি ভোজন করেন। স্বামী উপবিষ্ট হলে, উনি আসীন হয়েন। ভর্তা নিদ্রাগত হলে উনি নিদ্রা যান। আবার স্বামী উঠবার আগে উনি জেগে ওঠেন। ভূষণবিহীন হয়ে কখনো আপনার সম্মুখে আসেন না। স্বামীর আয়ুক্ষয় আশঙ্কায় কদাপি স্বামীর নাম মুখে আনেন না।

স্বামী অকারণ আক্রোশ করলেও লোপামুদ্রা কখন কুপিতা হন না। স্বামীকর্তৃক তিরস্কৃতা হলেও প্রসন্ন থাকেন। তাহারা স্বামীকে কোনোদিন কোনো আব্দার অনুরোধ করেন না। স্বামী যখন কোনো কাজের কথা বলেন, উত্তরে বলেন উহা ত হয়েই গেছে। স্বামী আহ্বান করলে তৎক্ষণাৎ গৃহকার্য পরিত্যাগপূর্বক সম্মুখে আসেন এবং প্রতীক্ষায় সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকেন। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকেও কিছু দান করেন না। যাবতীয় পূজা উপকরণ যথাযথ সুসজ্জিত করে দেন, সুস্বাদু অন্ন-ফলাদি ভর্তার উচ্ছিষ্ট ব্যতীত ভোজন করেন না। দেবতা, পিতৃগণ, গো, অতিথি ভিক্ষুক পরিচারকবর্গ, আত্মীয়কে না দিয়ে কোনো বস্তুই ভোজন করেন না। গৃহভাণ্ডারে টান না পড়ে তাই খুব সংযত ব্যয় করতে বিশেষ নিহতা তিনি। স্বামী না বললে স্বেচ্ছায় কোনো সামাজিক উৎসব বা তীর্থাদিতে কখনো যান না। দেবগুরু বৃহস্পতি এমনি ভাবে অগস্ত্য গৃহিণীর সুখ্যাতি করলেন! কারণ এই যে, গৃহকর্ত্রীর ব্যবহার কেমন হতে হয় তারই এই আখ্যান।

অগ্নিপুরাণ

ইহাতে কোনো সাম্প্রদায়িক ভাবের ছোঁয়া আদৌ নেই। অগ্নিপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ১৫ হাজার।

ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাস কর্তৃক রচিতবলে যে প্রবাদ আছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বেদব্যাস কৌরব-পাণ্ডবদের সমসাময়িক ব্যক্তি ; তাঁর অবস্থানকাল ৪ বছর পূর্বে বলতে হয়। কিন্তু পুরাণে এমন সব ব্যক্তির কথা আছে যা হিসাবে একেবারে মিলে না। তাছাড়া বিভিন্ন নাম ত জানা যায়ই। এটা পরিষ্কার বোঝা যায়, সুত কোনো রাজাদের স্তুতিপাঠক ছিলেন। তিনি সংকর জাতীয় মানুষ। তিনিই পুরাতন ঘটনা একত্রিত করে এক একখানি পুরাণ প্রস্তুত করতেও পারেন। সব পুরাণ তাঁর মুখ থেকেই ব্যক্ত দেখা যায়। যাই হোক এই সবই পণ্ডিতদের অনুমান !

অগ্নিপুরাণ ৩৮২ অধ্যায় সম্পূর্ণ আছে। এতে যেসব সূচি দেখা যায় তা এইরূপ— মৎস্যাদির অবতার, রামায়ণ, হরিবংশ, ভারত, নয় প্রকার সর্গ, বৈষ্ণবশাস্ত্র, পূজা, দীক্ষা, দেবাদি প্রতিষ্ঠা, পবিত্রারোহণ, প্রতিমালক্ষণাদি প্রাসাদ লক্ষণ, নানাবিধ মন্ত্র, শৈব, শাক্ত, সৌর আগম, নানাবিধ মণ্ডল, বাস্তু, বহুবিধ যন্ত্র, প্রলয়, ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল, ভুবনকোষ, দ্বীপ, বর্ষ, নদী, গয়া, গঙ্গা, প্রয়াগ, তীর্থমাহাত্ম্য, জ্যোতিষ শাস্ত্র, যুদ্ধ, জয়, সমুদ্র, মন্বন্তর, বর্ণধর্মাদি, অশৌচ,

দ্রব্যশুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, রাজধর্ম নানাবিধ ব্রত, ব্যবহার, শান্তি, ঋগ্বেদাদির বিধান, সূর্যবংশ, সৌমবংশ, ধনুর্বেদ, বৈদ্যশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, মীমাংসা, ন্যায়শাস্ত্র, পুরাণ সংখ্যা ও মাহাত্ম্য, ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, নির্ঘণ্ট, শিক্ষা, কল্প, নৈমিত্তিক প্রাকৃতিক এবং আত্যন্তিক, প্রলয়, বেদান্ত, ব্রহ্মবিজ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ, স্তোত্র, অষ্টাদশবিদ্যা, পরব্রহ্মের সপ্রপঞ্চ, নিষ্প্রপঞ্চরূপ এই সমস্ত বর্ণনা দেখে বোঝা যায় এটি একটি অতি মহৎ পুরাণ বটে।

ভবিষ্যপুরাণ

চতুর্মুখ ব্রহ্মা কর্তৃক মনুর নিকট কথিত হয়। অঘোরকল্পের বৃত্তান্ত কথন প্রসঙ্গে প্রধানত সূর্যের মাহাত্ম্য অবলম্বনে জগতের স্থিতি ও সৃষ্টি পদার্থের স্বরূপ কীর্তিত আছে। ইহাতে বহুল পরিমাণ ভবিষ্যবৃত্তান্ত বর্ণনা আছে। তাই নাম ভবিষ্য পুরাণ। সাত হাজার শ্লোকসংখ্যা ভবিষ্য পুরাণের বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা যুধিষ্ঠির। মহাভারত যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় এই বর্ণনা দেন শ্রীকৃষ্ণ।

এর অধিক ব্রতানুষ্ঠানাধির দান ধর্মের কথাই বেশি। রথযাত্রা মদনোৎসব কল্কিপুরাণ এইসব ভবিষ্যৎ পুরাণের অন্তর্গত। প্রথম অংশে ৬টি অধ্যায় আছে। দ্বিতীয় অংশে ৭টি অধ্যায় এবং তৃতীয়াংশে ২১টি অধ্যায় আছে।

কল্কি অবতারের বিষয় বর্ণনা আছে বলে একে কল্কিপুরাণও বলে। এতে কল্কির জন্ম হতে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা আছে। কলিযুগ এবং বুদ্ধাবতার কথাও আছে।

কোনো কোনো পণ্ডিত বিবেচনা করেন কল্কি পুরাণখানি আধুনিক কালের সংযোজনা। অনেকে স্বতন্ত্র উপপুরাণ বলতে আগ্রহী বোঝা যায়। ভবিষ্যপুরাণে আছে রাজা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও চন্দ্রহাসের মনোজ্ঞ কাহিনী। ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজার কন্যা 'বিষয়া'র বিবাহ হয় ঐ চন্দ্রহাসের সঙ্গে। সে এক রহস্যময় নাটক।

কাহিনীটি এইরূপ ঃ পুরাকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে কোনো এর রাজা ছিলেন তাঁর রাজ্যের কোনো গ্রামাধীশের চন্দ্রহাস নামে এক পুত্র ছিল। পুত্রের বয়স পঞ্চম বৎসর যখন তখন তার বাবা মারা যান। তিনি শত্রু কর্তৃক নিহত হন। চন্দ্রহাসের মাতা, চন্দ্রহাসকে নিয়ে রাজার মন্ত্রীর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। মন্ত্রী মাতা ও পুত্রকে সাদরে আশ্রয় দিলেন। চন্দ্রহাস-জননী এখানে ছেলেকে নিয়ে দিনযাপন করতে থাকেন। কায়মনে তাঁদের অবস্থার জন্য জগদীশ্বরের সাধন-ভজন করেন। পুত্র চন্দ্রহাস মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে খেলাধুলা করে। একদিন খেলতে খেলতে রাজসভায় হাজির হল। তখন রাজসভায় নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য অনেক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সামুদ্রিক বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিও ছিলেন। চন্দ্রহাসকে দেখে ঐ জ্যোতিষী বললেন 'হে রাজা, এই যে ছেলে এ তো যেমন-তেমন ছেলে নয় ; ভবিষ্যতে অসাধারণ বীর সাহসী হবে এবং এর অগাধ ধনসম্পদ হবে। এমনকি রাজা হওয়ার লক্ষণও আছে। তাছাড়া এ আপনার ভবিষ্যৎ জামাতাও হবে। এইসব কথা শুনে রাজা কোনো মন্তব্য করলেন না। গভীর চিন্তায় পড়লেন। সিদ্ধান্ত করলেন, চন্দ্রহাসকে বধ করবেন। যেমন মনস্থ করলেন, অমনি ঘাতককে হুকুম দিলেন, "যাও ওকে নিয়ে বধ কর, আমাকে নিদর্শন দেখাবে।"

ঘাতক ছেলেকে নিয়ে গেল কিন্তু সে ভাবতে লাগল, মায়ের একমাত্র ছেলে, বাবা, নেই। রাজা কেনই বা খুন করতে চান, কে জানে! ঘাতকের মনে নানা চিন্তা হতে লাগল। সে তাকে হত্যা না করে একটি আঙ্গুল কেটে নিল। একহাতে চন্দ্রহাসের ৬টি আঙ্গুল ছিল, তারই একটি কেটে সে রাজাকে দেখাল— "সে খুন হয়েছে।"

এদিকে চন্দ্রহাস গভীর বনমধ্যে একাকী রোদন করতে থাকল। এমন সময় সেই গভীর বনে অন্য এক রাজা শিকারে গিয়েছেন। তার কান্না শুনতে পেয়ে কাছে গেলেন।

বালক বলল, "আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজার মন্ত্রীর বাড়িতে থাকতাম। কোনো শত্রু আমাকে এই বনে এনে আমার এই আঙ্গুল কেটে ফেলে রেখে চলে গেছে।"

ঐ রাজার কোনো পুত্র ছিল না তিনি চন্দ্রহাসের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। এবং তাঁর পত্নীর হাতে অর্পণ করে পালন করবার নির্দেশ দিলেন। চন্দ্রহাস সেই স্থানে যৌবনপ্রাপ্ত হল।

চন্দ্রহাস অপূর্ব কান্তিমান কন্দর্পতুল্য হয়েছে। রাজা ধৃষ্টদ্যুম্ন জানতে পেরেছেন, চন্দ্রহাস এক রাজার গৃহে অবস্থান করছে। তখন মন্ত্রীকে তাঁর কাছে পাঠালেন, ঐ রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে চন্দ্রহাসকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

অনন্তর চিন্তান্বিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, চন্দ্রহাসকে ছলনায় বধ করার জন্য চক্রান্ত করলেন। একটি চিঠি লিখে ছেলে মদনের কাছে পাঠালেন চন্দ্রহাসকেই। ধৃষ্টদুম্ন অন্যত্র তখন অবস্থান করছিলেন।

চিঠিতে লেখা আছে, "মদন এই চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি একে বিষ দান করবে।" চন্দ্রহাস রাজবাটীতে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, যুবরাজ মদন নিদ্রামগ্ন। তখন চন্দ্রহাস বাহির বাটীর এক বৃক্ষতলায় শয়ন করল এবং নিদ্রিত হয়ে পড়ল। এই সময় বিষয়া নামে রাজকন্যা সখীদিগকে ডেকে বললেন, "দেখ কে ঐ পুরুষশ্রেষ্ঠ তরুমূলে নিদ্রা যাচ্ছে, আমি বিবেচনা করি ওর পরিচয় জানা দরকার। তিনি আরো বললেন, উহার মস্তক সংলগ্ন একটি পত্র দেখা যাচ্ছে ওটি নিয়ে এস।"

এই কথা শুনে এক সখি ধীরে ধীরে সমীপস্থ হয়ে ঐ চিঠি এনে রাজকন্যার হাতে দিল। কন্যা চিঠি খুলে সব অবগত হল এবং পিতার এই কাজ বুঝে অতি সঙ্গোপনে ঐ চিঠিতে লেখা "বিষ" কথাটির পরিবর্তে বিষয়া দান করবে লিখে, সখির দ্বারা যথাস্থানে পত্র রেখে দেওয়া হল। যুবক চন্দ্রহাস জাগরিত হযে ঐ চিঠি মদনকে দিলেন। মদন চিঠি পাঠ করেই মহাধূমধাম আয়োজনে চন্দ্রহাসের সাথে তার বোনের বিবাহ কার্য নিষ্পন্ন করলেন।

রাজা ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজবাটীতে ফিরে এসে এই ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, মদনকে ডাকা হল, চিঠি তলব করা হল। না। সব যেন ঠিক আছে। ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য চিন্তা করে ফেললেন "যাও আজ রাতে রাজবাড়ির উদ্যানবাটীতে কুলদেবীর কাছে পূজা দেওয়া দরকার "তোমরা নতুন সংসার জীবনে প্রবেশ করছ তো!" আসল ষড়যন্ত্র হল, ঐ মন্দিরে খতম করে দেওয়া হবে। পরিকল্পনা পাকা, রাত্রে উদ্যানবাটীর মন্দিরের দিকে কেউ না যায় প্রহরা নিযুক্ত হয়েছে।

ঘোর অন্ধকার রাত! রাজপুত্র মদন নিজেকে খুব চঞ্চল ও অস্থির বোধ করতে থাকল! মন মানছে না। ছুটল মন্দিরের দিকে।

ওদিকে যে কারও যাওয়া নিষেধ! রাজ আদেশ। পথে মদন খুন হয়ে গেল! হৈচৈ পড়ে গেল। পরস্পর ব্যাপারটা বোঝবার কোনো অসুবিধার কথা নয়। হায়! চন্দ্রহাস, মৃতরাজপুত্রকে মন্দিরে নিয়ে মায়ের কাছে আকুল নিবেদন—মা! হয় তুমি আমাকে নাও নতুবা রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে দাও। তা যদি না কর আমি নিজে আত্মাহুদের আত্মঘাতী হব। দেখি মায়ের কি করুণা। রাজবাড়ির কুলদেবী 'মা' রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে দে মা। নচেৎ, আমি এ জীবন রাখব না, রাখব না।

মা ! চন্দ্রহাসের আবেদনে অবশেষে সাড়া দিলেন। মদনকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিলেন। এই হল শেষ কাহিনীর।

১৮টি পুরাণের কথা অতি ক্ষুদ্রাকারে তুলে ধরা হল মাত্র। ১৮টি পুরাণের নাম অর্থাৎ এই মহাপুরাণ সহজে মনে রাখার জন্য বামন পুরাণে ও দেবীভাগবতে এইরূপ উক্তি আছে—

"ম দ্বয়ং ভদ্বয়ং চৈব
ব্র ত্রয়ং ব চতুষ্টয়ম।
অ-না-প-লিং-গ-কু-স্কানি
পুরাণানি পৃথক পৃথক।।

মহাপুরাণের তালিকা মনে রাখার জন্য ঐটি বাংলা করলে এইরূপ মানে দাঁড়ায়—

ম দ্বয়ং মৎস্য ও মার্কণ্ডেয়
ভ দ্বয়ং ভাগবত ও ভবিষ্য
ব্র-ত্রয়ং-ব্রহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত, ব্রহ্মাণ্ড
ব চতুষ্টয়ম বিষ্ণু বরাহ, বামন-বায়ু
অ অগ্নি। নী নারদ। প পদ্ম। লিং লিঙ্গ
গ গরুড়। কূ কর্ম। স্ক স্কন্দ।

এই পুরাণগুলির আবার সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বিধায় ভাগ আছে।
নানা পুরাণ গ্রন্থে বলা আছে—
সাত্ত্বিক—"বৈস্তুবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতম্ শুভম্।
গরুড়ঞ্চ তথা পদ্মং বারাহং শুভদর্শনে
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি চ।।
রাজস—"ব্রহ্মাণ্ডং। ব্রহ্মবৈবর্তং।"
তামস—"মাৎস্যং কৌর্ম্যং তথা লৈঙ্গম শৈবং
স্কন্দং তথৈব চ
আগ্নেয়াংশ্চ ষড়েতানি তামসানি
নিবেধিত মে।।"

কিন্তু নিম্নলিখিত বিভাগখানি বৈপ্লবিক ভাবে সিদ্ধান্ত।

১।	ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ শ্লোকসংখ্যা		১২০০০	ব্রহ্মার
২।	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ	"	১৮০০০	,,
৩।	মার্কণ্ডেয়	,,	৯০০০	,,
৪।	ভবিষ্য পুরাণ		১৪৫০০	,,
৫।	বামন পুরাণ		১০০০০	,,
৬।	ব্রহ্মপুরাণ		১০০০০	,,
৭।	বিষ্ণুপুরাণ		২৩০০০	বিষ্ণুর
৮।	নারদীয়	পুরাণ	২৫০০০	,,
৯।	ভাগবত	,,	১৮০০০	,,
১০।	গরুড়	,,	১৯০০০	,,
১১।	পদ্ম	,,	৫৫০০০	,,
১২।	বরাহ	,,	২৪০০০	,,
১৩।	মৎস্যপুরাণ	,,	১৪০০০	শিবের
১৪।	কূর্ম	,,	১৭০০০	,,
১৫।	লিঙ্গ	,,	১১০০০	,,
১৬।	বায়ু	,,	২৪০০০	,,
১৭।	স্কন্দ	,,	৮১১০০	,,
১৮।	অগ্নি	,,	১৫৪০০	,,

অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে মীমাংসা শ্রেষ্ঠ।
মীমাংসা অপেক্ষা তর্কশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ।
তর্কশাস্ত্র অপেক্ষা পুরাণ শ্রেষ্ঠ।
পুরাণ অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ।
ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রুতি শ্রেষ্ঠ।
শ্রুতি অপেক্ষা উপনিসদ শ্রেষ্ঠ।
উপনিষদ অপেক্ষা 'গায়ত্রী" শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত।

গায়ত্র্যে পরো বিষ্ণু গায়ত্র্যে পরঃ শিবঃ।
গায়ত্র্যে পরো ব্রহ্মা গায়ত্র্যে ত্রয়ী ততঃ।।

গায়ত্রী সম্পর্কে এইরূপ শাস্ত্রে আছে—

সূর্যদেব মান্দেহ নামক নিশাচরকে বিনাশ করার জন্য উদয়-অস্ত ব্রহ্মাণ কর্তৃক পরিত্যক্ত তিন অঞ্জলি জল দান চাহেন "গায়ত্রী মন্ত্রপূত জল" ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রার্থনা করেন।। যিনি এই জল দান করেন তিনি ত্রিলোকদান ফল লাভ করেন। সাবিত্রীদেব যথাকালে সম্যক উপাসিত ঐ জল প্রাপ্ত হলে ; তাঁকে আয়ু আরোগ্য, ঐশ্বর্য, রত্ন, হস্তী, অশ্ব, স্ত্রী পুত্রী মিত্র ক্ষেত্র বিবিধ ভোগ্য দান করেন। স্বর্গ এবং মোক্ষ পর্যন্ত প্রদান করেন।

মহামুনি বিশ্বামিত্র এইভাবে ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করেছিলেন।

রামায়ণ কথা

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয় সরিতশ্চ মহীতলে
তাবৎ রামায়ণী কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।"

৭টি কাণ্ডে রামায়ণ মহাগ্রন্থ রচিত। মোট ২৪০০০ শ্লোক আছে।

মহর্ষি বাল্মীকি নারদকে সম্বোধন করে বললেন, "হে দেব এই পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তি গুণবান্ বিদ্বান, মহাবল ও পরাক্রান্ত মহাত্মা ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, কৃতজ্ঞ সচ্চরিত্র আছেন কি? কোনো ব্যক্তি সকল প্রাণীর হিতসাধন করতে বদ্ধপরিকর, কোনো ব্যক্তি লোক ব্যবহার কুশল অদ্বিতীয় সুচতুর ও প্রিয়দর্শন ? কোনো ব্যক্তি কি রোষ ও অনুসূয়ার বশবর্তী নহেন? রণস্থলে ক্রোধবিশিষ্ট হলে যাকে দেবতাদেরও ভয় হয়? হে! তপোধন! পৃথিবীতে এরূপ গুণসম্পন্ন মনুষ্য কে আছেন এক্ষণে আমাকে বলুন।"

ত্রিলোকদর্শী মহর্ষি নারদ, বাল্মীকির বাক্য শুনে তাঁকে সম্ভাষণপূর্ব, বললেন, "তুমি যে, সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করেছ তৎসমুদয় সামান্য মনুষ্যের সুলভ নহে জানি, এক্ষণে আমি স্মরণ করি রাম নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবিখ্যাত এক ব্যক্তি আছেন। তাঁর বাহু যুগল আজানুলম্বিত, স্কন্ধ অতি উন্নত, গ্রীবাদেশ রেখাত্রয়ে অঙ্কিত। বক্ষঃস্থল অতিবিশাল, মস্তক সুগঠিত। ললাট অতি সুন্দর, জত্রুদ্বয় গুঢ়, হনু বিলক্ষণ স্থূল, গোলের উপরি অংশ নেত্র আকর্ণ বিস্তৃত, বর্ণ শ্যামল, তিনি নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্বা তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানানুরূপ ও বিরল।

এই ব্যক্তি হলেন রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক। এই গ্রন্থখানি ভবিষ্যতের জন্য কি বার্তা নিয়ে আসছে ভাবী অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র তা বলার অপেক্ষা রাখে কি?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মানসী কাব্যে "ভাষা ও ছন্দ" তারই প্রতিধ্বনি শুনিয়েছেন।

উইটিবি সমাহিত "তাপস বাল্মীকি"।

মাঃ নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ
যৎ কৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম্।। ১৫
তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বিক্ষতঃ।
শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতংময়া।। ১৬

শূন্যে নিনাদিত ধ্বনি শুনে স্বয়ং ব্রহ্মা নারদ মুনিকে পাঠিয়াছিলেন সেই তমসার তীরে।

"যে ধ্বনি শুনিনু কানে, তারে লয়ে কি করিবেন তিনি?" শুনে এস তুমি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য "ভাষা ও ছন্দে" আছে—

"যাও তুমি তমসার তীরে,
বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এসো, বোলো তারে "ওগো, ভাগ্যবান,
এ মহাসংগীতধন কাহারে করিবে তুমি দান?
এই ছন্দে গাঁথি লয়ে কোন্ দেবতার যশঃ কথা

স্বর্গের অমরে কবি মর্ত্যলোকে দিবে অমরতা?"
কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর
"দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচিরাচর,
ভাষাশূন্য, অর্থহারা। বহ্নি ঊর্ধ্বে মেলিয়া অঙ্গুলি,
ইঙ্গিতে করিছে স্তব ; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি
কী কহিতে স্বর্গ জানে। অরণ্য উঠায়ে লক্ষ শাখা
মর্মরিছে মহামন্ত্র,

....

"স্বর্গ হতে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে,
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে—
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দ গানে।"

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন—

"ইহা স্মরণ করিবেন যে, ইহা কোনো ঐতিহাসিক গৌরব কাহিনী নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত্র ; ভারতবর্ষ ইহা শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাহা অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছি। হিন্দু ধর্মের আদর্শ অনুসারে বামায়ণের রামচন্দ্র দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহার কাহিনী বর্ণনা করা আমি অবান্তর মনে করিয়া এইখানে রামায়ণের ইতি টানিলাম।"

মহাভারত

পুরাকালে ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। একদা রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া উদ্দেশ্যে কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন, মুনিবর আশ্রমে ছিলেন না। শকুন্তলা বিবিধ বিধানে রাজ অতিথির সৎকার ও শুশ্রূষাদি করেন। রাজা দুষ্মন্ত অবগত হলেন, শকুন্তলা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকা অপ্সরার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেছেন। এবং কণ্বমুনির আশ্রমে পালিত হয়েছেন। রাজা দুষ্মন্ত গান্ধর্ব মতে শকুন্তলাকে বিবাহ করেন এবং কয়েকদিন তার সাহচর্যে দিন কাটানোর পরে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করে তিনি বাজ্যে ফিরে যান।

শকুন্তলার গর্ভে ভবিষ্যতে যে ছেলে হল সেই ছেলে রাজা ভবত নামে বিদিত, যার নামে এদেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। রাজা ভরত অতিশয় খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তদ্বংশীয় পরবর্তী রাজন্যবর্গ তদীয় নাম অনুসারে ভারত নামে কীর্তিত হলেন।

রাজা ভরতের হস্তী নামে এক প্রপৌত্র ছিলেন, সেই হস্তী রাজার স্থাপিত নগর ছিল "হস্তিনা"। তদীয় প্রপৌত্র সংবরণ রাজার কুরু নামে এক পুত্র হয়। এই কুরু বয়সকালে নিবিড় জঙ্গল পরিষ্কার করে সুবিখ্যাত কুরুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

কুরুর পাঁচ পুরুষের পরে প্রতীপের আবির্ভাব হয়, প্রতীপ রাজার সুবিখ্যাত পুত্র শান্তনু এক সময় গঙ্গা দেবীর সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হন ও বিবাহ করেন। গঙ্গাদেবীর গর্ভে একে একে ৭টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। এই গঙ্গার ৮ম গর্ভজাত সন্তান দেবব্রত যার পরবর্তীকালে ভীষ্ম নাম হয়েছে। তৎকালে সন্নিহিত অরণ্য

প্রদেশের জনৈক দাস রাজার কন্যা মৎস্যগন্ধার সহিত মহর্ষি পরাশরের মিলনের ফলে বেদব্যাসের (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন) নামে পুত্রের জন্ম হয়। একদা সেই দাস রাজার কন্যা মৎস্যগন্ধা (সত্যবতীর) সহিত রাজা শান্তনুর সাক্ষাৎ হলে রাজা শান্তনু কন্যার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হন। রাজা শান্তনু ঐ কন্যাকে বিবাহ করার জন্য বিচলিত হয়ে পড়েন। রাজপাটে তাঁর মনোনিবেশ হয় না, এইরূপ কারণে দাসরাজার সমীপে স্বয়ং দেবব্রত হাজির হন পিতার বিবাহের নিমিত্ত। দাস রাজা তো সম্মতি দিতে চান না। কারণ তাঁর কন্যার গর্ভজাত সন্তানের কোনোদিন রাজা হওয়ার সম্ভাবনা নেই ; যেহেতু দেবব্রতই রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

এই ঘটনাই। দেবব্রতকে ভীষ্ম করেছে। ভীষ্ম থেকেছেন "চিরকুমার"।

ভীষ্ম আরো প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি নিজ হাতে সত্যবতীর ছেলেকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাবেন।

সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র জন্ম নেয়। বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকে চলে যান।

স্বীয় সন্তানের বংশরক্ষার বাসনায় সত্যবতী আপনার পুত্র (কুসারীকালীন) দ্বৈপায়ন ব্যাসকে স্মরণ করেন, এবং তাঁর বংশ রক্ষার জন্য যথাযথ বিধান সহ অনুরোধ রাখেন। অতঃপর ব্যাসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন—

অম্বিকা মহিষীর গর্ভে—ধৃতরাষ্ট্র
অম্বালিকা „ „ —পাণ্ডু
দাসীর „ —বিদুর।

ধৃতরাষ্ট্র জন্ম অন্ধ বলেই তঁর ছোট ভাই পাণ্ডু রাজা হন। গান্ধাব রাজনন্দিনী গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্র পরিণয় হয়। পাণ্ডুর দুই স্ত্রী— কুন্তী এবং মাদ্রী। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ও একটি কন্যা জন্মলাভ করে। পাণ্ডু অভিশপ্ত হেতু দৈব্য ইচ্ছায় ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠির পঞ্চপুত্র লাভ করেন। মদ্র রাজনন্দিনী পৃথা বা কুন্তী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বা পিতৃষ্বসা বা পিসিমা। কুন্তীর (কানীনকালীন) এক পুত্র ছিল। সূর্যপুত্র কর্ণ। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। বায়ু-পুত্র ভীম। নকুল সহদেব ছিল অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে জন্ম।

একদা তীর্থযাত্রায় পাণ্ডু সস্ত্রীক গমন করেন। সময়, বসন্তকাল। বনের মনোহব শোভা চারদিকে পাখিব কলকাকলি। সরোবরে মরাল-মরালী বা বিহার করছে। চক্রবাক উড়ছে ওদিকে-এদিকে মাযাহরিণীর দল ঘুরছে। এমন এক পরিবেশ পাণ্ডুর মন উন্মাদনায় ভরে উঠল। তিনি মাদ্রীকে আকর্ষণ করলেন, রমণ করলেন। পাণ্ডুর প্রাণবায়ু স্থির হয়ে গেল। পাণ্ডু মারা গেলেন।

যথাযথ পাণ্ডুর সৎকার অন্তে ঋষিগণ সমভিব্যাহারে কুন্তী ও মাদ্রী ছেলেদের সঙ্গে রাজধানী হস্তিনাপুরে এলেন। এবং ধৃতরাষ্ট্র স্নেহে পালিত হয়েন। পরিণত কালে রাজ্যের অংশ ভাগ আইন মতে অর্ধেক অংশ যুধিষ্ঠিরদের প্রাপ্য। কিন্তু অন্ধ রাজার গোঁয়ার ছেলে দুর্যোধন ভীষণ স্বার্থপর তিনি আদৌ রাজ্য ভাগ দিতে রাজি নন।

এই মহাভারতের নায়ক কে? নিশ্চিত যুধিষ্ঠির ধীরোচিত নায়ক। কিন্তু মুখ্য ভূমিকায় দুটি চরিত্র কৃষ্ণ এবং অর্জুন।

মহাভারতকেই ভূমিকা করে আমাদের গণসাহিত্য গীতা গ্রন্থখানি রচিত। এখানে কথক শ্রীকৃষ্ণ। শ্রোতা অর্জুন। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, তবে দেখা যায়, মহাভারতের শান্তিপর্ব, উপনিষদ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ হতে অনেক শ্লোক গ্রহণ করে এই গীতা গ্রন্থখানি রচিত। শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে সুন্দর পরিবেশে বিবৃত হয়েছে ।

সারা পৃথিবীতে আর কোনো এমন গ্রন্থ নেই যার তিন হাজার সংস্করণ আছে। গীতা মহৎ ও পবিত্র পুস্তক। গীতা সম্পূর্ণ জ্ঞান কাণ্ডের আধার বোঝা যায়। মহাভারতের নাম মনে এলে সর্বাগ্রে কৃষ্ণ এবং অর্জুনের নাম আসে। গীতা বললেই আসে সেই কৃষ্ণ এবং অর্জুন।

মহাভারত আর গীতা কেন হাত ধরাধরি করে প্রকাশিত হল?

"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসুবঃ।

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বতঃ সঞ্জয়।।"১।১

অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন গীতার নিগূঢ়তম তাৎপর্য বোঝাবার জন্যই প্রথমেই এইরূপ উক্তি।

এটি মহৎ প্রয়াস বলা যায়। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। ইনি রাজা, ১০০ শত ছেলে তাঁর। একটি মেয়ে। আমাদের দেহ রাজ্যের রাজা হল মন। মন অন্ধ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এরা সদা সচেতন বিধায় ১০ দিক × ১০ দিক ১০০ পুত্র। চক্ষু, কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক = জ্ঞান, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান = কর্ম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ২টি পক্ষ = প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। কর্ম ইন্দ্রিয়কে সংযত করে, জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা শুদ্ধ আত্মায় পৌঁছানোর লড়াই হল কুরক্ষেত্রের যুদ্ধ।

অর্জুন—তেজতত্ত্বঃ এর স্থান নাভিচক্র। জঠরাগ্নি অর্জুন সবকিছু করতে সিদ্ধহস্ত (সেইজন্য) সব্যসাচী।

অর্জুন যুদ্ধের প্রাক মুহূর্তে বিষাদগ্রস্ত! আত্মীয়স্বজন, সম্বন্ধী, শালা, শ্বশুর, মাতুল বধ করে কাদের নিয়ে রাজত্ব করবেন। সত্যি তো, কামনা-বাসনা বিষয় ভোগ চলে গেলে থাকল কী? জীবন অর্থশূন্য হয়ে যাবেই তো! সেই কারণে বিষাদমগ্ন অর্জুন। সাধন সমর, সেই বড় কঠিন কাজ। যোগশাস্ত্র না পড়লে এ জিনিস বোঝা যাবে না। ষোড়যোগে যারা পঞ্চ 'ম' কার করেন। তাঁরাই প্রকৃত যোগ সাধক।

আমবা সাধারণভাবে বুঝে থাকি এই যে, রাজাপাট-বাড়ি-গাড়ি-সুন্দরী-নারী—যুদ্ধে মরে গেলে তো সবই শেষ। যদি যুদ্ধে জয়ী হয়ও বিরোধীরা বা উক্ত আত্মীয়স্বজন তারা থাকল না। এই বোঝাবার জন্য এই রূপকের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

বলাবাহুল্য, আমাদের হিন্দুদের সকল ধর্ম শাস্ত্রগুলি এই রকম রূপক দ্বারা আবৃত আছে। যারা সাধন পথের পথিক তাঁদের জন্য গুরু দরকার হয়। কেজোগুরু নয়। ভীম হচ্ছেন বায়ু তত্ত্ব। শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ারূপ বায়ু অদৃশ্য শক্তি, অসীম প্রাণশক্তি।

নকুল + সহদেব = শরীরের রক্ত, মাংস, জলীয় পদার্থসমূহ।

যুধিষ্ঠির = স্থির চিত্ত, কোনো কারণে বিক্ষুব্ধ নয়। সাধনায় মনে নিবৃত্তি তথা যত কিছু চাওয়াপাওয়ার সকলের অবসান সর্বত্যাগী হতেই হয়। সর্বত্যাগী হবে যোগী। উলটনা পালটানা পাশা খেলা বা জুয়া খেলা করে রাজ্যপাট এবং স্ত্রী সবই চলে গেল।

প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা মহাভারতের এক মহা বিস্ময়কর ছবি। যুধিষ্ঠির নত মস্তক, অন্য চারভাইয়ের গায়ে গাম ঝরছে। কিন্তু যুধিষ্ঠির একটিবার যদি উচ্চারণ করতেন, ভীম তুমি এর প্রতিবিধান করো তাহলে মুহূর্তে মনে হয় রাজসভা সুদ্ধ নদীর জলে নিক্ষেপ করতেন একা ভীম। কিন্তু না। সকল ত্যাগ না করলে সিদ্ধি লাভ হয় না, হতে পারে না। যুধিষ্ঠির শরীর নিয়ে স্বর্গে গেলেন। আর কিন্তু কারও যাওয়া হল না। আমরা জানি, শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন হরিহরআত্মা। বিশেষত সম্পর্কিত বান্ধব বটে। তথাপি কৃষ্ণ কেন অন্তত অর্জুনকে সশরীরে স্বর্গে পাঠালেন না?

শ্রীকৃষ্ণ। কৃ ধাতু হল কর্ষণ করা—নিবৃত্তি সহায়ক। শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ নিয়ত যে কর্ষণ ক্রিয়া চলছে তার স্থিতি হেতু "কূটস্থ চৈতন্য" স্থির চিত্ত বা ব্রাহ্মীস্থিতি-ই-কৃষ্ণ কেশব! ক-ব্রহ্মা। অ-বিষ্ণু। ঈশ-শিব। শিব গমনার্থ বা সঞ্চলনশীল সৃষ্টির গতি। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ইহারা দেবতা। যিনি শাসনাধীন আছেন তিনিই কূটস্থ চৈতন্য ভগবান কৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন যথাক্রমে পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খধনি করলেন। ভৃঙ্গ, বেণু, বীণা ঘণ্টা ও মেঘের ধ্বনি = পাঞ্চজন্য। দিব = আকাশ। দত্ত = প্রকাশ।

আজ্ঞাচিক্রস্থ কূটস্থ হতে বায়ুর শব্দ, নাদরূপে তেজের দ্বারা প্রকাশ হতে থাকল।

পৌণ্ড্র, সুঘোষ, মণিপুষ্পক শঙ্খ যথাক্রমে ভীম, নকুল ও সহদেবের।

সিংহনাদ—সুন্দর শব্দ—মহৎজ্যোতিঃ। কুরুক্ষেত্রে এই সকল শঙ্খনিনাদ বলা হয়েছে।

শিখণ্ডী—অর্থাৎ জ্যোতির মধ্যস্থিত-অতি ভিতর যে স্থান তার কথাই বলা হয়।

সাত্যকি—সুমতি

দ্রুপদ—শীঘ্রগতি

সঞ্জয়—দিব্যদৃষ্টি

দ্রৌপদীর পুত্রগণ—পঞ্চতত্ত্বের গুণসমূহ।

কপিধ্বজ—বায়ুরূপী হনুমান। কপি-কাঁপা প্রাণরূপী রুদ্রের কম্পন।

প্রণবোধনুঃ—ওঁ-কার রূপ দেহই ধনুস্বরূপ।

প্রাণের চঞ্চলতাই .... মন।

গুড়াকেশ—যিনি নিদ্রিত অবস্থাকে জয় করেছেন। প্রাণরূপ আত্মাই পিতা।

ভীষ্ম—ভয়। এখানে পিতৃব্য ভীষ্ম।

আচার্য—জেদ।

কৃপাচার্য উভয়ের গুরু। উভয়পক্ষের অর্থাৎ ভালোতে জেদ থাকে, মন্দতেও জেদ থাকে। শুভকার্যে জেদ শুভ বা সুফল দান করে। মন্দ কাজে জেদ ক্ষতিকর, ভয়ঙ্কর বিপদজ্জনক।

জীবভাবে ইন্দ্রিয়গণকে স্বজন বলে।

ইন্দ্রিয়গণ দেহের সম্মুখে আছে এগুলি পশ্চাতে নেই। ইন্দ্রিয় দ্বারা জীব ভোগ সুখ আস্বাদন করে। গীতা প্রথম অধ্যায় ১। ৩৮—৪১ দ্রঃ।

যদ্যপেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদোহে চ পাতকম্।।

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপাশ্যদ্ভির্জনার্দন।।
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোহিভিভবত্যুত।।
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।। ১।।৩৮-৪১।।

শ্লোকগুলির বাংলা অর্থ হল—

জীব পরস্পর প্রসূত বংশকেই কুল বলে। এই কারণে ইন্দ্রিয়ের অভাবে জড়পিণ্ড হয়ে যায়। বংশোৎপত্তি আর হয় না ; এতে ইন্দ্রিয় দমন রূপ যুদ্ধ পাপ। সাধন সমর হতে নিবৃত্ত হতে চাইছেন এই কারণে। এইজন্য বলা হল—কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখেও এই পাপ কাজ হতে নিবৃত্ত হব না কেন?

আত্মাই প্রকৃত কুল, সেই আত্মার ধর্মই সনাতন ধর্ম, অর্থাৎ বলা হয় কুলধর্ম।

প্রাণাভাবে বংশ থাকে না, উৎপত্তি হয় না জীবভাবে পুত্রপৌত্রাদি বংশকে কুল বলে বংশোৎপত্তি অভাব হেতু কুলক্ষয়।

সাধন দ্বারা প্রকৃত কুলের প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট পুত্র উৎপন্ন হওয়ার ক্ষমতা থাকে না। এই স্বধর্ম রূপ আত্মকর্ম করণে কুলক্ষয় হয় না। অ-কারণে প্রাণের গতি চঞ্চল হয়। আয়ু ক্ষয় হয়, কুলক্ষয় হয়।

হে কৃষ্ণ ! স্ত্রীগণ দুষ্টা হলে বর্ণসংকর হয় ইত্যাদির ঐরূপ তাৎপর্য হেতু শ্লোকের উদ্ভব। কুলঘ্নদিগের এবং কুলের নরকের নিমিত্তই বর্ণসংকর জন্মে। কুলঘ্ন কুলের ক্ষয়কারী। প্রাণরূপী আত্মাই হল কুল, সেই প্রাণের যে ক্ষয় করে তাকে কুলঘ্ন বলে। কুলের 'নরক' অর্থাৎ দেহের অর্দ্ধেক স্বর্গ অর্দ্ধেক নরক—তমোগুণের স্থান তাই নরক। অজ্ঞান কর্তৃক কুলরূপী আত্মাকে অধোগতি করার নামই কুলঘ্নের নরক।

পিণ্ড কী?

কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদং হংস মুদাহৃতম্ ইতি।

গুরুগীতা দ্রঃ।

স্থির বায়ুরূপিণী কুণ্ডলিনী অচৈতন্যভাবে মূলাধারে আছে, এই মূলাধারস্থ স্থির কুণ্ডলিনীকে চেতনময়ী করে বিষ্ণুপদে বা "যে স্থান হতে অজপারূপ হংসের উৎপত্তি" আজ্ঞাচক্রে, স্থিতিরূপ (অর্পণ) করতে পারলে প্রকৃত পিণ্ডদান অর্থাৎ জীবের মুক্তি হয়। মূল ধারস্থ স্থির বায়ুকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করে রাখার নাম—কুণ্ডলিনীর চৈতন্যাবস্থা। এই যিনি করতে পারেন তাঁর চৈতন্যরূপ পুত্র লাভ হয়। তিনি এবং তাঁর পিতৃপুরুষগণ সেই পুত্রের দ্বারা নরক হতে উদ্ধার লাভ। (পিতা হ বৈ প্রাণঃ) প্রাণকে অধঃপাতিত করার নাম পিতৃগণের পতিত হওয়া এবং পণ্ডিতরূপ কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যাবস্থাই প্রবোধ রূপ—প্রকৃষ্টজ্ঞানরূপ পুত্র কর্তৃক পুং নামক নরক থেকে উদ্ধার পাওয়া। ইহাই পিণ্ডদান।

এই ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

ঋগ্‌বেদের আলোচনায় তিনি বলেন,

"ইন্দ্র কে? বিষ্ণু কে? কোনো মানুষ কি তাঁদের দেখেছেন ? তাঁদের অস্তিত্ব কী করে বোঝা গেল? অনেক পাকা হিন্দু বলতে পারেন হ্যাঁ, তাঁদের দেখে এসেছেন। সেকালে ঋষিদের স্বর্গের সাথে যোগাযোগ ছিল বৈকি? তাঁদের সাথে যে দেখাসাক্ষাৎ হত পুরাণ ইতিহাসে তো আছে।

এই কথার কোনো উত্তর নেই, তবে এ সম্পর্কে একটি কথা বলতে হয় যে, পুরাণেতিহাসে যে ইন্দ্রাদি দেবতার বর্ণনা আছে যাঁদের সহিত রাজর্ষি মহর্ষিদের সাক্ষাৎ হত যাঁরা পৃথিবীতে এসে অবতাররূপে লীলা করতেন, তাঁদের চরিত্র বড় চমৎকার ! কেহ গুরুতর ! কেহ গুরু তল্পগামী, কেহ চৌর, কেহ বাঙ্গালি বাবুদিগের ন্যায় ! ইন্দ্রিয় পরবশ মোতাবেক নন্দনকানন মধ্যে রম্ভা তিলোত্তমা উর্বশী মেনকা লইয়া কেলি করিতেন ; কেহ অত্যন্ত লোভী ছিলেন। মোট কথা মহাপাতকী ছিলেন। আমার মতে তাঁরা দুর্বল ভোগবাদী ছিলেন শুধু তাই নয়, অসুরদের পদানত হইতেও দেখা যায়। কেহ কেহ বিতাড়িত হয়ে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেছেন। তাঁরা অতি হীন চরিত্রের ছিলেন জানা যায়। কখনো দেখা যায় দুর্বাসা, বশিষ্ঠ ইত্যাদি মুনিদের অভিশাপে বিপদগ্রস্ত ছিলেন। তাঁরা সর্বদা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে প্রাণধারণ করতেন। এই কি দেবচরিত্র ! ইহাদের সাথে নিকৃষ্ট মানব চরিত্রের কোনো প্রভেদ দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট এই সকল দেবতার উপাসনায় মহাপাপ হয় ! চিত্তের অবনতি ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু ! বাস্তবে তা নয়। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আছে! সেইটাই জানার নাম ধর্ম। সেই অর্থ যাঁরা বোঝেন "তাঁদের জন্য হিন্দুধর্ম। হিন্দু ধর্ম বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এই হল বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য।

মনু সংহিতায় গৃহস্থধর্মের জয়গান আছে। সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম গার্হস্থ্যধর্ম। এই যখন অভিমত সকল শাস্ত্রের, তবে কেন মিথ্যা ভড়ং করব? আর ধর্ম যদি করতেই হয় মুনিঋষিদের পথও মত ছাড়া, কে বলে দেবে খাঁটি পথ কোন্‌টি? বিশ্বামিত্র একজন ক্ষত্রিয় হয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। কেবল গার্হস্থ্যধর্মের জোরে। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করে।

ধর্মশাস্ত্রগুলি সমস্তই "পরোক্ষবাদ" ও পরোক্ষবাদে পুষ্ট। এতএব,

"রাজহংস হও তুমি, অচিরে স্বর্গ আসিবে নামি।"

মহাযোগনিষ্ঠ রাজযোগী হরিপদ পরমহংস (গীতারত্ন) বলেন,

রামায়ণ বাল্মীকির মানসকাব্য। অতএব রামায়ণের রামচন্দ্র অবতার ছিলেন কিনা এ কথার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রামায়ণের যাবতীয় উপাখ্যান বাল্মীকির মনোকল্পিত ব্যাপার। রাম যদি অবতার হবেন, বনবাসকালে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ হলে তিনি স্ত্রীর শোকে যেরূপ মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন তা সাধারণ লোকের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।

প্রশ্ন ঃ রামায়ণ না হয় বাল্মীকির মনোকল্পিত রচনা, কিন্তু দ্বাপরে মথুরাপতি শ্রীকৃষ্ণ যে কারাগারে দেবকীর গর্ভে জন্মেছিলেন সে কথা তো কাল্পনিক নয়?

উ ঃ শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে গীতাই প্রমাণ। তিনি বলেন, রামায়ণ যেমন বাল্মীকির কাল্পনিক রচনা মহাভারতও তেমনই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মনোকল্পিত রচনা। মহাভারতের যাবতীয় চরিত্র উপাখ্যানই কোন-না-কোন ভাব নিয়ে রচিত। ভাব বাদ দিলে কৃষ্ণচরিত্র আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। উক্ত পুস্তক হতেই কৃষ্ণ নাম জনসমক্ষে প্রচারিত হয়েছে মাত্র।

রামের ন্যায় কৃষ্ণ নামে কোনো মনীষী জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ব্যাসের কল্পিত কৃষ্ণ নহেন। সুতরাং বর্তমান যে দেহধারী কৃষ্ণের পূজা হয় তাহা রামের ন্যায় কল্পিত চরিত্র মাত্র।

প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণ নাম বেদে আছে। বেদ তো এখনকার লেখা নয়। কোন্ সুদূরকালে ঋষিরা বেদ লিখে গেছেন? তাছাড়া বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়, কেন?

বেদের কৃষ্ণ ! কৃ ধাতু অর্থাৎ হল কর্ষণ করা অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াই হল কৃষ্ণ।

গীতা—দ্বাপর যুগের কৃষ্ণ রচিত হবে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ।" অর্থাৎ ভগবান জন্মেও না, মরেনও না।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরানো "তিন জন্মরহিত"। সর্বদা একইরূপে আছেন, তিনি সকলের আদি।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ হে জিতনিদ্র অর্জুন আমি আত্মারূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করছি।

"অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ" অর্থাৎ আমি সকল ভূতের আদি। যখন ভূতগণ জন্মেনি আমি তখনও ছিলাম।

সারাক্ষণ আমাতেই সকল ভূত অবস্থান করছে। এবং অনন্ত ভবিষ্যতে আমাতেই লীন হয়ে যাবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে-যে কৃষ্ণ দ্বাপর যুগে জন্মেছিলেন দেবকীর গর্ভে গীতার কৃষ্ণ ইনি নন। গীতার কৃষ্ণ ব্যাসের মনোকল্পিত। বেদের ব্রহ্মকেই কৃষ্ণরূপে কল্পনা করেছেন মাত্র। দেবকীর গর্ভজাত কৃষ্ণের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এমন করেছেন ; ইহা আদৌ সমীচীন কাজ নয়।

গীত মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত কয়েকটি শ্লোক মাত্র। তাছাড়া উপনিষদ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণেব অংশবিশেষ। ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করে তাতেই রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি শিক্ষা দেবার জন্য উপনিষদসমূহ জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মমূলক শ্লোকগুলি চয়ন করে গীতা গ্রন্থখানি প্রণয়ন কবেছেন। উপনিষদেব সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রণীত। উহা অভ্রান্ত এবং উহা ভগবানেব বাণী— এই বিষয়ে আব সন্দেহের অবকাশ নেই। উপনিষদ যেমন ভগবানের বাণী , গীতাও তাই। ব্যাসদেব গীতাগ্রন্থ প্রণয়ন করে তা জনসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন, তাই গীতায় লেখা আছে—

সর্বোপনিষদো গাবঃ দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। গো অর্থে পৃথিবী। পাল অর্থে তিনি পালন করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তান ব্যাসদেব। তিনিই উপনিষদ হতে দুগ্ধ দোহন করেছেন।

বেদ রচনা হয়েছিল আনুমানিক সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। অনেক বলেন, ৫০,০০০ হাজার বছর আগে। দ্বাপর যুগে কৃষ্ণেব জন্ম হয়েছিল ১২ হাজার বছর পূর্বে। কৃষ্ণ ছিল কি না কে বলতে পারে? গীতা যে ব্যাসদেবের হৃদয়ের শুদ্ধাত্মার বাণীরূপ ভিন্ন মত পোষণ করা যায় না।

গীতার ন্যায় ভাগবত গ্রন্থখানি রচনা নিয়ে দ্বিমত আছে। কারো কারো মতে ভাগবত

ব্যাসদেবের রচনা, এইরূপ উক্তি সর্বৈব মিথ্যা। কারণ সত্যযুগে বেদ রচনা হয়। বেদব্যাস সেই যুগে বেদ ভাগ করেন। তিনি কিভাবে আবার দ্বাপর যুগে এসে ভাগবত রচনা করলেন?

ব্যাসদেব বেদবিভাগ করেন, ব্রহ্মসূত্র এবং মহাভারত রচনা করেন এবং তিনি সুতকে তা প্রচারের ভার দেন। পুরাণগুলি সুতেরই রচনা এই সিদ্ধান্ত হতে পারে। কেউ বলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাসদ বোপদেব গোস্বামী দ্বারা ভাগবত পুরাণটি রচিত হয়। গ্রন্থখানি চালু করার জন্যই তিনি ব্যাস নাম দিয়েছেন মাত্র—এইরূপ চিন্তা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

দেখা যায়, মহাভারতে কুরক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই শুকদেব গোস্বামীর প্রয়াণ হয়। অথচ সেই শুকদেব কর্তৃক মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভাগবত শ্রবণ করান কী করে? প্রায় ৫০ বছর অতীতকালে শুকদেব আবার উদয় হলেন এসব ঘটনা ভাবায় না কি? শুধু ধর্ম পাঠের নামে কী হচ্ছে ভেবে দেখতে হয়। বৈদিক যুগের বহু ঋষিবৃন্দ কীভাবে শুকদেবের ধর্মসভায় (প্রায় মৃত্যুকালে) উপস্থিত থাকেন? অতএব বিবেচনা করলে দেখা যাবে, বহু তঞ্চকতাময় পূর্ণ ঘটনায় পূর্ণ এই সমস্তই।

শ্রীমদ্ ভাগবতের যে ভাব সেই সম্পর্কে হরিপদ ভারতী পরমহংস মহাশয় বলেন, পুতনা বধ, গোপীর বস্ত্রহরণ, গোবর্দ্ধন ধারণ, শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা, কালযবন বধ, কংস বধ, কালিয়া দমন, কৃষ্ণের রামলীলা ইত্যাদি ঘটনা একটু আলোচনা করতে চাই। আমাদের পুরাণ ইতিহাসে রাক্ষসগণ যে-কোনো রূপ ধারণ করতে দেখা যায়, বাস্তবে তা হয় না। তাহলে তা অমর হয়ে থাকত। রাক্ষসগণ ও দেবগণ ইচ্ছামতো দেহ ধারণ করেন এসব সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যাপার। দুর্গার পুত্র গণেশের মাথা শনির দৃষ্টিতে খসে গেল যখন গণেশ অপর কোনো সুন্দর রূপ ধারণ করতে পারেননি। কেন? তিনি আবার স্বয়ং ভগবান শিবও মহামায়া দুর্গার পুত্র বলে কথা!

শিশু শ্রীকৃষ্ণ পুতনার স্তনদ্বয় নিপীড়ন করাতে পুতনা এমন আঘাত পেল যে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করল। মৃত্যুর সময়ে তার দেহ ব্রজের ছয়ক্রোশ ব্যাপী স্থানে ছড়িয়ে পডল। তার দেহের ভারে বৃক্ষসকল চূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু! গোপগণের কোনোই ক্ষতি হল না। কি আশ্চর্য! পুতনা প্রথমত সুন্দর একটি রমণী ছিল। কী করে ঐ বিশাল দেহ ধারণ করল? পুতনাব দেহ যখন দাহ করা হয় সে সময় সুগন্ধময় হয়েছিল; কেননা তার পাপময় দেহ আর ছিল না। যেহেতু কৃষ্ণের স্পর্শমাত্রই সে পবিত্রতম হয়ে গিয়েছিল।

পাপরাশি দেহের মধ্যে কোথায় কীভাবে ছিল? পাপ দেহের মধ্যে থাকে কি? যদি মনের মধ্যে থেকেই থাকে.......মৃত্যুর পর মনটা কি দেহে জমাট বেঁধে ছিল? নাকি দেহ ছেড়ে সব চলে গেল? শরীর পার্থিব বস্তু-এর শুচি অশুচি কেমন করে ভাগ করা যায়? যে-কোনো দেহ মৃত্যুর পর পচে যাবেই এ তো বাস্তব ঘটনা। তারপর শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ পাওয়া মাত্র তার স্বর্গযাত্রা হয়ে গেল, তা কি করে প্রমাণ হয়?

রাজা যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে গেলেন, আর কৃষ্ণ ব্যাধের বাণে প্রাণত্যাগ করলেন? আর তাঁর শেষ ইচ্ছা, "মরিলে তুলিয়া রেখ কদম্বের ডালে।" হিন্দু শাস্ত্রমতে প্রত্যেক জীবের

মধ্যে আত্মারূপী ভগবান বিরাজ করেন। কর্মানুসারে জীবগণের যে নরক বাস হয় তাহাও শাস্ত্র বলে, অতএব পুতনা জীবনে কি খুব মহৎ কাজ করে গেছে নাকি? তেমন ঘটনার নজির তো শাস্ত্রে বলা নেই। তাঁরা রাক্ষস, খোক্ষস, পিশাচ ইত্যাদি তারা কি ভাল কাজ জীবনে করে? তার পরিচয় তা শাস্ত্রে দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের মুখের ভিতর যশোদা নিখিল বিশ্ব দেখেছিলেন। যশোদা যখন কৃষ্ণের মুখের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দেখলেন তখন মা যশোদা কোথায় ছিলেন মুখের বাইরে না ভারতের বাইরে কোথাও ! এইরূপ কল্পনা অতিমাত্রায় অবান্তর বর্ণনা দিয়ে আমাদের ধর্ম পুস্তক রচনা। যশোদা বিশ্বদর্শন করে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। যখন সম্বিৎ ফিরে পেলেন—কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করলেন, আহা তাঁর পুত্রের কি মহিমা ! কৃষ্ণ ভগবান যখন—যশোদা জ্ঞান হারাবেন কোন্ যুক্তিতে?

শাস্ত্র বলছে— ***ভিদ্যন্তে হৃদয় গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ***
ক্ষিয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তাস্মনি দৃষ্টে পরাবরে।

ভগবানকে একবার দর্শন করলে মনের সংস্কার নষ্ট হয়ে যায়। আমিই ব্রহ্ম কি না এরূপ কোনো সংশয় থাকে না। নিঃসংশয়ে তার ব্রহ্মত্ব লাভ হয়ে যায়। সাধকের ত্রিবিধ কর্মই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভগবানকে দেখে যশোদার স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেল। কারণ কি? মুখের ভিতর জগৎ দেখার অর্থ এইটাই হয় যে কথায় কথায় যশোদাকে জগতের তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অনেক কিছু বলেছিলেন।

যমুনার তীরে কালিয় দমন! কালিয় নামে একটি হ্রদ এখানে যেহেতু কালিয় নামে একটি সর্প বাস করত সেহেতু সেই সর্পের বিষের দ্বারা হ্রদের জল বিষময় ছিল। কালিয় হ্রদের তীর দিয়ে যে সকল প্রাণী গমনাগমন করত, তারা বিষ জলের ছোঁয়ায় মরে যেত। শ্রীকৃষ্ণ ঐ দূষিত জল দেখে তীরবর্তী কদম্ব ডালে উঠে বস্ত্রাদি দৃঢ়রূপে পরিধান করে কালিয় হ্রদে লম্ফ দিয়ে জলে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে কালিয় সর্প কৃষ্ণকে বেষ্টন করে ফেলল। কৃষ্ণও নিজের শরীরকে স্ফীত করতে লাগলেন, ফলে কালিয় পীড়িত হয়ে পড়ল এবং কৃষ্ণকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু! কৃষ্ণ তাকে মেরে ফেললেন।

সর্পের বিষে জল ফুটত, আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটিকে ছেলে ভোলানো গল্প বলা যায়। সাপের বিষ থাকে সাপের দন্তমূলে, সর্পের দুটি বিষদন্ত থাকে, কাউকে ছোবল না মারলে সেই বিষ নির্গত হয় না। আসলে, সাধক নিরন্তর রিপুগুলির পিছনে লেগে থাকেন, তাদের দমন করার চেষ্টা করেন। এবং শেষ পর্যন্ত দমন করেন, সিদ্ধি লাভ করেন। রিপু দমন হল, সর্পকে মেরে ফেলা হল। এই কথাটা বোঝার জন্য কাব্যকার ঐ রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন।

কৃষ্ণ কালিয়র মাথার উপর দণ্ডায়মান কেন?

মনের সবগুলি বৃত্তি নীচগামী বৃত্তি যে একসঙ্গে দমিত হবে এমন না হতে পারে। তাই কৃষ্ণ কালিয়র মাথার উপর দণ্ডায়মান। সর্পের অনেক ফণা। প্রধান ২টি ফণার উপর পদার্পণ দেখা যায়।

এবার আসা যাক বস্ত্রহরণ কাহিনীতে। ভগবান জ্ঞানস্বরূপ। তিনি তাই জগৎগুরু।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ধরে নিলেও অন্যান্য রাখাল-বালকগণ তো ভগবান ছিল না। সকলের সামনে গোপযুবতীদের উলঙ্গ অবস্থায় জল হতে উঠে আসতে বলা কোনো মানুষের কাজ নয়। ভগবান তো দূর। তারা হস্ত দ্বারা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন করে তীরে উঠলেও শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তির কারণে তাদের দু-হাত উপর তুলে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দেবতাকে প্রণাম জানাতে বললেন ; তবেই তাদের পাপ দূর হবে। কারণ জলদেবতাকে অবজ্ঞা করায় অর্থাৎ উলঙ্গ হয়ে জলে নামায় তাদের পাপ হয়েছে। সকল বালকগণের সম্মুখে কুমারীগণকে স্ত্রীঅঙ্গ (লজ্জাস্থান) উন্মুক্ত করিয়ে দাঁড় করানো অনুচিত নয় কি?

শ্রীকৃষ্ণকে গুরুও বলা হয়েছে । যুবতীদের অন্য মানুষের সম্মুখে উলঙ্গ করে তুলে ধরা তো গুরুর ধর্ম হতে পারে না! ভগবান অন্তর্যামী। দুষ্কৃতকারীরা তার কৃতকর্মের জন্য যদি মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করে, ভগবান কি তা গ্রহণ করেন না? উলঙ্গ হয়ে জলে ক্রীড়া করলে যে পাপের কথা বলা হল ; তা তখন নীতিবিরুদ্ধ ছিল না। উলঙ্গ হয়েও জলক্রীড়া তখন নিয়ম ছিল। এখনও মেয়েরা বিবস্ত্রা হয়ে দলবেঁধে জলক্রীড়া করে।

এই ঘটনার তাৎপর্য কী?

ভগবানকে সমস্ত অর্পণ না করলে তাঁকে পাওয়া যায় না। কায়মনোবাক্যে সর্বস্ব দেওয়া।

এবার আসা যাক গোবর্দ্ধন ধারণ ঘটনায়।

গো পালন ছিল গোপেদের ব্যবসায় বা জীবিকা। উপযুক্ত বৃষ্টি হলে ঘাস হবে। গরুর খাদ্য হবে। এর জন্য ইন্দ্রপূজা করতেন গোপগোপীগণ। এইরূপ পূজা করতে দেখে কৃষ্ণ পিতাকে বললেন "আপনারা কোন্ দেবতার পূজা করছেন?" তখন তাঁর বয়স ১২ বছর। নন্দরাজ বললেন, "আমরা ইন্দ্র দেবতার অর্চনা করছি।" কৃষ্ণ বললেন, জীবমাত্র কর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কর্ম দ্বারা বিলয় হয়। সুখদুঃখ ভয়, অভয় কর্ম দ্বারা লাভ হয়। নিজে কর্মে লিপ্ত থেকে অন্য জীবের কর্মের ফলদাতা কোনো ঈশ্বর যদি থাকেন তবে তিনিও কর্মফল দান দ্বারা কর্তারই ভজনা করেন। কেন না ব্যক্তিই কর্ম করেন, তিনি কখনই প্রভু নন। অর্থাৎ তিনি কোনো ফল দিতে সক্ষম হতে পারেন না। প্রাণীগণের স্বভাব বিহিত কর্মের জন্য প্রাক্তন কর্মানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করেন।

মোট কথা, ইন্দ্রের পূজা দরকার নেই। কৃষ্ণের নির্দেশে গোপগণ ইন্দ্রপূজা বন্ধ করে দিলেন। পরিবর্তে পূজার দ্রব্যাদি দ্বারা গো, ব্রাহ্মণ ও পর্বতের পূজা করছিলেন।

ইন্দ্র অতি ক্রুদ্ধ হয়ে ৭ দিন যাবৎ প্রবল বর্ষণ এবং বজ্র ক্ষেপণ করে চললেন। এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্বত ছাতার মতো উর্ধ্বে তুলে ধরলেন। সমস্ত গোপগণ গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন। কৃষ্ণের ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে বুঝে ইন্দ্র বর্ষণ -ঝড়-বিদ্যুৎ সব বন্ধ করলেন। ইন্দ্রও যদি ভগবান, তবে ভগবান কৃষ্ণের উপর তিনি ক্রুদ্ধ হবেন কেন? ভগবান তিনি সর্বজ্ঞ, ভগবান সর্বশক্তিমান, ভগবান সর্বব্যাপী, এই তিনটি গুণ ভগবানে বিদ্যমান থাকে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, কৃষ্ণ যে ভগবান সে কথা ইন্দ্রের জানা ছিল না।

ভগবান আর দেবতার প্রভেদ কি?

দেবতাগণ চিন্ময় নহেন, মলিন স্বভাব ! পুরাণাদিতে এর প্রমাণ আছে। তাছাড়া গায়ের

মলিনত্ব। দ্বিতীয়ত, দেবতার রূপ আছে, তাই সসীম। আকৃতি মানে সসীম। অপরদিকে, ভগবান অসীম ও আকারহীন, অনন্ত। দেবতারা অল্পজ্ঞ, অল্প শক্তিমান ও সসীম। মানবগণও তাই। অধিকন্তু দেবতাদের যেরূপ হীনচরিত্র শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়, তাদের চেয়ে অনেক উত্তম মানুষ এই ধরাপৃষ্ঠে আছেন। তখনও ছিল এবং এখনও আছেন।

যোগোপদেশে বলা হয়েছে—"হে পুরুষব্যাঘ্র! দেবতা প্রভৃতিকে বিশেষভাবে চিত্তের মধ্যে আশ্রয় দান করে যেসব উপাসনা করা হয়, সেই দেবতাগণ সকলেই তো অশুদ্ধ ও কর্মাধীন।"

যে দেহের মুক্তি আছে আর বিনাশ আছে ; সেই দেবতার উপাসনায় কোনো ক্ষেত্রে ফল লাভ হয় না। হতে পারে না। যার মুক্তি হয় তার কোনো রূপ থাকে না।

এই হল শাস্ত্রের নিয়ম। সুতরাং কোনো দেবতার পূজা হতে পারে না। সংসারীর সংসার ছাড়া দেহধারী কোনো দেবতার আরাধনা কিছু না। ঋগ্বেদ তাই বলেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যাখ্যা সহ মতামত দিয়েছেন যেমন "দুঃখের কথা আমরা এখন মূর্তি পূজা আরম্ভ করেছি। আমরা যে-কোনো দেবদেবীর পূজা করতে পারি। কিন্তু দেবতার কাছে চাইতে পারব না। হে দেব বা দেবী আমাদের সুখ দাও শান্তি দাও ধন দাও বাড়ি দাও গাড়ি দাও সুন্দর স্ত্রী দাও ইত্যাদি কোনো কিছু দাবি করলে তোমাব পূজা ব্যর্থ হয়ে গেল।"

কংসবধ, জরাসন্ধ বধ, কালযবন বধ এগুলি সম্পর্কে এবার আলোচনা করা যায়—

আমরা জানি, কৃষ্ণ কালযবনের কাছে বারে বারে পরাজিত হয়েছেন, আবার আক্রমণও করেছেন—সাধক তার লক্ষ্যস্থলে পৌছুতে এমনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েন। ইন্দ্রিয়গণ যে দুর্জয় ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীল সহজে বশে আনা যায় না। চিৎ + জড় জরাসন্ধ + কালযবন—তাই বার বার দেখা দিয়েছেন। এই পর্বটি সবার চেয়ে মনোজ্ঞ এবং তাৎপর্যবাহী। সারা গ্রন্থে এতো সুন্দর রূপক আর নেই।

রাসলীলায় যে পূর্ণ আনন্দ আস্বাদন দেখানো হয়েছে তাতে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিজনিত আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেও উহা গুণের অন্তর্গত বলে পূর্ণানন্দ লাভ হয় না। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মের মিলনেই সাধকের পূর্ণানন্দ লাভ হয়। তাই ঋগ্বেদে বলা আছে প্রজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম। পূর্ণ আনন্দ এই অবস্থার মধ্যে হয়. অন্যত্র তা হতে পারে না তো সাধকের কাছে, কখনোই নয়।

এর অর্থ বুঝতে গেলে উৎসব নামক রূপক কাহিনীটির আশ্রয়ে যেতে হবে।

বিশেষত সত্ত্বগুণ মানবদেহে কখনো একা থাকতে পারে না। প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজঃ ও তমঃগুণের যে কর্ম দুঃখ ও পূর্ণতা বোধ তা অবশ্যই থেকে যায়। গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে যেতে না পারলে পরম আনন্দ লাভ করা যায় না। তাই অজ্ঞানতা স্বরূপ "কংস"-কে বধ করতেই হবে।

এই দেহ যে আমি, এই অহংকারই কংস। 'কংস'তো সর্বাগ্রে নিহত হতে পারে না। প্রথম তার সাঙ্গপাঙ্গের নিধন চাই। তাহলে কংস হীনবল হয়ে পড়তে বাধ্য। অনুচরগণই তো কংসের প্রকৃত ক্ষমতা।

ধনুর যজ্ঞ কেন? আত্মোন্নতি মূলক কর্মে ধনুর মতো লক্ষ্য স্থির থাকে বা থাকতে হয়। উপনিষদ তাই বলেছে—

প্রণবঃ ধনুশরোহ্যাত্মাঃ ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যসুচ্যতে
অপ্রমস্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তস্ময়োযথা।

স্মরণ রাখতে হবে—শ্রীকৃষ্ণ ইতিপূর্বে তাড়কা, বকাসুর, কালিয়, হস্তী, চাণুর, কুবলয় সকলকে বধ করেছেন। এখন কংস বধ হবে অর্থাৎ সাধক বোধি লাভ করবেন ব্রহ্মজ্ঞ হবেন।

আবার ফিরে আসা যাক জরাসন্ধ বধের ঘটনায়।

জরাসন্ধ (অস্তি) ও তা প্রাপ্তির ইচ্ছা বলবতী হলেই প্রাপ্তি। অর্থাৎ অস্তি ও প্রাপ্তি সাধককে ত্যাগ করলেই যে তার মূল অজ্ঞানতা নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট হয়—একথা সত্য নয়। দেহাত্মবুদ্ধি পুনঃপুন (জরাসন্ধ) সাধকের হৃদয়ে উঁকি দেয়। এইজন্য জরাসন্ধ বারে বারে আক্রমণ করেছেন কৃষ্ণকে।

শ্রীকৃষ্ণের রং শ্যামল কেন?

শ্যামল অর্থ মলিন রং, জীব যত সময় পর্যন্ত না ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ততক্ষণ বিষয়ভোগে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের মাধ্যমে অজ্ঞানময় এবং অপবিত্র। এই অবস্থার জন্য কংসকে হস্ত দ্বারা বধ করছেন। কংস হস্তে নিয়েছেন শাণিত কৃপাণ, অপরদিকে কৃষ্ণ খালি হাত। কেবল মুষ্টি আঘাতে মঞ্চ থেকে টেনে নীচে ফেলে বধ করলেন কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ কোনো মূর্তিধারীলোক নন, ভগবান নন। এই ব্যাখ্যা ব্যাসদেব মহাভারতে দিয়েছেন—

"কৃষি ভূর্বাচকো শব্দো ন তু নিবৃত্তি বাচকঃ
তয়োরৈকং পরব্রহ্ম কৃষ্ণরিত্যভিধিয়তে।"

কৃষি ভূ-বাচক অর্থাৎ উহা আকর্ষক সত্তা। ন শব্দ নিবৃত্তিবাচক অর্থাৎ যিনি কাকেও আকর্ষণ করেন না।

শ্লোকটির ভাবার্থ হল—পরমাত্মা আনন্দরূপ, তাই সকল জীবই আনন্দধারা বা পরমসুখের জন্য তাঁর দিকে নিয়ত ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু তাঁতে পরমাত্মাতে দ্বৈত প্রতীতির একান্ত অভাব বলে তিনিও কাকেও আকর্ষণ করেন না। সুতরাং যা অখণ্ড আনন্দময় তাই কৃষ্ণ বা ব্রহ্ম। কৃষ্ণ শব্দ দ্বারা এখানে কোনো মূর্তিবিশিষ্ট দেবতার রূপ প্রকাশ করেননি। কৃষ্ণ বলতে নিরাকার ব্রহ্মকেই বোঝাতে চেয়েছেন মহামুনি ব্যাসদেব।

কৃষ্ণের শ্যাম রূপক বর্ণনার কারণ হল শ্যামবর্ণ বিষয়ভোগ মলিন অশুদ্ধ। এই হল মূল শাস্ত্রীয় বিধান।

কোনো মূর্তি পূজা দ্বারা ভগবানের পূজা হয় না। ভগবান নিরাকার। ওঁ এই প্রণব অক্ষর ভগবান বাচক। নম শিবায়ঃ, নম কৃষ্ণায়ঃ, নম নারায়ণায়ঃ, হরে রামঃ ইত্যাদি দ্বারা ভগবানের আরাধনা হয় না।

কোনো বৃক্ষের মূলে সার জল দিলে যেমন সমস্ত বৃক্ষটাই পত্রপুষ্প ফলে সতেজ রূপ ধারণ করে, পুষ্টিবর্দ্ধন সহ পরম কল্যাণ হয়—তেমনি আত্মারূপ ভগবানের পূজা দরকার। অখণ্ড শক্তির পূজা চাই। খণ্ডশক্তি ভজনায় ব্রহ্মজ্ঞান বোধ হয় না।

"জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।" ৭/১৮ গীত।"
জ্ঞান কখনও ভক্তির অঙ্গ নয়।
চৈতন্যচরিতামৃত। মধ্যলীলা ২২/৮২ দ্রষ্টব্য।
"জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।"
হরি হি নির্গুণং সাক্ষাৎ পুরুষ প্রকৃত পরঃ।
স সর্বদৃগুপদ্রষ্ট্রাতং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ।।

ভাগবত ৮৮/৪

"লোকেঽস্মিন দ্বিবিধানিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্"

গীতা ৩/৩

সুতরাং ভাগবতে যেসব প্রণালী বা রূপক বর্ণনা, উহা অত্যন্ত নিম্নমানের হতে পারে ; কিন্তু এক একটি কাহিনীতে, এক একটি আধ্যাত্মিক ভাবের দ্যোতক মাত্র বোঝা গেল।

এবার দেখুন ভক্তি রসামৃত সিন্ধু ২/১৫।

"ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে,
তাবৎ ভক্তি সুখাস্যাত্র কথসভ্যুদয়ো ভবেৎ।"

তাহলে বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ! এদের কর্মের পদ্ধতি ভয়াবহ। এই পরকিয়ামপ্রীতি কোনো সাধন পথ হয় কী করে? মূল শাস্ত্রে কোথাও ভক্তিবাদ বা রাধাবল্লভী প্রেমের নজির পাওয়া যাচ্ছে না।

বৈষ্ণবরা তারক ব্রহ্ম নাম করেন।

কলিকাল নামে মুক্তি। আমরা তো কলিতে সবাই অবতার হয়েই আছি এখানে আবার মুক্তি কীসের? মুক্তিটুক্তি সেই দ্বাপর যুগে ছিল। এখন নেই। জীবের মুক্তি আসে কী করলে? কখন সে বিদ্যাটা আলাদা করে জানা দরকার? বৈষ্ণবশাস্ত্রে তো বৈষ্ণবদের জন্য কোনো মুক্তি নেই। চৈঃ চঃ মহালীলা দেখুন ১৯/১৭৫।

"স্বর্গ মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নবক করি মানে।"

অতএব বৈষ্ণবদের জন্য তারক ব্রহ্ম নাম কেন? ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

বেদান্ত অনুবন্ধ নামে চিহ্নিত করে দিয়েছে। যথা—বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অধিকার।

উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপনাকে নাম করতে হবে।

সকল শাস্ত্রেই ঐ ৪টি অনুবন্ধ থাকতেই হবে। সৃষ্টি সেই আইনেই চলে। সেই আইনই বিজ্ঞান! বিজ্ঞান হল পরীক্ষানিরীক্ষার ফসল। সৃষ্টির যে নিয়ম তা পদ্মপুরাণে আছে—

"মাং গোপয়ঃ যত সৃষ্টিরুত্তোরোত্তরঃ।"

বাংলা অর্থ হল—আমাকে (সত্যকে) গোপন করো, সৃষ্টি পরম্পরা ঠিক চলবে।

অতএব শাস্ত্রেই বলে দেওয়া আছে যে মানুষের জন্য যে শাস্ত্রসমুদ্র রচিত হয়েছে তার পনেরো আনা তিন পাই ভেজাল।

তুমি হংস হয়ে "পিবতু" পান করো, এখানে চলো বা চলতে হবে।

সবচেয়ে বিস্ময়ে বৈষ্ণবদের তারক ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করা! কারণ হল, বৈষ্ণবগণ বলেন, নিজেদের সেবক-দাস-ভক্ত ইত্যাদি। তারক ব্রহ্ম নাম (মোহ) কি মুক্তির জন্য? সে আশা কারোর না করাই ভাল। মুক্তি কাকে বলে, কখন হয় দেখুন।

সকল কল্পের দেবতাগণ সবাই বৈমানিক বা অন্তরীক্ষবাসী বা স্বর্গবাসী।
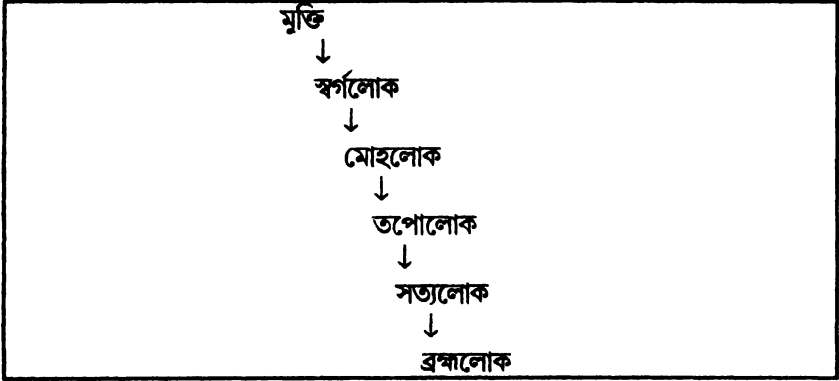
দশবার গমনাগমন
মোহ লোক অবস্থান দশ সহস্র দেব যুগ
তপোলোক অবস্থান সহস্র দেব যুগ
সত্যলোক অবস্থান কিছুদিন
ব্রহ্মলোক অবস্থান পুনর্জন্ম নেই।

তাহলে আমরা ধর্মকর্ম করি কেন?

করি এই জন্য ধর্ম-অর্থ-যশ (কাম)-মোক্ষ লাভ হেতু। সংসারী মানুষের এই কামনা বাসনা ষোলো আনা থাকে।

মোক্ষ হল অনাবিল সুখ। এখানে দুঃখের কণামাত্র নেই। মনু সংহিতায় যাকে আত্যন্তিক সুখ বলা হয়েছে।

ব্রহ্মাণ্ডে চার প্রকার স্থূল শরীর হতে জগতের বিকাশ। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ। জগতের প্রতিপালনের জন্য বিবিধ অন্ন, পানাদি, ফল, মধু এ সকল কল্পবৃক্ষ স্বরূপ। প্রয়োজন মতো পাওয়া যেত।

জরায়ুজ—যাহা গর্ভবেষ্টনী দ্বারা জন্ম হয়।

অণ্ডজ—বিভিন্ন পক্ষী এবং জলজ প্রাণীসমূহের সৃষ্টি হয়।

স্বেদজ—ক্লেদাদি, মলপদার্থ জল কাদা ইত্যাদি হতে জোঁক, মৎ-কুল, মশক বিভিন্ন কীটাদি সৃষ্টি হয়।

উদ্ভিজ্জ—ভূমিভেদ করে যে লতা-গুল্ম-বৃক্ষ প্রভৃতি উদ্ভিদ শ্রেণীর জন্ম হয়।

মানুষ সকলের ঊর্ধ্বে শ্রেষ্ঠ জীব।

বেদান্তে সপ্তদশ অবয়ব দ্বারা মানুষ সৃষ্টি বলা হয়েছে। এই সপ্তদশ অবয়ব হল শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু অর্থাৎ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান।

পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ।

পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় = চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক।

চার অন্তরেন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহং।

এই ১৭টি উপাদান। মরণের পর পঞ্চভূতে বিলীন হয় নশ্বর দেহ। স্থূল শরীরকে লিঙ্গ-শরীর বলা হয়। শিবলিঙ্গ পূজা শিবই পূজিত হন। শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুর পরিচয় দেখুন।

প্রাণ—নাসাগ্র সঞ্চারী বায়ু। অপান—অধোগমনশীল বায়ু মল বার যার ক্ষেত্র।

ব্যান—সর্বনাড়ি সঞ্চারী ও সর্বশরীরব্যাপী পরিচালিত বায়ু। এই বায়ুর চাপে সর্ব শরীরে রক্ত পরিচালিত হয়। রক্ত চলাচল বন্ধ মানে ব্যাধি বা মৃত্যু।

উদান—ঊর্ধ্বগতিশীল বায়ু। ঊর্ধ্ব বায়ু মানুষের নানান ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং হার্ট বিপর্যস্তের মস্ত একটা কারণ।

সমানবায়ু—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করার পর রস, রক্তাদি বিভাগ অন্তে যথা যথা স্থানে প্রেরণ করায় এই বায়ু।

বুদ্ধি—অন্তঃকরণের নিশ্চয়করণ শক্তি যুক্ত বৃত্তির নাম বুদ্ধি।

মন—সংকল্প ও বিকল্প শক্তিমতী বিবিধ কল্পনা করার শক্তি বৃত্তির ও মনের অধীন।

অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির নাম চিত্ত।

অভিমানাত্মিকা বৃত্তির নাম অহঙ্কার। বুদ্ধি ও মন মিলিত পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশে উদ্ভূত ; ইহাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা হয়। বিজ্ঞান কোষই পরলোক সঞ্চারী জীব বলে তত্ত্ববিদগণ বলে থাকেন।

পঞ্চীকৃত ভূতনিচয় হতে উৎপন্ন যথা পৃথিবী লোক, অন্তরীক্ষ, স্বর্গলোক, মোহলোক, জনলোক, উপরি উপরি বিদ্যমান তপোলোক—সত্যলোক। অধঃ অধঃ বিদ্যমান অতল, বিতল, ভূতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাললোক। এই সকল ব্রহ্মাণ্ড নামে বিদিত।

পুরাকালে সংসার ধর্ম পালন অন্তে পুত্রের উপর সংসার অর্পণ করে গুরুদায়িত্ব লাঘব করে ঈশ্বর আরাধনার জন্য বানপ্রস্থ নিয়ম ছিল। বনের নির্জন পরিমণ্ডলে ঈশ্বর চিন্তার জন্য উপযুক্ত বিধায় এই নিয়মই বোঝা যায়। এখন সংসারীগণ কালে ভদ্রে কোনো তীর্থ পর্যটনে গেলেও তাঁর মন পড়ে থাকে বাড়ির পুঁই মাচার দিকে। এই হল ধর্ম, তবু যদি ধর্ম করতেই হয়, ধর্মের যথাযথ ফরমূলা বজায় রেখে ধর্ম সাধন বাঞ্ছনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেদের আলোচনায় লিখেছেন, "হ্যাঁ! আমরা ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এ সবের পূজা করতে পারি ; ঈশ্বরের আরাধনা করা ভাল ; তার মানে এই নয় যে আমাকে ধন দাও, সুখ দাও, বাড়ি গাড়ি দাও, সুন্দরী স্ত্রী দাও, আরো কত বাসনা থাকতেই পারে। কিন্তু! তা হবে না। কোনো মতেই না। ঐরূপ কামনা থাকে যদি, সে পূজা করা পাপ।" বলতে ইচ্ছা হয় যে, বেদ বহির্ভূত কার্য করাই অনাচার, ম্লেচ্ছ, ইহা শাস্ত্রস্বীকৃত।

আমরা 'সনাতন ধর্ম' নামটার সাথে বিশেষ পরিচিত ; চাই বুঝি আর না বুঝি। কীরূপ বুঝি? মরে গেলে পুঁতে দিতে হয় অথবা পুড়িয়ে অস্থি গঙ্গায় নিমজ্জন করতে হয়। শ্রাদ্ধাদি কর্মে যার যেমন ক্ষমতা তেমনিই করেন, বাৎসরিক হয় বটে! অনেক লোক খেতে দিতে হয়, ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হয়। বিধবাদের ক্ষেত্রে মাথা মুড়িয়ে আতপ চালের ভাত,

নিরামিষ ইত্যাদি বিভিন্ন পালন অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে সনাতন ধর্ম নাশ হয়। ওদিকে কত পিণ্ড আদায় হলে প্রকৃতশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয় এবং যথাযথ তর্পণ করা হয় সে খবরই কেউ রাখি না।

ধর্মের বিকৃতকরণ, বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণে সারা ভারতে মূর্তিপূজা আরম্ভ হয়েছিল। হিন্দুধর্ম বেদ ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে বহু ঘটনা! বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর এ সবই ঘটেছিল। বুদ্ধদেব একেশ্বরবাদী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্মের বিভাজন ঘটে। হীনযান ও মহাযান নামে। হীনযান বুদ্ধের অনুগামীগণ ছিলেন। মহাযান + বজ্রযান ২ ভাগে ভাগ হয়ে গেল পরে। মহাযান হতে আরো ভাগ হল। আউল-বাউল, বৈষ্ণব, হরিচাঁদ, বাঁকাচাঁদ, রুদ্র সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবী প্রেম, রাধাবল্লভী প্রেম এই ধর্ম ও ধর্ম সম্প্রদায়গুলি বর্তমান রাজনীতি দলগুলির মতো হয়ে গেল।

যে কারণে যদু বংশ ধ্বংস কাম্য হয়ে ওঠে ঠিক অনুরূপভাবে জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, শংকরাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে আচার্য শংকর হাল ধরলেন ধর্ম রক্ষার পন্থার। বুদ্ধের মূল একেশ্বরবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার জন্য।

সনাতন ধর্মে যে মূর্তিপূজার চল আরম্ভ হয়েছিল তা বিকৃত বৌদ্ধধর্ম হতে এসেছিল। একে কোনোমতে সনাতন ধর্ম বলা হয়নি এবং বলা যাবে না। কেন? একই আত্মা সর্বব্যাপী অবস্থিত বা বিদ্যমান ; তিনি অসীম, দৃশ্যমান নহেন। মূর্তি সসীম। ইহা খণ্ডরূপ, যাকে দেবতা বলা হয়েছে। আত্মার অজ্ঞানতাপ্রসূত দেবতা জ্ঞান বা সকাম সাধনায় জীবের মুক্তি হয় না। মুক্তি লাভ হয় প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হলে। সেই জ্ঞানের অধিকারী হতে হলে গুরুসমীপে উপনিষদ শুনতে হবে। উপনিষদ অধ্যয়নে শিক্ষা হয় না। উপনিষদ জ্ঞান কাণ্ডের অধীন। হিন্দু ধর্মের সকল শাস্ত্রেই সেই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে লেখা হয়েছে।

ধর্মশাস্ত্রগুলির ক্ষেত্র কোনো-না-কোনো রূপক দিয়ে মোড়া আছে। অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝলে সবই বৃথা। এই নিহিতার্থ জানার জন্যই গুরুর দরকার। সংসারীদের জন্য গুরুর কোনো প্রয়োজন নেই। সংসারে থেকে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ কেউ চাইতে পারে না। অতএব সাধারণ মানুষের গুরু কোন্ কাজে লাগবে? ঋগ্বেদ বলছে—"নঃ তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহৎ যশঃ"।

অর্থাৎ যিনি নিজের যশের দ্বারা নিজেই প্রকাশিত তাঁর আবার মূর্তি কীসের?

পাতঞ্জল যোগদর্শন বলছে—'তস্য বাচক প্রণবঃ' যথা ওঁ প্রণব বলা হয়।

বেদে আমরা দেখি, ইন্দ্র-সূর্য-আকাশ মরুৎ, যজ্ঞ, বিদ্যুৎ বজ্র এই সকল নাম আছে। "বৈদিক ঋষিগণ ঐ আকাশে বিরাজিত শক্তিসমূহ, আবার সময়ে সময়ে বিকশিত শক্তিকে লক্ষ করে যজ্ঞ করতেন। তাঁরা উপাসনা করতেন মানবগণের মধ্যে যে জ্ঞানাগ্নি, জঠরাগ্নি, আকাশ, বায়ু, জল, মৃত্তিকা পঞ্চভূত সমূহ এবং ইহাদের সম্ভূত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ সকলেই দেবতা মেনে তাদেরই উপাসনা করতেন। দেবতা কেন? এরা জগতের বস্তুসমূহকে প্রকাশ করে তাই। যেমন—চক্ষু, কর্ণ। কর্ণ বহিঃইন্দ্রিয়গণ, বাইরের রূপ-রস সমূহকে প্রকাশ করে।

জগতের বস্তুসমূহকে প্রকাশ করে, তাই দেবতা দেব ধাতু প্রকাশ করা। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার চারটি অন্তরিন্দ্রিয়, অন্তরের ভাবসমূহকে প্রকাশ করে এই অর্থে এরাও দেবতা।

হৃদয়েস্তু দেবতা সর্বে = উপনিষদ বেদে যে শিবের কথা আছে তাহা দুর্গার স্বামী শিব নন।

"শিবং প্রশান্তং অমৃতং ব্রহ্মোযোনিম।" কেঃ উপঃ ৬ দ্রষ্টব্য।

"স ব্রহ্ম স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরম স্বরটি
স এব স প্রাণঃ স কালাগ্নি স চন্দ্রমা।"

সেই আত্মদেবই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র। সেই অক্ষর ওঁ-কার। ইনিও সর্বব্যাপী এবং সকলের প্রাণ। ইনিই বৈশ্বানর অগ্নিরূপে সকলের অন্তরে আছেন, ভুক্ত দ্রব্য পাক করেন। ইনিই চন্দ্রমা রূপে ওষধিসমূহ পুষ্ট করেন।

বেদে ও উপনিষদে ভগবানকে নরদেহধারী বা অন্য কোনো দেবদেবী রূপে ভাবা হয়নি। মানুষের মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস, ভৈরব এইসব মতের বিরোধ অহরহ। এখানে কিছু সুচতুর ব্যক্তির কেরামতি চলছে—সেই পুরাণ কাল থেকেই। তাঁরা বুঝিয়েছেন, "ভগবান মহিমময়, তিনি সাকার আবার নিরাকার।" তাঁর পক্ষে সব সম্ভব। তাঁকে যেভাবে ডাকেন তিনি সেই ভাবেই কৃপা করেন।

ব্রহ্ম গুণাতীত। তিনি গুণের মধ্যে এসে গুণময় হবেন কোন্ সে ভক্তের টানে? আমাদের সাধনার জোর কত! যে জাত বাবা-মাকে বৃদ্ধ আশ্রমে পাঠান তাদের মতো ভক্ত আছে নাকি?

প্রকৃতেঃ মানানির্গুণৈঃ কর্মানি সর্বেশঃ
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহিমিতি মন্যতে।

গীতা।

অর্থাৎ প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ দ্বারা কর্মসমূহ নিষ্পন্ন করে থাকে। দেহাত্মবুদ্ধি আসক্ত ব্যক্তিগণ নিজেকে (আত্মাকে) কর্তা বলে মনে করে, গুণসমূহ প্রকৃতির অন্তর্গত, আত্মা গুণাতীত। ভগবান কর্মের কর্তা নহেন, কর্মের প্রেরণা হয় অভাব বোধ থেকেই। ভগবানের কীসের অভাব? ভগবান স্বয়ং পূর্ণ।

এখন এই প্রশ্ন হতে পারে যে কোনো মূর্তি না থাকলে কি মন বসে? বসে না। তাহলে উপাসনা হবে না কেন? সমাধিপদ ২৭ শ্লোকে আছে—

"তস্য বাচক প্রণবঃ।"

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র একই কথা বলেছে। হরিনাম করলে কলির জীবের সহজে উদ্ধার হয় এইরূপ কথা সবাই জেনে আছে, এর বেশি জানার সুযোগ ছিল না। "ত্রিকালজ্ঞ ঋষি নারদ! হস্তে বীণা, মুখে "হরি বলো" আর দ্বিচারিতা তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, হরি নামে তাঁর উদ্ধার হয়নি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—

নারদ ঋষি একদা ঋষি সনৎকুমারের নিকটে গিয়ে আকুল প্রার্থনা জানালেন, উপায় কি হবে—তাঁর জীবন বিষময় মনে হচ্ছে; কোথাও কোনো শান্তি পাচ্ছেন না। এসব কথা

শোনার পর সনৎকুমার তাঁকে আশীর্বাদ করে কিছু উপায় বাতলে দেন। নারদ মুনি জীবনে স্বস্তি-শান্তি পেলেন। মনে হচ্ছে নারদ ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না অথবা ভড়ং করেছেন সারাটা জীবন। হরি হরি করে মাঠে মারা গেল জীবনটা। কি দুর্গতি তাঁর!

রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, "যত মত তত পথ" এইটা সর্বনাশের কথা। এমন করে দল ভেঙে দিলেন যে হিন্দু জাতটা ধ্বংস হতে বসেছে। এই বিজ্ঞানের যুগে বিশ্বচেতনার আয়োজন যেখানে আমরা তো বলতে পারি জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে উপায় যখন আছে তখন খানাখন্দ, কাঁটাগাছ দাপিয়ে না চলে, প্রয়োজনীয় হ্যাজাক লাইট জ্বেলে রাস্তায় চলা ভাল। সোজা পথ ধরে গেলে যাত্রা সহজ হয়, পরিশ্রম বাঁচে, সময় বাঁচে। যেহেতু কলিকাল সেহেতু মানুষের গড় আয়ু কম। লোকে বলে দিন থাকতে দিনের নাম নে।

ধর্ম করলে কি হয়? ধর্ম করলে মৃত্যুর পর উপকার হয়। যেমন নরক যন্ত্রণার লাঘব হওয়া, বা না হওয়া ইত্যাদি। (বেদান্ত অনুবন্ধ) দ্রষ্টব্য। আমরা যে ধর্ম করি তা হল ধর্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ। মোক্ষ মানে সুখ। আত্যন্তিক সুখ। মুক্তির জন্য ধর্ম হয় না বা ধর্মের জন্য মুক্তি আসে না।

আমাদের ধর্মের একটা দিক আছে, তা হল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলদায়ী ব্যাপার। ধর্ম মানুষকে দেবে কী? রবীন্দ্র বলেছেন, "দুঃখ নব নব।"

আমি বলি, "হিন্দু ধর্মশাস্ত্র-সাগরে ডুবেছি-উঠেছি অনেকবার,
কি অপরূপ মহিমা কিবা ভাষা নাই বোঝাবার ;
কি হবে এই ধর্মে? শুধালাম গুরুকে।
চরণে চরণে, হাতে হাত ধরি।
এগিয়ে চলো পা পা করি
রাগ হিংসা বর্জন করি
হতে পার গুরু তুমি যে তাহারি
তখন পূজিবে সকলে তোমাকে"।

ধর্ম মানুষকে যদি নম্র করে তাহলে সেই ধর্ম দ্বারা সমাজের কল্যাণ হবে।

সেই হল আসল ধর্মসাধন, সেই পথের পথিক হতে পারেন। তবেই ধর্ম করুন। ধর্ম সবই ধারণ করতে পারে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলে—কলিকাল বলতে, "নির্দিষ্ট কোনো যুগ বিচার না করে দর্শনের পথ ধরতে।" কলি অর্থে—'অধম', হিংসাদ্বেষাদি, অসদ্ভাবসমূহকেই বোঝায়। মূলত এই সংস্রব বড়ই ভয়ের ; এই অবস্থায় ভগবানের নামজপ করা ভাল।

সংসারী মানুষ স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে নানা সমস্যায় কাটে দিন। তাদের তো বৈরাগ্য হওয়া, ধ্যানস্থ থাকা কোনদিনই সম্ভব নয়। তাই নাম জপ করা ভাল। এর মানে কিন্তু নর্তন, কুর্দন, নামকীর্তন নয়। চৈঃ চঃ দ্রঃ (বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্র ১২৭-৭৫) এবং তথাপি মহাভারতের দানধর্মে এইরূপ আছে। ইহা চৈঃ চঃ ২৬ পাতা দ্রষ্টব্য।

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাস কৃচ্ছ্রমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণঃ।"

যিনি কৃষ্ণ কথাশ্রয়ী, যাঁর কান্তি সোনার মতো সুন্দর-বাহুভূষণ যাঁর চন্দন চর্চিত এবং যিনি সন্ন্যাসী, স্থিরচিত্ত দৃঢ়নিষ্ঠ ও শান্তিপরায়ণ তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণ। শ্রুতিতে যাঁকে বলেছে হিরণ্ময় পুরুষ ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম! এই শ্লোকের দ্বারা বোঝায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। তথাহি ভাগবতে ১১/৫/৩১/৩২ আছে

ইতি দ্বাপর উর্বশী স্তুবান্তি জগদীশ্বরম্
নানা তন্ত্র বিধানেন, কলাবপি তথা শৃণু।।

অন্বয় ঃ হে উর্বীশ পৃথিবীপতি দ্বাপরে জগদীশ্বরম্ এইরূপ ভাবেই স্তব করে থাকেন তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতের উর্বীশই চৈতন্যচরিতামৃতে হলেন—জগদীশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

অর্থাৎ রাজন সাধুজনেরা ভগবানের রূপ স্তব এইভাবেই করে থাকেন। কলিযুগেও নানান তন্ত্রের বিধান অনুসারে যেমন করা হবে তাও শুনুন। ১০ মঃ শ্লোকে যে কৃষ্ণবর্ণ শব্দ আছে তার অর্থ যিনি সর্বদা কৃষ্ণের বর্ণনা করেন, কালো বর্ণ যুক্ত নহে; "ত্বিষা অকৃষ্ণ" গৌরকান্তি যুক্ত বিশেষণ দ্বারা কালো রঙের খণ্ডন করা হয়েছে।

অতএব বৈষ্ণবগণ উচ্চসংকীর্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা আরম্ভ করলেন। রামচন্দ্র যাতে রাগ না করেন, তাঁরও নাম রাখা হল। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব, তাঁদের বিষ্ণুর নাম নেই কেন? মনে করা যায়, বিষ্ণুপক্ষীয় সদস্যসংখ্যা কম থাকায় তাঁর নাম বাদ হয়ে গেল। আর হরে নামটা এসেছে দুষ্টের ভয়ে। এছাড়া শাস্ত্রীয় কোনো সিদ্ধান্ত নাই। নারদ পুরাণে, হরেন্নামৈব হরেন্নামৈব কলৌঃ নাস্ত্যেব নাস্তেবকেবলং গতিরর্ন্যথা।

বিষ্ণুপুরাণে আছে—কৃৎ-এ যজন যজ্ঞৈস্ত্রতায়ম্ দ্বাপরে অর্চয়ন যদপ্নতি, তদাপ্নতি কলোঃ সংকৃত্য-ব-কেশব।

এই যুক্তি সংহিতা স্বীকার করে না, অতএব বেদগ্রাহ্য নয়। অনাচার।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ যে বেদ রচনা করেছেন এবং বিশ্বের পণ্ডিত সমাজ যা স্বীকার করেন সেই বেদ অপৌরুষেয়। ইহাতে কোনো মানুষ কোনো সিদ্ধান্ত দিলে তা গ্রাহ্য হতে পারে না। একদা ঋষি জৈমিনী তর্কের খাতিরে প্রমাণ করেছিলেন যে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। পরক্ষণে তিনি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, "প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর আছে"। অতএব তর্কে তিনি গুরুকে পরাস্ত করায় তিনি গুরুনিন্দার ভাগী হয়েছেন। তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তুষানলে আত্মাহুতি দরকার; তিনিই তাই করেছিলেন। একদা নবদ্বীপের মায়াপুরে এক মার্কিনী মহারাজ মায়াপুরে এক শিষ্যদের সভায় মন্তব্য করেছিলেন, নবদ্বীপে এত সাপের উপদ্রব কেন জানেন? এর কারণ মহা দুর্নীতি ! অতএব সেই বৈষ্ণব চূড়ামন্দিরে সে কথা মনে রাখতে হবে। সে যুগে মুনিঋষিগণ পাহাড়-পর্বত বনজঙ্গলে অনাহারে শরীরকে ক্লিষ্ট করে ঈশ্বরোপাসনা করতেন সে কি কল্পনা মাত্র না মূল্যহীন? বাড়ি বসে ছলনার দ্বারা সাধক হয়ে গেলে চলে কি? শ্রীকৃষ্ণ যে ১৮ মাস কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং পাশুপত বিদ্যালাভ করেছিলেন তার পরিচয় আছে "শিব পুরাণে"।

শিব পুরাণ একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ, যার অন্তর্গত বিদ্যেশ্বর সংহিতা, কৈলাস সংহিতা, বায়বীয় সংহিতা পূর্ব ভাগ, বায়বীয় সংহিতা উত্তরভাগ, ধর্মসংহিতা আছে। জ্ঞান সংহিতাও এর অন্তর্গত। শিব পুরাণ হতে সাংখ্য শাস্ত্রের উৎপত্তি বলা আছে।

বিষ্ণু পুরাণের তৃতীয়াংশে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে লিখিত আছে, "ব্রাহ্মং পাদ্যং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতম্ তথা।" ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে মার্কণ্ডেয় পুরাণে, স্কন্দপুরাণের বিভিন্ন খণ্ডে শিব পুরাণের নাম মহাপুরাণগুলির সঙ্গে একত্রে বলা হয়েছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের পূর্বখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে উপপুরাণ ও মহাপুরাণ তালিকা দেওয়া আছে; তার মধ্যে শৈব নাম আছে—এই সকল প্রমাণে শিব পুরাণকে অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে গণিত হতে হবে। অথচ পদ্মপুরাণের অন্তর্গত যে পুরাণ তালিকা আছে;

ম দ্বয়ং ভ দ্বয়ং চৈব
ব্রত্রয়ং ব চতুষ্টয়ম্
অ-না-প-লিং-গ-কৃ-স্কানি।
পুরাণানি পৃথক পৃথক।

মবয়ং = মৎস্য + মার্কণ্ডেয়। ভদ্বয়ং, ভাগবত, ভবিষ্য ব্রত্রয়ং ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত।

অ—অগ্নি। না—নারদ। প—পদ্ম। লিং—লিঙ্গ। গ—গরুড়। কৃ—কূর্ম। স্কানি—স্কন্দপুরাণ। এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে শিবপুরাণকে বাদ দেওয়া হয়েছে; পরিবর্তে ভবিষ্য পুরাণের নাম দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্য পুরাণের বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা যুধিষ্ঠির। অনুমান করা যায়, শিবপুরাণকে মহাপুরাণ তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কারণ হতে পারে যে—এই পুরাণে যেসব তত্ত্ব আছে তাতে বৈষ্ণবদের ধর্মের অস্তিত্ব কিছুই থাকে না—নিশ্চিত শৈব হয়। এখানে কৃষ্ণ একজন গৃহত্যাগী বানপ্রস্থী ব্যক্তিমাত্র। ইনি মহামুনি উপমন্যুকে গুরু রূপে বরণ করেন। এই গুরুর নির্দেশে ১৮ মাস কঠোর তপস্যার পর তাঁকে শিবঠাকুর দর্শন দেন এবং পাশুপত দান করেন কৃষ্ণকে।

পাশুপত কী? পাশুপত মহামন্ত্র। ইহার দ্বারা কোনো অসাধ্য সাধন করা যায়। এই পুরাণের ঘটনা মোতাবেক কৃষ্ণের ভগবান হওয়ার কোনো সুযোগ নেই অথবা যদুবংশের যে পরিচয় তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এইসব অন্তর্নিহিত কারণের জন্য শিবপুরাণকে মহাপুরাণের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

শিবপুরাণের বক্তব্য অনুসারে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর তুমুল সংগ্রাম কালে, উভয়েব বিবাদ শান্তি ও জ্ঞানোদয়ের জন্য একটি বিরাট জ্যোতির্ময় লিঙ্গ উদ্ভব হয়। উভয়ে বিস্মিত হয়ে দ্বন্দ্ব থামিয়ে এই লিঙ্গ স্বরূপ অবগত হবার জন্য ব্রহ্মা হংসরূপে ঊর্ধ্বে গমন করলেন আর বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করে অধোদেশে গমন করলেন। বিষ্ণু ৪,০০০ বছর এইভাবে সেখানে থাকেন। একে শ্বেতবরাহ কল্প বলা হয়। ব্রহ্মা বললেন, আমরা দুজন ঐ লিঙ্গ সম্পর্কে কোনো কিছু জানতে বা বুঝতে না পেরে বার বার প্রণাম করতে থাকি। এইভাবে শত বছর কেটে যায়। এক সময় ওঁ-কার রূপ শব্দ আনন্দময় শব্দ উদ্ভূত হতে থাকে। আমরা বিস্মিত বোধ করছি। বিস্ময়ের কারণ হল যে ঐ স্থানে এক পঞ্চমুখ দশবাহু কর্পূরের মতো শুভ্র গৌরবর্ণ নানা আভরণে ভূষিত একটি মূর্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হলেন। ইনিই শিব এবং তিনি ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর জগৎ সৃষ্টির কর্তৃত্ব ও পালন কর্তৃত্ব নির্দেশ করলেন। অতঃপর ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কথন, ঋষিদের সৃষ্টি, ভগবতীর (প্রকৃতি রূপিণীর) প্রকাশ, তাঁর দেহত্যাগ,

শিব পূজা বিধি বর্ণনা আছে। ভৈরব কর্তৃক ব্রহ্মার শিরশ্ছেদন, শিবের অনুগ্রহে পুনরায় মস্তক লাভ প্রণবের স্বরূপ বর্ণনা আছে।

বিষ্ণু কৃষ্ণ হয়ে গেলেন কী করে? ভাগবত মহাভারত ছাড়া আর কোনো গ্রন্থেই কৃষ্ণ নামের পরিচয় নেই। আসলে হিন্দুধর্মের পুরাণগুলি লেখা হয় দ্বাপর যুগের শেষে গুপ্ত যুগে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে, রাজা জন্মেজয়ের সময়কালে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন একটি পুরাণ লিখে তাঁর শিষ্য লোমহর্ষণ বা সুতকে দিয়েছিলেন, লোমহর্ষের কাছে তা শুনে সুত আর ৩টি পুরাণ লিখেছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রথম অংশ দ্রষ্টব্য। এতে বোঝা যাচ্ছে মার্কণ্ডেয় পুরাণ ব্যাসের লেখা নয়। তাছাড়া ব্যাসদেব স্বয়ং মহাভারতের চারটিপ্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন জৈমিনীর নিকট। তাহলে ১৮টি পুরাণ ব্যাসের লেখা হয় কেমন করে, ভক্তি দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যাবে কেমন?

লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঘন।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্।। গীতা—৩।৩

ব্যাখ্যা। কর্মযোগের দ্বারা আত্মার বিচ্যুতিলাভ হয় কিন্তু ভক্তির দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না। ফলে কী হয় ! ভক্তি সর্বদা ভক্ত ও ভগবানকে পৃথক করে রাখে। এতে কোনোরূপ একাত্মতা জন্মে না, তাই উহা জ্ঞানলাভের অন্তরায়। ভক্তিতে অন্ধ মনের প্রকৃত অবস্থা 'স্বরূপ' কে, দেখা যায় না। চৈতন্য চঃ মধ্যলীলা ২২। ৮২ দ্রঃ

"জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির নহে অঙ্গ।"
"জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্" গীতা ৭। ১৮।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বললেন, জ্ঞানী ও আমাতে কোনই প্রভেদ নেই। জ্ঞানী আমার আত্মাই।

সুতরাং, যে জ্ঞান ভক্তির অঙ্গ নয়, তা ভগবানের অঙ্গ হয় কী করে?

ভক্তি বলতে অনন্য ভক্তি বোঝায়। অনন্য ভক্তিতে কোনো ভেদ নেই। ন + অন্য। রামকৃষ্ণ এই ভক্তির বলে নিজে খেতেন আবার মায়ের মুখে দিতেন। তাকে অনন্য ভক্তিযোগ বলা যায়। জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির নহে অঙ্গ।

তাছাড়া ভক্ত, দাসের কোনো মুক্তি হয় নাকি? আপনার বাড়ির কোনো কর্মচারী, তার কোনো স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না। যখন যেখানে হুকুম হবে তার যাওয়া চাই। "কষ্ট বৃত্তি পরাধীনা।" প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা দ্রষ্টব্য।

অন্য অভিলাষী ছাড়ি জ্ঞানকর্ম পরিহরি
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা
এই ভক্তি পরম কারণ।
বৈষ্ণব ভক্তি কণ্ঠহার দ্রঃ।
"নারায়ণ প্রসাদ ভক্ত না কর গ্রহণ।"
বৈষ্ণবদের বাণী। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়া সদা হরি।।

কি ধরনের দ্বিচারিতা ভাবা যায় না! নারায়ণের প্রসাদ কোনো ভক্তের কাছে নিষিদ্ধ। হায়! হায়! এই ধর্মের কি হাল।

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ১৯।১০৮ দ্রষ্টব্য।

"আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।"

ব্যাখ্যা। স্বর্গাদি সুখভোগের আশা আর কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা কৃষ্ণভক্তগণ করবে না। তারা জ্ঞানী এবং কর্মীর সঙ্গ করবে না। শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা শুধু রাধাকৃষ্ণ পূজা করবে।

উপরে যা সব বলা হল বৈষ্ণব সাধনার তত্ত্ব। জ্ঞানীসঙ্গও নিষেধ, এইটাই ভয়ংকর সন্দেহের। আসল তত্ত্ব ফাঁস হয়ে যাবে। সেজন্য ভক্তদের পূজা উৎসবে অনেক লোকের মাঝে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে ; প্রসাদ নেওয়া অর্থ-তাই। আসল পূজা ব্রহ্মের পূজা। তাঁকে জানার নাম জ্ঞান। সে জ্ঞান অর্জন করতে কর্ম দরকার, ওখানে সব নিষেধ করা আছে কেন?

গীতা ৩। ৫ দ্রঃ।

'নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতির্জৈগুণৈঃ।।"

গীতা ৩। ৬ দ্রঃ।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণং
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচতে।

ব্যাখ্যা। বাঁচতে গেলেও তো মলমূত্র ত্যাগরূপ কর্ম করতেই হবে। তা যদি নাও করি তবে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া না করে বাঁচা যাবে?

বৈষ্ণবরা কর্ম ত্যাগ করতে হবে বলেন কোন্ বিবেচনায়? পৃথিবীর কোন্ মানুষ কর্ম ছাড়া বাঁচে না? বিনা প্রয়োজনে কেউ কোনো কর্মই করে না। বেদান্ত সিদ্ধ এই গুহ্যতত্ত্ব ; বৈষ্ণবগণ তো ভাগবত পড়েন—ভাগবত এই কথাই বলে।

উপরন্তু বৈষ্ণব মতে সব কর্ম বাদ দিয়ে কেবল কৃষ্ণকথা শুনতে বলা হয়েছে। এ তো আরো ভয়ানক বিপদ, উৎসন্নে যাওয়ার পথ ! কারণ কৃষ্ণলীলায় পদাবলী ইত্যাদিতে শুধু প্রেমযমুনায় সাঁতার দেওয়ার নামে ইন্দ্রিয়ের নামসেবা দ্বারা মনের চঞ্চলতা বেড়ে যায় ; অধর্ম হয়। তবে হ্যাঁ মালা টিপে নাম করা মন্দ নয়।

কৃষ্ণভক্তি নিষ্কাম কর্ম ! এইরূপ যারা বোঝাতে চান তাঁদের কাছে নিবেদন, কীসের জন্য ও পথের অনুগামী হয়েছেন?

কেননা চৈঃ চঃ দেখানো আছে—
ভুক্তি মুক্তি যাবদ্ হৃদি পিশাচি বর্ততে
তাবৎ সুখাস্যোহৃদি কথমভূদয়োঃ।

স্বর্গের বাসনা মুক্তির ইচ্ছা যদি ভক্তের হৃদয়ে জাগরূক থাকে তাহলে, হৃদয়ে ভক্তির উদয় হবে না। আর ভক্তি না হলে কৃষ্ণের কৃপা হয় না। কৃষ্ণ কি কৃপা করবেন? যেহেতু ভক্তিতে কিছুই হয় না। শাস্ত্রকারগণ যা বলেন ভেবেচিন্তে বলেন, আমি চৈঃ চঃ অবলম্বনে দেখিয়েছি।

"জ্ঞান বৈরাগ্য নহে ভক্তির অঙ্গ।"

ঠিকই তো! বৈরাগ্য নিয়েই জ্ঞানের সাধনা হয়? তাও না। ভক্তি-টক্তির স্থান সেখানে নেই ; সেখানে অসীমের সাথে সাম্যতা লাভ করতে হবে বা হয় ; ধূ ধূ মরুভূমি মাত্র।

মহাপুরুষ সকলের কাছেই প্রণম্য। কিন্তু উপাস্য নয়। আমার মত, ধর্মটর্ম কিছুই দরকার নেই। কর্তব্যশীল সংসারী থাকুন, তাতেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম উদ্‌যাপন করা হয়। হ্যাঁ নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পাদন সহ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। পঞ্চদেবতার পূজা চাই। দেবযজ্ঞ পূজাপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ বেদপাঠ, ভূতযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ, তর্পণ, নৃযজ্ঞ দীন-দুঃখী পাতককে পারেন তো তাদের সেবা করুন। কিছুই যদি না দিতে পারেন জল, পিঁড়ি, মধুর সম্ভাষণ করুন এতেই মহাধর্ম হয়। কোনো ভড়ং করার কোনো প্রয়োজন নেই।

জন্ম হতে মানুষ তিনটি ঋণ নিয়ে আসেন পিতৃমাতৃঋণ, দেবঋণ, মনুষ্যঋণ। নিজের দৈনিক রোজগারকে ভাগ করে ২ ভাগ আপনার নিজের জন্য ব্যয় করুন অপর দু-ভাগ যা বলা হল সেইমতো সম্পাদন করুন প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ধর্মের কারণ ১৫ দিন অন্তর যে ২টি তিথি পরিবর্তন হয় শুক্লাতিথি কৃষ্ণাতিথি এর মানে মহাকর্তব্য তোমার স্মরণ করিয়ে দিতে আসে ; তোমার তর্পণ দেবার সময় এসেছে। সংসারের কাজে ভুল হয়ে যায় পাছে শাস্ত্রে বলেছে পিতৃতর্পণ ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণুকেও দিতে হয়। ইহা অবশ্য কর্তব্য পবিত্র কর্ম ; এই সংবাদ দিয়ে কোনো ধর্ম কখন হয় না, হতেই পারে না।

এইসব হাঁড়ির খবর নিয়ে ধর্ম অনুশীলন উচিত অন্যথায় অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত? রামচন্দ্র বাল্মীকির মনোকল্পিত ব্যক্তি। চৈতন্যদেব তো কোন্ দূর! চৈতন্যদেবকে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারকরূপে ইতিহাস সমালোচকগণ চিহ্নিত করেছেন। অতএব চৈতন্যদেব সম্পর্কে অন্য কিছু বলার নেই।

সমালোচকগণ এও বলেছেন, ইনি দক্ষিণ ভারতের শৃঙ্গেরী মঠের দীক্ষিত হবেন, সেইজন্য চৈতন্য উপাধি গ্রহণ করেছেন। অন্যথায় আনন্দ ইত্যাদি অন্য কিছু হত, আমাদের যে ভাগবত গ্রন্থ তার সূতিকাগার হল "তথাহি ভাগবত" আগম শাস্ত্রের অধীন।" বিদ্যাসাগর রচনাবলীতে শাম্বপুরাণ মতে এইরূপ আছে—

"করাল ভৈরব উত্তর পূর্ব
পাঞ্চরাত্র, বৈখানস, ভাগবত শিব স্তথা
সহস্রাণি তন্ত্রশাস্ত্রানি।"

এই মতে বিচার করলে আলোচনার কোনো কিছুই থাকে না।

চৈতন্যদেবের গুরু ছিলেন কেশব ভারতী। শংকরাচার্যের দশনামী সম্প্রদায়ের উপাধি যথা—ভারতীয় পুরী, সমুদ্র, বন, সরস্বতী, গিরি, পর্বত প্রভৃতি।

অতএব চৈতন্যদেব নাম হয়েছে ঐ ব্রহ্মচারীদের উপাধি অনুসারে। নতুবা সন্ন্যাস নেওয়ার পর নামের পরে আনন্দ যোগ হওয়ার কথা। সন্ন্যাসীদের তাই হয়। অত্র উপাধি মতে চৈতন্যদেবের যা কিছু অনুষঙ্গ সবকিছু ঐসব সম্প্রদায়ের সরবরাহ বস্তু। শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে তাই দেখা যায়।

চৈঃ চঃ লিখেছেন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ যার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিচয় নেই। কেবল গ্রন্থের (চৈতন্য চরিতামৃতম্) তে এইটুকুই আছে—

"শাকে সিন্ধ্বগ্নিবানেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।"

পূর্বাহ্ণে সন্ধ্যেহহ্নিহসিত পঞ্চম্যাং অত্র গ্রন্থ সমাপ্তয়ম বা গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতং।।"

এমনকি নাম বংশ ধাম এসব কিছুই নেই। সেকালে উহা আবশ্যিক রীতি ছিল। অতএব ঐ গ্রন্থ আদৌ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন মানা যায় না। "জালগ্রন্থ"।

শ্লোকের অর্থ এইরূপ—১৭৫২ খ্রিস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে বৃন্দাবনান্তরে কোনো এক জায়গায়, রবিবার পূর্বাহ্ণ অর্থাৎ বেলা ১২টার আগে, পঞ্চমী তিথিতে এই গ্রন্থ লেখা সমাপ্ত হল।

চৈতন্যদেব অপ্রকট হয়েন ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে ১৭৫২ — ১৫৩৩ = ২১৯ বছর পরে এই গ্রন্থের প্রকাশ হয় বা রচনা হয়। যে গ্রন্থ কৃষ্ণদাস লিখলেন, চৈতন্যদেব সম্পর্কে তিনি বা তাঁর উর্ধ্বতন বা নিম্নতন তিন পুরুষ পরের বা আগের ঘটনা এইরূপ বিবেচনা করা যায়। তিনি যেসব গ্রন্থ অবলম্বন করেছেন লেখার জন্য সেসব আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত নয়। তা কৃষ্ণ কথা তথাহি ভাগবত প্রভৃতির অবলম্বনে। সুতরাং নিপুণ পাণ্ডিত্যের দ্বারা উত্তর ভারতের কৃষ্ণচরিত অবলম্বনে ইহা ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে বড়ু চণ্ডীদাসকৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিতগ্রন্থ। কবিরাজ মহাশয় চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেছেন এর সাহায্যে। এই সম্পর্কে সমালোচকগণ বলেন, বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ লিখেননি। অন্য কেউ লেখক তাও বলতে পারেন নি। তাঁরা জেনেছেন ঐ গ্রন্থের প্রথম অংশের শেষ ভাগের কিছু ও মাঝের বেশ কিছু এবং শেষের কিছু কিছু পাতা ছিল না।

মনে রাখতে হবে, এই তথাকথিত বৈষ্ণব আন্দোলন সম্পূর্ণ ১৭-১৮০০ শতক ধরে। দুই শত বা ততোধিক কাল এই বৈষ্ণবচর্চা পুষ্টিলাভ করেছে। তখন পরিবেশ খুবই অনুকূল ছিল। কৌলীন্য প্রথা তুর্কিশাসন-শোষণ হেতু জৈনধর্মের সাহচর্য পেয়েছিল এবং সংঘবদ্ধ হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের কোনো জাতিভেদের ব্যাপার ছিল না। অতএব বৈষ্ণবগণ হলেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বাংলা সাহিত্যের সমালোচকদেব ইহা বিশ্লেষণ। বৈষ্ণব আন্দোলন উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যাঁরা তাঁদের নাম স্মরণীয়—যথা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস। প্রাক্ চৈতন্য যুগেব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে অমানবিক লীলামহিমা রচিত হয়েছে। ইহা ছিল পরোক্ষ এবং কল্পনা-নির্ভর। রাধাভাবে ভাবিত মহাপ্রভু চৈতন্য ছিলেন, বৈষ্ণবকর্তাদেব সম্মুখে প্রমূর্ত রূপ সঞ্চারকারী ব্যক্তি। এই নব ভাবের পথে যাঁদের রচনা পদাবলী বিশেষ খ্যাতির দাবি রাখে ; তাঁদের নামগুলি যথা—গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ।

বাংলা ব্রজবুলি ও সংস্কৃত ব্রজবুলি এই মিশ্র ভাষায় নব নব অমর পদাবলী তাঁরা রচনা করেছিলেন। সাথে নামসংকীর্তন যোগ দিয়ে কলির মানবকে বৈষ্ণব গুরুগণ উদ্ধার করার যে মোহজালে জড়ালেন তা ভাবার মতো বিষয়।

বৈষ্ণবদের মতে চারযুগের নামসংকীর্তন এইরূপ দেখা যায়—

১। নারায়ণ পরবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতি।

২। রামনারায়ণ অনন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণকেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।।

৩। হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ
মুকুন্দ শৌরে যজ্ঞেশ্বর।
নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয়ম্—
মাং জগদীশ রক্ষ।।

৪। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।

ত্রেতাযুগে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়নি। সেই সময় কংস নিধন হয়নি। কৃষ্ণের নাম যে কংসারী তা ত্রেতাযুগের মানবগণ কি করে জানলেন?

রাম কৃষ্ণ নামের দ্বারা যদি মানব মুক্তি পায় তবে শিব দুর্গা কালী প্রভৃতির নাম কী অপরাধ করল? তাদের কোনো নাম হল না কেন? বেদে গীতায়, শ্রুতি স্মৃতি কোথায় তারকব্রহ্ম নাম বা ঐ নামে মুক্তি হয় এমন তো দেখা যায় না?

তাছাড়া বৈষ্ণবদের ধর্মে মুক্তির কোনো ব্যাপার নাই। তাঁরা কৃষ্ণদাস বা দাসানুদাস। তারকব্রহ্ম নামে কাজ কী? তাছাড়া বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি যখন স্বীকার করে না তবে ঐ নাম অনাচার বলা উচিত! চারটি বেদের মূল লক্ষ্য একই—এতে কোনো কিছু বলার অবকাশ নেই। তারকব্রহ্ম নাম কী? ওঁ এই হল ব্রহ্মের প্রতীক। বেদ স্মৃতি পুরাণ দর্শন সকলেই ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।

ঋগ্বেদ—প্রজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম
সামবেদ—তত্ত্বমসি
যজুর্বেদ—অহম্ ব্রহ্ম
অথর্ববেদ—অহম্ ব্রহ্মোস্মি

বৈষ্ণবদের গুরু একটা ভয়ংকর বস্তু। এখন প্রশ্ন হল—গুরুর কী কাজ? ঈশ্বরজ্ঞান দিয়ে মুক্ত করাবেন? না অন্য কিছু দিয়ে?

স্বামী রামসুখদাস বলেন—রামচরিতমানস ৯৩।৩ এবং ৯৯।৩—৪ দেখুন।

১। "গুরু বিনি ভাব নিধি তরই ন কোঈ।

২। গুরু সিষ বধির অন্ধকা লেখা।
এক ন গুণই এক নহি দেখা।
তরই শিষ্যধন শোক ন হরই।
সো গুরু ঘোর নরক মহুঁ পরঈ। এবং

তাৎপর্য। ভণ্ডগুরু হলে উদ্ধার হয় না। তৈরি করা গুরুতে কিছু হয় না। কোনো-না-কোনো সাধুর কথা মেনে চলা ভাল, যাঁর কথা মানলে উদ্ধার হবে সেই তো গুরু।

তাঁর সঙ্গে, গুরুর সঙ্গে আর যোগাযোগ থাকার দরকার নেই। গুরু মন্ত্র দিলেন, তা যদি মনেপ্রাণে মেনে নাও এবং প্রয়োজন বোধ কর তবে মঙ্গল হবেই হবে। শ্রীমদ্ভাগবতের

একাদশ স্কন্ধে দত্তাত্রেয় নিজের চব্বিশজন গুরুর বর্ণনা দিয়েছেন, মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের উদ্ধার চাই। গুরু করলে কল্যাণ হবে এমন বিধান দেখা যায় না। কল্যাণ নিজের আগ্রহে হয়। এইজন্য শাস্ত্রে ৪টি অনুবন্ধ আছে।

বেদান্তের অনুবন্ধে আলাদা একটি পরিচ্ছেদ আছে—বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অধিকারী। জগতে কোনো মানুষ এর বাইরে যেতে পারেন না। মানুষের সকলের সব কাজেরই এই পথ। যে গুরু উদ্ধার করতে পারেন না তাঁর মন্ত্র নেই, শক্তিও নেই। হাতি প্রকাণ্ড কিন্তু তার শক্তি দাঁতে।

কেউ যদি বলেন, "আমরা তো গুরুর কাছে থেকে কণ্ঠি নিয়েছি, তবে কি ফেরত দেব?" কণ্ঠি ফেরত দিতে বলব না। প্রতিদিন একবার মালা জপ করুন। বাকি সময় যাতে শ্রদ্ধা হয় বা আছে সেই মন্ত্র জপ করুন।

আমাদের সমস্ত শাস্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। বল্লাল সেনের পূর্বে রাজা দেবীবর কনৌজ থেকে যে ৬ জন ব্রাহ্মণ নিয়ে এলেন। সেই থেকে গৌড়দেশ সংস্কৃত পাঠেরও শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে যায়।

এক সময় গৌড়ীয় ভাষার একটা রীতিই গড়ে উঠেছিল। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুরাণ সংহিতাগুলি একটিও প্রাচীন বৈদিক নেই দেখা যায়। বিশেষ করে বৈষ্ণবগণ গৌড়দেশ বর্জন সংযোজন দ্বারা সব নতুন কলেবর দান করেছেন এবং নিজেদের পছন্দ মতো শাস্ত্র বানিয়ে নিয়েছেন। সমস্ত শাস্ত্রে বানিয়ে নিয়েছেন। সমস্ত শাস্ত্রে তাহা বর্ণিত হয়েছে। কোথায় কী পরিবর্তন বা নতুন ভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে; নিজেদের মত ও পথকে বলবৎ করার এবং অভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে। তা মুছে ফেলার কোনো উপায় নেই। আর এখন করার কিছু নেই বটে। সেই পথে হাঁটবেই বা কে?

সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান একদা ছিল গৌড় দেশ। বিদ্যাসাগর তাঁর শাস্ত্রযুদ্ধে যে-সকল পণ্ডিতদের পরাস্ত করেছিলেন তা কেবল বিদ্যাসাগর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে অন্য কারোর পক্ষে হত না, কোনোদিনই না। বিদ্যাসাগর আমাদের যা দিয়েছেন সেগুলো আর গোপন করার কোনো উপায় নেই।

বিদ্যাসাগর আমাদের নতুন বেদব্যাস। আর বিবেকানন্দ হলেন নতুন বৈদান্তিক।

হিন্দুধর্মের সংহিতাগুলিতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতা থাকলেও মূল লক্ষ্য সেই তুমি আত্মাই ব্রহ্ম। এতে কোনো দ্বিমত নেই। তখনকার দিনে চতুরাশ্রম সমাজব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ধর্মেব কোনো বিভেদ হয়নি। কেবল আচার-আচরণের বিভেদ ছিল। ধর্মের বিভেদ করেছেন বৈষ্ণবগণ। আধুনিককালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় স্বামী বিবেকানন্দ জানালেন—ধর্মের নামে শুধু অপার্থিব জিজ্ঞাসা আমাদের চলার পথের সহায়ক হতে পারে না; উচিতও না। তাই তিনি বিমূর্ত বেদান্তকে জুড়ে দিলেন চলার পথে। রাজভক্তি, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ নানারকম মতবাদ প্রবন্ধ লিখে হিন্দুজাতিকে একটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। বেদান্তকে জীবব্রহ্মের অখণ্ডতাকে তাত্ত্বিক ব্যূহ থেকে টেনে লোকসমাজে হাজির করালেন, ধর্মের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ঘটালেন। মুমূর্ষু হিন্দুধর্ম নতুন চলার পথে সুদৃঢ় হোক এই ছিল তাঁর আর্তিক চেষ্টা। যে বেদান্তকে আচার্য শংকর মুহ্যমান মহা অন্ধকার হতে বা

সমুদ্রতল হতে কূলে আনলেন—বিবেকানন্দ তাকে মার্জনা করে নতুন কলেবর দান করেছেন, বিবেকানন্দের সেই অমোঘ বেদান্ত—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ফেলি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

আমাদের বন্দনা হোক সর্বাত্মবাদ—

"পথ সেবয়েতুঃ সর্বাঃ আত্মনা।
মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।"

স্বামীজি বলেছেন, তোমার বিবাহ, তোমার ধন তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয় ; নিজেব ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। ভুলিও না তোমার সমাজ সেই মহামায়ার ছায়া মাত্র। ভুলিও না—নীচজাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে আমার যুবকবৃন্দ তোমরা সবল হও, তোমাদের জন্য ইহাই আমার বক্তব্য। ফুটবল খেলিলে তোমার স্বর্গ আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাদের কেবল আবশ্যক ; আত্মার অপূর্ব তত্ত্ব অনন্ত শক্তি, অনন্তবীর্য, অনন্ত শুদ্ধ ও অনন্ত শূন্যতার তত্ত্ব অবগত হওয়া।

দুইটি ভাব মানুষের চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে—ক্ষমতা ও দয়া। ক্ষমতা প্রয়োগ চিরকাল স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হয়েছে। দয়া স্বর্গীয় বস্তু। আমাদের সকলকে দয়াবান হতে হবে। ন্যায়বিচার ও অধিকার বোধ দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক। শুধু তাই নয় পরিণামে ইহাই দুঃখের কারণ।

ভারতীয় হিন্দুধর্ম গৃহস্থকে শ্রেষ্ঠ বলে গেছে।

বিবেকানন্দ ভক্তিযোগে গুরুর উল্লেখ করেছেন, "গুরু আত্মার সাথে আত্মার যোগ।" বিশেষ শক্তিসম্পন্ন আত্মা, যে আত্মা সর্বজ্ঞ। সেই আত্মার যাদুস্পর্শে শিষ্য ধনী হবেন ; কিন্তু শিষ্যের মুক্তির জন্য ব্যগ্রতা থাকা চাই চাই।

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বেদ-বেদান্ত থেকে কিছু বক্তব্য রেখেছেন। বেদ পড়লে কী হয়? ভেদ কোনো থাকে না। ইহা সম্পূর্ণ ঋষিদৃষ্টির ফসল। দ্রষ্টা ঋষিগণ ছিলেন ব্রহ্মময়। আগম-নিগম-ভূত-ভবিষ্যৎ সবই উদ্ভাসিত বা দৃশ্যমান চোখের সম্মুখে। বেদান্ত বা উপনিষদ ইহা বেদের সার নির্যাস। বেদে সর্বোপরি আরাধ্য বস্তু 'পরব্রহ্ম'।

সংহিতা নিত্য নৈমিত্তিকময় কর্মসংসার জীবনের অনুশাসন। তাছাড়া ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট। বেদের ঋষিগণ বলে, অগ্নিই পরব্রহ্ম। অগ্নি বা অগ্রণী। সর্বাগ্রে যিনি দিশারী, সকলের আগে তাঁর স্থান ; তাই তিনি পুরোহিত। তিনি পাবক, সকলকে পবিত্র করেন, তিনি জাত-বেদা। তিনি সকলই জানেন তাই পরব্রহ্ম। যারা বায়ু মন্ত্রের দ্রষ্টা বলে, বায়ু পরব্রহ্ম, বায়ু ব্যতীত অগ্নিও প্রজ্বলিত হতে পারে না। অগ্নি না হলে ২।৪ দিন বাঁচা যায়। কিন্তু বায়ু না হলে তিন মিনিটও নয়।

মানুষের জীবনের ৭টি স্তর। সারা বিশ্ব যে সাতটি ভুবন ৭×৭ = ৪৯ ভাগে বিভক্ত হয়ে বায়ু বিশ্বসংসারকে রক্ষা করেন। সুতরাং বায়ুই পরব্রহ্ম। যে ঋষি ইন্দ্র ভাবনাময় বলেন, ইন্দ্র হল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা।

আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্জগতের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্ক—ক্ষিতি, অপ,

তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত মহাভূতের অন্তর্গত। সুতরাং নিখিল জগৎ হল ইন্দ্রিয়ের রাজত্ব। বেদে ইন্দ্রের সাথে বৃত্রাসুরের যুদ্ধ ঘটনা আছে। সেখানে বৃত্রাসুর বৃষ্টির বাধ্যরূপ দস্যু ; এই কারণে ইন্দ্র বজ্রক্ষেপণ করেন। বর্ষার সময় ঝড়, বজ্রপাত হয় এই কারণে। যুদ্ধে ইন্দ্রেরই জয় সূচিত হয়। যাঁরা বরুণদেবতার ধ্যান করেন তাঁরা বলেন, বরুণই পরব্রহ্ম। বরুণ জলের অধিপতি। সমুদ্রের উপর তাঁর একাধিপত্য, অসীম প্রভাব বিদ্যমান। সমুদ্র ৭টি—আলোর সমুদ্র, প্রাণের সমুদ্র, জলের সমুদ্র, জ্ঞানের সমুদ্র, দয়ার সমুদ্র ও অপরা পারাবার বরুণ রাজাধিরাজ।

কৈবল্য কী?

চিত্ত সম্বন্ধে বর্জিত হওয়াই কৈবল্য।

চিত্তবৃত্তি কী?

একাগ্রতা ও সমাধি।

সমাধির মুখ্য উপায়?

অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

আত্মায় ৬ গুণ আছে—"শমদমাদি"। আত্মজ্ঞান কেমন? ব্যাস দর্শনমতে ইহা যোগ বৃত্তি, প্রমাণবৃত্তি, বিপর্যয়বৃত্তি, আত্মা বা দ্রষ্টা। শম = অতিরিন্দ্রিয়ের নিয়ম অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উপযোগী বিষয়ে অন্তরাত্মাকে প্রতিনিবৃত্ত করা। দম = বহিরিন্দ্রেয় দমন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বিষয় হতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে প্রতিনিবৃত্ত করা।

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেবের মধুকথা থেকে শুনুন। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, "আমার প্রীতিকামনায় সমস্ত কর্মফল আমাতে অর্পণ করে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হলে আমাকে পাওয়া যায়। চিত্তশুদ্ধি না হলে বিবেক আসে না। সুতরাং সাধনার প্রাথমিক স্তর হল চিত্তশুদ্ধি। নিষ্কাম কর্মে চিত্তশুদ্ধি হয়।

নিষ্কাম কর্ম কীরূপ?

কর্ম হলেই তো কামনা হয়। আমি একটা বই চোখের কাছে আছে দেখছি, পাঠ করার ইচ্ছা হবে, পাঠে আনন্দ পাব। এখানে বইপাঠ নামক কর্মের কামনা হল—আনন্দ লাভ।

এইরকম প্রতিটি কর্মেই কামনা আছে।

কামনা নিষ্কাম কর্মে আছে, সকাম কর্মেও আছে।

নিত্যনৈমিত্তিক কাম্য স্বভাবজ সকল কর্মেই আছে। নিত্যকর্ম সন্ধ্যা বন্দনাদি না করলে অন্যায় হয়। অন্যায় করব না এই কামনায় নিত্যকর্ম করে থাকি। নৈমিত্তিক কর্ম যেমন—শ্রাদ্ধাদি কর্ম অবশ্য কর্তব্য কর্মের মধ্যে পড়ে।

কাম্য কর্ম কেমন? কোনো কামনা নিয়ে যে যজ্ঞ কর্ম করা হয় আগের দিনে রাজসূয়, অশ্বমেধ, গোমেধ, পুত্রেষ্টি 'সন্তান কামনায়' যজ্ঞ করা হত। ইহা কাম্য কর্ম। ঐরূপ কাম্য কর্মের মধ্যে লাভালাভের খতিয়ান একটা থাকে। বিশেষত মানমর্যাদার ব্যাপার তো থাকেই।

সর্বহারা, ভৃত্যপদবাচ্য যে তার পক্ষেও নিষ্কাম কর্ম হয় না। যদি তাকে কোনো টাকা না দেওয়া হয়, পেট-ভাতে, তবু তার কাছে কি নিষ্কাম কর্ম হয়? কী করে হবে? তার পিছনে একটা বাধ্যবাধকতার বেড়া থাকে না কি? প্রভু কি মনে করবেন, আমার এটা করা উচিত, আমি পরের খাই বিনিময় তো একটা আছে এইরূপ ভাবনা আছে বা থাকে।

আত্মা কী?

শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও স্বরূপচৈতন্যই হল আত্মা। আর সবই অনাত্মা (ইহা অনুভব সিদ্ধ কথা) বেদান্ত ৫৫।৫৬ শ্লোক দ্রঃ।

গীতার ১৭।১৪ অংশের থেকে তত্ত্ব এখানে দিতে চাই।

দেবতা, ব্রহ্ম, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা।

শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা। এইগুলির শারীরিক তপস্যা হয়। তাৎপর্য কী? দেবতার পূজা, ব্রাহ্মণের পূজা, গুরুর পূজা?

দেবতা অর্থাৎ দিব শব্দে আকাশ। শূন্যতত্ত্ব। (শূন্যধাতু ভবেৎপ্রাণঃ) স্থান আজ্ঞাচক্র। তথায় যার অবস্থান সেই প্রাণই দেবতা। এবং প্রাণাদি বায়ু সকল দেবতা। বাইরে দেবতা বা প্রতিমা অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে যে-সকল জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন তার প্রতিমূর্তির নামই প্রতিমা।

দ্বিজ বাইরে উপবীতধারী অন্তর্লক্ষে কী? যার কূটস্থ জ্ঞান হয়েছে সেই দ্বিজ।

গুরু! বহির্লক্ষে যিনি কানে মন্ত্র দেন, অন্তর্লক্ষে যাঁর বাহির ও ভিতরে শ্রদ্ধা জন্মেছে, যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার রূপ দর্শন করিয়ে দেন, সবিতৃমণ্ডলের মধ্যবর্তী যে নারায়ণ রূপ, সেইরূপ যিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দেন তিনিই গুরু।

তত্ত্বজ্ঞানী অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বা (বোধি) এই জ্ঞান যে অবগত তিনি গুরু।

আত্মাকে প্রকৃষ্টরূপ যে জানে সেই প্রাজ্ঞ। তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী। এই ভাবের পূজাবিধি বেদে উপনিষদে বলেন। শৌচ ও সরলতা? শৌচ বহির্লক্ষে বাহ্যিক শুদ্ধতা, অন্তর্লক্ষে মনের শুদ্ধতা বা শুচি। এই শুচি ও অশুচি এখানে মনে রাখা চাই।

হ্যাঁ! আমি যদি ব্রহ্মই হলাম শুচি অশুচি কেন? এ প্রশ্ন হতেই পারে!

অজ্ঞতাবশতই শুচি-অশুচির কথা এখানে বলা হয়েছে। আমি যে ব্রহ্ম সেই বোধ না জন্মানো পর্যন্ত, তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত অজ্ঞ। যখন তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণতা লাভ হবে তখন ব্রহ্মময়।

এই অবস্থাটা যোগীদের ক্ষেত্রে মৈথুনক্রিয়া বলে।

এই মৈথুনক্রিয়া (শুচিক্রিয়া) সম্পূর্ণ হলেই কুণ্ডলিনী যখন কূটস্থের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে যায় তখনই ব্রহ্মময়।

এই শুচি পুবাকালে ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিন ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমাত্মার নির্দেশ বলা হত। এবং তিনটি দ্বাবাই ব্রাহ্মণ-বেদ-যজ্ঞ প্রতিপন্ন। ঐ তিনটিকে জানাই ব্রহ্মতত্ত্ব।

ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ। জানাব নামই বেদ।

এই ব্রহ্মতত্ত্বরূপ অবস্থাতে প্রাণকে আহুতি দেওয়ার কার্যকেই যজ্ঞ বলা হয়। ব্রহ্মময় 'ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম তদুচ্চতে। ওঁ তৎ সৎ। ব্রাহ্মণ বেদ যজ্ঞ।

যিনি জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। গীতা ১৭।২৪ তাই বলছে—

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্।।

অতএব ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ করে ব্রহ্মবাদীদিগের যজ্ঞদান তপঃক্রিয়া সর্বদা করতে হয়। গীতার ৬ষ্ঠঃ অধ্যায় 'অভ্যাসযোগে' যেতে হবে।

আমরা সংসারী জীব। সর্বদা সুখপ্রার্থী। সেই সুখ পেতে হলে প্রথমে প্রথম অধ্যায়

বিষাদযোগে যেতে হয়। মন কিছুতে মানতে চায় না। ইন্দ্রিয়সুখ বাদ দিয়ে জীবন রিক্ত, শূন্য! সেই পথের পাঠক যারা তাঁদের গুরু চাই। অন্যথায় গুরুর দরকার নেই। ঝামেলা বাড়লে মানসিক বিপর্যয় আসে।

ইংরাজি ২০০5 নভেম্বর মাসে দৈনিক বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশ বসিরহাটস্থ কোনো মাস্টারমহাশয়-র মৃত্যুর পর তাঁর দেহ দান করা হয়েছে। তাঁর পুত্রকন্যাগণ সবাই প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের সিদ্ধান্ত পিতৃশ্রাদ্ধে কোনো অতিথি বান্ধবকে ভূরিভোজ না দিয়ে ৮০,০০০ টাকা তিনটি সংস্থাকে দান করবেন। এই সম্পর্কে বলতে গেলে, যথাবিধি শাস্ত্রানুসারেই তো হল। দান আর অতিথিসেবা একই পর্যায় পড়ে। শ্রাদ্ধক্রিয়া ও তর্পণবিধি তাঁরা যথাবিধি মান্য করলেন। ১২-১০-৩০ দিন অন্তে শ্রাদ্ধাদি নিয়ম সম্পূর্ণ হয়।

মনু সংহিতায় এইরূপ বক্তব্য আছে।

এখানে ১ দিন ৩ দিন ১০ দিন মধ্যে সকল জাতির চতুরাশ্রম অনু বলা হয়েছে নিশ্চয়ই। এখন, কোন্ বিধানে কি হচ্ছে সে নিয়ে বক্তব্য নেই। মনু সংহিতায় কোথাও দেখা যায় না, ব্রাহ্মণকে দান দিলে সব পাপ দূর হয়। সংসারী কোনো ব্যক্তি, কোনো সাধক, কোনো পণ্ডিত যেই হোন না কেন—দয়া করে গুরুগিরি করবেন না। কারণ না ব্রহ্ম জ্ঞানী হয়ে গুরু গিরি করা ভণ্ডামি ছাড়া অন্য কিছু নেই। গুরুগিরি করবেন মঠে কিংবা আশ্রমে গিয়ে।

আমি জানি তন্ত্রসাধকদের, বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের মধ্যে অনেকে যাদুবিদ্যা, হঠযোগ দ্বারা অলৌকিক কার্যাদি সম্পন্ন করেন। এটা কোনো দেবত্ব নয়, মহত্ব সাধু জ্ঞানযোগী নয়, একধরনের শক্তি। এই শক্তি-র দ্বারা যাঁরা জীবে সেবার ভ্যবাচ্যাকা দেখায় সেইটা একটু যাচাই করতে হয়। সবাই খারাপ জোচ্চর সেটাও কখনো হতে পারে না।

আমাদের সমূহ শাস্ত্র এক একটি রূপক। সেগুলি পড়তে গেলে কিছু বিশেষ বোধ থাকা চাই। আমাদের শাস্ত্রাদিতে উপনিষদ, গীতা, বেদ প্রভৃতিতে এমন অক্ষর, শব্দ, ধাতুগত ব্যাপার ইত্যাদির মানে না জানলে সব উলটাপালটা হয়ে যায়। মূলসুর ছিন্ন হয়। নিহিতার্থ জানলে সহজ হয় ভাল লাগে। অবাক লাগে, কেন শাস্ত্রকারণ সাধারণের বোধগম্য করে দেননি, উপরন্তু আরো জটিল করে দিয়েছেন!

এইজন্যই পড়ে জানবার বুঝবার জন্য গুরু দরকার হয়। অন্যথায় ভুলপথে পরিচালিত হতে বাধ্য।

শ্রীকৃষ্ণ = শ'র—আত্মার—প্রাণবায়ু। 'র' শব্দে বহ্নিবীর চক্ষুস্থানীয় তেজস্তত্ত্ব। 'ঈ' হল শক্তি। এই শক্তি তেজঃ কর্তৃক চক্ষুতে বায়ু স্থির করতে পারলে যে অবস্থার—"বিনা বলোকন", দৃষ্টি স্থির যে রূপ অবস্থা তারই নাম শ্রী।

কৃষ্ণ = কৃষ্ ধাতু আকর্ষণ—কর্ষণ। শ্বাসপ্রশ্বাস রূপ কর্ম। ন শব্দ নিবৃত্তিবাচক—আকাশতত্ত্ব।

"কৃষির্ভূবাচক শব্দো নভশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ।
তয়োরেকঃ পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।।"

স্থির প্রাণই কৃষ্ণ।

হৃষীকেশ হৃষীকেশনাম্ = ইন্দ্রিয়ানাম ঈশঃ

ঈশঃ হল দেবতা। ইন্দ্রিয় হল মনের দেবতা।

অচ্যুত। অ-চ্যুত = না ক্ষয়িত হওয়া। (অ-ক) ভ্রংশ নিজপদ হতে যার নাশ হয় না। ক্ষয়বিহীন যিনি।

গুড়াকেশেন = গুড়াকা হল নিদ্রাতপস্যা। ঈশেন জিত-নিদ্রেণ (অর্জুনেন) অর্থাৎ যিনি নিদ্রাকে জয় করেন বা করেছেন।

কেশব = ক হল ব্রহ্মা, অ হল বিষ্ণু, ঈশ হল শিব। ব অক্ষরটি গমনার্থ ধাতু থেকে জাত। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন দেবতা।

মধুসূদন = বিনাশক। মধু-মায়া, সূদন-বিনাশ ; কূটস্থ-চৈতন্যের স্মরণে মায়ারূপ দৈত্যের নাশ।

হে মাধব। মা-লক্ষ্মীর যিনি স্বামী, স্থির প্রাণরূপ আত্মা, তিনিই মাধব।

জনার্দন। জন হল অসুর। অর্দন হল পীড়ন।

কূটস্থের স্মরণে অসুর ভাবের নাশ হয় বলে তিনিই জনার্দন পদবাচ্য।

বার্ষ্ণেয়। বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ। বৃষ্ণি = প্রচণ্ডজ্যোতি, সেই জ্যোতি হতে উদ্ভূত হয় এক গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ = বার্ষ্ণেয়।

কুণ্ডলিনী শক্তি। "কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদং হংসমুদা হৃতম্ ইতি।" গুরুগীতা দ্রঃ।

স্থির বায়বীয় রূপে কুণ্ডলিনী অচৈতন্যভাবে মূলাধারে রূপিণী কুণ্ডলিনীকে চেতনময়ী করে বিষ্ণুপদে আজ্ঞাচক্রে স্থিতিরূপে অর্পণ করতে পারলে প্রকৃত **পিণ্ডদান করা** হয় ও জীবের মুক্তিলাভ হয়।

অনঘ। অন অর্থে নেই। অনঘ পাপ অর্থে। পাপ যাতে নাই। যা নির্মল ও পবিত্র তাই অনঘ।

সাংখ্য। যার দ্বারা আমি কে জানা যায় তাকে সাংখ্য বলা হয়।

আমি শব্দ যাহা, তাহা আমি পদবাচ্য নয়। এই দেহও পদবাচ্য নয়।

দেহের অস্তিত্ব অজপারূপ কর্মের অস্তিত্বে। অজপা ফুরালে আমি শব্দ থাকে না। কর্ম দ্বারা, কর্মের অতীত অবস্থারূপ জ্ঞানের অবস্থা লাভ হলে আমি কে ইহা জানা যায়—ইহাই সাংখ্য।

ব্রহ্মা = রজোগুণসম্পন্ন দেবতা।

রজঃ গুণের স্থান নাভি হতে কণ্ঠ পর্যন্ত।

এই অগ্নিতে প্রাণবায়ুর ঘৃত দ্বারা হোম হয়। ইহার আরো ব্যাখ্যা হয়। ৪র্থ অধ্যায় গীতা দ্রষ্টব্য।

· গীতার দশম অধ্যায় ১৫ শ্লোকে বলা হয়েছে

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেবদেব আদিত্যাদিরও প্রকাশক। হে জগৎপতে বিশ্বপালক, তুমি আপনিই আপনাকে আপনার দ্বারা জানো অর্থাৎ আত্ম যতক্ষণ আমি এবং অহং জ্ঞান থাকে ততক্ষণ তোমায় জানা যায় না।

শ্রী ভগবান = ষড়ৈশ্বর্যবান—অনিমা, লঘিমা ব্যাপ্তি-প্রকাম্য, মহিমা, ঈশত্ব এই সকল

অবস্থার মাধ্যমে সর্বাবস্থায় সর্বভূতে স্বামীত্বই ভগবান। আমাদের শরীরের মধ্যে তাই ছয় গুণ আছে।

১। মূলাধারে—শাশ্বতপদ
২। স্বাধিষ্ঠানে—শান্তি
৩। মণিপুরে—রেতঃপূর্ণ
৪। অনাহতে—স্বরূপা
৫। বিশুদ্ধার্থে—তুষ্টি
৬। আজ্ঞাচক্রে—জ্যোতিঃ

ধর্ম = জীবের প্রতি দয়া যাতে জীবের রক্ষা হয়, স্থিতি হয়। প্রাণের চঞ্চল গতিকে স্থির করার নাম জীবের স্থিতি। ইহাই ধর্ম, স্থিতিরূপ ধর্ম, না করলেই অধর্ম।

পূর্বে বলেছি ১৭০০, ১৮০০ শতক ধরে ছিল চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, কবিগান, তর্জাগান নৌকাবিলাস, মাথুর ইত্যাদি। ধর্মমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তখন মানুষ সামাজিক আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিন কাটাতেন। বৈষ্ণবদের ধর্মসাধনা যে ভক্তিবাদ বা পরকীয়া সাধন রাধাবল্লভী রীতি নিয়ে এখন কিছু বলতে হবে।

ভক্ত। এই সম্পর্কে স্বামী রামসুখদাস বলেছেন—

নিজের অসহায়তার অনুভূতি এবং ভগবানের মহান প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস হলে মানুষ ভক্ত হতে পারে। ভগবান সর্বজ্ঞ পরম সুহৃদ এবং সর্বশক্তিমান। নিজের মধ্যে কিছু ক্ষমতা যোগ্যতা বিশেষত্ব দেখলে এবং অসহায়তার জন্য দুঃখ না হলে অর্থাৎ তা দূর করবার প্রয়োজন অনুভূত না হলে, ভগবানের প্রভাবের উপর বিশ্বাস হয় না। ভগবান সংসারকে ভক্তের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর ভক্তকে নিজের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের সুখের জন্য ভক্তের অস্তিত্ব বটে! বাস্তবে সুখের ভোক্তা ভগবান, জীব নয়। যেমন শিশু মায়ের জন্য, ভক্তও ভগবানের জন্য। কিন্তু ভক্তিতে, সৎ এর সঙ্গে অসৎও এসে যায়। সাংসারিক ভোগের সময় অসৎ এর সঙ্গে সৎ এসে যায় সৎ এর সঙ্গে অসৎ আসে। ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ তিনটিই অসৎ হয়ে যায়। সুতরাং ভগবানের প্রতি ভক্তের অনন্য ভাব থাকতে হবে। ভক্তি প্রধানত ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষদের কৃপায় অথবা ভগবৎকৃপার লেশমাত্র থেকেই লাভ হয়। সকাম ভাব হল ভক্তি, নিষ্কাম থাকলে ভক্তিযোগ হয়।

কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান থেকে কোনো লাভ হয় না। কেবল ভক্তি থেকে লাভ হয়। কেননা ভক্তিতে ভগবানের সম্বন্ধ থাকে। এজন্য ভগবান সকাম বিশিষ্ট (আর্ত এবং অর্থার্থী) ভক্তদের উদার ভাব।

"উদরাঃ সর্ব এবৈতে"।

গীতা ৭/৮ এবং রামচরিতমানস ১৮৬ দ্রষ্টব্য।

সেবা। কাউকে দুঃখ না দেওয়া, কারও অহিত না করাই সেবামূলক কাজ।

মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। বাবা-মায়ের সেবা করা ; এটা প্রত্যেকের কাছে বাধ্যতামূলক। কারণ, তাঁরা আমায় শরীর দিয়েছেন। পালন করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়ে

যোগ্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা চিরঋণী। এই ঋণ শোধ করার উপায় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সেবা। এরপর তোমার দেশসেবা, ভগবান-সেবা, যা-খুশি করতে হয় করো।

ইতিহাস পুরাণে দেখা যায় মিথ্যা কথা প্রায় বলত না কেউ। এখন চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। গুণে শেষ করা যাবে না সুতরাং দুঃখ করো না। সুযোগ মতো সবাই চোর।

কোনো মৃত্যুপথযাত্রীকে নাম শোনানো হয়। সে হয়তো সংসারের মায়ার যে বন্ধন সেই আবর্তেই মগ্ন। এতে নামগান কি তার কোনো কাজে লাগে?

ভগবান অন্তিমকালে মানুষকে কিছু ছাড় দিয়েছেন। তাই শেষ অবস্থায় ভগবান নাম শোনালে সেখানে যমদূত আসবে না। দ্বিতীয়ত, যে নাম শোনায় তার উদ্দেশ্য কল্যাণ করা, নাম শোনালে তারও কল্যাণ হয়। তৃতীয়ত, নাম শুনে মৃতুপথযাত্রীর অন্তিম সময়ে যদি ভগবান স্মরণে আসে তাহলে তার কল্যাণ হবেই।

শাস্ত্রে আছে পিতার কৃতকর্মের ফল পুত্র-পৌত্রাদিতেও বর্তায়। কেন এমন হবে?

এ কথার বলা যায় বেতার কেন্দ্র থেকে যেমন ধ্বনির প্রসারণ ঘটে তাঁর সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয় তেমনি যন্ত্রের চাবি ঘোরালে সেই নম্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ; ঐ ধ্বনি ধরা যায়। এক্ষেত্রেও সেইরূপ হয়। জীব তারই কাছে জন্মগ্রহণ করে, যার কাছে কোনো কর্মসম্বন্ধ (ঋণবদ্ধ) থাকে। অতএব পুত্র-পৌত্র একরকম নিজেদের কর্ম ভোগ করে অর্থাৎ তাদের বংশ পরম্পরায় সেই ব্যাধিই জোটে ; যার ভোগ তাদের ভাগ্যে লেখা আছে।

এই ভোগ বা ফলভোগ করবার জন্য ভাগ্য যে কর্ম করায় তা ভাগ্য অনুসারে না চলমান ঘটনা থেকে হয়?

এ কথার বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন। এই বিষয়ে এটি বোঝা যায় যে, ফলভোগের জন্য ভাগ্য যে কাজ করায় তা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাজ ভাগ্য দ্বারা হয় না। তা হয় কামনা থেকেই।

কাম-এষঃ, ক্রোধ এষঃ। গীতা ৩।৩৭ দ্রঃ।

ভগবান কলিযুগ কেন অনুমোদন করলেন? কেন না অল্প আয়াসে যাতে জীবের কল্যাণ হয় সেই উদ্দেশ্যে ভগবান কলিযুগ সৃষ্টি করেছেন। কলিকালে মানুষের সামান্য পুণ্য কাজও বড় ফল দেয়। ভগবানের এই উদ্দেশ্যের সদ্ব্যবহার করা চাই।

"কলি কব এক পুণীত প্রতাপা
মানস পুণ্য হোহিঁ নহিঁ পাপ"।

রামচরিত। উঃ কাণ্ড ১০৩।৪ দ্রঃ।

ভগবান কলিকালে এই বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। মনে কোনো পুণ্য কাজ করার ইচ্ছা হল—কিন্তু কোনো কারণে করা হল না—তাহলেও তাতে পুণ্য হবে।

মনে পাপ কর্ম করার ইচ্ছা হল, কিন্তু করলেন না—পরে সেই পাপ চিন্তার জন্য অনুতাপ হল, তাহলে পাপ হবে না। শুধু মানসিক ভাবনায় পাপ হয় না।

বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব যাঁদের তাঁরা হলেন কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বীরভূম জেলার অজয় নদীর ধারে কেন্দবিল্ব গ্রামে জয়দেবের জন্ম হয়। পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামা দেবী। আধুনিক

ঐতিহাসিকগণ এই তথ্য স্বীকার করেন না। ভোজদেব কোনো বাঙালির নাম হয় না। তাঁদের মতে, জয়দেব অবাঙালিই ছিলেন। তিনি ছিলেন মিথিলা বা উড়িষ্যার অধিবাসী। এই নিয়ে বিতর্ক আছে, শোনা যায় আরও কয়েকজন জয়দেব নামে সংস্কৃত কবির পরিচয় নাকি ছিল!

রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় যে পঞ্চরত্ন ছিলেন তাঁদের মধ্যে গোবর্ধন, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি, জয়দেব এঁদের লেখায় রাজা লক্ষ্মণ সেনের নাম আছে। **গীতগোবিন্দে রাজা লক্ষ্মণ সেনের নাম নেই। অথচ তখন রাজপ্রশস্তি ছাড়া কোনো লেখা স্বীকৃত ছিল না।** নিয়ম ছিল পণ্ডিতগণ পূর্বে রাজার প্রশস্তিসহ রাজদরবারে তাঁর লেখা পাঠ করবেন অতঃপর প্রচার হবে।

জয়দেবকে মিথিলা বা উড়িষ্যাবাসী বলা হয়। তিনি উড়িষ্যায় থাকাকালীন এক ব্রাহ্মণ কন্যা পদ্মাবতীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়।

জয়দেব কাব্য— প্রথম সর্গঃ ১-সামোদ দামোদরঃ।

হে রাধিকে! নভোমণ্ডল নিবিড় জলদ জালে সমাবৃত হইয়া উঠিল।

শ্যামল তরুনিকর অন্ধকারময় হইল। শ্রীকৃষ্ণ অতীব ভয়শীল। নিশাভাগে একাকী গমনে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং তুমি ইঁহাকে আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করো।"

নন্দ কর্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞা হইলে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধা কী হরিসমভিব্যাহারে পথপ্রান্তবর্তী কুঞ্জতরুর অভিমুখে প্রস্থান করেন এবং কালিন্দীকুলে সমুপস্থিত হয়ে বিরলে কেলি করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদিগের সেই গুপ্তকেলি।

এই গুপ্তকেলি (লীলা) ভগবদভক্তিপরায়ণ মহাত্মাগণের হৃদয়মন্দিরে নিত্য প্রস্ফুরিত হউক।

দ্বিতীয়ত ঃ, বিগলিত বসনং পরিহিত বসনং
ঘটয় জঘন পিধানম্
কিসলয় শয়নে পঙ্কজ নয়নে
নিধিমিব হর্ষ নিধানম। ১।১৩ দ্রঃ।

হে কমললোচনে! বস্ত্র ত্যাগ করো। কাঞ্চী বিসর্জন দাও, পল্লবশয্যাতে সলীল হইয়া জঘনাবরণ উন্মোচন করো। দেখ, রত্নের আকর উদ্‌ঘাটন করিলে তাহা দেখিয়া যেরূপ মানবগণ হর্ষপ্রাপ্ত হয়, উহাও সেইরূপ হরির আনন্দ উৎপাদন করিবে।

তৃতীয়ত ঃ, পরিহরি কৃতাতঙ্কে শঙ্কাৎত্বয়া সততং
ঘনস্তন জঘনয়াক্রান্তে স্বান্তে পরাণবকাশিনি
বিশতি বিতনোরণ্যে ধন্যো না কোঽপি
মর্মান্তরং। প্রণয়িনি (স্তনভার) পরীরম্ভারম্ভে।
বিধেহি বিধেয়তাম।। ১০।১০ দ্রঃ।

হে বিশাল নিতম্বে। যখন তুমি আমার কেবলমাত্র হৃদয়ে বিরাজ করিতেছ তখন আর তাহার অবকাশ কোথায়? কেবলমাত্র ভাগ্যবান কাম ভিন্ন কেহই আমার অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

ষষ্ঠ সর্গ ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ থেকে নিম্ন শ্লোকগুলি বলছে—

৬।১৭ দয়িতাবিলোকিতলজ্জিতহসিতা
বহুবিধকূজিতরতিরসবসিতা।

৬।১৮ বিপুল পুলক পৃথুবেপথভঙ্গা
শ্বাসিত নিমীলিত বিকসদনঙ্গা।

৬।১৯ শ্রমজলকন ভর সুভগশরীরা
পরিপতি তোরসি রতিরণধীরা

প্রাকৃত ভাষায় লেখা শ্লোকগুলির বাংলা হল—

রাধা প্রান্ত কান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করে কখনো হাস্য কখনো লজ্জায় অধোমুখী হল, মধ্যে মধ্যে রসভারে আকুলা মদন বিকার সূচক নানা শব্দ করতে লাগল। সে রোমাঞ্চিত, কম্পিত কামতরঙ্গে ভাসমান হতে লাগল। ঘন ঘন নিশ্বাস বিসর্জন ও নেত্র নিমীলিত হয়ে মদনাবেশ প্রকাশ করল। সে রতিসংগ্রামে সুদক্ষা—মদনসমরে তার দেহে স্বেদোদ্‌গম হওয়ায় সে অতি মনোরম ভাব ধারণপূর্বক কান্তের বক্ষোপরি শয়না।

এমন রসসাগরে ডুবে নিশ্চই কৃষ্ণের লজ্জা হয়েছে। হওয়ার কথাই। আমাদেরও লজ্জা হয়। এই হল ভক্তলীলাকীর্তন।

এবার আসা যাক জয়দেব-পরবর্তী যুগের বিখ্যাত পদকর্তা বিদ্যাপতির কাব্য—

৮৮৪ নং গান

বামা নয়ন ফুরন আরম্ভ।
পুলক মুকুলে পুরল কুচকুম্ভ।।
নীবী নিবিল স সরতে বিধি।
সগুণে সুচিহলু সাহস সিধি।।
চল চল সুন্দরী ন কর বে-আজ।
মদনে মহানিধি পাওবি আজ।।
বিলম্ব ন কর অঙ্গি রহি অভিসার।
হটে পত্র ফার এ কামিক বাণ।।
তাহি তরুণিকী কওন তরঙ্গ।
করা মদন মহীপতি সঙ্গ।।
বিদ্যাপতি কবি কহন বিচারি।
পুণমন্ত পাব এ গুণমতি নারি।।

কয়েকটি শব্দের বাংলা অর্থ হল—

জকর ছায়া। মহাসিধি—মহাসিদ্ধি
নীবী—বন্ধন। নিবিল—গভীর
পুণমন্ত—পুণ্যবান। তাহি—তাহাকে সেইরূপে
তরুণিকা—পূর্ণযৌবনা
স শরতে—কামবাণে

কবি চণ্ডীদাস গেয়েছেন—

যাইতে দেখিল শ্যামে কি কবিবে কোটিকামে
ভাঙ ভঙ্গিম সুঠাম, চাঁদ বদনে চাহে
যাহা পানে সে ছাড়ে কুল লাজ।
সহি এমন সুন্দর কাণ।
হোরি কুলবতী ছাড়ে নিজ পতি
ত্যজি লাজ ভয় মান।
অতি সে শোভিত বক্ষঃ বিস্তারিত
দেখিয়ে দর্পণকার।
তাহার উপরে মালা শোভিয়াছে ভাল
উপজে মদন বিকার।
নাভির উপরে জনু তমাল জিনিয়া তনু
দলিত অঞ্জন জিনি আভা
বড় কারিকর কুন্দিয়াছ ভাল
রাম কদলীর শোভা
চরণ নখর কোণে রঞ্জিত শোভিত মনে
মণিময় নূপুর তায়।
চণ্ডীদাস হিয়া ও রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া যায়।

এই যে পদগুলি লেখা হল—এসব পড়ে, অনুস্মরণ করে কীর্তন করা যেন কত গৌরবের। কোনো ভক্তজন, সুধীজন, বিজ্ঞজন, রুচিশীল, ঈশ্বর চিন্তার ধারেকাছে যেতে পারেন কি? নভেল পড়লে যে অবস্থা মনে হয় তার চেয়েও ভীষণ কদাকার মনে হয় নাকি? সত্যি পরকীয়া সাধনায় ভক্ত বটে! এতে বৈষ্ণবগণ দুঃখ পাবে না। কারণ তাঁরা সংস্কার শোধনবাদ মেনে নিচ্ছেন। এখন কত সুরে নাম কীর্তন হতে দেখা যায়—

১। ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

২। জয় নিতাই গৌর রাধেশ্যাম
মুখে বল হরি নাম।

"নবদ্বীপ থেকে মায়াপুর এর পরে আরো দূর বৃন্দাবন মধুপুর"।

এবার চণ্ডীদাস জীবনী একটু বলি। বেশ ঘটনাবহুল।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার নাম নিয়েও তর্কের ক্ষান্তি নেই। পিতা ছিলেন দুর্গাদাস, মাতা ভৈবী। কেউ বলেন তাঁর মাতা বিন্দুবাসিনী। জাত ব্রাহ্মণ, পেশায় পূজারী। গ্রামের বিশালাক্ষী বা বাশুলী মন্দিরের পূজারী। খুব অল্প বয়সে পিতা-মাতা হারান তিনি। গ্রামবাসীদের অনুগ্রহে ঠিক উপনয়নের পরেই তিনি ঐ মন্দিরের পূজারী হয়েছিলেন। চণ্ডীদাস বিবাহ করেছিলেন কিনা পণ্ডিতদের মধ্যে সে মীমাংসা হয়নি।

নান্নুর থেকে ৬ মাইল দূরে তেহাই নামক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে বাস করত এক রজক। তার কন্যা রামী বা রামমণি চণ্ডীদাসের মন্দিরে আসে এবং আশ্রয় চায়। শেষ পর্যন্ত চণ্ডীদাস রাজি হয়ে তাকে মন্দিরে স্থান দেন।

দ্বিতীয় কাহিনী। রামী প্রতিদিন কাপড় কাচতে আসত। চণ্ডীদাস ছিপ নিয়ে (রামী যে পুকুরে কাপড় কাচতে আসত সেইখানে মাছ ধরত। এইভাবে প্রণয় আবদ্ধ হয়ে যায়। এই নিয়ে গবেষকগণ বলেন, এইটা বলা যায় সামাজিক কারণে চণ্ডীদাস মন্দির হতে বহিষ্কৃত হয় এবং রানীর গ্রামে এসে বাস করেন। বলা হয় চণ্ডীদাস পরকীয়া সাধনের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। চণ্ডীদাসের পদাবলী মাধুর্যগুণে মণ্ডিত। বৈষ্ণবগণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁর পদ নিজে গান করতেন এখন জনশ্রুতি আছে।

চণ্ডীদাসের শেষ জীবনের ইতিহাস কিছু জানা যায় না।

চণ্ডীদাসের দেহাবসানের এইরকম কিছু কাহিনী আছে—

১। তিনি রজকিনী রামীকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের নাটমন্দিরে কীর্তন করছিলেন হঠাৎ মন্দির ভেঙ্গে পড়ে এবং প্রোথিত হন।

২। মন্দির ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা ঘটেছিল—তবে সে ঘটনা নান্নুরে নয়, কিন্নাহারে এই কথা বলা হয়।

৩। চণ্ডীদাস একদা রামীকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়ের রাজদরবারে গান করছিলেন। চণ্ডীদাসের রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে রানী চণ্ডীদাসের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মনে মনে কামনা করতেন। রাজার কানে এই বার্তা পৌঁছে গেল। তখন রাজা হুকুম দেন চণ্ডীদাসকে হাতির সঙ্গে বেঁধে হাতি চালিয়ে দেওয়া হোক। এইভাবে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়।

ঐ চণ্ডীদাস নামধারী ব্যক্তি প্রাকচৈতন্য যুগের।

চৈতন্য পরবর্তীকালে যাঁরা কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন

বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, রসিক চণ্ডীদাস প্রমুখ। কোন্ পদগুলি কার নিশ্চিত বলা কঠিন। আমার মনে হয় একদা কায়েমি স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা এইসব কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে। কেউ তাঁদের নিজ পরিচয় পাচ্ছে না।

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে রথযাত্রার সময় চৈতন্যদেব অপ্রকট হয়ে যান। মন্দিরে বিলীন হয়ে যান। জগন্নাথ বিগ্রহের সাথে মিশে যান। এই ঘটনা প্রচার হয়েছে। আসলে তাঁকে বিশেষ মন্ত্রণাবশত পাণ্ডারা তাঁকে গায়েব করে দিয়েছেন।

হিন্দু ধর্মের প্রকৃত প্রাণপুরুষ জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য সম্পর্কে দেখুন—

ভারতীয় ধর্মীয় জীবনে বহুবার এসেছে পরিবর্তন। সংগ্রাম করে করে সে তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছে কোনো প্রকারে। সেই মৌর্য যুগ থেকে ভারতের ধর্মাকাশে দুর্যোগের মেঘ জমেছিল। এইভাবে বৈদিক ধর্ম প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়। মৌর্যরাজশক্তিবলীয়ান বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ বিকৃত রূপ নিয়ে অভিযান চালাতে থাকে অবৌদ্ধদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে। বৈদিক ধর্ম ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আত্মরক্ষার সবরকম চেষ্টা চালাতেই থাকে। কেউ কেউ আত্মরক্ষার জন্য স্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধদের দলে মিশে গেলেন।

এই সময় ব্রাহ্মবংশীয় পুষ্যমিত্র শুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৈদিক ধর্মকে

পুনরুজ্জীবিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি দুবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ ছিল বৈদিক ধর্মের প্রতীক।

শুঙ্গবংশের পরে কুষাণরা আচার্য পার্শ্বের অধ্যক্ষতায় বৌদ্ধধর্মের চতুর্থ সঙ্গীতি আহ্বান করেন। চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, তিব্বত প্রভৃতি দেশ হতে ভিক্ষুগণ আসেন এবং ভারতে বৌদ্ধধর্মের ভিত দৃঢ় করেন এই কুষাণরাজ। এমনকি রাজপুরুষদের সাথে বৌদ্ধরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে বেদের ধর্মপথ শাস্ত্রগ্রাহ্য নয় একথা প্রচার করেন। এখন থেকে রাজধর্ম পালন করতে হবে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম পালন করতে হবে এমন ঘোষণা করেন তাঁরা।

এবার এল গুপ্ত যুগ। গুপ্ত নরপতিগণ ছিলেন বৈষ্ণব। ভাগবত রচনা হয় এই সময়ে। অনেক পুরাণের নবীন সংস্করণ হয়। স্মৃতি রচনা হয় এই গুপ্ত যুগেই। বৌদ্ধগণও চুপচাপ বসেছিলেন না। বৌদ্ধ ন্যায় সৃষ্টি হল। নাগার্জুন, বসুবন্ধু, দিঙনাগ, ধর্মকীর্তি, মুখ পণ্ডিত বৌদ্ধ ন্যায়ের জন্ম দিয়েছিলেন। গুপ্ত ও বর্দ্ধন যুগ ছিল তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে সংঘর্ষের যুগ। এই সংঘর্ষ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল। জৈন মতাবলম্বীগণও চুপ করে ছিলেন না। সুমন্ত ভদ্র, সিদ্ধিসেন, দিবাকর এঁদের রচনা নিয়ে জৈন ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র বলে প্রচার করতে থাকেন তাঁরা।

জৈন ধর্ম শ্রুতিকে মানত না। ওদিকে পূর্ব ভারতে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সমগ্র ভারত তখন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। দেখা যায়, যত রাজ্য—তত ধর্ম—তত পথ গড়ে উঠেছিল। কোনো রাজচক্রবর্তী তখন ছিল না। সেই হেতু ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট নিয়মনীতিও ছিল না।

দক্ষিণ ভারতের আলোয়াই নদীর ধারে ছোট্ট গ্রামের মাভৈঃ বাণী নিয়ে হাজির হলেন আচার্য শংকর। ভগবান শিবের অবতার, বৈদিক ধর্মের অজেয় প্রাকার আচার্য শংকর। বিশ্বপ্লাবন সৃষ্টিকারী বিশাল সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠতম উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি তিনি।

খ্রিস্টীয় ৬৮৬ বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে সুখমধ্যাহ্নে তাঁর আবির্ভাব হয়। শৃঙ্গের মঠ মহীশূর জেলায় তুঙ্গভদ্রা নদীর বামদিকে প্রতিষ্ঠিত। আচার্য শংকরের "মঠ" ইহা বৈদিক সংস্কৃতি কেন্দ্র যজুর্বেদের প্রতীক ; শৃঙ্গেরী মঠ বিখ্যাত। দক্ষিণে শৃঙ্গেরী পশ্চিমে দ্বারকাপুরী সামবেদ ; পূর্বে গোবর্দ্ধন মঠ ঋগ্বেদ, উত্তরে জ্যোতির্মঠ অথর্ববেদের প্রতীক। এছাড়া শংকর প্রতিষ্ঠিত মঠগুলির মধ্যে কাশীর সুমের কাকীর কামকোঠী পীঠ বিশেষ উল্লেখ্য। কাশী মঠের যাবতীয় খরচ রামনগরের মহারাজা বহন করেন জানা যায়। মুসলমানদের আক্রমণকালে রাজা প্রতাপ সিং এই মন্দিরটি তাঞ্জোরে স্থানান্তর করেন ধর্মীয় সুরক্ষার জন্য।

শংকরাচার্যের প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায় যাঁরা তাঁদের এই নামেই তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী, পুরী ইত্যাদি ডাকা হত। এই উপাধিগুলির রহস্য পরিচয় খুবই আধ্যাত্মিক। আচার্যের যে মঠনামা আছে তা থেকে জানা যায়।

১। "তত্ত্বমসি" আদি মহাকাব্যের প্রতীক ত্রিবেণী সঙ্গম। এই সঙ্গমরূপী তীর্থে যে ব্যক্তি তত্ত্বার্থ জানবার ইচ্ছা করে, স্নান করেন তাঁকে "তীর্থ" বলে।

২। যে পুরুষের হৃদয় থেকে আশা-মমতা-মোহ এসব বন্ধন নাশ হয়ে গেছে, আশ্রমের নিয়ম ধারণের জন্য যিনি দৃঢ় এবং আবাগমন থেকে সর্বথা বিরহিত তিনিই "আশ্রম"।

৩। যে মানুষ সুন্দর শান্ত নির্জন বনে বাস করেন এবং জগতের সকল বন্ধন থেকে দূরে থাকেন তিনি "বন"।

৪। যিনি এই পার্থিব কলহ থেকে দূরে বনে বাস করেন, নন্দনবনের আনন্দ ভোগ করেন, তাঁকে "অরণ্য" বলে।

৫। যিনি গীতার অভ্যাসে তৎপর থাকেন, উঁচু পাহাড়ে বাস করেন, গম্ভীর নিশ্চিন্ত বুদ্ধি ধারণ করেন—"গিরি" বলা হয় তাঁদের।

৬। যে ব্যক্তি পাহাড়ের মূলদেশে নিবাস করে সমাধিস্থ হয়ে থাকেন যিনি সংসারের সার অসার সম্পর্কের বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন তাঁকে "পর্বত" বলে।

৭। যিনি গম্ভীর এবং সমুদ্রের কাছে বাস করেন, অধ্যাত্মশাস্ত্রের উপদেশরাজি—রত্নরাজি গ্রহণ করেন, আশ্রমের মর্যাদা কখনোই লঙ্ঘন করেন না তাঁকেই "সাগর" বলে।

৮। স্বর (শ্বাস) যে পণ্ডিত জ্ঞানী বেদের স্বরগুলি সম্বন্ধে সুপরিচিত এবং সংসাররূপী সাগরের জ্ঞাতা তাঁকে "সরস্বতী" বলে।

৯। ভার ধারণ করবার জন্যেই 'ভারতী উপাধি দেওয়া হয়। (যে ব্যক্তি বিদ্যার ভারে সম্পূর্ণ, যিনি জগতের সকল ভারমুক্ত এবং দুঃখের সঙ্গে অপরিচিত তাঁকে "ভারতী" বলা হয়।

১০। যে পূর্ণ সেই "পুরী'। তত্ত্বজ্ঞানে যে পূর্ণ, পূর্ণ তত্ত্বপদে স্থিত ; নিত্য পরব্রহ্মে বৃত, প্রভৃতির অধিকারীকে "পুরী" বলে।

এই যে দশ নামের পরিচয় জানা গেল, বৈদিক ধর্মের মূল সুর এঁরাই প্রচার করেন। দশনামী সম্প্রদায় আচার্য শংকর কৃত। দণ্ডস্বামী নামে আর এক বৈদিক সম্প্রদায় বলেন, দশনামীরা নীচু সম্প্রদায়।

আধুনিক যুগে রাজা রামমোহন রায় জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি হিন্দুদের দেব-দেবীকে পূজা নিয়ে ভীষণ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন, "রামমোহন সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, উর্দু, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরাজী, ফরাসী এই নয়টি ভাষা জানতেন এই নয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন—বিলক্ষণ বুদ্ধিমত্তার প্রশংসাপাত্র ছিলেন।"

রামমোহন রায় দেশের একজন অনন্যসাধারণ মানুষ ছিলেন। রামমোহন রায়ের পূর্বে হিন্দুধর্মের কি হাল ছিল তা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় লেখা থেকে জানা যায় "তখন বঙ্গভূমি অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, পৌত্তলিক বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে কর্মকাণ্ড, উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড কিছুই ছিল না। দুর্গোৎসব, বলিদান, নন্দোৎসব, কীর্তন, দোলযাত্রা, আবীর খেলা, রথযাত্রা লইয়া লোকের মহা আমোদ ছিল। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব দান, তীর্থভ্রমণ, অনশন ব্রত দ্বারা পুণ্য অর্জনের যেন ধুম পড়িয়াছে। স্বপাক হবিষ্য ভোজন যেন পবিত্রকর কর্ম। কলিকাতার বিষয়ী লোকেরা ব্রাহ্মণেরা ইংরাজ অধীনে বিষয়কর্ম করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষার জন্য

বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহারা কার্যালয় হইতে ফিরিয়া অবগাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছ সংস্পর্শ জনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যাপূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা তাঁহাদের যশঃ সর্বত্র ঘোষণা করিতেন। কেহ কেহ ঐরূপ কষ্ট না করিয়া কার্যালয়ে যাইবার পূর্বে, সন্ধ্যাপূজা হোম ইত্যাদি সম্পন্ন করিতেন ; নৈবেদ্য, টাকা, ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ও সংবাদপত্রের ন্যায় বাড়ি বাড়ি গিয়া দেশ-বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকার সংবাদ দিতেন। বিশেষত কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ, দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন তাঁহার সুখ্যাতি ও অখ্যাতি কীর্তন এবং ধনদাতাদের যশ মহিমা ব্যাখ্যা করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যকে যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্রধনীদের উপর তাহাদের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাহারা শিষ্যবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকে পাদ-উদক, কাহাকে চরণের ধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ অর্জন করিতেন। এই নিদর্শন আজও গ্রামগঞ্জে বিদ্যমান দেখা যায়।"

রামমোহন রায় নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য পৌত্তলিকতার সঙ্গে যে প্রাচীন ধর্মাচরণের কোনো যোগ নেই তা তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন। বেদান্ততত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপলব্ধির মূল কথা তা বোঝাতে চেয়েছেন, ধর্মের সঙ্গে যেসব অন্ধ কুসংস্কার, অবতারবাদ, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান জড়িত ছিল তা তিনি মানতেন না।

নারীর অবস্থান নিয়ে আমাদের সমাজে নারী-পতিব্রত্যের বিনিময়ে চিরকাল লাঞ্ছিতা অবহেলিতা শোষণের শিকার তা বুঝে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরই ফল সতীদাহ নিবারণ।

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরকে বাদ দিয়ে হিন্দুধর্মের অস্তিত্ব ভাবাই যায় না। সতীদাহ কলঙ্ক মুছে দিয়ে তিনি যেন হিন্দু সমাজকে গভীর অন্ধকার থেকে আলোয় এনেছেন। হিন্দুসমাজের দুর্নীতি এবং নানা অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর অনলস সংগ্রাম কোনোদিন ভোলা যাবে না। তিনি ৯টি ভাষা শিখেছিলেন। শাস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদিতে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রথম সংস্কৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্র উপনিষদ অনুবাদ করে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। পর পর ৫টি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন রামমোহন। ইহা ইং ১৮১৯ সালের ঘটনা। তিনি বেদান্তের প্রচারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি যে উপনিষদগুলি বাংলা ভাষ্য লিখেছিলেন সেগুলি হল—তলবকার, কঠোপনিষৎ, ঈশোপনিষৎ, মাণ্ডূক্য, মণ্ডূকোপনিষৎ এবং এগুলিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্য।

কাশীনাথ তর্কবাগীশ, গোস্বামীর সহিত ভট্টাচার্যের সহিত বিচার—সহমরণ ও প্রতিমা পূজা নিয়ে বিচার ইত্যাদি কারণে সহজ গদ্য ভাষা চালু করেন। প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ গ্রন্থ দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যার জন্য বাংলায় গদ্য ভাষার প্রচলন দরকার ভেবে এই কাজ তিনি করেন। রামমোহনের আগে মধ্যযুগে রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের কোনো যোগ ছিল না। রাষ্ট্র চলত বাদশাহ, নবাব, রাজন্যবর্গের ও তাদের কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা। সাধারণ জনগণের কোনো নাক গলানোর ব্যাপার সেখানে ছিল না।

রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার প্রথম উন্মেষ রামমোহনের হাত ধরে হয়। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত সম্পর্কে আইন রচনার জন্য বেশ কিছুই অভিমত ইংরাজীতে লিখে পেশ করেন।

সেই ঘটনা বহুল অধ্যায় এখানে লেখা সম্ভব নয়। তিনি প্রণম্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি সতীদাহ নিবারণের জন্য তিনি নমস্য।

রামমোহন বিদ্যাসাগরকে বাদ দিয়ে হিন্দুধর্ম লেখা যায় না। বিদ্যাসাগর ১২২৭, ১২ আশ্বিন ইং ১৮২০, ২৬ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। এই গ্রামটি প্রথমে হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল, পরে মেদিনীপুরের সাথে যুক্ত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। তাঁর ঠাকুরদাদা রামজয় তর্কভূষণের পণ্ডিত হিসাবে বিশেষ খ্যাতি ছিল। রামজয় ও তাঁর ভাইদের সাথে সদ্ভাব ছিল না। তাই অধৈর্য হয়ে পুত্রকন্যা নিয়ে চলে আসেন শ্বশুরবাড়ি স্ত্রী দুর্গাদেবীর ইচ্ছায়। এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র হলেন বীরসিংহ গ্রামের অধিবাসী।

অতীব দারিদ্রতার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। বহু কষ্ট, অনলস অধ্যবসায় আর কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা তিনি বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠেন।

বিদ্যাসাগর কলকাতায় এলেন পিতার কাঁধে চড়ে, কখনো হেঁটে। নিতান্তই বালক, ভর্তি হলেন সংস্কৃত কলেজে—তৃতীয় শ্রেণীতে। এই সময় পর পর তিনটি পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের জন্য তিনি পারিতোষিক পান। এইবার ইংরাজীতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠ আরম্ভ করেন। এইভাবে তাঁর বিদ্যাভ্যাস চলেছিল। এর পরে তাঁর বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বহু বলার আছে ; যেহেতু তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একাই একটি ইতিহাস। তাঁর ২টি দিক নিয়ে কিছু বলা একান্তই প্রয়োজন। কারণ তিনি হিন্দুধর্মের কলঙ্ক ভঞ্জনেব সাথে সাথে নবজীবনের উত্থান ঘটিয়েছেন।

বাল্যবিবাহ—অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাদানে পিতামাতার পরম কল্যাণ হয়। কারণ গৌরী দান জনিত পুণ্য সঞ্চয়। নবম বর্ষীয়া কন্যাদানে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়। দশম বর্ষীয়া দানে পবিত্রলোক প্রাপ্ত হয়।

স্মৃতিশাস্ত্র প্রোক্ত এইরূপ কল্পিত অনর্থকারী বিধির প্রতি খড়্গহস্ত হন বিদ্যাসাগর মহাশয়। শাস্ত্রে তিনি দেখেন, আট রকম বিবাহ বিধি আছে। এছাড়া স্বয়ম্বর সভায় বিবাহ প্রচলিত ছিল। সেখানে অধিক বয়স না হলে কি করে হয়? তিনি আরো দেখেছেন যে পশ্চিম দেশীয় লোকদের মধ্যে বর কন্যার অধিক বয়সে বিবাহ হয়। এই সময় তাঁর নজরে আসে নবশাখা জাতীয় কোনো ব্যক্তিব ৮/৯ বছরের এক কন্যা বিধবা হয়েছে। এবং ঐ ব্যক্তি তার কন্যাকে পুনর্বার বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এগিয়ে এলেন। শাস্ত্র তোলপাড় করে শেষ পর্যন্ত সকল গর্বিত পণ্ডিত চূড়ামণিদের তিনি শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত করেন। এবং বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইন, বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ করেন তা সমাজে প্রচার ও প্রচলন করে ছাড়লেন।

বৈদিক সংস্কৃতির পীঠস্থান তখন গৌড়দেশ ছিল। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে ৪৭৪টি টোল চতুষ্পাঠী ইত্যাদি ছিল। হাজার হাজার পণ্ডিত বিদ্যাবাগীশ, চূড়ামণি, তর্কশাস্ত্রী, ন্যায়রত্ন, বিদ্যাভূষণ, অলঙ্কারশাস্ত্রী এইরূপ খেতাবধারীদের একা বিদ্যাসাগর হিন্দু শাস্ত্র সাগর মন্থন করে শাস্ত্রযুদ্ধে সকলকে যে পরাস্ত করলেন তা কেবল বিদ্যাসাগরের দ্বারাই সম্ভব ; অন্য কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি পণ্ডিত বিদ্যাসাগর। তিনি নব বেদব্যাস। তিনি সকল শ্রদ্ধাভক্তির ঊর্ধ্বে, তিনি প্রণম্য সবার।

তখনকার দিনে রাজাদের ইচ্ছায় ধর্ম সমাজ পরিচালিত হয়েছে। রাজাদের নিজস্ব পণ্ডিত থাকতেন। বড় বড় সব পণ্ডিতদেরই রাজ দরবারে ঠাঁই হত। সমাজে চালু হত বিবিধ কানুন। রাজা বল্লাল সেনের কোনো এক খেয়াল থেকে উদয় হল—ব্রাহ্মণদের শ্রেণীবিন্যাস করার। তিনি সকল পণ্ডিতদের আহ্বান করলেন। ওমুক দিন বেলা ৯ ঘটিকায় রাজদরবারে উপস্থিত থাকতে হবে।

সভায় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পণ্ডিতরা হাজির হতে লাগলেন।

যারা ১ প্রহরে এলেন তাঁরা অকুলীন। দেড় প্রহরে যাঁরা এলেন তাঁরা শ্রোত্রিয়। যাঁরা আড়াই প্রহরে এলেন তাঁরা কুলীন। নিত্যক্রিয়া সমাপন কবতে সময় লাগে, সেই কারণে তাঁদের দেরি হয়েছে। অতএব সর্বশেষ আগত ব্যক্তিই কুলীন। এই কুলীনরাই হলেন তদানীন্তন কালের মহাবিপদ সৃষ্টিকারী জীব। এদের তাঁবেদারিব কাবণে উচ্ছনে গেছে হিন্দুসমাজ।

একদিকে বিজাতীয় শাসনের ভয়ংকর উৎপাত আর একদিকে কুলীন বামুনের হুহুংকার, ফলে সমাজ চ্যুত বিধর্মী হয়ে গেছে বহু বহু সমাজভুক্ত মানুষ।

তাছাড়া দেখা যায়, সেকালে ধর্মকর্ম যা কিছু ছিল একটা বিশেষ শ্রেণীর ফতোয়া মাত্র। মুক্তচিত্ত মুনিঋষিগণ যে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের কথাই ভেবেছিল এতে সন্দেহ নেই। আমাদের বেদ উপনিষদ ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ বিশুদ্ধ আকারে নেই। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি পণ্ডিতদের হাজার কারচুপি দ্বারা কি যে করা হয়েছে তার সহজ হদিস কেউ পাবে না। সমস্ত ধর্মপুস্তক সংস্কৃত ভাষার রচিত। তাই সেগুলির সম্পর্কে সাধারণের অজ্ঞতাই। বিদ্যাসাগর স্বাভাবিক দেখালেন শাস্ত্রের নামে কি ভণ্ডামি হচ্ছিল যেমন ঘটেছে দুর্নীতি। আমাদের দেশে ধর্মের নামে যত ভণ্ডামি হয়েছে পৃথিবীতে আর কোনো কিছুতেই তা হয়নি।

কোনো ধর্মগুরু নতুন কোনো কথা বলতে পারেন না। ফ্রেম ঠিক আছে—কাঁচটা পালটে দিতে পারেন, মুছে পরিষ্কার করে দিতে পারেন ; এর বেশি কিছুই পারেন না।

স্বামী রাম সুখদাসের মতে—

"পারস মে অরু
সন্ত মেঁ, বহুত অন্তরৌ জান।
উহ লোহা কাঞ্চন করে
উহ করে আপু সমান।

এইটি হল গুরুকৃপার বৈশিষ্ট্য।

এই গুরুকৃপা চার রকমের হয় যথা—স্মরণে, দৃষ্টিতে, শব্দে, স্পর্শে। যেমন কচ্ছপ বালির মধ্যে ডিম পাড়ে, নিজে জলের মধ্যে থাকে কিন্তু ডিমকে মনে রাখে, তার স্মরণের ফলেই ডিম ফুটে ওঠে। সেইরকম গুরুকে মনে করা মাত্রই শিষ্যের জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। এটি **"স্মরদীক্ষা"**।

মাছ জলের মধ্যে নিজের ডিমের দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে থাকে। তার তাকানোর ফলেই ডিম ফোটে। এইরকম গুরুর কৃপাদৃষ্টিতে শিষ্য জ্ঞানলাভ করে। এ হল **"দৃষ্টিদীক্ষা"**।

তিত্তির পাখি পৃথিবীতে ডিম পাড়ে আর আকাশে শব্দ করতে করতে চক্কর দিতে থাকে।

তার শব্দের ফলে ডিম ফোটে। সেই মতো গুরু তাঁর কথাব দ্বারা শিষ্যকে জ্ঞান দেন এ হল "**শব্দদীক্ষা**"।

ময়ূরী তার ডিমের উপর বসে থাকে। তার স্পর্শে ডিম ফোটে। তেমনি গুরুর হাতের স্পার্শে শিষ্যের জ্ঞান হয়—এ হল "**স্পর্শদীক্ষা**"। গুরুর কথা হয়, গুরুর উপদেশ মানলে কল্যাণ হয়। গুরু হলেন শব্দ। শরীর নন।

"জো তু চেলা দেহ কো, দেহ খেহ কী খান।
জো তু চেলা সবদ কো, সবদ ব্রহ্ম কর মান।"

গুরু শরীর নন, আর শরীরও গুরু নন।

'ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত' শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২৭

গুরুর কখনও মৃত্যু হয় না। গুরু যদি মারা যান তাহলে শিষ্যের কল্যাণ হবে কী করে? শরীরকে তো অধম বলে।

"স্থিতি জল পাবক গগন সমীরা।
পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা"।

রামচরিত মানস কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ১১।২ দ্রঃ।

যদি কোনো হাড়মাংসযুক্ত শবীর গুরু হয় তাহলে সে অধম্। গুরুর বেশে কালনেমি রাক্ষস।

এজন্য গুরুতে শরীর বুদ্ধি মান্য কবা এবং শরীরে গুরুবুদ্ধি মান্য করা অপরাধ। সবাই ধর্ম করেন। গুরু যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সেটা যথাযথ হয় কিনা, সেটাই শাস্ত্র। যথাযথ না হলে অনাচার। ব্রাত্য। পাপ। এই হচ্ছে বিধান।

মুক্ত পুরুষ না হলে গুরু হতে পারে না। কোনো সংসারী মানুষ গুরু হতে পারেন না। ঋষিগণ জগৎ-কল্যাণের জন্য নিয়োজিত। দিব্যশক্তি সম্পন্ন ঋষিগণ সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন—কলির মানুষ ও তাদের জীবনযাপন প্রণালী। কলির মানুষের জন্য নতুনভাবে শাস্ত্র রচনা কবে গেছেন। আমাদের সেই পথে চলাই সংগত। এই কারণে যুগধর্ম ও কলির ধর্ম" লেখা হল।

১। কৃৎ এ মানবধর্ম দ্বাপরে গৌতমাস্মৃত
ত্রেতায় সাংখ্য লিখিত
কলৌ পরাশর স্মৃতি।। —মৎস্যপুবাণ

২। সত্যে ব্রহ্ম দ্বাপরে বিষ্ণু
ত্রেতায় সূর্য কলিতে রুদ্র।। —মার্কণ্ডেয় পুরাণ

৩। কৃতে ত্বাস্থিগতা প্রাণা স্ত্রেতায়াং মাংসমাশ্রিতাঃ
দ্বাপরে রুধিরঞ্চৈব কলৌ ত্বন্নাদিক্ষু স্থিতাঃ। পরাশর সংহিতা

৪। তপঃ পরং কৃতোযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে
দ্বাপরে যজ্ঞ মেবাহুর্দানমেব কলৌযুগে। —মৎস্য পুরাণ

৫। ত্যজেদ্দেশং কৃত যুগে ত্রেতায়াং গ্রামুৎসৃজে
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্তারস্তু কলৌযুগেষ —পরাশর সংহিতা

৬। কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ
দ্বাপরে তন্নমাদায় কলৌপতিত কর্মণা। —পরাশর সংহিতা
৭। কৃতে তাৎকালিকঃ শাপ স্ত্রেতায়াং দশভিদিনৈঃ
দ্বাপরে চৈকমাসেন কলৌ সংবৎসরেণ তু।। —পরাশর সংহিতা
৮। কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পতিত কর্মণা। —পরাশর সংহিতা
৯। অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহপরে
অন্যে কলিযুগে নৃনাং যুগহ্রাসানুরুপতঃ। —মনুঃ সংহিতা
১০। যস্তু কর্তাযুগে ধর্মো ন কর্তব্যঃ কলৌযুগে
পাপ প্রসক্তাস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যৌ নরস্তথা। —আদি পুরাণ
১১। সবেব ধর্মা কৃতে জাতাঃ সর্বে নষ্টাঃ কলৌযুগে
চাতুর্বর্ণ্য সমাচার কিঞ্চিৎ সাবধানংবদ বুভুসিৎ বচনং।
১২। বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তিন কলৌ নৃনাম। —বিষ্ণুপুরাণ।
১৩। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানং বিরোধোমত্র দৃশ্যতে
তত্র শ্রৌতং প্রমাণস্তু তয়োর্দ্বিধে স্মৃতিরা। —ভাগবত (বেদব্যাস)।
১৪। শ্রুতিভ্রষ্টঃ স্মৃতি প্রোক্তপ্রায়শ্চিত্ত পরাঙ্মুখ
ক্রমেন শ্রুতিসিদ্ধার্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ
পঞ্চরাত্রং ভাগবতং মন্ত্রং বৈখানসাভিধনম্
বেদভ্রষ্টান সমুদ্দৃশ্য কমলাপতিরুক্তবঃ। —পদ্মপুরাণ

উপরে যে ১৪টি শ্লোক বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র এবং ভাগবত হতে বলা হল এগুলির বাংলা তর্জমা হল যথাক্রমে—

সত্যযুগে মনুর ধর্ম। দ্বাপরে গৌতম। ত্রেতায় সাংখ্য কপিল, জ্ঞানকাণ্ড।

কলিতে পরাশর একমাত্র ধর্মের প্রবক্তা।

যুগধর্মে—সত্যে ব্রহ্মা দ্বাপরে বিষ্ণু। ত্রেতায় সূর্য এবং কলিতে রুদ্রের অর্থাৎ শিবের পূজা বিধেয়। সত্যযুগে কোনো পূজাপাঠ নেই। কেবল তপস্যা ধ্যান। দ্বাপরে বিষ্ণুসেবা, নাম। ত্রেতায় কেবল যজ্ঞ—গোমেধ অশ্বমেধ হাতি ছাগ নরবলিও ঘটত। এই তখনকার ধর্ম। কলিকালে কেবল শিবের আরাধনা পূজাপাঠ সকল শাস্ত্রে গৃহীত।

সত্যযুগের মানুষের প্রাণ ছিল অস্থিগত, শরীর অনাহারে শুষ্ক হলেও মৃত্যু নেই।

ত্রেতা যুগে প্রাণ মাংসাশ্রিত—শরীর শুষ্ক-ক্লিষ্ট হলেই মৃত্যু।

দ্বাপরে রক্তশূন্য হলেই প্রাণত্যাগ ঘটেছে।

এই কলিকালে মানুষের প্রাণ অন্নগত। না খেলে অনাহারে অবশ্য মৃত্যু।

যুগধর্মে সত্যযুগে পতিত কর্ম করলে, অনাচার করলে তাকে দেশত্যাগ করতে হত। ত্রেতাযুগে গ্রামত্যাগ করতে হত। দ্বাপরে কেবল পতিতের অন্ন খেলেই পতিত হয়ে যেত ; তাকে ত্যাগ করতে হত। এই পতিত কর্মের জন্য পরিবারের সকলকেই বর্জন করা হত অর্থাৎ একঘরে করা হত।

কলিকালে দেখা যায়, কেবল পতিত কাজ যে করে সেই বাদ হয়ে থাকে। তাও নাম কা ওয়াস্তে। জাতপাত কোনো বিচার আদৌ নেই। এখন সবর্ণ-অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত। এখন জোর ঘোষণা চলছে, সব জাতি এক সব একাকার আজ।

সত্যযুগে পতিত ব্যক্তির সাথে সম্ভাষণ করলেই পতিত হয়ে যেত। ত্রেতাযুগে স্পর্শ করলেই পতিত হত। দ্বাপরে পতিতের অন্ন খেলে পতিত হত। কলিতে কেবল পতিত কর্ম করলে পতিত। কলিকালে পতিতের ভাত খেলে, কথা বললে কোনো দোষ নেই। এটা এখন কোনো ব্যাপারই নয়। এমনকি পতিত-টতিত ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

সত্যযুগে মানুষের ন্যায় সততার প্রতি একটা সুদৃঢ় নিষ্ঠা ছিল, তা থেকেই কোনো মতে বিচ্যুত হতে কেউই চাইত না। এই কারণে তাঁদের বাক্‌শক্তি ছিল অমোঘ। মুখ দিয়ে যখন যা বলতেন সঙ্গে সঙ্গে তা ফলবতী হয়ে যেত। ত্রেতাযুগে কোনো অভিশাপ ফলত ১০ দিন পরে। দ্বাপর যুগে ফলত ১ মাস পরে। কলিকালে বলবৎ হয় এক বৎসর পরে। এইভাবে পাওয়া যাচ্ছে এক ক্রমহ্রাসমান চিত্র।

মনু বললেন, সত্যযুগের ধর্ম এক রকম, ত্রেতাযুগের ধর্ম এক রকম, দ্বাপরের এক রকম এবং কলিযুগের ধর্ম এক রকম। তিনি বলেছেন প্রত্যেক যুগের ধর্ম বিভিন্ন। সত্যদ্রষ্ট। ঋষিগণের অগোচরে কিছুই থাকতে পারে না। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া ক্ষণজীবন কাল, তাই চিরাচরিত নীতি শিথিলযোগ্যও বটে। সত্যযুগের ধর্ম, যাগযজ্ঞাদি কষ্টকর কার্য। কলিযুগের মানুষ করতে পারবে না, কলির মানুষ পাপাশ্রিত এবং ভগ্নমনোরথ। সত্যযুগের ধর্মজ্ঞান নীতিজ্ঞান শুভবোধ—সবই ক্ষীয়মাণ, সকলকে বুঝে চলতে হবেই।

বিষ্ণু পুরাণ বলেছে, সে যুগের চতুরাশ্রম ধর্ম এ যুগের মানুষের কাছে অচল। স্বয়ং ব্যাসদেব ধর্মকর্মের পথে নিয়মকানুন যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য বেদের সহিত, স্মৃতির সহিত পুরাণের বিরোধ স্বাভাবিক তা বুঝে নিয়ে বিধান দিলেন, কোন্‌টা ঠিক বা কোন্‌টা গ্রাহ্য হবে।

শেষ শ্লোকের মীমাংসা এইরূপ। অনাগত কালে দেখা যাবে—ব্রাহ্মণগণও শ্রুতি স্মৃতি পরিত্যাগ করে মোহশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট এবং বশীভূত হয়ে পড়বেন। যে মোহশাস্ত্র শ্রবণ করা মাত্রই জ্ঞানীগণ পতিত হয়ে যায়। সেইসব মোহশাস্ত্রগুলি যথা—করাল, ভৈরব উত্তর, পশ্চিম, পঞ্চরাত্র, বৈখানস, ভাগবত মন্ত্র তথা শৈব সহস্রাণি ইতি।

এসব মোহশাস্ত্রের প্রবক্তা স্বয়ং কমলাপতি বিষ্ণু।
"মাহ গোপয়ঃ যৎ সৃষ্টিরুত্তোত্তরঃ"। মৎস্যপুরাণ

কূর্মপারণ বলছে—

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকোস্মিন্‌ বিবিধানি
শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধাণি তেষাং নিষ্ঠাতু তামসী।
করাল-ভৈরবাঞ্চপি যামলং মমে এবং
বিবিধানি চান্যানি মোহনার্থাণি তানি তু
ময়া সৃষ্টানি চাম্যামি মোহয়ৈষ্যাং ভবার্ণবে।"

শাম্বপুরাণ বলছে—

শ্রুতিভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্ত
প্রায়শ্চিত্ত পরাঙ্‌মুখ ক্রমেণ
শ্রুতিসিদ্ধার্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ।
পঞ্চরাত্রং ভাগবতং মন্ত্রং বৈখানসাভিধম্‌
বেদভ্রষ্টান্‌ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবাণ্‌।

অতএব দেখা যায়, স্বয়ং বেদভ্রষ্টদিগের নিমিত্ত পঞ্চরাত্র ভাগবত, বৈখানস শাস্ত্র বা তন্ত্রশাস্ত্র—এগুলি মোহশাস্ত্র হিসাবে প্রেরণ করেছেন। কেন, তার ব্যাখ্যা পদ্মপুরাণে আছে—

"মাং গোপয়ঃ যত সৃষ্টিরুত্তোত্তরঃ।"

ভগবান শিব পালনকর্তা বিষ্ণুকে বললেন "তুমি তোমাকে অর্থাৎ আমাকে গোপন কর তাহলে সৃষ্টি ঠিক চলবে। মিথ্যার গোলক ধাঁধায় সবাই ঘুরবে ফিরবে, সৃষ্টি চলবে সমস্ত ঠিক ঠিক।"

"শৃণুদেবী প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্‌।
যেষাম্‌ শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনাঽপি।
হি ময়োক্তম্‌ শিবংপাশুপাতাদিকম্‌
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তেস্তু জনান মদ্বিমুখান কুরু
মাঞ্চ গোপয়ঃ যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।"

কলৌ পরাশর স্মৃতি কেন? যেহেতু দেখা যায়—

"কৃতে শ্রুত্যাদিত্যে মার্গস্ত্রেতায়াং স্মৃতিচোদিতঃ
দ্বাপরে তু পুরাণোক্ত কলাবাগম সম্ভবঃ"

"ইত্যাদিগমবচন"

আগম শাস্ত্র বলেছে ওই শ্লোকগুলি। কলিতে কেবল আগমশাস্ত্র চলবে, কোনো শাস্ত্রের কথা আগম বলেনি। উক্ত যুক্তি দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ বিতর্কে হারাতে চেয়েছিলেন জনৈক পণ্ডিত। প্রকাশ থাকে যে, বেদ-স্মৃতি-পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রে পরাজিত হবার পর ঐ অস্ত্র ক্ষেপণ করেন মুর্শিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়।

তিনি বলেন, বিদ্যাসাগর যা বলেছেন তা ঠিক নয়। তিনি জোর গলায় দাবি করেন—কলিতে কেবল আগমশাস্ত্র চলবে, অন্য কিছু না।

উত্তরে বিদ্যাসাগর লিখলেন—

চ কার মোহশাস্ত্রানি কেশবঃ সশিবস্তথা।
কপিলং নকুলং বামং ভৈরবম্‌, পূর্ব-পশ্চিমম্‌
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ।।

কূর্ম পুরাণ দ্রষ্টব্য।

এরপর তদানীন্তন কুলীন চূড়ামণির দল ভয়ংকর লজ্জায় মুখ ঢাকেন। বিদ্যাসাগরের জয় হল। সেইদিন হিন্দু সমাজ নতুন করে বাঁচবার নিশানা পেল। সেদিন বাংলা তথা সমগ্র

ভারতবর্ষের নবজাগরণের দিন হল। বিদ্যাসাগর আমাদের কাছে নব ব্যাসদেব পরিগণিত হলেন। নিজে উচ্চব্রাহ্মণ বংশের হয়েও সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতের একাই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, দেশ ও দশের প্রতিনিধি হয়ে গেলেন। তাঁর মতো মানুষ আর জন্মাবে না এই কলিযুগে। এই আমাদের দুর্ভাগ্য।

তাঁকে স্মরণ করে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন

"চন্দ্রচূড় জটাজালে যেমতি জাহ্নবী আছিলা—
তেমতি গৌড়জনে বিধৃত সকল শাস্ত্র ছিল অবরুদ্ধ
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবি।
কুটিল কালসাপ কুলীন কৌলীন্য প্রথা হেন
গ্রাসিল যে তাকে, দেবনাগরী ভাষার মোহডোরে
হায়! কে জানিত আসিবে পুন ঃ নব ব্যাসদেব ;
স্নেহের সে ধনে—
করিবে পবিত্র মন ও মননে ....; ভক্ত সকল
সন্তানে তাঁর। যথাপুত বারি করে গঙ্গার সগরে।"

হিন্দুধর্ম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম। হিন্দুধর্মের আদি কথা—অহম্ ব্রহ্ম। আমরা জানি, বেদ চারিটি। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ। চারিটি বেদের মূল সুর সেই অহম্ ব্রহ্ম।

ঋগ্বেদ—প্রজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম
সামবেদ—তত্ত্বমসি
যজুর্বেদ—অহম ব্রহ্ম
অথর্ববেদ—ব্রহ্মোঽস্মি

হিন্দুশাস্ত্রে ২০টি সংহিতা আছে।

২০টি সংহিতা কেন? বহু সম্প্রদায় হেতু নিজ নিজ ধ্যানধারণায় গড়ে উঠেছে সংহিতাগুলি। সময়ের সাথে পরিবর্তনকে স্বীকার করে মুক্তচিত্ত ঋষিগণ ওগুলি করেছেন—সকলগুলিই বেদানুসারী বুঝতে হবে। যেহেতু সকল বেদের একই কথা। একই সুর স্মৃতি শাস্ত্র বা সংহিতা হল ভারতীয় জীবনদর্পণ ও জীবনচর্যা।

এই সংহিতাগুলির মধ্যে মনুসংহিতাকে সর্বাপেক্ষা অসাম্প্রদায়িক বলে স্বীকৃত এবং গ্রহণীয় এ বিষয় দ্বিমত নেই। মনু মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক বলে অনুমোদিত।

মনু সংহিতার ১২টি অধ্যায় আছে।

১। সৃষ্টি, ২। সংস্কার বিবরণ, ৩। বিবাহ, ৪। গৃহস্থের নিয়ম, ৫। অশৌচ ব্যবস্থা, ৬। ধর্ম, ৭। বানপ্রস্থ, ৮। রাজধর্ম, ৯। দাম্পত্য ধর্ম ও দায়ভাগ, ১০। সংকর জাতীয় বিবরণ, ১১। প্রায়শ্চিত্ত, ১২। জন্মান্তর প্রাপ্তি।

মনু বলেন, মানুষ ৩টি ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যথা—দেবঋণ, পিতৃঋণ, মনুষ্যঋণ। শাস্ত্রপাঠ পূজা যজ্ঞ ইত্যাদি দ্বারা দেবঋণ শোধ করতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে পিতৃঋণ শোধ করতে হয়।

পিতৃ তর্পণ সম্পর্কে বলা হয়—এই তর্পণ দেবতাদেরও করণীয় কর্তব্যকর্ম। অতএব

মানুষেরও অপরিহার্য। এই তর্পণ স্মরণ করাবার নিমিত্ত চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়ে থাকে। মনুষ্যঋণ শোধ হয় বিভিন্ন সেবামূলক কাজ দ্বারা। যেমন—কূপ খনন, রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপণ, আশ্রয়স্থান, জলাশয় খনন, এই সকল জনহিতকর কাজকর্ম। দীন-দুঃখী-আর্ত ও ফকিরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া দান কার্য ইত্যাদির মাধ্যমে।

আমরা জানি বেদ এবং বেদাঙ্গ।

বেদাঙ্গ কী?

কল্প, শিক্ষা, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ—এই ছয়টিকে বেদাঙ্গ বলে।

কল্পসূত্রের ৩টি ভাগ আছে, যথা—শ্রৌত, গৃহ্য এবং ধর্ম।

শ্রৌত—বেদানুসারী কর্ম। গৃহ্য—অবশ্য পালনীয় কর্ম। ধর্ম—পারিবারিক, পারমার্থিক ও রাজনৈতিক সামাজিক কর্তব্য বিষয়ক সূত্র। এগুলিকে ধর্মসূত্র বলে।

গৃহকার্য সম্পাদন করবার জন্য চিরস্থাপিত বা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত রূপে স্থাপিত বিষয়ক সূত্রগুলিই গৃহ্যসূত্র। যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপগুলিকে শ্রৌতকর্ম বলে।

মনুর মানবতা ৫টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, চৌর্যবৃত্তি দমন, দেহে এবং অন্তরে শুচিতা রক্ষা ও ইন্দ্রিয় সংযম। এখানে শুচিতা বলতে মৃত্তিকা সাবানজল দ্বারা ধৌত করা নয়। তিনি বলেছেন জীবিকার জন্য যে অর্থার্জন তাই।

মনু ৮ প্রকার বিবাহের ইঙ্গিত করেন। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজপত্য, অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ বিবাহ। ব্রাহ্ম—দৈব—আর্য—প্রাজপত্য ৪টি উত্তম বিবাহ নির্দেশ করেছেন।

হিন্দু বিবাহ, শুভ বিবাহ কেন? যে কারণে বিবাহকে শুভবিবাহ বলে তা অনুধাবন করুন। প্রথম কুল ও বংশ বিচার। তারপর আশীর্বাদী। ভাল গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলকে আমন্ত্রণ করা, অব্যূঢ়ান্ন করা। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ—কলাতলায় স্নান যজ্ঞ, শুভ সপ্তপদী প্রদক্ষিণ, বিবাহ আসনে উপবেশন—বেদমন্ত্র উচ্চারণের সাথে গ্রন্থিবন্ধন।

এরপর সংস্কারকর্ম। তারপর সংসারযাত্রা একি কম কথা। এই বিবাহ ক্ষণভঙ্গুর হতে পারে না। এত লোকের উপস্থিতি এবং তাঁদের শুভকামনা ব্যর্থ হতে পারে না? দুঃখের কথা, এখন হামেশাই চুক্তির বিবাহ চলছে—"লিভ টুগেদার"।

ইতিহাস বলে, এইভাবে বর্ণসংকর উদ্ভবহেতু রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। ধর্মের গোড়ায় কী ঘটেছে সে কথা একটু জেনে নিতে হবে। খ্রি.পূ. ৪৮৬-তে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ ঘটে। এর পূর্বে ধর্মের এই সূত্র ; সূত্র ব্রহ্ম জগৎ কারণ ছিল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্মে বহু বিভাজন ঘটে। বুদ্ধ অনুগামী যাঁরা তাঁরা হীনযান। অপরপক্ষ মহাযান—এই ভাগ হল। মহাযান হতে আবার ভাগ হয় বজ্রযান। মহাযান হতে ভাগ হল—আউল—বাউল—কর্তাভজা—বাঁকাচাঁদ বৈষ্ণব ইত্যাদি। অর্থাৎ এখন ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর যেমন রাজনৈতিক দলের হাল দাঁড়িয়েছে। রোজ রোজ কোনো-না-কোনো দলের উদ্ভব ঘটছে। সেদিন এই অবস্থাই ধর্মের দেখা গিয়েছিল। এর জন্য রাজ্যের শাসনব্যবস্থা অস্থিরতা অনেকাংশেই দায়ী ছিল। ধর্মের নামে একটা জঘন্য অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

দেশে মাৎস্যন্যায় সৃষ্টির ঘটনা দেশ জুড়ে ভয়ংকর অনাচার। এমন সময় জগৎগুরু

শংকরাচার্য ৬৮৬ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের আলোয়াই নদীর ধারে কালাডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করে এগিয়ে এলেন ধর্মের ধ্বজা নিয়ে "মাঃ ভৈঃ"। 'অহম্ ব্রহ্ম', জগৎ ব্রহ্ম।

শংকরাচার্য ভারতের দিকে দিকে যেখানে যত ধর্মীয় মঠের সন্ধান পেয়েছেন ছুটে গেছেন তর্কযুদ্ধে একে একে সকলকে পরাস্ত করে, নিজের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাই তিনি জগৎগুরু।' কেউ দয়া করে তাঁকে ঐ খেতাব দান করেনি। যারা তাঁর সাথে একমত হলেন না তাঁরা একটু গা ঢাকা দিয়েই রইলেন। পরে অন্য মত ও পথের পথিক তাঁরই প্রতিষ্ঠিত সেই মতবাদের প্রতীকরূপেই ভারতের চারদিকে ৪টি মঠস্থাপন করে উপযুক্ত মোহান্তদের হাতে অর্পণ করলেন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। ৪টি মঠ ৪টি বেদের প্রতীক বলা হয়। পূর্বে—গোবর্দ্ধন মঠ, পুরী (ওড়িশ্যায়) ঋগ্বেদ। পশ্চিমে—সারদা মঠ ; সামবেদ। উত্তরে—অথর্ববেদ এবং কাশীর সুমের মঠ। দক্ষিণে—যজুর্বেদ, কাকীর কামকোঠী। এছাড়া তাঁর দশনামী সম্প্রদায়গুলিও আধ্যাত্মিকতার এক একটি প্রতীক। নামগুলি শুনলে তা জানাও যাবে। তাছাড়া তাঁর মঠনামায়ও বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়।

১। তীর্থ, ২। আশ্রম, ৩। বর্ণ, ৪। অরণ্য, ৫। গিরি, ৬। পর্বত, ৭। সাগর, ৮। সরস্বতী, ৯। ভারতী এবং ১০। পুরী।

পুরীকে যোগীপদবাচ্য বলা যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেনবংশীয় সম্রাট লক্ষ্মণ সেন-এর সভাকবি কবি জয়দেব তাঁর গীতগোবিন্দের হাত ধরে বাঙালিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করেন। এঁর পূর্ববর্তী রাজা দেবীসুর কান্যকুব্জ থেকে ৬ জন ব্রাহ্মণ নিয়েছিলেন গৌড়দেশে। সেই থেকে গৌড়দেশ একদা সংস্কৃত সাহিত্যের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল—এমনকি সংস্কৃতি সাহিত্যের একটি গৌড়ীয় রীতিও গড়ে ওঠে। এঁর পরে এলেন রাজা বল্লাল সেন। ইনিই কৌলীন্য প্রথা চালু করে ভেদনীতির দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। এক চরম অধঃপতন নেমে আসে সমাজে।

৫ম থেকে ১২ শতক পর্যন্ত এ দেশে যেসব সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল তার মধ্যে চন্দ্রস্বামীর ব্যাকরণ, সুভূতিচন্দ্রের হস্তায়ুর্বেদ, মাধবের রুগবিনিশ্চয়, চক্রপাণি দত্তের চিকিৎসাসার সংগ্রহ, শ্রীধর-এর ন্যায়কন্দলীর নাম আছে, গৌড়পাদের আগমশাস্ত্র, ভবদেবের ব্যবহারতিলক, হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব, জীমূতবাহনের দায়ভাগ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগের শেষ ভাগ পর্যন্ত এবং সেন যুগ অবধি ঐ গ্রন্থসমূহের কদর ছিল।

ভট্ট নারায়ণের বেণীসংহার, মুরারী গুপ্তের অনর্থ রাঘব, বিশাখ দত্তের মুদ্রারাক্ষস, ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক, নীতিবর্মার কীচক বধ প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক ছিল। অভিনন্দের রামচরিত (রামচন্দ্রের উত্তরজীবনের কাব্য)। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত গ্রন্থে সম্রাট রামপাল ও অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র নামক গ্রন্থ, স্তুতিবাদ মাত্র। এতে পাল যুগের সম্যক ধারণা আছে। সপ্তমদশকের বাণভট্টের হর্ষচরিত সেই যুগের এক বিখ্যাত গ্রন্থ।

তাঁর মতে—সৃষ্টে বিশ্বগুরু ব্রহ্মাঃ দ্বাপরে ঋষি সপ্তমঃ।

ত্রেতায়া ব্যাসএবস্যাৎ কলাবর্তে ভাবাম্মহ্যমৃঃ।। সৃষ্টিকালে বা সত্যে ব্রহ্মা বিশ্বগুরু ; দ্বাপরে বশিষ্ট, ত্রেতায় ব্যাস ; কলিতে আমি এসেছি।

১৫—১৬ শতকের বাংলাসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেন্দ্রিক বৈষ্ণব পদাবলী বড়ু চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্তন' রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে রচনা। এরই নকল করে বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলী। কৃষ্ণকীর্তনের রাধা ছোট, কৃষ্ণ কৈশোর বয়স্ক মাত্র। এতে নাটকীয় রস আছে, কিন্তু পদাবলীতে নাটকীয় রস নেই।

১৪১৬—৯৪ অর্থাৎ ১৫ শতকে দেখা যাচ্ছে হুসেন শাহ ছিলেন গৌড়ের সুলতান।

এই সময়ে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল খুব বিখ্যাত ছিল। বিজয় গুপ্ত ময়মনসিংহ জেলার বোর গ্রামের লোক। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। মধ্যযুগে ছিল পাঁচালী গ্রন্থগুলি আর বৌদ্ধ চর্যাপদ। পাঁচালীগুলি যেমন—চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, রামায়ণ, মহাভারত। ভাগবত এগুলি সবই সুর করে পড়া হত। তাই এগুলি পাঁচালী।

এরপর মুসলমান শাসকগোষ্ঠী ও পরে ইংরেজরা এল ভারতভূমিতে সর্বগ্রাসী হয়ে। আমাদের নিজ শিক্ষাধারা যা ছিল শক্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেল। আমরা আমাতে নেই তখন। আমাদের গুণীজ্ঞানী বেশির ভাগই সব ইংরেজদের গোলাম সুবাদে ব্যক্তিত্ব হীন হয়ে রইলেন। একদা আমাদের গৌড়দেশ ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের পীঠস্থান। শাস্ত্রগ্রন্থাদি অনেক বিদেশি শাসনে ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে যা ছিল এবং যা ছিল না মহাসমারোহে তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ইংরেজ বিদায় হওয়ার পর আমরা শান্তির নিশ্বাস ফেলে ধর্মকর্মে মন দিতে আগ্রহী হলাম।

ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি আর চৈতন্যদেবের সাঙ্গপাঙ্গ যে বৈষ্ণব সমাজ গড়ে তুললেন তাদের নিজস্ব পুঁজি কী? ভাগবতের অনুবাদক মালাধর বসু। এবং শ্রীকৃষ্ণবিজয় আর একটি অনুবাদ—ইহা উত্তরভারতের কৃষ্ণকথা অবলম্বনে রচিত। এই মালাধর বসুর হাত ধরে বৈষ্ণবদের বাজার গরম। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন যেখানে শেষ সেখান থেকেই পদাবলী কীর্তনের জয়যাত্রা শুরু। ১৭।১৮ শতাব্দী জুড়ে বৈষ্ণব পদাবলীর যুগ ছিল। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত সমুদ্র অনুকরণে আরম্ভ হয় "গোকুলানন্দের পদ কল্পতরু।" এতে ১৪০ জন পদকর্তার পদ সংগৃহীত হয়েছে। গোবিন্দদাস কবিরাজের ৪০৬, চণ্ডীদাসের ১১১৮, জ্ঞানদাসের ১৮৬, বলরাম দাসের ১৩৬, বিদ্যাপতির ১৬৩, দীনবন্ধু দাসের ৯৯, রাধামোহন ঠাকুরের ১৮২, বৈষ্ণব দাসের ২৬— এইভাবে আরো অনেক পদ নিয়ে ঐ গ্রন্থখানি সংকলিত।

চৈতন্যদেবের অনেক পরে কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রকাশ হয়েছে। অতএব বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ ওই উত্তর ভারতের কৃষ্ণকথা থেকে এসেছে। পুরীর মন্দির শংকরাচার্যের প্রতিষ্ঠিত মন্দির "গোবর্দ্ধন মন্দির" ঋগ্বেদে বলা হয়েছে। চৈতন্যদেবের লীলা ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়ে যায়। শংকরাচার্য্যর লীলা ৭ম শতাব্দীতে। প্রভাস খণ্ড পড়ে দেখুন, সেখানে কৃষ্ণ প্রথম নদীয়ায় লীলা প্রকাশ করে পরে পুরীতে লীলা করেছেন, এই লেখা আছে। অতএব ধর্মের নামে বুজরুকি একেই বলে। সে যাই হোক, আমি বলতে চাই "যুগ ধর্ম ও কলির ধর্ম" নিয়ে—

যতদিন গৌণ হয়, ধর্মের মহিমা ততই বেড়ে যায়। এটাই নিয়ম।

বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, ধর্মশাস্ত্র এসবের বাইরে আর কিছুই থাকতে পারে না। যা আছে

তা ধর্মের নামে যোগ শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, মন্ত্র, বৈখানস, আগম, ভাগবত এগুলি শাক্ত ও তন্ত্রসাধনায় পড়ে। এর মধ্যে যোগ শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রে যুগধর্ম মান্য করার নির্দেশ আছে। সত্যে ব্রহ্ম। দ্বাপরে বিষ্ণু ত্রেতায় সূর্য, কলিতে রুদ্র অর্থাৎ শিবই উপাস্য। মার্কণ্ডেয় ১ম অংশ দ্রষ্টব্য। শিবপুরাণ দ্রষ্টব্য।

কলিতে যে নামই মুক্তির কারণ বা উপায়—এই কথা শাস্ত্র বলে না।

কৃৎ-এ মানবধর্ম। দ্বাপরে গৌতমাস্মৃত। ত্রেতায় সাংখ্য লিখিত কলৌঃ পরাশর স্মৃতিঃ।

কৃৎ-এ দায়েৎ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং

দ্বাপরে অর্চয়ন কলৌ দানকর্মাণি।

মৎস্যপুরাণ—শ্বাম্ব পুরাণ দ্রষ্টব্য। বিষ্ণুপুরাণে, নারদ পুরাণে নামের কথা আছে। যথা—

ধ্যায়েৎ কৃৎ-এ যযনযজ্ঞে স্ত্রেতায়

দ্বাপরে অর্চয়ন যদাপ্নতি

তদাপ্নতি কলৌ সংকৃতব্য কেশবঃ

কেশবকে কৃষ্ণ ধরা হয়েছে।

নারদ পুরাণে — হরেন্নামৈব, হরেন্নামৈব কেবলম্

কলৌঃ নাস্ত্যেব কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা

দুটি পুরাণে হ্যাঁ, ২টি পুরাণে না—এই মন্তব্য দেখা যায়।

তাছাড়া শাস্ত্রবিচারে—হরিনাম—বেদান্তসিদ্ধ নয়; বেদান্ত অনুবন্ধে পরিষ্কার লেখা আছে—প্রত্যেক শাস্ত্রে ৪টি অনুবন্ধ থাকতেই হবে।

অনুবন্ধ কী? বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে—বললে এতে কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না।

অধিকারী গৌণ বোঝা যায়। সম্বন্ধও তথৈবচ। অতএব এই নাম অশাস্ত্রীয়।

কাহার উদ্দেশ্যে মালসাভোগ হয়? বিষ্ণু না কৃষ্ণ?

যদি বলেন বিষ্ণু—তা হতেই পারে না। কারণ? বিষ্ণু স্বয়ং আত্মতত্ত্ব। কৃষ্ণ দ্বাপরের দেবতা। কলিতে কৃষ্ণের কোনো পূজা শাস্ত্রে লেখা নাই। কলিতে শিব বা রুদ্র। যুগধর্ম বাদ যদি দিই তবু বেদান্তসিদ্ধ হওয়া চাই! যে-কোনো নাম যে-কোনো দেবতার নাম হোক তা বেদান্তসিদ্ধ চাই।

এখন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে - এটি শুদ্ধ নাম। অতএব এইমতে সংকীর্তন হওয়া চাই।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে (ভবকাণ্ডারী) পারের কাণ্ডারী হরে।

কলিধর্ম জিজ্ঞাসায় স্বয়ং ব্যাসদেব প্রশ্ন করলেন তাঁর পিতাকে—

বশিষ্ঠাঃ কাশ্যপস্তথা গার্গেয় গৌতমাশ্চ

তথা চৌশনাসাঃ স্মৃতাঃ।

অত্রে বিষ্ণাশ্চ সংবর্তাদ্ধক্ষাদাঙ্গিরস্তথা

শাতাতপাঞ্চ হারীত যাজ্ঞবল্ক্যাস্তথৈবচ।

আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মা শাঙখ্য লিখিতস্য চ
কাত্যায়ন কৃতাশ্চৈব তথা প্রচেত সাম্মুনেঃ
শ্রুত্বা হ্যেতে ভবৎ প্রোক্তাঃ শ্রুতার্থ মে ন-বিস্মৃতাঃ।।
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্মা কৃত ত্রেতাদিকে যুগে।

বাংলা। আমি আপনার নিকট মনু, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, আত্রি, বিষ্ণু, সংবর্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য আপস্তম্ব শঙ্খ লিখিত, কাত্যায়ন ও প্রচেতস নিরুপিতা ধর্ম শ্রবণ করিয়াছি তাহা বিস্মৃত হই নাই। সে সকল সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগের কথা। এখন কলিযুগের ধর্ম শুনিতে চাই। এই কথা ব্যাসদেব পিতা পরাশরকে বলিলেন। অন্য এক জায়গায় একদল মুনি ব্যাসদেব সকাশে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন “কলির ধর্ম ব্যাপারে কিছু বলুন।”

তৎ শ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সশিষ্যেঽগ্ন্যর্কসন্নিভঃ
অস্মাৎ পিতৈব পৃষ্টব্য ইতি।

“ব্যাস” দ্রষ্টব্য বিদ্যাসাগর রচনাবলি।

এতে বোঝা গেল কলি ধর্ম প্রবক্তা একমাত্র পরাশর আর কেউই কালির ব্যাপারে কিছু বলার অধিকারী নন। পরাশর সংহিতার ১০ম অধ্যায় দেখুন—কলি যুগের ৩২৯০ বছর গত হলে পৃথিবীতে শূদ্রক রাজা হবেন। তিনি মহাবীর ও অতি সিদ্ধপুরুষ হবেন। তৎপর বিংশতি বৎসর গত হলে নন্দবংশীয়রা রাজা হবেন। চাণক্য এই নন্দবংশ ধ্বংস করবেন। তৎপর ৬৯০ বছর গত হলে বিক্রমাদিত্য রাজা হবেন। কুমারিকাণ্ড যুগব্যবস্থাধৃত দ্রষ্টব্য।

পরাশর ঋষি বলেন, কলিতে কোনো সংসর্গদোষ নেই। কলিযুগাইনুধর্মের সমাচারণে সকলেই অল্পায়ু হবে—তাই এই কলিকালেতে চারি বর্ণেরই এই কলিধর্ম—সনাতন ধর্ম হবে।

এই পরিচ্ছদে দেখা যায় যে, মূলত চারি বর্ণের ধর্ম একই। বৈষ্ণব বলে কোনো ধর্মের কথা বলা নেই। তাছাড়া—

বৈষ্ণব বিষ্ণু হেতু
তাঁর স্থান আত্মতত্ত্ব !
অতএব—কলৌঃ সংস্মৃত্যবঃ কেশব।
পুরাণের মত অনুসারে বৈষ্ণবগণ
মালাজপরূপ ধর্ম করবেন।

জীবজগৎ মূলক প্রেম-ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। ভক্তিতে নয়। ভক্তিতে মুক্তি। মুক্তি মানে ব্রহ্মত্ব লাভ। তাহলে বৈষ্ণবগণ সবাই মুক্ত সম্প্রদায়? কিন্তু! চৈঃ চঃ ভক্তিচন্দ্রিকায় আছে—‘ভুক্তি যাবৎ হৃদি পিশাচী বর্ততে’ ইত্যাদি। বৈষ্ণবগণ মুক্তি চাইতে পারেন না, এ তো নরকের পথ এঁদের কাছে। তাছাড়া দাসের মুক্তি হতে পারে না।

ভক্ত বা দাস আর ভগবান এত পৃথক ; ন-অন্য অনন্য, এই মুক্তির উপায়।

এই ভক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের মধ্যে দেখা গেছে। নিজে খাচ্ছেন সেই খাবার মাকে দিচ্ছেন খেতে। এ দেখে তাঁকে অনেকে পাগল বলত এবং মন্দির থেকে তাঁকে তাড়িয়ে

দেওয়ারও ষড়যন্ত্র হয়েছে। রানি রাসমণি বুঝেছিলেন, অনুভব করেছিলেন ব্যাপারখানা কি! আমি ঐ ভুক্তির মুক্তির জন্য কলম ধরিনি। আমি চাইছি মোক্ষ লাভের পথ কী?

তাই গৃহস্থ ধর্মই আমার আসল কথা। কোনো গৃহস্থের মুক্তি? না। সে দুরূহ ব্যাপার।

মুক্তি কী? কোনো গৃহস্থকে কল্পবৃক্ষস্বরূপ বা কামধেনুর সমান বলা হয়। কল্পবৃক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় যা কিছু খাবার ফলমূল মধু এইসব ঐ বৃক্ষ থেকে পাওয়া যেত তাই খেয়ে তখনকার মানুষ বেঁচে থাকত—তখনও চাষ-আবাদ এসব শুরু হয়নি, চাষ অজানা ছিল। সত্যযুগ ত্রেতাযুগের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই মতো চলেছিল পৃথিবীর সমাজ। কামধেনুর চারিটি বৃন্ত স্তন ইহা তো জগতের কল্যাণের জন্যই—। স্বাহা, স্বধা, বৌষট্ ও হন্তকার—এই চারটি স্তনবৃন্ত গাভীর আছে। স্বাহা দেবতাদের জন্য। মন্ত্রের শেষে স্বাহা উচ্চারণ করে নিবেদন করতে হয়। স্বধা পিতৃপুরুষদের জন্য বা উদ্দেশ্যে এই মন্ত্রে নিবেদিত হয়। বৌষট্—ভূতলোকের জন্য আর মনুষ্যলোকের ক্ষেত্রে 'হন্তকারী' শব্দ উচ্চারণ করতে হয়। এইজন্য শাস্ত্র বলে, প্রত্যেক গৃহস্থই তার আয়ের ৪ ভাগ করে ২ ভাগ নিজের ভরণপোষণের জন্য, ১ ভাগ দেবতার জন্য, ১ ভাগ আর্ত ও ফকির ইত্যাদির জন্য ব্যয় করবেন।

বলছিলাম গৃহস্থ এক কল্পবৃক্ষ—গৃহস্থের দিকে তাকিয়ে আছে কাকপাখি-বিড়াল-কুকুর-সাধু-সন্ত-সন্ন্যাসী-মুনি ইত্যাদি। এরা মাধুকরী দ্বারা জীবনধারণ করেন। তোমাকে তর্পণ দিতে হবে, পূর্বপুরুষরা তাকিয়ে আছেন, এসব দায়িত্ব সর্বদা মাথায় যদি থাকে, পরিবারে সকলের প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার যদি থাকে, তাদের অভাব, যে-কোনো অভিযোগকে যদি মমতা দিয়ে দেখো, তোমার প্রতিটি ব্যবহারে অসন্তুষ্ট যদি কেউ না হন, তোমার রোজগার যদি সৎ হয় এবং যদি চরিত্রে দৃঢ়তা থাকে—সংযতবাক, ইন্দ্রিয় সংযম থাকে তাহলেই তো তোমার দেবতার প্রতি শ্রেষ্ঠ উপাসনা হয়ে গেল! এর জন্য গুরু কীসের। মন্দিরে মাথা ঠোকার কোনো প্রয়োজন নেই। সর্বদা আত্মকর্ম কর, তোমার কর্তব্য মনে রাখো।

গীতায় বলে—'আত্মানম্ পরমো গুরু'। আবার অনেকে বলেন,—'কৃষ্ণং বন্দে জগদগুরুম্'। সেই গুরুদেবের সেবা করো। অন্য গুরুর যদি দরকার মনে কর, তবে সেই গুরুর certificate চাই! গুরু হতে গেলে শিষ্যকে উদ্ধার করার শক্তি গুরুর থাকতে হয় বা হবে।

চিত্ররথ-কন্যা মালাবতী ছিলেন উপবহনের স্ত্রী। মালাবতী স্বামীহারা! শোকার্তা! দেবতাদের উদ্দেশ্যে খড়্গহস্ত তিনি অভিশাপ দিয়ে তিনি দেবতাদের ইন্দ্রত্বহীন করবেনই। ভীতসন্ত্রস্ত দেবগণ। ব্রহ্মা মালাবতীর সম্মুখস্থ হলেন। মালাবতীর ঘোষণা—"আমি নারী, স্বামী হলেন স্ত্রীদিগের হর্তা কর্তা, পোষণকর্তা, রক্ষাকর্তা ও অভীষ্ট দেবতা।" এই ভারতীয় বৈদিক সমাজের সাংসারিক ছবি "এই ধর্ম আমার হিন্দুধর্ম"। এই ধর্ম মোক্ষ দিতে পারে, মুক্তি দিতে পারে।

কিন্তু! কলিকাল—বড়ো ভয়ানক ! আবার বড়োই ভালো। সেইজন্যই তো ধন্য কলি বলা হয়েছে।

কলির ধর্ম—শাস্ত্র দানকর্ম ঘোষণা করেছে। কেউ হেঁয়ালি করে বলতে পারেন, তো দান ছাড়া কি কলিকালে আর কোনো তীর্থ কিংবা গঙ্গাস্নান, উপবাস, ব্রত, পূজাপার্বণ কোনো কিছু দরকার হবে না?

হবে, সবই। সবই করুণা তার মধ্যে দানই ধর্মের বেশি সহায়ক—এটি মনে রাখুন! তেল মেখে স্নান করতে হয়, বেশি তেল হাতে যদি থাকে শেষে পায়ে মাখার নিয়ম আছে। এর জন্য কোনো শাস্ত্র নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের আলোচনায় বলেন, হিন্দু ধর্মের একেশ্বরবাদ! অমূর্ত ব্রহ্ম সাধনায়—মনে উৎসাহ পাই না। সাক্ষাৎ জীবরূপে যে ভগবান বিরাজিত—তাঁর সেই রূপ! অতএব সেই ভগবানে সেবা করাই ঈশ্বরের সেবা।

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজেছ ঈশ্বর! জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"। এইজন্য বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিরাট ভাবে মনোনিবেশ করেন। আজ পৃথিবীব্যাপী তার বিকাশ হয়েছে, সগৌরবে তা চলছে।

গণংকার ফুটপাতে বসেন, আবার হাতিবাগান টোলে বসেন বা কোনো জুয়েলারি দোকানে বসেন। যদি ধরে নিই—উভয় ক্ষেত্রে জ্ঞানে, গুণে সমান, দাঁড়িপাল্লায় মেপেও সমান, বোঝা যায়—তবু আত্মবিশ্বাসে ঘাটতি থাকে। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু! সাফল্যের সহায় হয় বটে। কিন্তু না, কিন্তু না।

"প্রাপ্তব্যমমর্থং লভতে মনুষ্যো দেবোঽপি
তং বারায়িতুং ন শক্তঃ"।
"অতো না শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাট লেখা ন পুনঃ প্রযাতি"।।

বাংলা অর্থ হল—মনুষ্যদিগের অদৃষ্টে যে অর্থের প্রাপ্তি লিখিত হয়েছে, তা অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। দৈব ও তাহা নিবারণ করতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত কারও হতাশ বা বিস্ময় বোধ করার অবকাশ নেই। সুকর্মে ত্বরান্বিত হয় মাত্র। অন্ধকারে চলার চেয়ে আলোর সঙ্গে চলা উচিত। যত মত তত পথ—শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন। একটা সহজ কথা। আমরা সহজ করে বুঝব না কেন?

দিল্লিতে আপনি যাবেন—বিমানপথ, রেলপথ, রকেট বাস, হাঁটাপথ সমস্তই আছে। যে কোনো পথে আপনি যেতে চান যান।

সুদামা কৃষ্ণসকাশে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং তাঁর পরিণতি কি হল। এটা আপনাদের উপর বিচারের ভার দিলাম।

শাস্ত্রপুরাণে লেখা আছে—কোনো শঠতা দ্বারা মিত্রলাভ হয় না। পরপীড়ন দ্বারা সম্পদ লাভ ভালো নয়। কপটবৃত্তি দ্বারা ধর্ম হয় না। বিনাশ্রমে বিদ্যা হয় না। কঠোর ব্যবহারে রমণী বশীভূত হয় না ; তার কাছ থেকে প্রেম-ভালোবাসা পাওয়া যায় না। গোচারণধূলি, ধান্যের ধূলি, নিজপুত্রের অঙ্গ সংলগ্নধূলি অত্যন্ত পবিত্র—ওই ধূলি দ্বারা মহাপাতক বিনষ্ট হয়। এই সবই শাস্ত্র বলছে। আমরা কি যত্নবান হই এই ব্যাপারে?

আমরা ধর্ম করতে মুখিয়ে আছি! বাবা মাকে লালনপালন করলাম না, সেবাযত্ন করলাম না, আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে শান্তি কামনায় মশগুল যখন ; সাবধান হতে হবে নাকি? সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মুখে ধাবমান যারা, তাদের জন্য ধর্মের কোনো দরকার নেই। তাদের কোনো ভগবান নেই যে উদ্ধার করেন। আমরা ধর্ম করতে চাই। ধর্ম কীসে হবে? ধর্ম

করলে কী হবে? যাগ-যজ্ঞ, পূজা করলে, নামকীর্তন করলে কি ধর্ম হয়? না, ধর্ম হয় না। ধর্ম অন্তর্জগতের জিনিস। অন্তরের শুচিতা, বাকসংযমী হওয়া, ইন্দ্রিয় সংযত করা ইত্যাদি পবিত্রতা ধর্মের সহায়ক মাত্র। ইহাতে সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠে। ইহাকে ধর্মের পরিবেশও বলা হয়। নীতি-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠার তন্ময় রূপকে ধর্ম বলা যায়। **ধর্মদ্বারা জীবের পরপারে পাপের নরক ভোগের কম বেশি বা ছাড় হতে পারে।** ধর্ম পারলৌকিক ব্যাপার। ঐহিক ফলদায়িকা যে ধর্ম তাহাই গৃহস্থ। শ্রমিকগণের কাম্য—এইরূপ বেদান্ত মতে সিদ্ধ হয়। রামানুজ এইরূপ মতের অনুগামী ছিলেন ; যেহেতু আমি এই জগতে কী পেলাম, কী হল আমার, জীবনের সার্থকতা আমি দেখলাম, জানলাম বেশ! মৃত্যুর পরে আমার কি হবে না হবে কে দেখেছে? এইরূপ তাঁর বক্তব্য। আমাদের এই ভাবনায় ভাবতে দোষ কি?

জগতে নিষ্কাম কর্ম হয় না। কর্ম মাত্রই সকাম। অতএব বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ ও সকাম অর্থাৎ বেদান্তের অনুবন্ধের প্রয়োজন মিটে না। গৃহস্থধর্ম সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। পঞ্চ যজ্ঞ তার জন্য। আত্মা হতে পৃথক যে জ্ঞান "ব্রহ্মচৈতন্য" তা হতে বিচ্যুতকে অজ্ঞান "ব্রহ্মচৈতন্যহীন" বলে। জীব আপনাব নির্দুঃখতা জানে না, ব্রহ্মভাব জানে না ; সে আপনাকে সুখ-দুঃখ ভোক্তা ও জন্মমৃত্যুর অধীন বলে জানে। সেই **অজ্ঞান নিবৃত্তি** ও তদনন্তর আপনার **আনন্দময়ত্ব অনুভব—এই দুইরকম প্রয়োজন হল**। এর নিট ফল কী? নিট ফল আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই ধর্মের অধিকারী। আমাদের ভারতীয় হিন্দুধর্ম ঐহিক ও পারত্রিক মুক্তি দুই ভাবকেই ধারণ করেছে। সেইজন্য ধর্মভাবনা খুব জটিল। তারা জাগতিক উন্নতির জন্য ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ (এখানে পারলৌকিক শান্তির) এই চতুর্বর্গ সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন। পূর্ণ জীবনের সাধনার জন্য। তারই নির্দেশ যেন মহাভারতে বোঝা যায় —।

"ধর্মার্থ কাম মোক্ষার্থৈঃ সমাস ব্যাস কীর্তনৈঃ তথা ভারতসূর্যেন নৃণাং বিনিহতং তমঃ।। "পুরাণ পূর্ণ চন্দ্রেন শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ। একনৃ বুদ্ধি কৌরবানং চ কৃতমেতৎ প্রকাশমম্।।

মহাভারত আদিপঃ ৮৫-৮৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রুতিজ্যোৎস্না শব্দটির অর্থ হল—বেদের আলো। শ্রুতি এইকথা বলে না। অর্থাৎ এখানে শ্রুতি আর পুরাণে (মহাভারত) বিরোধ দেখা যায়। সিদ্ধান্ত ঐ পুরাণোক্ত মত ঠিক না বেদকেই ধরতে হবে এবং মান্য করতে হবে। স্মৃতিতে ব্যাস এবং জৈমিনী দুই গুরুশিষ্য ছিলেন সুখবাদের অনুগামী, তাই ব্যাসদেবের নামে এই জালিয়াতি করেছে যে মহাভারত তা পরিষ্কার।

শাস্ত্রে ব্যাস নামে অনেকেই আছেন, কত নম্বর ব্যাস ইহা বলেছেন তা লেখা নেই। এইভাবে ভুল পথের বা ধর্মের নামে কী কী কীর্তন হয়েছে জানার দরকার নয় কি? লাভ না হোক ক্ষতি আছে জেনেশুনে দেখে চলাই মানুষের কর্তব্য কর্ম। আসলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যে ভক্তিবাদের উদ্ভব হয়েছিল—যার মূল কথা ছিল আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন। অন্য অর্থে মানুষের সাথে ঈশ্বরের মিলন। মূলত ইসলাম অথবা খ্রিস্টধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে ভক্তিবাদের প্রবেশ ঘটেছে।

খ্রিস্টাব্দ বিচারে ৭ - ১২ শতকে দাক্ষিণাত্যের শৈব নায়নার ও বৈষ্ণব আলওয়ার

সম্প্রদায় এই আন্দোলনের সূচনা করেন। খ্রিস্টীয় ১৪ - ১৫ শতকে এই ভক্তিবাদ ব্যাপক প্রচার লাভ করে। ভক্তিবাদীগণ পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ মানতেন না। রাম, কৃষ্ণ আত্মা যে নামেই ডাকুন না কেন ভক্তি একমাত্র ঈশ্বর লাভের উপায়। মধ্যযুগে রামানন্দ এই ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে যে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে জাতপাতের কোনো প্রশ্নই ছিল না। তারই প্রেক্ষিতে কবির—রামদাস, সোনা নাপিত, সাধন কসাই এঁরা সেই গুণে রামানন্দের শিষ্য হয়েছিলেন।

আমরা দেখি, চৈতন্যদেবের শিষ্য যবন হরিদাস জগাই মাধাই ইত্যাদি কত কত নাম। কবির ১৪৮৯ - ১৫১৭। নানক ১৪৬৯ - ১৪৩৮, রামানন্দ ১৪৫৫ - ১৫২৫। চৈতন্যদেব ১৪৮৬ - ১৫৩৩।

অতএব গৌড়ীয় বৈষ্ণবতন্ত্র সেই ভক্তিবাদ মাত্র। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ধার করা মতবাদ এই মতবাদের সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য ভয়ংকর সমস্ত ঘটনার সমাবেশ দেখা যায়। তাই শাস্ত্রের মধ্যে অনেক গোঁজামিল লক্ষ্য করা যায় ; যাহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক বটে। বৈষ্ণবদের পঞ্চতত্ত্ব ও ক্রিয়াকাণ্ড ভাববার মতো বিষয়! **এখানে মোক্ষকে 'পারত্রিক ফল' বলা কি কোনো জ্ঞানীর কাজ হতে পারে?** মোক্ষ, ভোগ বা আত্যন্তিক সুখের স্মৃতিতে ব্যাস এবং জৈমিনী ব্যাখ্যা করেছেন, যে সুখের মধ্যে দুঃখের কণামাত্র নেই, তাহাই মোক্ষ। মোক্ষ মানে মুক্তি ভুক্তি নয়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই নাম সংকীর্তন শুদ্ধ নয়। কারণ—যুগধর্ম মান্য করা হয়নি।

দ্বিতীয় কারণ বেদান্তসিদ্ধ নয়, বেদগ্রাহ্য নয় এই "নাম"। দেখা যায়, এই নামকে মহিমান্বিত করবার প্রয়াসে শিবপুরাণকে পুরাণের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বায়ুপুরাণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সেখানে শিবের ন্যূনতম পরিচয় আছে মাত্র।

এই বায়ুপুরাণ হল খনির কলেবর। শিবপুরাণের ১/৪ অংশ শিবপুরাণ ২৪০০০ হাজার শ্লোক এবং বায়ু পুরাণে ৬০০০ শ্লোক মাত্র। শিবপুরাণ অনুসারে কৃষ্ণকে শৈব বলতে হবে। অসীমকৃষ্ণ নামে সংসারত্যাগী ব্যক্তি ছিলেন—যাঁর গুরু হলেন ঋষি উপমন্যু—। তাঁর নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণ শিবের জন্য ১৮ মাস কঠোর নিরন্ন, উর্ধ্ববাহু ১ পদে দণ্ডায়মান সাধনা করেন। ফলে শিব সন্তুষ্ট হন এবং পাশুপত দান করেন তাঁকে। শাস্ত্রে পাশুপত মোহশাস্ত্র নামে বিদিত। যেহেতু শাস্ত্র অর্থাৎ আগমশাস্ত্র।

আগমশাস্ত্র মানে—বিদ্যাসাগর মহাশয় শাম্বপুরাণ উদ্ধৃত করেই পণ্ডিত সমাজকে পরাস্ত করেছিলেন।

আগম শাস্ত্র এবং বৌদ্ধ তথাই ভাগবত—এরা ভাই ভাই। জৈন এক সন্ন্যাসীর পরিচয় আছে এই গ্রন্থে লক্ষ্য করবেন—শুনলে ভয় হবে।

আমার ধর্ম হিন্দুধর্ম ৫ম মণ্ডলে রামায়ণ আলোচনা দেখুন। সেই যে রামায়ণ এর নায়ক শ্রীরামচন্দ্র তাঁর চরিত্র নিয়ে চরিত্রের উৎকর্ষতা ব্যাখ্যা করা আছে। তার প্রেক্ষিতেই রামায়ণ ভারতের মহারত্ন। ঋষি বাল্মীকি তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে সৃষ্টি করেছেন ভারতীয় সমাজের মানব চরিত্রের ছবি সারা ভারতের আদরের আমাদের নতুন ধর্মের প্রয়োজন কী? বস্তু প্রয়োজন

যুগধর্ম তাই ! সেই অযোধ্যা নেই, সেই রামও নেই। কিন্তু পুরাণ ইতিহাস আছে। যা আমাদের অনুস্মরণে রাখা ভালো। পূর্বসূরিদের ভুলে গেলে "জারজ" ঘৃণার পাত্র হতে হয়। অতএব যে গাছ নেই তার মূলে জল ঢালা যায় না। তার ছবি করে রাখাই ভালো। ঠাকুর-দেবতার ছবিগুলি কে কোন্ স্বর্গ থেকে কে পাঠালেন, আমরা জানি না। দেখি না, অথচ পূজা করছি। এই মূর্তিগুলির নাম ঋগ্বেদে নানা সূক্ত থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে—জগতে সমাজের শৃঙ্খলা ধরে রাখার জন্য। যেহেতু দেবতাদের সাথে দেবীদের সংযোগ করা আছে সেই হেতু তাঁরা সসীম দেবতা মাত্র। তাঁদের জীবকে মুক্ত করার কোনো ক্ষমতা নেই।

তাঁরা ভোগবাদী হেতু অজ্ঞান বা মলিন। সেইজন্য সকল দেবতাদের বা তথাকথিত অবতারদের গায়ের রং শ্যামবর্ণ হয়েছে। অধ্যাত্মাদীগণ এক্ষেত্রে মহামহিম। আমাদের সকল শাস্ত্র এক-একটি "রূপক নাটক"।

যেমন জল হতে—পিবতি হংস বারিণাম্ দুগ্ধাম্-তস্মাৎ পিবতু ধর্মাৎ ধর্মাত্রি বচ। আমরা জানি ব্যাসদেব বলে কেউ ছিলেন না বাল্মীকিও না! উদ্দেশ্য নামকরণ মাত্র! প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশের ইলিয়ড ও ওডিসি দুই মহাকাব্যের হোমার তিনি আপন দেশও কালের কণ্ঠে ভাষা দান করেছে মাত্র। দেশের ধন হয়ে উঠতে পারেননি। তা শুধু লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী মাত্র। আমাদের রামায়ণ মহাভারত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত গ্রাম অবধি মুদির দোকান হতে রাজপ্রাসাদ সর্বত্র সমান আদরণীয়। কেন? ভারতবর্ষের যে সাধনা যা আরাধনা যা সংকল্প তারই ইতিহাস হয়ে চিরকাল বিরাজমান আছে এবং থাকবে। বিশেষত রামায়ণ যে, আমাদের ঘরের কথার অনুরণন। একি ভোলা যায়!

এই সঙ্গে স্মরণ করতে হবে সম্পূর্ণ সপ্তদশ-অষ্টাদশ বা আরও অধিককাল ধরে বাংলায় বৈষ্ণব পদাবলীর কথা। তখন উত্তর ভারতে বৌদ্ধ মতাবলম্বীদের ছিল রামরাজত্বের প্রভাব। এদিকে শাস্ত্রপুরাণাদি সবই সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। সাধারণ মানুষ আমরা কয়জন তা জানি? ওদিকে গৌড় দেশ সেই সেন যুগ থেকেই সংস্কৃত সাধনার পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। অতএব যা লিখিত সবই ব্যাসের লেখা! বৈষ্ণবদের ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত আর বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথা ও পদাবলী তথাহি ভাগবত (অনুবাদক ছিলেন মালাধর বসু) আবির্ভাব তার গৌড় দেশে কি কোথায় জানা নেই। এইসব হল বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের নিশানা। অনেক পরে চৈঃ চঃ গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন তাঁর কথায়—

"শকে সিন্ধুগ্নি বাণীন্দৌঃ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে পূর্বাহ্ণসিত পঞ্চম্যাং অত্র গ্রন্থ সমাপ্তয়ম্"।

বাংলা অর্থ হল—১৭৫২ খ্রি. জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃন্দাবনের বাহিরে কোথাও বেলা ১২টার আগে রবিবারে পঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হল।

কৃষ্ণদাসের বাবা-ঠাকুরদাদা চৈতন্যদেবকে দেখেননি। তিনি লিখিলেন চৈতন্য মহিমা, অভাবনীয় লেখনী বটে।

এইভাবে ঝালে-ঝোলে-অম্বলে চলছে চলুক। যত খুশি চলুক। আমার বলার কি আছে? আমি বলছি আসল ঘটনাটা—এই সাধনায় লিপ্ত হয়ে যা জানলাম তাই বলতে হল, তার বেশি নয়। মায়াপুর শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম। নবদ্বীপ শ্রীকৃষ্ণ অবতার নীলাচলে হলেন ভগবান।

শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হয়ে গেলেন পুরীতে, যেহেতু তিনি জগন্নাথে অপ্রকট হলেন। ভগবান—অসীম। অবতার—সসীম। সসীম—ভগবান যদি কলি এক পুকুর জল কয় কাপ হবে? উত্তরটা আপনারাই ঠিক করুন।

বেদশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্রে হরিনামে মুক্তি একথা লেখা নেই। স্মৃতিতে যুগধর্ম মান্য করার কথা আছে। অপর পক্ষে ১ টি পুরাণে—নামে মুক্তি হয় বলা হয়েছে, ২টি পুরাণে কলৌ দানকর্মাণি আছে। মনুসংহিতায় চার যুগের ধর্ম পৃথক বলা হয়েছে। পরাশর সংহিতায় কলৌ দানকর্মাণি নির্দিষ্ট হয়েছে এবং সর্বমত গ্রাহ্য আমি তা দেখিয়েছি। চোরের চুরি করা সকলে জানেন। এমতাবস্থায় যুগধর্ম অনুসারে, প্রচলিত শাস্ত্র অনুসারে না গিয়ে যদি দেশাচার বলি তবে? আমি বিশ্বধর্ম ভাবনা ও মাতৃতত্ত্বে যা দেখিয়েছি তার মধ্যে কোন্‌টি নিলে সুবিধা হয় এবং অধিকাংশের কাছে গ্রাহ্য হয় তাই হবে আপনার দেশাচার। অন্যথায় মানুষ নামে আদিও হীন দেশাচার নেই, হতে নেই।

স্মৃতি-শ্রুতি-দর্শন-উপনিষদ-গীতা কোন্‌টি আপনার কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় তা ঠিক করে নিন। যদি ওগুলি মান্য করেন তবে আপনাকে যুগধর্ম অথবা বেদান্ত অনুবন্ধ যে-কোনো অন্তত একটি মানতেই হবে। সেই অর্থে নিম্নমতো নাম করা যেতে পারে—

১। হরে ববম ববম বম হরে হরে
হরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম হরে
হরে ভব কাণ্ডারী ভব কাণ্ডারী
পারের কাণ্ডারী হরে।

২। সত্যে ব্রহ্মা সনাতন বিষ্ণু দ্বাপরে হন
ত্রেতায় সূর্য জানি জানি—
যজ্ঞের অধিকারী
কলিতে আছেন শুধু শংকর শংকরী

৩। আমাদের প্রচলিত নামের শেষে
বলতে হবে — হবে ভব কাণ্ডারী
পারের কাণ্ডারী হরে।

৪। মথুরাতে কৃষ্ণ অযোধ্যাতে রাম,
গোলোকে শ্রীহরি কৃষ্ণ, সেই তো সে নাম
হরি রাম কৃষ্ণ হরি, হরি হরি,
আকাশ কৃষ্ণ, বাতাস কৃষ্ণ, কৃষ্ণ জগৎময়
জীবের সাধ্য করে কি পাপ নামে যত ক্ষয়
হরি রাম কৃষ্ণ হরি হরি হরি।

"দশ মহাবিদ্যা"

দক্ষ যজ্ঞের নিমন্ত্রণে যাওয়ার জন্য মহেশ্বর নিষেধ করেন সতীকে। অতঃপর সতীর দশমহাবিদ্যারূপ ধারণ বর্ণনা।

১। ক্রোধে সতী হৈলা **কালী** ভয়ংকর বেশ
মুক্তকেশী মহামেঘম্বরা দন্তুরা
শবারূঢ়া করকাঞ্চী শব কর্ণপুরা
গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে
গলিত রুধিরমুণ্ড বাম করতলে,
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশান
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দু'পাশে
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাট বিলাসে
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইল মুখ।

২। **তারা** রূপেতে সতী হইলা সম্মুখ।
নীল বরনা, লোলজিহ্বা করালবদনা
সর্পাবান্ধা ঊর্ধ্ব এক জটাবিভূষণা
অর্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ডখর্পর
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিরোপর।
দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি

৩। **রাজরাজেশ্বরী** হয়ে দেখা দিলা সতী।
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর
চারিহাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর
পঞ্চপ্রেত নিরমিত বসিবার মঞ্চ
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ্বর রুদ্র পঞ্চ
দেখি শংকর ভয়ে মুখ ফিরাইল।

৪। হইয়া **ভুবনেশ্বরী** সতী দেখা দিল।
রক্তবর্ণ সুভূষণা আসন অম্বুজ
পাশাঙ্কুশ বরাভয় শোভে চারিভুজ
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাট উজ্জ্বল
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল
দেখি ভয়ে মহাদেব শেল এক ভিতে।

৫। **ভৈরবী** হইয়া সতী লাগিল হাসিতে।
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজ কমলআসনা
মুণ্ডমালী গলে নানা ভূষণ-ভূষণ
অক্ষমালা পুঁতি বরাভয় চারিকর
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাট উপর
দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইল কম্পিত

৬। **ছিন্নমস্তা** হৈল সতী অতি বিপরীত
বিপরীত পুণ্ডরীক কালিকার মাঝে
তিনগুণ ত্রিকোণ মণ্ডল ভালে সাজে
বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি
কোকনদ বরনা দ্বিভুজা দিগম্বরী।
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থি মালা গলে
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে
কণ্ঠ হইতে রুধির উঠিছে তিনধার
একধার নিজমুখে করেন আহার
দুই দিকে দুই সখি ডাকিনী বর্ণিনী
দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী।
চন্দ্র সূর্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন
অর্ধচন্দ্র কপাল ফলকে সুশোভন
দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা নয়ন

৭। **ধূমাবতী** হয়ে সতী দিলা দরশন।
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন
কাকধ্বজ রথারুঢ়া ধূম্রের বরন
বিস্তর বদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা
এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা
ধূমাবতী দেখে ভীম সভয় হইল।

৮। হইয়া **বগলামুখী** সতী দেখা দিলা।
রত্নগৃহে, রত্ন-সিংহাসনে মধ্যস্থিতা
পীতবর্ণা বস্ত্রাভরণ ভূষিতা
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি
আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া ঊর্ধ্ব করি
চন্দ্র সূর্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন
ললাটমণ্ডলে চন্দ্র খণ্ড সুশোভন
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া

৯। পথ আগুলিলা সতী **মাতঙ্গী** হইয়া।
রত্ন পদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি
চতুর্ভুজ খড়্গ্ চর্ম পাশাঙ্কুশ ধরি
ত্রিলোচনা অর্ধচন্দ্র কপাল ফলকে
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে
মহা ভয়ে মহাদেব হৈল কম্পমান

১০। **মহালক্ষ্মীরূপে** সতী কৈলা অধিষ্ঠান।
সুবর্ণ সুবর্ণবর্ণ আসন অম্বুজ
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারিভুজ।
চুতর্ভুজ চারি শ্বেত বারণ হরিষে
ভারত কহিছে মাগো এই দশ, রূপে
দশদিক, রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে।
ইতি দশ মহাবিদ্যা—অন্নদামঙ্গলম্।
সব শেষে আমার ধর্ম মণ্ডলমে।

গরুড় পুরাণ হতে—ভগবান কহিলেন এক্ষণে আমি গীতাসার বলিব। ইহা পূর্বে অর্জুনের নিকট কীর্তন করিয়াছিলাম। অষ্টাঙ্গমার্গযুক্ত ও সর্ব বেদান্ত পারগ মানবের পক্ষে আত্মলাভ সম্ভব। আত্মলাভই পরমলাভ তাহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই।

পূর্বখণ্ডম, ২৪২ অধ্যায় ৫৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ অনন্তর আত্মজ্ঞান বলিতেছি শ্রবণ কর। অদ্বৈত জ্ঞানকে সাংখ্য যোগ বলা যায়। বাস্তবিক, পরমাত্মাতে যে একচিত্ততা তাহাকেই যোগ বলে শ্রবণ-মনন-ধ্যান এই সমস্তই জ্ঞানের সাধন। জ্ঞান দ্বারাই জীবের মুক্তি হয়। যজ্ঞ, দান, তপস্যা বেদাধ্যয়ন ও তীর্থসেবা দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না। দান, ধ্যান বা পূজাদি কর্মদ্বারাও মুক্তি হয় না। মুক্তিলাভের দ্বিবিধ কর্ম বেদে উক্ত আছে। স্বকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। সকাম যজ্ঞাদি কর্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হলে ক্রমে নিষ্কামতা প্রাপ্ত হয়ে মানব মুক্তি লাভ করতে পারে।

অদ্বৈত জ্ঞানদ্বারা এক কালেই মুক্তি হয় ; দ্বৈত জ্ঞানীদের এক জন্মে মুক্তি হতে পারে না। পরের অধ্যায়ে—ভগবান বললেন, যম, নির্মম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগ মুক্তির নিমিত্ত উক্ত হয়েছে।

পৃ. খৃ. ২৪৩ অধ্যায় ৫৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সূত কহিলেন, এক্ষণে বেদান্ত, সাংখ্য ও সিদ্ধান্তশাস্ত্র প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান বলছি। আমিই জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম স্বরূপ বিবৃত এইপ্রকার চিন্তা করবে। এক জ্যোতিই ত্রিধাবিভক্ত হয়ে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নিতে আছে। যেমন গরুর শরীরে ঘৃত বিদ্যমান থাকলেও তা দোহন করে যথাবিধি প্রয়োগ করলে সেই ঘৃত মহাবলপ্রদ হয়, সেইরূপ বিষ্ণু সর্বজীবের শরীরে বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আরাধনা ব্যতীত কেহই সেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে জানতে পারে না। যারা জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক তাদের কর্মজ্ঞান আবশ্যক। কর্মজ্ঞান হলে পরে যোগতরু আরোহণ করলে যখন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তখন কর্মত্যাগ হবে।

ইহার অধ্যায়—চত্বারিতশদধিকদ্বিশততম
. পৃষ্ঠা ৫৮৩ দ্রষ্টব্য।

এই অধ্যায়ে আরে লেখা আছে—বুদ্ধি, মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযমপূর্ব্বক পরম পুরুষ বাসুদেবের প্রতি নিবেশিত করাকে ধ্যান বলা হয়।

বুদ্ধি দ্বারা অহংকারকে এবং প্রকৃতি দ্বারা বুদ্ধিকে সংযম করে, চিৎশক্তি দ্বারা প্রকৃতির সংযমন করত কেবল আত্মাতে অবাস্থিত হবে। তখন আত্মা (মন) দ্বারা আত্মাকে দেখতে

থাকবে। চিৎরূপ অমৃত শুদ্ধ, নিষ্ক্রিয়, সর্বব্যাপী শিবপ্রদ আত্মাকে জেনে তুরীয় অবস্থাতে অবস্থিত হবে। শব্দস্পর্শাদি পঞ্চগুণ ও সত্যাদি গুণত্রয় মিলিত সমুদয়ে অষ্ট পুরাত্মক চিৎপদ্মের অষ্টপত্র স্বরূপ ; গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই ঐ পদ্মের কর্ণিকা। দেহমধ্যে কর্ণিকাতে চিৎরূপী দেব অবস্থিত আছেন। জীব যখন পুর্যষ্টকদল এবং গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে নির্গুণভাবে প্রাপ্ত হয় তখনই সেই জীব মুক্ত হতে পারে—এতে সংশয় নেই।

প্রাণায়াম, জপ, প্রত্যাহার, ধারণা-ধ্যান, সমাধি—ছয়টি যোগের সাধক। এবং অষ্টাঙ্গ যোগ মুক্তির সাধক। এ ছাড়া আর কোন্ কিছুই ধর্ম সম্পর্কে জানার বোঝার নেই। এই হল আমার ধর্ম হিন্দুধর্ম। ইহা পবিত্রতম এবং মহাধর্ম বঙ্কিমচন্দ্রেব ভাষায়—মৃতে প্রাণদানই হইল হিন্দুধর্ম।

আমার ধর্ম হিন্দুধর্মের বেদানুসঙ্গ দার্শনিক চয়নিকা বা সুনির্দিষ্ট নিরীক্ষণ নিম্ন রেখাচিত্র অনুসারে গ্রহণীয়।
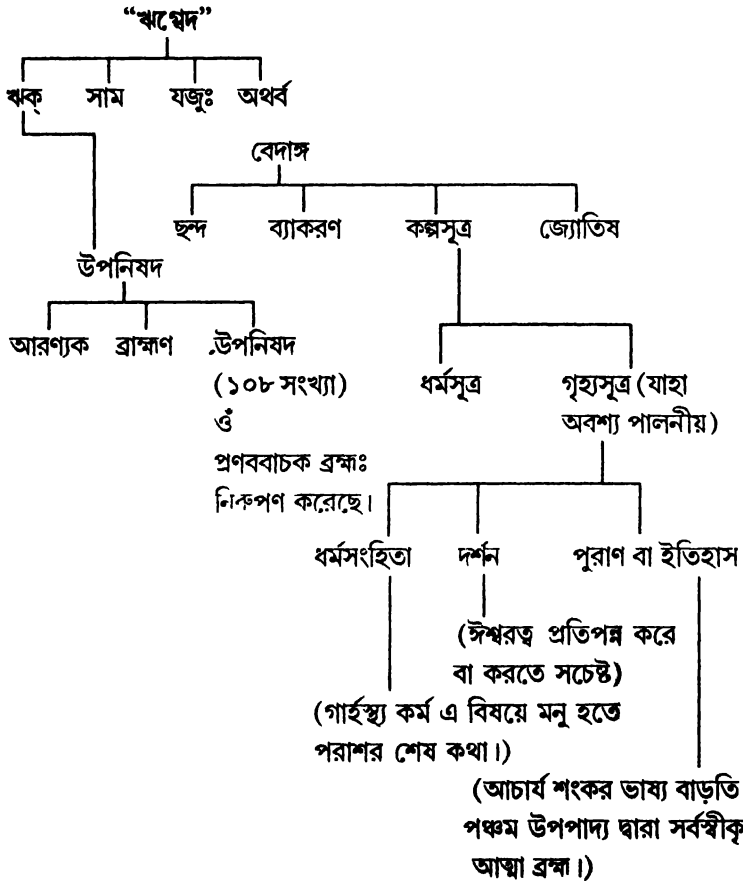
ব্রহ্মত্ব লাভে সক্ষম কারা?

নিপুণ গার্হস্থ্য ধর্মপালনের দ্বারা জীবের ব্রহ্মত্ব লাভ বা মুক্তি হয়। এই অবস্থায় পুনঃজন্ম হয় না।

যাঁরা গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করেন না, তাঁদের পক্ষে মুক্তি আসে অষ্টাঙ্গ যোগসাধন দ্বারা।
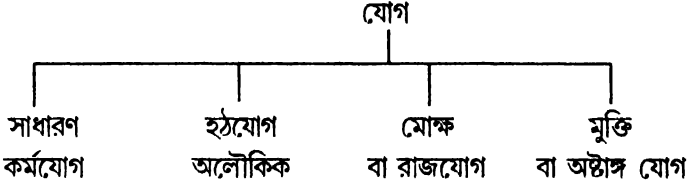
শাস্ত্রযুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিপন্ন করেছেন শাস্ত্র বহির্ভূত সমুদয় মোহশাস্ত্র মাত্র। মোহশাস্ত্র মানুষকে পতিত করে, অধঃনমন ঘটায়। মোহশাস্ত্র কলুষময় জীবনসঙ্গ ; ইহা ভয়ংকর। তাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন—

চ কার মোহশাস্ত্রাণীঃ করাল ভৈরব
উত্তর পশ্চিম পাঞ্চরাত্রঃ বৈখানস
তন্ত্রঃ ভাগবত শিবস্তথা সহস্রাণিঃ।
ভাবতেই হবে।

৬। কৃষ্ণং স্মরণং গচ্ছামি

ভূমিকা ঃ বাসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, যশোদাদুলাল কৃষ্ণ, নন্দের নন্দন কৃষ্ণ এবং শিব পুরাণের ভাষায় বাসুদেব পুত্র অকৃতকর্মা অসীমকৃষ্ণ সম্পর্কে জানবার বোঝবার বাসনা নিয়ে লিখতে বসেছি। আমি খুঁজে দেখেছি ভারতের হিন্দুশাস্ত্রসমূহ কৃষ্ণ সম্পর্কে কী তত্ত্ব পরিবেশন করেছে ; এবং বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গ যা যা কী বলেছেন তা আমাদের ইতিহাস স্বীকার করে কিনা।

বেদ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্রসমূহ হতে তত্ত্ব বিশ্লেষণ সহ উত্থাপন করে দেখাবার চেষ্টা করছি। কোনোরূপ বিকৃত বাসনা অবহেলা অবজ্ঞার লেশ মাত্র আমার নেই, এতটুকু অশ্রদ্ধার অবকাশ নেই। নেই কোনো কু-মতলব কেবল ঘটনার বিন্যাস পরিবেশন করাই আমার লক্ষ্য। গীতার কৃষ্ণ, মহাভারতের কৃষ্ণ শ্রীশ্রীপুরষোত্তম কৃষ্ণ সম্পর্কে আমার এই প্রতিবেদন যথাযথ হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। অনেক ধর্মজ্ঞানপিপাসুর লিপ্সা সার্থক হোক এই কামনা করে আমার এই লেখা শেষ করেছি।

ইতি

ডা. শ্রীসুশীলকুমার বর—হোমিও

মুখবন্ধ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বিংশতি স্তব ঃ

শ্রীকৃষ্ণঃ করুণাসিন্ধু সিন্ধুবৎ দয়াময়ং
ভক্তাধীনম্ ভক্ত জীবনম্ ত্বং প্রণমামি চ
শ্রীনন্দনন্দনং।।
জগদীশ্বরম্ জগৎ দুর্লভম। শ্রীব্রজমাধব
ব্রজেশ্বরম।
গোবিন্দম্ গোপীবল্লভম্ ত্বং প্রণমামি চ
শ্রীনন্দনন্দনং।।
বেণুধারী ধেনুবিহারী কানু ব্রজবালকম্
দেবকী গর্ভজং ত্বং প্রণমামি চ
শ্রীনন্দ নন্দনং।।
জলধি ভঞ্জনং হরি মধুকৈটভ নাশনম্
বরাহ মুরতি ধারিণীম্ ত্বং প্রণমামি চ
শ্রীনন্দ নন্দনং।।
কৃতান্ত অন্তকারী মুরারী ভরভয়নাশনম
সুখমোক্ষ প্রদায়ক ত্বং প্রণমামি চ
শ্রীনন্দনন্দনং।।
কৃপাং কুরু কল্পতরু ত্রিজগৎ ব্যাপীয়ং
দাসানুদাসহম্ চিরস্মরণায় ত্বং প্রণমামি চ
শ্রীনন্দনন্দনং।।
ব্রজবালক পূজনীয় গোপীকুল কৃতার্থকারী
পদশিরঃ সরষ গঙ্গা প্রণম্যহম্ হরে মুরাবী
অহল্যা পদরজঃ দত্তা পাষাণ মানবী
প্রণম্যহ্ তৎপদে যৎপদে জাহ্নবী।।
ধীবরম দুর্লভম্ পদম্ কাষ্ঠতরী রজময়ং
প্রণম্যহম হরে মুরারী শ্রীবিষ্ণুপদং।।
পামর কৃতার্থ হরিনাম করোতি করোতিফলম্
পতিত পাবনম্ শ্রীনন্দনন্দনং হরিম্ প্রণম্যহম্।।
ভগবত প্রধানম কৃষ্ণং শ্রেয় প্রবৃত্তমাধব
যদুকুল উদ্ভবম্ হরিং হরিময়ং যাদবং।।
বৃন্দাবন লীলাকারী হরি গিরি ধারকম্।
ইন্দ্রত্ব দমনম্ ত্বয়া ত্বং হি প্রণম্যহম্।।
নিকুঞ্জ বিহারী হরি, গোপীগণ জীবনম্।
প্রণম্যহম্ হরে মুরারী শ্রীবিষ্ণুপদং।।

এ দাসে হেরি লোচনাম্বুজে পদাম্বুজে দেহিস্থানম
কত যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র যেন পদাশ্রিতম্।।
বিন্দু অঙ্গজ কান্ত কৃতান্ত অন্তকারী
হরে মুরারে হরে হরে বংশীধারী।।
ত্বং হি ধাতা বিধাতা সৃষ্টি সৃজনম্।
ত্বং হি ক্ষীরদ নারদ নিরাকার ভঞ্জনম্।।
বিরিঞ্চি স্থাপনম্, শংকরের সংকটনাশনম্।
ভক্তি মুক্তিদাতা পতিত পাবনম্।।
দেহিভক্তি ত্বং হি ভক্তি ধর শ্রীমাধব।
তার ভবসিন্ধু দীনবন্ধু ধর শ্রীমাধব।।
নম, নমঃ নারায়ণং এতদ্ বিংশতি স্তব সমাপ্তয়ম।

সূচনা ঃ নন্দের দুলাল, যশোদার গোপাল, গোঠের রাখালরাজা গোপীর বস্ত্র হরণকারী কালিয় দমন বা বকাসুর বধকারী কৃষ্ণ ; কংসের কারাগারে জন্ম দৈবকী ও বাসুদেব পুত্র কৃষ্ণকে জানতে হলে ২৫০০ বছর আগের ইতিহাস খুঁজতে হবে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের সময় মথুরা তখন জমজম ছিল প্রাচীন ভারতরে এই নগরী। সেখানে থেকে রাস্তা গেছে সুদূর পশ্চিমে, যার সংযোগ রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত ছিল বলে জানা যায়। ভারতবর্ষে কত জাতি কত রূপে এসেছে। এসেছে ব্যবসায় করতে, লুট করতে, দখল করতে, সে-কথা ইতিহাস বলবে। কবিগুরুর ভাষায় ধরা পড়েছে —শক, হুন, দল মোঘল, পাঠান এক দেহে হল লীন। হ্যাঁ, এই ঘটনা একশত ভাগ সত্য। 'কী যাদু বাংলা গানে' যেমন বলা হয় তেমনিই বলা যায় কি মোহ ভারতভূমে।

ইতিহাসের কথায় বলতে হলে চতুর্দশ শতাব্দীর "ঐতিহাসিক ওয়ারসার" তাঁর গ্রন্থ "তাজজিইতুল আনসার" লিখে গেছেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে বাসযোগ্য জায়গা ভারতবর্ষ। পৃথিবীর সবার চেয়ে ও মনোরম সুন্দর ভূভাগ হল ভারতবর্ষ। এর ধুলো, বায়ুর চেয়ে পবিত্র! এত মনোরম সে দেশ যেন স্বর্গের নন্দনকানন! এ নন্দন কাননের সঙ্গেও তুলনা চলে না ভারতবর্ষের। এ যে আরো বেশি সুন্দর।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মনোরম দেশ। সবচেয়ে প্রাচীন সুসভ্য দেশই ছিল যে শুধু তাই নয় ; ধনী দেশও ছিল। সেদিন মথুরা জমজমে জংশন। এখান থেকে একটি রাস্তা পশ্চিমে রোম পর্যন্ত, উত্তরে তক্ষশিলা পুষ্কলবতী পুরুষ হয়ে মধ্য এশিয়ার সিল্কট রুটে লীন। পূর্বের সম্পূর্ণ রাস্তাটি গেছে একেবারে বিদ্রোহীদের দেশ (চীন)। এইসব পথ পেরিয়ে ভিনদেশিরা মথুরা আসত বিশেষত ব্যবসায় কারণে এবং নানা সুযোগ সন্ধানে।

বহু ভাষাভাষী বহু সংস্কৃতির মিলনের দেশ এই ভারতবর্ষ। প্রাচীন ভারতের জনজীবনে বিদেশিদের প্রভাব খুবই বেশি ছিল—অস্বীকার করার উপায় নেই। তারা নিজেদের দেশ হারিয়ে দিল এই মাটির টানে, এখানকার হরিণনয়নাদের কটাক্ষে, বিরহে, অভিমানে এবং মানবিক কারণে, লোভ ও লাভের মোহে। মিশে গিয়েছিল গোটা উত্তর কুরু অর্থাৎ আজকে মধ্য এশিয়া থেকে আসা শক-হুন-কুষাণ-গুর-স্তালিক-আভর জাতিরা। তারা নিয়েছে দিয়েছে

মিলায়ে মিলিয়েছে। আভির জাতিরা ছিল ঘোষশ্রেণীর। এদের পেশা গোরু পালন করাই প্রধান। এরা মথুরায় এসেছিল রং (কুমকুম) ব্যবসায় করার জন্য। অন্য কোনো কেমিক্যাল রঙের কথা তখনও কেউ জানত না।

উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার, মথুরা থেকে ১৫ কিমি. দূরে বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের প্রধান তীর্থভূমি। চতুর্দিকে কৃষ্ণলীলা ক্ষেত্র, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর জুড়ে আছে মধুবন মহাবন, গোকুল, লোহবন, বেলবন, উপান্তির বন, ভদ্রবন, বৃন্দাবন, নিধুবন, বহুলাবন, কামোদবন, তালবন। এই ব্রজভূমিতেই মথুরার ৫৩ কিমি. উত্তর-পশ্চিম যে একটি গ্রাম বা তক্ষশিলা—"বারসানা" সেখানে বাস করত শ্রীরাধিকা।

বারসানার সাড়ে আট কিমি. উত্তরে নন্দগাঁও। হ্যাঁ, এখানেই নন্দ আর যশোদা সযত্নে লালন করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে, এই হল সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বৃন্দাবনে চতুর্দিকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। বৈষ্ণবদের প্রধান তীর্থভূমি। মথুরা থেকে ১৫ কিমি. দূরে বৃন্দাবন ছিল—শ্রেষ্ঠতম লীলা কেন্দ্র। বৃন্দাবন, গোবর্ধন, বারসানা, নন্দগাঁও, প্রভৃতির হোরি খেলা বা হোলি উৎসব, সুপ্রাচীন জনপ্রিয় উৎসব ছিল। তখন হোরি খেলা হত জল ছিটিয়ে, গিরিমাটির রং নিয়ে, আর টেঁসুফুলের হলুদ রং তৈরি করে। পরস্পরের গায়ে রং দিয়ে নৃত্য করে হৈ-হুল্লোড় করত। মহা আনন্দে মেতে উঠত।

রং খেলা বা দোল খেলায় সেকালের আনন্দ ছিল। দোলের দিন বারসানার রাইকে রং মাখাতে গিয়ে বেশ কয়েকবার ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে চিনতে পেরে নাকাল করেছিলেন, রাধার সইরা। এখনও দোলের সময় সে-কথা মনে করে একটা উৎসব হয়। তার নাম লাঠমার হোরি। যুগ যুগ ধরে চলে আসছে সেই উৎসবও। বৃন্দাবনের অদূরে গিরি গোবর্ধন। এখানে রয়েছে কৃষ্ণ কানাইয়ার সঙ্গে ব্রজগোপীদের হোরি খেলার সাক্ষী হিসাবে গুলাল কুণ্ড। কৃষ্ণকথা গ্রন্থে, ১৫৯টি কুণ্ড বা হ্রদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুলাল কুণ্ড ছিল অন্যতম। তখন পলাশফুল থেকে তৈরি হত লাল গুলাল। সেই রঙের দোলা কৃষ্ণের গায়ে লাগত না কিন্তু!

সেখানে কামিনীরা মদ্যপান করে মত্ত ; তারা পিচকারির জল ছুঁড়তে পুরুষদের গায়ে। মৃদঙ্গের সঙ্গে উদ্দাম সংগীতে টইটম্বুর রাজপথ, জনপথ, গুলালে রাঙা চারিদিক। আবির, আর জলরঙে পিচ্ছিল রাস্তায় হাঁটা দায়। রসিক নাগরিকগণ বারানারীদের সঙ্গে রঙের খেলায় মেতে উঠত। মুখরিত হত পথঘাট-প্রান্তর। বারাঙ্গনারা শিস্ দিয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে সেই ক্রীড়া উপভোগ করতেন। ঐ যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আভীরদের নাম বলেছি তারা আসা-যাওয়ার পথে এই রং খেলার মুলুকে কুমকুম নিয়ে এসে এদেরই মাঝে বিক্রিবাটা করত।

তাদের অনেকেই মিশে যেত রং খেলায়—হুজুগে সকলের মধ্যে। এইভাবে আসতে-যেতে মনে ভালো লাগার প্রলেপ লেগে যায় তাদের মধ্যে। তারা জাতিতে গোয়ালা আভীর বা আহিরি—এই আভীরগণ এসেছিল খ্রিষ্টিয় প্রথম শতকের শুরুতে, গোধন তাদের জীবন জীবিকা। মথুরাকে কেন্দ্র করে বিস্তীর্ণ ঢেউ খেলানো তৃণভূমি যাকে ঘিরে আছে বন, উপপন, গা ঘেঁষে বইছে যমুনা নদী—। জায়গাটা বড়ো মনে ধরেছে তাদের। গোরু চরানোর পক্ষে এ রকম যুৎসই তল্লাট তেমন মেলে না। তারা যে কেবল গোরু চরাত বলে হাঁদারাম

মার্কা তা কিন্তু ছিল না! তারা রণনিপুণও ছিল। মহাভারত বলছে, অর্জুনের মতো বীর ক্ষত্রিয়কে পরাভব স্বীকার করতে হয়েছিল, এই আভীরদের কাছে। পুরাণে দশজন আভীর রাজার নাম মেলে।

যাই হোক যে রং খেলা নিয়ে আমি বলেছি সেখানে কিন্তু কৃষ্ণের কোনো নাম গন্ধ নেই। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে হর্ষের রত্নাবলী নাটকে যে হোরিখেলার দৃশ্য পাওয়া যায় সেখানেও কিন্তু ব্রজের কৃষ্ণ নেই। এমনকি খ্রিস্টপূর্ব প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং তার প্রাণকেন্দ্র মথুরাতে যে বাসন্তিকা রং গুলাল মহোৎসবের অস্তিত্ব ছিল তার পরিচয় আছে ঐতিহাসিক উপাদানে। জৈমিনির পূর্বমীমাংসা 'সূত্র' এবং 'কথক গ্রাহ্যসূত্র' থেকে তা জানা যায়।

রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধির সাথে সাথে আভীরদের সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়তেই থাকে। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে তারা পূর্ণ ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা লাভ করেছিল। এর মধ্যে তারা ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতিকে অন্যান্য বৈদেশিক জাতির মতোই পুষ্ট করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসে গোপালের বা গোপালকৃষ্ণের উপাসনা এই আভীরদেরই অবদান। গোপালকৃষ্ণের কাহিনী তাদেরই সৃষ্টি বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। হরিবংশ পুরাণ বলছে, শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ অথবা আভীর বা আহিরপল্লিতে জন্ম নিয়েছিলেন। এই কথার যথার্থতা মিলে গুপ্তযুগের দেওগড় রিলিফে কৃষ্ণের পিতা নন্দ এবং পালিকা মা যশোদার পরনে তাই বিদেশি পোশাক।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মথুরা ও সন্নিহিত অঞ্চলে তারা বাস করার পর সেখানেও কৃষ্ণের বাল্য ও যৌবন অবলম্বন করে গোপালকৃষ্ণের কল্পনা মানুষের মনে পাকাপাকি জায়গা করে নেয়। অতঃপর মথুরাকে কেন্দ্র করে যে বর্ণবৈষম্য শিথিল ভাগবত ধর্ম বলবতী হয়ে উঠেছিল তাতে প্রাক-আর্য উপজাতিরাও একটা সুবিধাজনক আশ্রয় পেয়ে গিয়েছিল। তাদের নিজস্ব দেবদেবীরাও অনায়াসে ঠাঁই পেয়ে যায়। তখন কৃষ্ণের প্রেয়সী বা পত্নী রাধাকে মেনে নিতে কোনও বাধা ছিল না কারোরই।

এইভাবে আভীরদের উপাস্য গোপাল, বৈদিক বিষ্ণু ব্রাহ্মণদের নারায়ণ, মথুরার অধিবাসীদের উপাস্য কৃষ্ণবীর বাসুদেব। সকলেই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন বৈষ্ণবধর্মে। হয়েছে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তযুগের সূচনার আগেই। তারপর কৃষ্ণকে একদিকে হোরির দিনে রঙ্গ করতে, আবার অন্যদিকে কুরুক্ষেত্রে পরিত্রাতা হিসাবে দেখে সাধারণ মানুষের ধন্দ তো লাগেনি, উপরন্তু এক ভাবের উন্মাদনায় ভেসে গেল জনজীবন। সেই বঙের দোলা লেগেছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মনেও। বৃন্দাবন থেকে ফিরে তিনিই বাংলায় দোলযাত্রার শুরু করেন।

(১৪৭৯—১৫৩১) সুলতানি শাসকদের ধর্মদ্বেষী তাড়নায় মথুরা-বৃন্দাবনে হোলি কিছুটা থিতু হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু বল্লভাচার্যের ভক্তি আন্দোলনের সূত্র ধরে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। এই সময় চৈতন্যের দুই শিষ্য রূপ সনাতনের আগমনে বৃন্দাবন নতুন প্রাণ ফিরে পায়। ১৫৭০ খ্রি. সম্রাট আকবর বৃন্দাবনের পদার্পণ করেছিলেন। মূলত তাঁরই প্রশ্রয়েই বৈষ্ণব আন্দোলন নবজন্ম লাভ করে ; বৃন্দাবনের হোলি খেলাও। ব্রজে এখন হর্ষে আনন্দে উদ্বেল ; কয়েক প্রজন্ম এইভাবে কাটছিল। এমন সময় আওরঙ্গজেব ভাইদের খুন করে

হাজির হলেন মথুরায়। তাঁর শাসনকালে বৃন্দাবনের হোলি বহুৎ ফিকে হয়ে গেল। এইভাবেই চলছিল কিছুদিন। তখন ব্রজবাসীগণ প্রদ্যুম্নের পূজা করত। বায়ুপুরাণ সপ্তনবতিতম অধ্যায় দ্রঃ।

শুক্রশাপে অভিভূত নিরাশ্রয় অসুরেরা রসাতলে প্রবেশ করল। শুক্রাচার্যের অভিশাপেই ইন্দ্র দানবদের হতোদ্যম করতে পেরেছিলেন। তখন থেকে যখনই যজ্ঞাদি শিথিল হবার উপক্রম হয়েছে, তখনই প্রভু বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করে অধর্ম নাশ করেছেন। তারপর চাক্ষুষ মন্বন্তরে প্রহ্লাদের শাসনে যেসব অসুর ব্যবস্থিত ছিল না, প্রভু ব্রহ্মা মনুষ্যবধ্য সেইসব অসুরদের বধের জন্য মানুষরূপী বিষ্ণুর অবতার বিধান করেন। তখনই ধর্মরক্ষার জন্য নারায়ণ আবির্ভূত হন। তারপর বৈবস্বত মন্বন্তরে অন্য আর দৈত্যে আবির্ভূত হলে এক যজ্ঞ প্রবর্তিত হয়। সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা ঋত্বিকের কাজ করেছেন। তারপর চতুর্থ যুগে যখন অসুরেরা আবির্ভূত হন, তখন বিষ্ণু সমুদ্র মধ্য থেকে আবির্ভূত হন। তারপর হিরণ্যকশিপু আবির্ভূত হলে তিনি দেবগণ পুরঃসর ভীষণ নরসিংহরূপ নিয়ে দ্বিতীয় অবতার পরিগ্রহ করেন।

ত্রেতাযুগের সপ্তম যুগে বলি যখন ত্রিলোকের অধিপতি, তখন অসুররা ত্রিলোক আক্রমণ করলে বিভূ-বিষ্ণু বামন অবতার পরিগ্রহ করেন। ইনি তৃতীয় অবতার। ঐ সময় অদিতিনন্দন বামন নিজের অঙ্গ খর্ব করে বৃহস্পতিকে সামনে রেখে যজ্ঞকারী দৈত্যেন্দ্র বলির সামনে উপস্থিত হন। বিপ্রবেশধারী বামন উপযুক্ত সময় বুঝে বিরোচনপুত্র বলিকে বললেন—হে রাজন, আপনি ত্রিভুবনের রাজা, তাই ত্রিপাদ পরিমিত স্থান আমায় দান করুন। বলি তাঁকে একান্ত খর্ব দেখে স্বয়ং তাঁর বাক্য অনুমোদন করলেন। তখন সেই প্রভু বামন ত্রিপাদ দিয়ে স্বর্গ, আকাশ ও পৃথিবী সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আক্রমণ করলেন। সেই মহাযশা ভূতাত্মা বামন যেন নিজ তেজে সূর্য থেকেও অধিকতর প্রদীপ্ত হয়ে দিকবিদিক প্রকাশিত করলেন। সেই মহাবাহু জনার্দন লক্ষ্মীকে আকর্ষণ ও ত্রিলোক আক্রমণ করে সব দিক সমুদ্ভাসিত করে অতিশয় শোভমান হলেন এবং নমুচি, শম্বা ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি অসুরদের হত্যা করলেন। অনেক অসুর চারদিকে পালিয়ে গেল। তখন ব্রাহ্মণরা সেই অদ্ভুত দর্শন বিষ্ণুকে দর্শন করলেন। তাঁরা দেখলেন ত্রিলোকে এমন কিছু নেই যা সে মহাত্মা পরিব্যাপ্ত করেন।

দেবদানব ও মানবেরা উপেন্দ্রের সেই অদ্ভুত বপু দেখে সকলেই বিষ্ণুতেজে মোহ প্রাপ্ত হলেন। সেই মহাত্মা ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য রাজ্য দান করেন। জনার্দন মানুষরূপে দিব্যবপু ধারণ করে অবতার রূপ পরিগ্রহ করেন। তাঁব **শাপজ অপর** যে সাতটি মানব অবতার আছে তা শুনুন।

ত্রেতাযুগের দশমযুগে ধর্মসকল নষ্ট হতে থাকলে তিনি মার্কণ্ডেয় পুরঃসর দত্তাত্রয় এবং মান্ধাতার শাসনকালে পঞ্চদশীর গর্ভে তথ্যপুরঃসর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অবতার জামদগ্ন্য ত্রেতার চতুর্বিংশ যুগে রাবণ বধের জন্য বশিষ্ঠ প্রমুখ দশরথাত্মজ মধ্যে রাম অবতার সপ্তম অবতার। অষ্টম জাতুকর্ণপুরঃসর বেদব্যাস অবতার। ইনি দ্বাপর যুগের অষ্টাবিংশ যুগে পরাশর থেকে জন্মগ্রহণ করেন। ঐরূপ অষ্টাবিংশতি যুগে দ্বাপরের শেষ অংশে যখন ধর্মের বিনাশ উপস্থিত হয়, তখন কৃষ্ণকুলে বসুদেবরূপী কশ্যপের ঔরসে দেবকীরূপিণী অদিতির গর্ভে ব্রহ্মগার্গপুরঃসর প্রভু বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। এই হল তাঁর নবম অবতার। এঁর অপ্রমেয়

প্রভাব বাক্য দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না। এই বালরূপী ভগবান ক্রীড়া পুত্তলির মতো কত ক্রীড়াই করেছেন। মহাবাহু মধুসূদনের সেইসব ক্রীড়ার ইয়ত্তা হয় না।

এইভাবে আমাদের শাস্ত্রে যে-কোনো কারণেই হোক রূপক ছলে কৃষ্ণের আবির্ভাব জানলাম। সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাটকবিশেষ! কেন এর প্রয়োজন? এর সারবত্তা কতটুকু?

আমাদের বেদের যেমন অসংখ্য দেবতার কল্পনা—তার শরীরী কোনো প্রতিচ্ছবি দেখি না ; এক্ষেত্রে সেইরূপ কিন্তু নয়। একেবারে প্রতিচ্ছবি নিয়ে হাজির। কোন্ সাধনার ফলে এমন অবতার রূপে প্রতিভূত! অসম্ভাব নয় কি? যদিও আমি স্বীকার করি "পুরাণম্ বেদসম্মতম্" বা "ইতিহাস পুরাণাভ্যাম্ বেদম্ সমুপবৃহয়েত" অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণেরে সাহায্যে বেদকে ব্যাখ্যা করবে—এটাই ছিল সর্বজনস্বীকৃত কথা। বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে বৈদিক বিধিবিধান ও বিভিন্ন বৈদিক আখ্যান থাকায় বেদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পুরাণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কোনো সন্দেহ জাগেনি।

পরবর্তীকালে আচার্য সায়ন প্রভৃতি বেদ ব্যাখ্যাতার পূর্বোক্ত রচনাটি তাঁদের ভাষ্যে উদ্ধৃতিও করেছেন এবং পুরাণকে বেদ জ্ঞানের সহায়ক মেনেছেন। কিন্তু পুরাণের সর্বত্র যে বেদের প্রভাব আছে তা নয়। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা বৈদিক আখ্যানবস্তু গ্রহণ করলেও তাঁদের আত্মা বৈদিক, ধর্মানুরাগী হলেও লৌকিক ধর্মের দিকেই তাঁদের যেন অধিক টান। লৌকিক বিধি-আচারকে বৈদিক মর্যাদা দেবার জন্য এবং তাদের বেদমূলকত্ব প্রমাণের জন্যই বুদ্ধোত্তর ভারতে পুরাণের সূত্রপাত হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ একমত।

নিরুক্ততার 'যাস্ক' তাঁর "নিরুক্ত" বেদাঙ্গ গ্রন্থে একাধিকবার এই ঐতিহাসিক ধারার উল্লেখ করে গেছেন।

শৌনকের বৃহদ্দেবতা গ্রন্থ থেকেও এরূপ ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই ইতিহাস পুরাণের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে।

বেদসংকলন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তাই বৈদিক সম্প্রদায় বেদ ব্যাখ্যার জন্য পুরাণ ইতিহাস দরকার বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু হায়! পুরাণ সর্বদাই বেদের সেই মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি।

মহাকবি কালিদাসও পুরাণের অসাধুতার কথা বলেছেন। অতএব পাঠককে অনুরোধ **উপরের ৭টি লাইনেই আমাদের শাস্ত্রের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থেকে শাস্ত্রপাঠ করতে হবে, ধর্ম করতে হবে**। কেননা বেদ মুনিঋষিদের দিব্যদৃষ্টির উজ্জ্বল প্রতিভাস। অপবপক্ষে শাস্ত্র পুরাণ লিখেছেন, পণ্ডিত উৎসাহী ব্যক্তিগণ মাত্র। তাই মহাকবি কালিদাস এগুলিকে অসাধু বলেছেন।

বেদের সঙ্গে পুরাণের পার্থক্য কেন তার বিশেষ কারণও আছে—যেমন বোঝার অজ্ঞতা। এইজন্য বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য, মাধবাচার্য যেমন সর্বজ্ঞ তেমনি আর কেউ নেই। পার্থক্য কেমন করে ঘটে একটি উদাহরণ দেখুন—মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রথম অংশের ভূমিকায় আছে হিরণ্যগর্ভসূক্তে—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ
পতরেকঃ আসীত।

সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ এই সম্পর্কে বলেছে, প্রাকৃত খণ্ডে বিবৃদ্ধঃ সন ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মসংহিতঃ স বৈ শরীরী। প্রথমঃ স বৈঃ পুরুষ উচ্যতে আদি কর্তা চ ভূতানাম্ ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।।

বাংলা অর্থ হল—১মঃ ব্রহ্মা নামে খ্যাত ক্ষেত্রজ্ঞ ও সেই প্রাকৃতে অণ্ডে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তিনিই প্রথম শরীরী এবং পুরুষ বলে অভিহিত। তিনিই ভূত সমূহের আদিকর্তা ব্রহ্মা এবং সকলের অগ্রে তিনিই বিরাজিত থাকেন। তিনিই সচরাচর ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে রয়েছেন।

হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থ নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলেছে—

"প্রজাপতি বৈহিরণ্যগর্ভঃ প্রজাপতেরণুরূপত্বায়।"

'সায়ন' শব্দটির দু-প্রকার অর্থ করে বলেছেন—

(১) "হিরণ্যং ব্রহ্মাণ্ডরূপং যসেশ্বরস্য
প্রজাপতে গর্ভে বর্ততে সোঽয়ং হিরণ্যগর্ভঃ।
(২) যদ্বা হিরণ্যস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য মধ্যে সত্য লোকে
গর্ভরূপেণাবস্থিতশ্চতুর্মুখো হিরণ্যগর্ভ।

দ্বিতীয় অর্থটি তৈত্তিরীয় সংহিতা বা অথর্ববেদের সংহিতায় পাওয়া যায় না। **উবট বা মহীধর** তাঁর ব্যাখ্যাতে ঐ অর্থটি স্বীকার করেনি। যদিও নিরুক্তকার যাস্ক শব্দটির পূর্বোক্ত দুই প্রকার অর্থই হতে পারে বলেছেন।

হিরণ্যগর্ভো হিরণ্ময়ো গর্ভঃ
হিরণ্যময়ো গর্ভোঽস্যেতি বা।

ঋক্ মন্ত্রটি আলোচনা করলে দ্বিতীয় অর্থ যথাযথ নয় বলেই মনে হয়। স্বরের সঙ্গে তৎপুরুষ সমাসেরই সঙ্গতি হয় বহুব্রীহির সঙ্গে হয় না। আচার্য সায়নের ভাষ্যে এইরূপ স্বরগত অসংগতি আরো অনেক ক্ষেত্রে আছে, বা ঘটেছে বলে পণ্ডিতগণ অভিমত দেন।

তৎকালের বিদ্যাসাগর আর পণ্ডিত সমাজ এখন কোথায়? আর কে শুনবে কার কথা। বিদ্যাসাগর হলেন কলির ব্যাসদেব। এইজন্য যা ঘটেছে বা নাই ঘটুক তাব সিদ্ধান্ত কিন্তু ব্যাসদেবই দিয়েই গেছেন—

"শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানি যত্র বিরোধো দৃশ্যতে
শ্রততৌ গৃণ্যন্তুশ্রু তদবিরোধে স্মৃতিধরা।"

শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্তে বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—পঞ্চম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পরাশর কহে শুন মৈত্রেয় সুজন।
যোগনিদ্রা বিষ্ণু আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ
শ্রীহিরণ্যকশিপুর ছয়টি সন্তান (কুমারে)।
আনিলেন একে একে (দেবী) দেবকী উদরে।
তাহাদের দুষ্ট কংস করিলে নিধন।

সপ্তম গর্ভের পরে করি আকর্ষণ।
স্থাপন করিলা তাহা রোহিণী জঠরে।
কালে সেই গর্ভে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।
জগতের হিত হেতু হরি ভগবান।
দেবকীর গর্ভে 'পরে হয় অধিষ্ঠান।।

এর পরের ঘটনা হল, নানা উৎপাতের কারণে নন্দরাজ গোকুল পরিত্যাগ করে অর্থাৎ ব্রজভূমি ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে গেলেন ; যশোদা—কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে। এখন কৃষ্ণের বয়স **সপ্তম** বর্ষ। এই সময়ে যে বেশে কৃষ্ণ চলতেন তা এইরূপ—

রাম কৃষ্ণ দোঁহে সেই দিব্য বর্ষাকালে
গোপালগণের সহ ভ্রমে কুতূহলে।।
কখন সংগীত করে কভু তাল দেয়
কদম্বের মালা কভু গলেতে দোলায়।
বৃক্ষের ছায়ায় কভু লয়েন আশ্রয়
ময়ূরের পুচ্ছ কভু শিরোপরি লয়।
গিরিধাতু করে কভু অঙ্গে বিলোপন
পর্ণশালায় শয্যায় নিদ্রিত কখন।।
মেঘের গর্জন কভু শুনিয়া শ্রবণে
হাহাকার শব্দ করে পুলকিত মনে।
কেকারব তুল্য ধ্বনি করেন কখন
কভু বা মোহন বেণু করেন বাদন।।
এইরূপে প্রতিদিন করিয়া দিবায়।
অপরাহ্নে শিশুসনে ঘোষগৃহে যায়।।

এই সময় তাঁর কালিয় দমন ধেনুকাসুর বধ, প্রলম্ববধ, গোবর্ধন ধারণ ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। ইন্দ্রের সাথে কৃষ্ণের কথোপকথন হয়। গোপীগণ সহ রাসলীলা এবং অরিষ্টাসুর বধ। তারপর কংসের ধনুর্যজ্ঞতে গমন। এই সময়ের কৃষ্ণ-বলরাম সম্পূর্ণ কিশোর বালক অনুমানিক ১৫ বছর অতিক্রম মাত্র। কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা। রজক বধ ও মালাগার গৃহে প্রবেশ কুব্জকে অনুগ্রহণদান, চালুর মুষ্টিক তোষণক ও কংস বধ ঘটনা ঘটে। কংসের সহিত সাক্ষাতের আগে তো কংসের যত রকম দুর্বৃত্ত অনুচর ছিল সবাই নিহত হয়েছে।

আর দুর্বৃত্তেরে হাঁকি কহিলেন বচন
এই দুই গোপশিশু অতি দুরাচার।
সভা হতে দূর কর বচনে আমার।
পাপাত্মা নন্দেরে ত্বরা করিয়া ধারণ।
লৌহপাশে বন্দী করি করহ স্থাপন।
দণ্ডাঘাতে বসুদেবে করহ সংহার।

যেসব গোপেরা আছে নন্দ সমভব্যাহ
তাহাদের ধনরত্ন করিয়া হরণ।
মম কোষাগারে সব করহ রক্ষণ।।
কংসের এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
উচ্চৈঃস্বরে হাস্য হরি করি উল্লম্ফনে।।
মঞ্চের উপরে ত্বরা করি আরোহণ।
কিরীট শোভিত কেশ করি আকর্ষণ।।
ভূমিতলে নিপাতিত করিয়া তাহারে।
বসিলেন মনসুখে তাহার উপরে।

কৃষ্ণ-বলরাম নিরস্ত্র তাছাড়া, অসয়ম বয়স! মঞ্চের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেশে ধরে ভূমিতে ফেলে তাহার উপর উঠে বসেছেন কৃষ্ণ ; অথচ কংসের মতো ভয়ংকর বীর তথা সন্ত্রাসকারী কৃষ্ণকে ও বলরামকে কোনরূপ আঘাত করেননি। কৃষ্ণ স্বয়ং যত জনকে বধ করেছেন সকলের সঙ্গেই হাতাহাতি যুদ্ধ বা মল্লযুদ্ধ হয়েছে মাত্র। কৃষ্ণের সাথে কালযবনের যে সংগ্রাম তাও ছিল এইরকম—

একদিন গোষ্ঠ মধ্যে দেব দেব হরি।
কটূক্তি করে, কত জরাসন্ধের পারি।।
শ্যালাষণ্ড আদি করি কর্কশ বচন।
মগধ ঈশ্বরে কহে দেব সনাতন।
এরূপে বিদ্রূপ যদি করে গদাধর।
হাসিয়া উঠিল তাহে যাদব নিকর।।
যথাকালে পুত্র প্রতি দিয়া রাজ্যভার।
জরাসন্ধ গেল তপে কানন ভিতর।।
কালযবন রাজ্য পেয়ে তার পরে।
বীর্যমদে অতি মত্ত হইল সংসারে।।
একদিন নারদেরে করি সম্বোধন।
জিজ্ঞাসিল কোথা আছে বলিষ্ঠ রাজন।।
বহু সংখ্যক ম্লেচ্ছ সৈন্যসহ আগমন।
আসিল সক্রোধে সেই কালযবন।
সেইস্থানে উপনীত হইয়া দুর্জন।
বহু সংখ্যক যদুসৈন্য করিল নিধন।।
একে মহাবলবান শ্রীকালযবন।
যাদব নিধনে সেই উদ্যত এখন।।
যদুগণে পরিত্রাণ করিবার তরে।
দুর্গ এক আবশ্যক ভাবিছে অন্তরে।।

অতঃপর দেখা গেল দ্বারকানগরীতে সমুদ্র মধ্যস্থলে—পুরী নির্মাণ করিলেন।

অমরাবতী সম পুরী মনোহর।
প্রাকারবেষ্টিত কিবা দেখিতে সুন্দর।।
শতেক তড়াগ তথা হয় সুশোভিত।
মহোদ্যান কত শত সদা বিরাজিত।।
এইরূপে নিরমিয়া দ্বারকানগরী।
মথুরার সর্বজনে আনিলেন হরি।।
নিরস্ত্র হইয়া নিজে করেন ভ্রমণ।
শ্রীকালযবন তাঁরে করিল দর্শন।।
কৃষ্ণে দেখি অস্ত্র লয়ে সেই দুরাচারে।
কৃষ্ণ পিছু পিছু দ্রুত হয়ে আগুসারে।।
তাহা দেখি জনার্দন করি পলায়ন।
পর্বত কন্দরে ত্বরা পশেন তখন।।
পিছু পিছু দুরাচার পশিল তথায়।
মুচুকুন্দ রাজা ছিল শয়ান তথায়।।
কৃষ্ণজ্ঞানে মুচুকুন্দে শ্রীকালযবন।
ঘন ঘন পদাঘাত করিল তখন।।
রোষানলে প্রজ্বলিত হয়ে নরপতি।
যেমন চাহিল কালযবনের প্রতি।
অমনি সে দুরমতি ভস্মীভূত হয়ে।
ভূতলে পতিত হৈল বিগলিত কায়ে।।
পরে মুচুকুন্দ কৃষ্ণে দেখিতে যে পায়।
দ্বাপরেতে অষ্টাবিংশ যুগ হলে তায়।।
যদু বংশে আবির্ভাব হইবেন হরি।
প্রত্যক্ষ হেবিণু এবে ওহে বংশীধারী।

শ্রীকৃষ্ণের এদিক ওদিক সমস্ত শত্রুর নিপাত হয়েছে। এখন তাঁর দ্বারকায় আগমন এবং রাজ্যপাট তারই কিছু ইতিবৃত্ত জানাব এখন। শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র একশত সধর্মিণী বলে বিদিত। মিত্রাবন্দা, সত্যা, জাম্ববতী, রোহিণী, সুশীলা, সত্যভামা, লক্ষ্ণা এই সাতজন ছিলেন প্রধানা মহিষী। রুক্মিণী ছিলেন তাঁর পাটরানি। কৃষ্ণ সকলের চেয়ে রক্মিণীকেই অধিক স্নেহ করতেন। কৃষ্ণের যত মহিষীর কথা বলা হল—প্রত্যেকের গর্ভে ৯টি পুত্র ও ১টি করে কন্যা জন্মেছিল। এই যদু বংশ এত বৃহৎ যে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য ১ কোটি গৃহ শিক্ষক নাকি ছিলেন নিযুক্ত। তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল অষ্টাযুত শত সহস্র, পুত্র, কন্যামুৎপন্ন, হয়েছিল বলে চিহ্নিত আছে। ৮ + ১৬০১০০ x ১০ = পুত্র, কন্যা কৃষ্ণের।

শাম্বপুরাণের একটি বিবরণে আছে।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

শাম্ব রূপযৌবনে গর্বিত হয়ে সতত ক্রীড়ায় মত্ত থাকত ও সর্বদা মহাত্মা নারদের প্রতি

অবজ্ঞা করত। এই পুত্রকে অবিনীত দেখে নারদ চিন্তা করলেন—অবিনীত, একে আমি বিনয় শিক্ষা দেবই। একদিন বাসুদেবকে বললেন—হে কেশব! আপনার যে-সকল ষোড়শ সহস্র পত্নী আছেন তাঁদের সকলের মন শাম্ব কর্তৃক অপহৃত হয়েছে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! সে রূপযৌবনশালী, চরাচর বিশ্ব শাম্ব রূপে অতুলনীয়। অতএব তাঁরা সকলে শাম্বের দর্শন আকাঙ্ক্ষা করেন।

এমনকি আপনার পত্নীগণও!

বাসুদেব বললেন—হে নারদ! তুমি যেরূপ বললে তা আমি কিছুতেই শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) করি না। নারদ বললেন—আমি সে রূপ করব যাতে আপনার শ্রদ্ধা হয়।

সেদিন শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুরীকারমণীগণের সাথে জলক্রীড়া করে নির্জনে অবস্থান করছিলেন রৈবতকের দ্বারকার সন্নিকটে পর্বতের রম্য উদ্যানে অট্টালিকাবলী শোভিত, সকলধাতুর কুসুমের দ্বারা নিত্য আমোদিত বিচিত্র কাননমধ্যে নিত্য নৃত্যরত ময়ূর ও শত শত কেকার রবে নিনাদিত, কোকিলের শব্দে ঝঙ্কৃত, চক্রবাকের দ্বারা উপশোভিত কোকিলাদের মধুর আলাপ ও জল কুক্কটের শব্দ, ভ্রমরের মধুর গুঞ্জন, শুক চাতকের ধ্বনিযুক্ত, নানাবিধ জলজ পুষ্পবিশিষ্ট দির্ঘিকাসমূহে হংসধ্বনি ও সারসকুল সমলঙ্কৃত সেই স্থান। হার—নূপুর কেয়ূর রশনা (কটিভূষণ) প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত স্ত্রীগণ পরিবৃত হয়ে বাসুদেব রমণ করছিলেন।

বিশেষত চার্বঙ্গী (মধুরাবয়বা) বিভূষিত বরস্ত্রীগণের (শ্রেষ্ঠরমণীগণের) ক্রীড়ার জন্য নিযুক্ত যথাযোগ্য পদ্মপাত্র মিষ্ট পান দেওয়া হচ্ছে। মণিকাঞ্চনপাত্রে নানাবিধ পুষ্পাদিবাসিত (পুষ্পের গন্ধে সুবাসিত) সুরা, আসব এবং আম্রভগ্ন বৃত্ত, ও নীলোৎপল দেওয়া হচ্ছে। এই অবসরে রমণীগণ মদ্যপানে মত্ত—এটা বুঝে নারদ ত্বরান্বিত হয়ে শাম্বের কাছে গিয়ে —"হে শাম্ব! রৈবতক উদ্যানে যাও। হে কুমার, অপেক্ষা করো না, তোমাকে বাসুদেব ডাকছেন, অতএব তোমার এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়।" শাম্বঃ সত্বর সেখানে গিয়ে পিতাকে প্রণাম করল। সুরাপায়ী স্ত্রী-সকল স্মৃতিলোপ হেতু শাম্বকে দেখে বিক্ষুব্ধ ও বিহ্বল হয়ে পড়ল।

তা দেখে হরি ক্ষুব্ধ হয়ে সেই বমণীগণকে (অল্পসত্ত্ব বিশিষ্ট যোৎদেব যাদের যোনি সিক্ত হয়েছিল) অভিশম্পাত করলেন—হে স্ত্রীগণ যেহেতু আমাকে পরিত্যাগ করে তোমাদেব চিত্ত অন্যত্র বৃত হয়েছে। আয়ুশেষে পরলোকে তোমরা পতিলোক প্রাপ্ত হবে না। আমি স্বর্গে গেলে তোমরা পতিলোক থেকে পরিভ্রষ্ট হবে এবং অরক্ষিত হয়ে দস্যুহস্তে পতিত হবে।

শাম্বকে উদ্দেশ্য করে বললেন—যেহেতু এই সকল রমণীগণ তোমার অতি রমণীয় রূপ দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছে অতএব তুমি কুষ্ঠরোগ প্রাপ্ত হবে।

এর পূর্বে দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণের দর্শনে "আগত মুনিদের প্রতি উপহাস করার জন্য (এই কন্যা অন্তর্বর্ত্নীকি প্রসব করবে?)—এই আভিশাপপ্রাপ্ত হবে।

অভিশাপ দিয়ে দুর্বাসা—কুলনাশক মুষল প্রসব করবে বলেছিলেন। সেইসময় শাম্বের জানু ভেদ করে মুষল বের করা হয়েছিল। এই ছিল যদুকুল ধ্বংসের ইঙ্গিতবাহী ঘটনা এক্ষণে

দেখা যায় কৃষ্ণ, বাসুদেব, হরি—ইনি একই নারীদের সাথে রৈবতক বনের ক্রীড়া কৌতুকেতে কোনো আদর্শ বহন করে না। কৃষ্ণের পুত্র শম্বকে ঐ রমণী গণ কেউ কি কোনোদিন দেখেননি? এও কি ভাবা যায়?

সেকালের চালচিত্র কেমন ছিল এবং কৃষ্ণের যে এত নারী তিনি কি ত্রিভুবন বিজয় করে সব নারীদের নিজের করে নিয়েছিলেন?

৫ম খণ্ড, সপ্তবিংশ অধ্যায়, বিষ্ণু পুরাণে আছে—সম্বরাসুর কর্তৃক প্রদ্যুম্ন হরণ এবং লবণ সমুদ্রে নিক্ষেপ। তা একটি মৎস্য ভক্ষণ করে এবং ঐ মৎস্য ধরা পড়ে ধীবরের জালেতে। ধীবর মাছটি দান করল সম্বরকে। সম্বর ওই মৎস্য রান্নার জন্য দিল স্ত্রী মায়াবতীকে। মায়াবতী মাছ কেটে ঐ ছেলে দেখে তাকে যত্নে লালনপালন করেন। শেষে মায়াবতীর কাছে সব অবগত হয়ে প্রদ্যুম্ন সম্বরকে মেরে ফেলে দেয় এবং মায়াবতীকে নিয়ে চলে যায় দ্বারকায়। কৃষ্ণ তাকে সাদরে গ্রহণ করেন বধূ হিসাবে।

তাহলে, নিজের ছেলেকে সম্বর যে চুরি করে নিয়ে গেছে তার জন্য এত কাণ্ড কেন?

কৃষ্ণ তো ভগবান! তিনি তো সবই জানবেন! এই প্রদ্যুম্ন ও মায়াবতীকে বলা হয় কামদেব ও তাঁর স্ত্রী রতিদেবী। হরকোপানলে হয় দগ্ধ। সেকালে বৃন্দাবনে হোলির পর নারীগণ কন্দর্পের পূজা করত জানা যায়।

পুত্র প্রদ্যুম্নকে পূজা করত, এই পরিচয় প্রাচীন শাস্ত্রে আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রথম অংশে ১২২ পাতায় আছে।

"কস্মান্মানুষতাং প্রাপ্তো নির্গুণোঽপি জনার্দনঃ।
বাসুদেবোঽখিলাধারঃ সর্বকারণ কারণম।"

অর্থাৎ যেটি সকলের কারণ, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার, সেই জনার্দন বাসুদেব নির্গুণ হয়েও কীজন্য মানুষ হয়েছিলেন?

এইজন্য নির্গুণ সগুণ ব্রহ্মের আলোচনায় যেতে হয়। তার জন্য পক্ষীরা চতুর্ব্যূহ সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন। নারায়ণ সগুণ নির্গুণ চারটি রূপের আধার। নির্গুণ ব্যাখ্যার অতীত। পণ্ডিতেরা তাকে শুক্ল মূর্তি বাসুদেব বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ অনুধাবনযোগ্য এই যে, তাঁকে নিছক কবির কল্পনা বলা হয়েছে। কারণ যোগীগণও সেই শুদ্ধ স্বরূপকে যথাযথ উপলব্ধি করতে পারেন না। সেই শুক্লমূর্তির রূপ, রং মুখে বর্ণনা করা যায় না। তা কেবল অন্তরে অনুভব করতে হয়.। ঋগ্বেদে তাকেই তো বলেছে "প্রজ্ঞানম আনন্দম ব্রহ্ম"। সেই পবিত্র মূর্তি সর্বকালে সর্ব অবস্থায় সমভাবে বিদ্যমান "সর্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম।"

গীতায় বলেছে—"বাসুদেব সর্বমিতি" ভগবানের **দ্বিতীয় মূর্তি** শেষনাগ বা সঙ্কর্ষণ। তিনি পাতালে অবস্থান করছেন এবং মাথার উপর পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। এই মূর্তিটি অসীম বলে তির্যক যোনি।

তৃতীয় রূপটি হলেন প্রদ্যুম্ন।

চতুর্থ মূর্তিটি অনন্ত শয্যায় শয়ান আছেন। রাজোগুণ যুক্ত মূর্তি হল অনিরুদ্ধ। ভগবানের প্রজাপালনকারী মূর্তিটি প্রদ্যুম্ন। তাই অধর্মের অভ্যুত্থান ও ধর্মের গ্লানি দেখা দিলে তিনিই অসুর নিধন করে ধর্মের পুনঃ স্থাপন করেন। সেইজন্য প্রদ্যুম্নকে পূজা করা হত।

ক্ষীরোদসাগরে শয়ান বিষ্ণুর প্রয়োজন মূর্ত হল তখনই যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের বাড়াবাড়ি হয়।

এই সগুণ—নির্গুণ তত্ত্বের কথা ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণেও আছে। মার্কণ্ডেয়ে পুরাণও সেই কথা বলেছে। গীতায় দেহধারী কৃষ্ণকে ভালো করে বোঝার জন্য তাকে বলতে হয়েছে—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া, মানুষীং তনুমাশ্রিতং
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম।। ৯।১১

তিনিই যে গদা চক্রধারী চতুর্ভুজ মূর্তি বাসুদেব তাই তিনি অর্জুনকে দেখালেন। দেখুন! — জগতে সূর্য সহস্র যুগ যুগ ধরে তাপদানকারী শক্তিরূপে বিরাজিত, তার কোনো পরিবর্তন নেই। তাহলে কেন কৃষ্ণের অবতারতত্ত্ব? অর্থ কিছু মিলে কি?

ভাগবতপুরাণ কৃষ্ণকে গূঢ়, কপট মানুষই বলছে। এতে, "চাংশকলাঃ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"—এইসব শ্লোক আছে। এ থেকেই বোঝা যায়, "ব্যূহবাদ"। কিন্তু ব্যূহবাদের ইতিহাস আরো প্রাচীন! বেদের যুগের আগে থেকেও ভারতে মাতৃপূজার বা শক্তিসাধনার প্রসার ঘটেছিল। শিবলিঙ্গের নিম্নকার গৌরীপটে এবং নগ্নমূর্তিতে সিন্ধুসভ্যতা যুগের নানান চিত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই পরবর্তী যন্ত্র (শক্তি) পূজার মধ্যে হয়তো এই ধারা কিছু কিছু স্থান পেয়েছে। ঋগ্বেদের বিভিন্ন অংশে দেবীসূক্তের প্রচলন, দেবী উপাসনার মধ্যে বিধি বর্তমান আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী পড়ার আগে ও পরে স্মার্ত সম্প্রদায়গণ দেবীসূক্ত পাঠ করেন।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও জৈনরাও দেবীপূজা করতেন। বৌদ্ধশাস্ত্র মহাবস্তু থেকে জানা যায় যে বুদ্ধদেব যখন মায়ের গৌতমীর সাথে কপিলাবস্তুতে আসেন তখন শাক্যবংশের মন্দিরে অভয়াদেবীর পুজো করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এই অভয়া হলেন দুর্গা। জৈনদের মধ্যে বাগেশ্বরী সারদা, ব্রাহ্মণী ১৬টি নামের পরিচিতি—সরস্বতী পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদের যুগে—সিন্ধু দুর্গা, বিশ্বদুর্গা, অগ্নিদুর্গা প্রভৃতি শব্দ আছে। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসেনীয় সংহিতায় অম্বিকাকে রুদ্রের বোন বলা হয়েছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের স্ত্রী। যজুর্বেদ থেকেই শরৎকালে অম্বিকার আবির্ভাব জানা যায়।

ব্যূহবাদের পূর্ণরূপটি কেমন ছিল?

বায়ুপুরাণ ও মোরা শিলালেখতে জানা যায় যে, তখন—পূজকদের মধ্যে কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে পূজা করা হত। পঞ্চরাত্র মতাবলম্বী ভাগবত সম্প্রয়দের দ্বারা তা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। এবং কৃষ্ণের পূজা প্রচলন হয়েছে নিশ্চিত। বায়ুপুরাণে

"মনুষ্য প্রকৃতি ন দেবা ন কীর্তমানান্নি বোধৃত,
সঙ্কর্ষণ—বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব এব চ।
অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে বংশবীরাঃ প্রকীর্তিতাঃ।"

নৈমিষারণ্যে পুরাণের কথা শোনার জন্য সমবেত ঋষিদের সুত বললেন, মনুষ্য প্রকৃতির দেবতাদের যে-সকল নাম বলা হয়েছে তা আপনারা শুনুন—সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব

এবং অনিরুদ্ধ এই পাঁচজন বংশের বীর বলে বিখ্যাত। খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক দশক জুড়ে এই বংশবীরদের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীগণও ক্ষেত্রবিশেষে পূজিতা হতেন, জানা যায়। যেমন—

"শাম্বশ্চ সদাহস্তঃ প্রদ্যুম্নশ্চপভৃৎ স্বরূপশ্চ
আনায়োঃ স্ত্রিয়ৌ কার্যৌ খেটক নিস্ত্রিংশ
ধারিণৌ সাত্বত, পরম পৌষ্কর অহিবুধ্ন"।

'পঞ্চরাত্র সংহিতা' বা দর্শনের আদি প্রকৃতির এই হল পরিচয়।

এই মতাবলম্বীদের দর্শন বলছে—প্রলয়কালে সৃষ্টি আরম্ভের পূর্বে **বাসুদেব কৃষ্ণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডলীন হয়ে যায়।** স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সৃষ্টির বাসনা যখন তাঁর মধ্যে জাগে তখন সেই ইচ্ছাকে তিনি মহাশক্তি স্ত্রীদেবীর মধ্যে সম্প্রসারণ করেন। সমস্ত কারণ একীভূত হলেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। পঞ্চরাত্র মতে শুদ্ধ সৃষ্টির প্রথম প্রকরণে জ্ঞান, বল, বীর্য, ঐশ্বর্য, শক্তি, তেজ এই ছয় গুণের আবির্ভাব ঘটে। একে বলে গুণোন্মেষ দশা। এই ছয়টি গুণ —শ্রাম ভূমি, শ্রমভূমি নামক দুটি ভাগে বিভক্ত। **এদেরই মিলনে ব্যূহবাদের** বিষয় জানা যায়।

মূল তত্ত্ব ঃ

এই দেবী উপাসনার বিবর্তন এক মনোজ্ঞ আলোচনা। খ্রিস্টপূর্ব ২য় বা ৩য় শতকে রচিত **বিদেশ সংহিতা** বৌদ্ধগ্রন্থতে বৈষ্ণব সৌর শৈব পূজকদের উল্লেখ থাকলেও দেবীপূজকদের উল্লেখ নেই। খ্রিস্টীয় ১ম শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতে আগমনকারী গ্রীক বণিকগণ কোমারীন অন্তরীপ সম্পর্কে বলেছেন, এখানে কুমারীদেবীর পূজা করত একদল উপাসক। কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করে, এখানে তারা বসবাস করত। তারা ঐ দেবীরই পূজা করত। গুপ্ত যুগে—কুমারগুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্তের শিলালেখা দেখে জানা যায়, কুমারগুপ্তের সামন্তরাজ বন্ধুবর্মণের পুত্র বিশ্বকর্মার ময়ূরাক্ষ নামক মন্ত্রীর দ্বারা একটি বিষ্ণুমান্দির ও একটি মাতৃমন্দির নির্মাণ করান। গয়া জেলার নাগার্জুনের পর্বতের গুহায় একটি লিপি থেকে জানা যায় যে, মৌখরীরাজ অনন্তবর্মা সেখানে কাত্যায়নী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বরাহমিহির তাঁর "বৃহৎ সংহিতায়" প্রতিমা 'প্রতিষ্ঠাপনম্ অধ্যায়' মাতৃকা পূজার অধিকারীদের মণ্ডলক্রমবিদ "মাতৃনামপি মণ্ডলক্রমোবিদো"—সেখানে শাক্তরা বিভিন্ন মণ্ডলে বা যন্ত্রে তারা দেবীপুজো করত। এইভাবে বলা যায় যে, পৌরাণিক ধর্ম ছিল তান্ত্রিক প্রভাবপুষ্ট।

এইজন্য বিদ্যাসাগর রচনাবলীতে দেখা যায় একটি গুরুতপূর্ণ শ্লোক,—

"চ-কার মোহশাস্ত্রানী করাল ভৈরব
উত্তর পশ্চিম, পঞ্চরাত্র বৈখানস
মন্ত্র ভাবগত শিবস্তথা সহস্রানি।"

অতএব—বৈষ্ণবগণ মুখ্যত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।

বৌদ্ধশাস্ত্রের আধারে তাদের ভাবধারা ভাগবত, কৃষ্ণচরিত ইত্যাদি নিয়েই বৈষ্ণবগণের আগমন এই বাংলায়। গুপ্তযুগ ছিল বৌদ্ধ মতাবলম্বী রাজাদের, তাদের আমলেই সমস্ত

পুরাণশাস্ত্রাদি রচিত হয় এবং বিভাগ ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে এই কথা ইতিহাস তথা সকল পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন।

বিষ্ণুপুরাণে—বিষ্ণু বা কৃষ্ণ বাসুদেব ও হরি, সব একাকার। সন্দিপনী মুনির কাছে বিষ্ণুই মন্ত্র নিয়েছিলেন এই কথা বলা আছে। বিষ্ণুই কৃষ্ণরূপে, বাসুদেব নন্দনরূপে জন্ম নেবেন, ত্রেতার শেষে স্বয়ং বিষ্ণু এই ঘোষণা করেছেন।

বাসুদেব কে? এই আলোচনা বিস্তৃত করা হয়েছে ব্যূহবাদে। মথুরার বাসুদেব নন্দ, যশোদা এইসব যে শুধু রূপক এই কথা সমস্ত গ্রন্থে স্পষ্ট বলাও আছে। সুতরাং মূল বক্তব্য কী এবং তার সন্ধান পেতে ধর্মের নিগড় পরতে হয় বৈকি? কোনো মুনি-ঋষির কথা কিংবা তাঁদের মত ও পথই কেবল ধর্ম হতে পারে। মুনি-ঋষিরা জগতের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু কোনো গৃহস্থ বা সংসারী মানুষের দ্বারা, তিনি যত বড়ো পণ্ডিতই হোন না কেন; ধর্মের নিশান দেবার অধিকার আছে কি? সর্বত্যাগী যোগী ব্যক্তিই কল্যাণময়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—

"তুমি যোগী হও আমাকে জানবে ও চিনবে।"

সেই যোগীই বিশ্বরূপ দেখার যোগ্য স্নেহ পরবশকৃষ্ণ সেই রূপ অর্জুনকে দেখালেন। গীতা ২/২০ দ্রষ্টব্য।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

আত্মা বা ভগবান জন্মোনও না মরেনও না।

তিনি পূর্বে কখন হয়েছিলেন বা পরে কখন হবেন এমনও নয়।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিনটি গুণে সকল ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। গুণ ব্যতীত কর্মের কোনো কর্তা থাকতে পারে না। এবং কর্তা না থাকলে কর্ম হয় না। তাই কর্ম ও কর্তার মূলে আছে তিনটি গুণ। আমরা জেনেছি ভগবান গুণাতীত—সুতরাং জন্ম মৃত্যুরূপ ক্রিয়া কি তিনি করেন? করেন না। তিনি যে বাসুদেব। বাসুদেব কে? বাসুদেব তিনি সর্বস্থানে বিরাজিত। সর্ব ইন্দ্রিয়ে তাঁর বাস। সব পৃথিবীতে যার আবাস তাঁরই নাম বাসুদেব। তাহলে বসুদেব নন্দনকৃষ্ণ হয় কীভাবে?

বিষ্ণুপুরাণে আছে— ৫ম খণ্ড—১ম অধ্যায়—

গুরু হতে গুরুতর পরমাত্মা তুমি
তব পরিণাম বল কেবা জানে শুনি।।
তোমার প্রসাদ লাভ করিবার তরে
আমার (পৃথিবী দেবীর) বাসনা করি সতত অন্তরে।
এখন তোমার পদে করি নিবেদন
অসুরেরা বসুধারে করিছে পীড়ন।
এই হেতু বসুমতী তোমার চরণে
শরণ লয়েছে আসি কহি তব স্থানে।।
উত্তর বাসুদেব বললেন......

জনম লভিব আমি জানিবে অন্তরে
একদিন দেবকীর পবিত্র জঠরে।
আমার অংশাংশে হবে সপ্তম নন্দন
দেবকীর ছয় পুত্র করিলে নিধন।
রোহিণীর উদরে দিবে শুন গো সুন্দরী
নিদ্রাকে সে সপ্তম সন্তান আকর্ষণ করি।
এইরূপে দেবকীর সপ্তম নন্দন
রোহিণীর গর্ভে যদি অধিষ্ঠিত হন
সমাজে এরূপ তবে হইবে প্রচার।
দেবকীর গর্ভ নষ্ট হয়েছে এবার।।
এইরূপ জনশ্রুতি হলে তার পর
রোহিণীর গর্ভে এক হবে বীরবর।।
তারপর দেবকীর পবিত্র জঠরে
জনম লভিব আমি জানিবে অন্তরে
তুমিও গোকুলে গিয়া শুন গো সুন্দরী
যশোদা উদরে জন্ম লবে ত্বরা করি।

এখানে স্পষ্ট দেখা যায় যে—স্বয়ং বিষ্ণু দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। বলরাম বা সঙ্কর্ষণ যিনি তিনি যশোদার সন্তান হলেন, আর যোগনিদ্রা রোহিণীর গর্ভে পরবর্তী কন্যাসন্তান।

সমাজে বলরামের পরিচয় কী?

বলরামকে নিয়ে কি কোনো প্রশ্ন কোনো কৌতুক যশোদার মনে জাগে না? বলরাম কৃষ্ণের অগ্রজ এইটুকু শেষ কথা। যশোদার সাথে বলরামেব বাল্যখেলা, প্রীতি, স্নেহবাৎসল্য, কোনো কিছু কোথাও পরিচয় দেখা যায় না।' এই নিয়ে আমরা কোনোকিছু ভাবি না। বুঝতে চেষ্টাও করি না। বলরাম প্রকৃতপক্ষে বীর অস্ত্রে পারঙ্গম। বরং সেভাবে কৃষ্ণের কোনো বণ চোখেই পড়ে না। কৃষ্ণেব সকল বল যেন যাদুবিদ্যাব মতো। এই নিয়ে পরে এখানে বলে রাখা ভালো যে, শাস্ত্রকারগণ ভুল করেননি ; হয়তো রূপকটা কিছু কমবেশি হয়েছে মাত্র। এই রূপক গভীব মনোনিবেশ দিয়ে বুঝতে হবে।

প্রভাস খণ্ড/অষ্টম খণ্ড

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ ও পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ—
কলি যে আগত স্বর্গে চলহ তোমরা।
পাপেতে হইবে পূর্ণ এই বসুন্ধরা।
অনিত্য সংসারে আর কতদিন রবে।
কলি অধিকারে রাজা কত কষ্ট পাবে।
শুন যুধিষ্ঠির হৈলে কলি অধিকার।
এত বয়ঃক্রম রাজা না থাকিবে আর।

এখানে কৃষ্ণ দেহত্যাগ করছেন—বৃক্ষের উপর শয়ান অবস্থায় আছেন। বাম পায়ের মধ্যম তলের তালুতে তীরবিদ্ধ।

বিষ্ণুপুরাণে দেহ রাখছেন—জানুর উপর রাখি পদ—ঠিক যোগাসন অবস্থায়। সেখানেও তীরবিদ্ধ কথাটি উল্লেখ আছে।

নবম খণ্ডে লেখা হয়েছে—

শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সাঙ্গ করি নারায়ণ
নিম্বতলে বসিলেন ত্যজিতে জীবন।

এখানে নারায়ণ মানে গৌরাঙ্গদেব বা কৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বলা হয়েছে।

পুরীতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগন্নাথ দেবের প্রত্যাদেশ—কারণ রাজা বরপ্রার্থনা করছেন—যে তাঁর ১৮ পুত্রে মরে ১৮ নালা রূপে অমর হয়ে থাকুক এবং ঐ ১৮ নালা পার হয়ে পাপীদের মুক্তি হয় তার জন্য। সেইজন্য ঐ ১৮ নালা মহাতীর্থ হয়ে আছে। এই বর রাজাকে দিলেছিলেন "জগন্নাথ"।

এখানে উল্লেখ্য যে, নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গলীলা শেষ করে তিনি পুরীতে জগন্নাথ লীলা করেছেন।

কৃষ্ণ দ্বাপর যুগে লীলা করেছেন—মথুরা বৃন্দাবনে। গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে যখন নাম মহিমা প্রচার করেন তখন কলিযুগ। তাহলে গৌরাঙ্গলীলা আগে কেন হবে?

এখানে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বয়ং এইসব লিখিয়েছেন। প্রাচীনকালে যে রাজা শাসন ক্ষমতায় থাকতেন তাঁদের নির্দেশে সবকিছুই লেখা হত। তাঁদের প্রশস্তি গাওয়া হত এবং আরো অনেক কিছুই করতে বাধ্য করা হত। দরবারের পণ্ডিতগণকে এইজন্য দরকার ছিল। সমস্ত রাজদরবারেই পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাবেশ দেখা গেছে। ইতিহাসে সকল রাজা, বাদশাদের দরবারে পণ্ডিতগণ থাকতেন সবেতন সাশ্রয় মাফিক, বৃন্দাবনে হোরি বা রং খেলা সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নাকি রং খেলা আরম্ভ করেছিলেন, শিশু কৃষ্ণভক্ত হিসাবে, এই কথা অস্বীকার করা যায় না?

এই ব্যাপারে একটি শাস্ত্রীয় উদাহরণ আছে বৃহৎ অদ্ভুত রামায়ণে—

গীতনাট্যলয়োপেতম্ গায়মানং সদাহরিং।
হরিমিত্রং সমাহূয় হৃতবানসি তদ্ধনম্।।
উপহারাদিকঞ্চৈব বাসুদেবস্য সন্নিধৌ
তব ভৃত্যাঃ সমাহৃত্য পাপং চক্রুস্তরাজ্ঞয়াঃ।।
হরেঃ কীর্তিং বিনা চান্যং ব্রাহ্মণেন নৃপোত্তম্
ন গেয়মিতি মন্তব্যং তর্স্মাৎ পাপং ত্বয়া কৃতম্।।

বাংলা মানে হল—হরিমিত্র ব্রাহ্মণের সর্বস্ব লুট করে তাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন রাজার অনুচরেরা, তাঁর আজ্ঞায়। কারণ? রাজা বলেছিলেন ওসব হরিনাম-টাম করা চলবে না। পরিবর্তে রাজার নামে কীর্তন করতে হবে। হরিমিত্র রাজি হননি। অতএব তখন রাজার আজ্ঞায় অনেক কিছুই হয়েছিল। অসম্ভবকে সম্ভব করা হতই। যতদিন যায়

ঘটনার অনেক পরিবর্তন হয়। ধর্মেরও মহিমা অধিক বেড়ে যায়। জমি একটির তৈরি হয়ে গেলে পরিবর্তন তার আর হয় না, সংস্কারে আটকায়। অথঃ কিম্?

শিব পুরাণোন্তর্গত—জ্ঞানসংহিতা / নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মার বরে তারকাসুর অজেয়। তারকেশ্বর ত্রিপুরপুরী নির্মাণ করে সেখানে অবস্থান করছেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর রাজ্য আক্রমণের আশঙ্কায় ভয় পেলেন। একদিন সকল দেবতার সমভিব্যাহারে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন ; ব্রহ্মা বললেন—শিববীর্য হতে সমুৎপন্ন পুত্র যখন সেনাপতি হয়ে তাকে অস্ত্র নিক্ষেপ করবেন তখনই তার নিধন হবে। তোমরা সেই মতো চিন্তা করো। এ বড়ো কঠিন কাজ। এ সময় উমাদেবী পিতার অনুমতিক্রমে বিশেষ ব্রতানুষ্ঠানে আছেন সঙ্গে দুজন সখী আছেন। এখানে শিবের সাথে উমার সংযোগ হতে পারে। দেবর্ষি নারদ যিনি অঘটন পটীয়সী তাঁর সৌজন্যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হল। ইন্দ্রের আহ্বানে মদন ও রতি এই কার্যে সহযোগিতা করেছেন। কন্দর্প শূলপাণির কামপ্রবৃত্তি জন্মাবার নিমিত্ত ধনুক আকর্ষণ করেছিলেন ; যথাসময় পার্বতী মহাদেবকে দর্শন দিলেন। তাঁর অগ্রে দণ্ডায়মান হলেন। তারপর মহাদেব পার্বতীর বস্ত্রাঞ্চল ধবার নিমিত্ত হস্ত বাড়ালেন, অমনি পার্বতী একটু দূরে সরে গেলেন। সেই সুন্দরী পার্বতী স্ত্রী স্বভাব প্রযুক্ত স্বয়ং লজ্জিতও হয়েন, এবং অঙ্গ দ্বারা হাবভাব প্রকাশ করত মহাদেবের দিকে বারংবার দেখতে থাকেন। তখন শম্ভু পার্বতীকে আপন অভিলাষরূপিণী দেখে মোহপ্রাপ্ত হলেন। মহাদেবেব চিত্ত চঞ্চল হল, দেখলেন বামভাগে মদন বাণ আকর্ষণ করছে। ফলে মদন ভস্ম হয়ে গেল।

গিরিরাজ দুহিতা পার্বতী গৃহে গমন করলেন। এই সময়ে দেবতাগণ শিবের কাছে গিয়ে তপস্যা করতে থাকেন—সন্তুষ্ট হয়ে শিবঠাকুর দেবতাদের বললেন, যে পর্যন্ত না রুক্মিণী দেবী এবং কৃষ্ণ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে রুক্মিণীর গর্ভে (প্রদ্যুম্ন) পুত্র উৎপাদন করবেন, এবং তার জন্ম কালে সম্বরাসুর তাকে হরণ করবেন রতি তখন পর্যন্ত সম্বরাসুরের ঘরে অবস্থান করুক। যথা সময় প্রদ্যুম্ন সম্বরাসুরকে বধ করে তার সমুদয় আত্মসাৎ করে পুনর্বার স্বনগরে ফিরে আনবে সম্পদ এই উপাখ্যান উপভোগ করাব মতো বটে । ইতিপূর্বে প্রদ্যুম্ন উপভোগ অনুরুদ্ধ "বজ্র" যিনি দ্বারকা রাজণ—হয়েছিলেন তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ দেহ রাখার আগে অর্জুনকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন—ঐ 'বজ্রকে' দ্বারকার রাজা করার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ নির্দেশ দিলেন তা ? অনুরুদ্ধ বয়স হয়েছে কারণ—বজ্র বর্তমান যুবরাজ সদৃশ আছেন—যেহেতু এরা মানুষ সমাজে যথেষ্ট গ্রহণীয় এবং আদরণীয় হবেন। তাছাড়াও তাঁর শক্তি-সাহস-বল সম্পর্কে কৃষ্ণভীষ্ম আশাবাদী ছিলেন। তাঁর প্রতি যথেষ্ট আস্থা ছিল রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও। ভগবানের যে পাঁচ মানুষরূপী অবতার তাঁর প্রতি সম্পর্কে বলা হয়েছে সেখানে অনিরুদ্ধের নাম ছিল তাই ব্রজকে রাজা করা হল। এখন শিবপুরাণের ধর্মসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাস উবাচ। ৪০ থেকে দ্রষ্টব্য।

এবং কথয়তস্তস্য মহাদেবাশ্রিতাঃ কথাঃ।
দিনান্যষ্টৌ প্রযাতানি মুহূর্তনিব তাপসঃ।।

নবমে তু দিনে প্রাপ্তে মুনিনা স চ দীক্ষিতঃ।
মন্ত্রমধ্যাসিতঃ শবরমথবর্বশিরসং মহৎ।।
জটী মুণ্ডী চ শশ্বী চ বভুব নিয়মান্বিতঃ।
মুনিনা দীক্ষিতঃ কৃষ্ণো যোগকাক্ষী চ মেখলী।।
মাসমেকং নিরাহারো দ্বিতীয়ং জলমাত্রেভুক্।
মাসত্রয়ং বায়ুভক্ষো বভুব সুসমাহিতঃ।।
পদাঙ্গুষ্ঠধৃততনুঃ ষষ্ঠে চোর্দ্ধভুজস্তথা।
সম্প্রাপ্তে ষোড়শে মাসি সন্তুষ্টো দর্শনং দদৌ।।
অর্থাৎ, ব্যাস বললেন— হে! তাপসগণ।

তারা এইরূপ বিষয়ক কথা কহিতে কহিতে আট দিবস অতীত হইল। নবম দিনে ভগবান কৃষ্ণ মুনি কর্তক শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। কালভেদে জটাশালী মুণ্ডশালী ও প্রাতিলোম্যযুক্ত হইয়া নিয়ম অবলম্বন করিলেন। মুনিদীক্ষিত ভগবান কৃষ্ণ-যোগকক্ষা ও মেখলাশালী হইয়া প্রথম একমাস আহার করেননি। দ্বিতীয় মাসে কেবল জলপান করিতেন ও মাসত্রয় বায়ুমাত্র সেবন করিয়া চিত্তসমাধি লাভ করেন এবং পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অবস্থিতিপূর্বক উর্ধ্ববাহু হইয়া কঠোর তপস্যা করিলেন। ষোড়শ মাস উপস্থিত হইলে প্রাবৃটকালে ভগবান শংকর সন্তুষ্ট হইয়া বাসুদেবকে দর্শন প্রদান করিলেন।

মহাদেব বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন এবং কৃষ্ণকে ৮টি বর প্রদান করিলেন কৃষ্ণ প্রার্থনা করিলেন, আমার বুদ্ধি নিয়ত ধর্মবিষয়িনী হউক, যশ ও বল সর্বাপেক্ষা অধিক হউক এবং আপনার প্রতি আমার ভক্তি বিচলিত না হয় ও নিয়ত যেন আপনার সান্নিধ্য লাভ করি। প্রথম জাত পুত্রদের যেন কন্যা না জন্মে এবং যুদ্ধে বলদর্পিত রিপুগণ আমার বধ্য হউক। সকল যোগীদের যেন প্রিয় হইতে পারি।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, কৃষ্ণের গুরু ছিলেন উপমন্যু।

বায়বীয় সংহিতা—পূর্বভাগ, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। একদা আক্লিষ্টকর্মা বসুদেব -পুত্র কৃষ্ণ সেই ধৌমাগ্রজ উপমন্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পাশুপত ব্রতের অনুষ্ঠান করেন এবং তাতে তাঁহার পরম জ্ঞান লাভ হয়েছিল। কীরূপে সেই পাশুপত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন? প্রসঙ্গে বায়ুপুরাণের—বপুদেব উল্লেখ আছে তনয় সাক্ষাৎ সনাতন পরমেশ্বর কৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছানুসারে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেও যেন নিজের দুঃখময় মনুষ্যভাবের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠ উপমন্যুর নিকট গমন করেন। এবং কৃষ্ণ বহুমানপূর্বক তিন বার সেই মুনিকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

উপমনু কৃষ্ণকে মলশূন্য দেখে—যথাক্রমে অগ্নি ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যথাবিধি তাঁহার গাত্রে ভস্মলেপন করলেন। অনন্তর সেই মুনি দ্বাদশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের দ্বারা পাশুপত জ্ঞান প্রদান করেন।

সেইদিন থেকে দেবতুল্য পাশুপত ধর্মাবিলম্বী শংসিতব্রত মুনিগণ কৃষ্ণের চারিদিকে ঘিরে উপাসনা করতে থাকেন। এই ঘটনা যে একটি মহারূপক তা বোখা যায় নাকি?

পাশুপত জ্ঞান কী প্রকার?

সনৎকুমার সংহিতায় আছে—পূর্বে দক্ষযজ্ঞারম্ভে ব্রহ্মাদি দেবগণ বীরভদ্রের ভয়ে ভীত হয়ে। শংকরের শরণাপন্ন হন। ভস্মাচ্ছন্নগাত্রে সেই সকল ব্যক্তিরা যজ্ঞদীক্ষিত পশুর ন্যায়, ভস্মকূট প্রাঙ্গণস্থিত গণেন্দ্রবৃন্দ কর্তৃক অভিযুক্ত হয়ে তেজঃশরের স্বরূপ সেই অভয়ের শরণাপন্ন হলেন। দেব উমাপতি ভস্মভূষিত গাত্রের সেই ব্রতধারীদের স্বকীয় যোগদান করেছিলেন যাহা সর্ব মোক্ষবিদ্যার তত্ত্ব বলে কথিত আছে এবং হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি যোগীপ্রধান কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে। হে ব্যাস! অপর যে সকল যোগ আছে, তা অতি কষ্টসাধ্য ; সহস্র জন্মান্তর ধরে সেই যোগ অভ্যাস করতে হয়।

সকল কর্ম ত্যাগ করে পাশুগত দীক্ষা গ্রহণ করলে মহেশ্বর প্রাপ্ত হতে পারে। তপোধর্ম সমাদৃত সর্বজ্ঞানযুক্ত সেই ব্রত সম্পর্কে এইরূপ কথা আছে—।

এখানে যে-কোনো বোদ্ধা পাঠমাত্রেরই চিন্তা আসে যে, সকল কর্ম ত্যাগ করে মানুষ কেমন করে বাঁচতে পারে? পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পর্ষাণ, পাদ, বায়ু ও উপস্য—এই পাঁচটির কর্ম কোনোভাবেই কি বন্ধ করে দিয়ে বেঁচে থাকা যায়? এগুলি অংশগতিপূর্ণ ঘটনা নয় কি? অধর্ম ব্যতীতপাপ হয় না—ধর্ম ব্যতীত পুণ্য হয় না এই অন্যোন্যশ্রয়ী ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করে এই ব্রত স্মরণ করতে হয়। তখন পাশুপত যোগ প্রাপ্ত হয়ে মহৎ ঐশ্বর্য ভোগ করা যায়। ব্রহ্ম স্বরূপ ভস্মের স্পর্শমাত্রে লোক মুক্ত হয়। ব্রহ্মাদি দেবতা সকল ভস্মে বিভূষিত হয়ে অভিমান করে থাকেন। এই ভস্মের তেজে যে বীর্য উৎপন্ন হয় তা হতে পবিত্র ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়। আত্মাকে শংকর ভেবে ভস্ম দ্বারা স্নানাচার করতে হয়। শিব যোগাত্মক ভস্মদ্বারা পাপরূপ বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায়। দেবগণ সোম হতে সম্ভূত, পিতৃগণ বহ্নি হতে উৎপন্ন ; অতএব এই প্রতিষ্ঠিত জগৎ অগ্নি-সোমাত্মক বোঝায়। ঈশ্বর অগ্নি ও সোম ভস্মের তেজস্বরূপ। ব্রাহ্মণ সেই ভস্মের তেজে সংহৃষ্ট হলেই পাপ হতে মুক্ত হন।

সাংখ্যবিদ্যা—তপস্যা ও বেদোধিত ধর্মসকল পরিত্যাগ করে কেবল ভস্মস্নান করলে লোকে প্রভুর সেই পদপ্রাপ্ত হন। নিষ্পাপই হোক, আর অধর্মিষ্ঠই হোক অথবা বহু ধর্ম নিরতই হোক শম্ভুর প্রতি ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ভস্মদ্বারা শুদ্ধ হয় এবং শীঘ্রই পরম যোগ প্রাপ্ত হন—সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হন। পাশুপত ধর্মাবলম্বীদের জন্য এইপ্রকার মহৎ ব্রতাবলম্বন করার নির্দেশ আছে। জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা এ তিন দেহেই অবস্থান, যেমন—নাড়িসমূহে আত্মা আছেন।

সকল প্রাণীর মধ্যে গূঢ়ভাবে আত্মা অবস্থিত। জ্ঞানসেবা দ্বারা আত্মাকে জ্ঞাত হওয়া যায়।

মহেশ্বরকে জানতে হয় কী করে?

এর ব্যাখ্যা সেই ওঁ মধ্যে নিহিত হয়ে আছে। 'অক্ষয়ত্রয়' ব্রহ্ম বলেই স্তুত হয়ে থাকেন। ইহা সকল শাস্ত্রের সার বিষয়।

ঐ ওঙ্কারান্তর্গত অ-কারে বিষ্ণু উ-কারে ব্রহ্মা, ম-কারে মহেশ্বর এবং মাত্রায় প্রকৃতি সেই প্রকৃতি পত্নীরূপে শম্ভুকে ভোগ করেন।

অষ্টাঙ্গ যোগ—এই সত্য স্বীকার করে নিয়েছে। সেই মাতৃতত্ত্বের সাধকদের কাছেই 'ম'-কার অতি পবিত্র।

এ বিষয়ে স্বামী নিগূঢ়ানন্দ রচিত মাতৃতত্ত্ব দেখুন।

শিবপুরাণের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ বলা যায়। একদা শিবকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মা নিজ মুখ হতে ব্রাহ্মণধর্মাধিকারে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বেদাচার ভ্রষ্টকারী, শূদ্রকে সৃজন করলেন।

জলরূপী শংকর হতে একটি অণ্ডও নারায়ণ উৎপন্ন হল। জল ও অগ্নির সহযোগে বায়ু ও তেজ সম্ভূত হয়।

বিকৃত বায়ু হতে আকাশ, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম হতে বিশাল পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়। ইহাই মহেশ্বরের অন্যতম মূর্তি।

এখানে শিবপুরাণে কৃষ্ণ, উপমনু গুরুর নির্দেশে ও সাহচর্যে শিব আরাধনা করেন এবং পাশুপত লাভ করেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। তাহলে কৃষ্ণ শৈব নয় কেন?

বৈষ্ণবগণ কারা?

ব্যূহবাদ আসলে শক্তিসাধনা। তাহলে বৈষ্ণবদের ভিত শক্তিমূলে ; সেদিক দিয়ে বুদ্ধের মাতৃদেবী অভয়ার পূজার কথাও মনে আসে।

বৃন্দাবনের মথুরার রাধাকৃষ্ণলীলার মধ্যে চৈতন্য অনুপ্রবেশ হেতু সকল বৌদ্ধশাস্ত্র সংকলন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জন ইত্যাদি করে বৈষ্ণব একটা আলাদা মত গড়ে তোলা হয়েছে। বৈষ্ণবদের মূলে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই।

এই সমস্ত শুরু হয়েছে বাংলায় তথা ভারতে সেই গুপ্ত যুগের খ্রিস্টীয় শতকের মাঝামাঝি সময় কালেই।

জ্ঞানসংহিতার ষড়বিংশ অধ্যায়ের ঘটনা হল—

ব্রহ্মার উপদেশ শ্রবণে দেবগণ হরিকে প্রণাম করে মনুষ্যগণের সর্বকাম প্রাপ্তির নিমিত্ত লিঙ্গমূর্তি প্রার্থনা করলেন। দেবগণের প্রার্থনায় হরি ও ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে বললেন "হে বিশ্বকর্মা তুমি উত্তম, উত্তম লিঙ্গমূর্তি নির্মাণ করে দেবগণকে প্রদান করো।"

ইন্দ্রপ্রস্তরময়, কুবের সুবর্ণময়, ধর্ম পীত মণিময়, বরুণ শ্যামবর্ণ, বিষ্ণু ইন্দ্রনীল, ব্রহ্মা সুবর্ণময়, বিশ্বদেব বসুগণ রৌপ্যময়, বায়ু পিতলময়, অশ্বিনীকুমার মৃত্তিকাময়, অগ্নি হীরকময়, বিপ্রগণ মৃত্তিকাময়, ময়দানব চন্দনময়, অনন্তাদি নাগ প্রবালময়, পিশাচগণ লৌহময়, দৈত্য ও রাক্ষসগণ গোময় নির্মিত শিবলিঙ্গ পূজা করতেন। ব্রহ্মা দেবগণকে শিব পূজাবিধি বলেছিলেন—সহস্র কর্ণ যজ্ঞ অপেক্ষা একটা তপোযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। সহস্র তপোযজ্ঞ অপেক্ষাও জপযজ্ঞ, সহস্র জপযজ্ঞ অপেক্ষা ধ্যানযজ্ঞ অতিশায়ী জানবে। ধ্যানযজ্ঞ অপেক্ষা আর কিছু নেই। এই হল শিব পূজাবিধি।

যে সময় শিব ত্রিপুর জয় করেন, তখন সকল দেবতাগণ তাঁর স্তব করেছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা শিবের সহস্রনাম প্রকাশ করেছিলেন, তার ফলাফল, নামের মাহাত্ম্য বলেছেন। এই নিয়ে আমার পৃথক একটি গ্রন্থ লেখা হয়েছে যথা সময় প্রকাশ করবার ইচ্ছা আছে। এখন সেই বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ মহিমা সম্পর্কে বিশেষ তত্ত্ব জানা দরকার। এই সম্পর্কে আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে যাক্।

বাঙালির সারস্বত সাধনার ইতিহাসে উমাপতি ধর, শরণ, আচার্য গোবর্ধন, কবিরাজ, ধোয়ীর, সতীর্থ, লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় এরা অন্যতম শ্রেষ্ঠ রতন ; জয়দেব সহ সকলেই

ছিলেন সংস্কৃত ভাষার কবি। কিন্তু জয়দেব বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বলে খ্যাতিলাভ করেন, কেন না ইতিহাসের যুগ বিবর্তনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপে ও প্রকৃতিতে জয়দেব বিশেষ প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর গীতগোবিন্দম্ কাব্যের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অপরিমেয় সম্পদ কেন হল?

গীতগোবিন্দম্ কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচনা। সেই সময় গৌড়দেশ হয়ে উঠেছে সংস্কৃত সাহিত্য সাধনার পীঠস্থান। এই গৌড় দেশে চৈতন্য প্রভাব অঙ্কুরিত হতে থাকে। খ্রিস্টীয় ১০ম শতাব্দী ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের অবক্ষীয়মাণ সময়। জয়দেব শুধু ধারানুসারী কবি নন, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য পরবর্তী আট শত বৎসর সংস্কৃত সাহিত্যের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে স্থান করে আশ্রয় দান করেছে। বিষয়বস্তু নতুন নয় তথাপি গীতগোবিন্দ লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সেতু রচনাকারী রামায়ণ-মহাভারতে গীতা, ভাগবতাদির সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তি তে আসীন হয়ে যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সেনবংশীয় ব্রহ্মসম্রাট লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় মধ্যমণি কবি ছিলেন জয়দেব। তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বে ছিল "চর্যাগীতি"। বৌদ্ধদের ধর্ম সংগীত কৃষ্ণকীর্তনে গীতগোবিন্দের প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল, কী অভ্যন্তরীণ কী বাহ্যিক। ইহা জয়দেবের অনুসরণ বলা যায়। কৃষ্ণকীর্তন বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা। কৃষ্ণকীর্তন কিন্তু নাটক সেখানে উক্তি প্রত্যুক্তি আছে। সেখানে চরিত্রগুলি কিশোর মাত্র। কিন্তু গীতগোবিন্দে তা নয়, যুবক-যুবতী মধ্যযুগীয় দ্বৈতধারায় পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য ধারায় গীতগোবিন্দই বাংলা সাহিত্যের উৎস ছিল। জয়দেবের পরে এলেন বিদ্যাপতি। ছন্দের ক্ষেত্রে জয়দেবই বিদ্যাপতির গুরু বলা যায়। সমগ্র বৈষ্ণব পদসাহিত্যে ভক্তিরসের যে স্বরলহরী প্রবাহিত জয়দেবই তার সূচনা করেন। জয়দেবের বৈধী ভক্তি পরবর্তীকালে মহারাগ ভক্তিতে পরিণতি ঘটে।

মঙ্গলকাব্যের বর্ণনাত্মক রীতি, ছন্দময়তা জয়দেবাশ্রিত বটে! ময়ূরভট্ট, মানিকরাম কানাহরি দত্ত, মুকুন্দরাম সর্বত্রই গীতগোবিন্দের প্রভাব আছে। মধুসূদন লিখেছিলেন, চল যাই জয়দেব গোকুল ভবনে। বঙ্কিমের আনন্দমঠ—সত্যানন্দের গানেতে বিদ্যাপতি, জয়দেব এর প্রভাব তাঁদের বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক গ্রন্থে যে হাঙ্গর শিকার বর্ণনায়—পশ্যতি তব পন্থানং শব্দাত্রয়ের ধ্বনি, গীতগোবিন্দের 'পতিতপতত্রে' শ্লোকের ছাপ আছে। রবীন্দ্রকাব্যে তো কথাই নেই। দ্বাদশ শতকে পূর্বভারতের শ্রেষ্ঠ কবি বাঙালি জয়দেবের আবির্ভাবের দু' শত বছর পর অর্থাৎ চতুর্দশ শতকে আবির্ভূত হন মৈথিলিকবি বিদ্যাপতিঠাকুর। যিনি কবি সার্বভৌম বলেই পরিচিত। ভৌগোলিক দিক থেকে মিথিলার সঙ্গে বাংলার যোগসূত্র থাকার কথা নয়। বিচিত্রচারী এই কবিও বাঙালি পরিচিতি পেয়েছেন।

মঙ্গলকাব্যসমূহের মধ্যে মনসামঙ্গল সবচেয়ে প্রাচীন বিজয়গুপ্তকে মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। তাঁর রচনাকাল ১৪১৬—১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ বলে মনে করা হয়। নিম্নোক্ত শ্লোক থেকেই তাই মনে হয়। ধাতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক। সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক।

নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল চাঁদ সদাগরের চরিত্র মহাকাব্যেরই মতো। হাস্যরসের করুণরসের মধ্যে পরস্পর বিরোধী চরিত্র বর্ণনায়ও নারায়ণ দেবের পরিণত ও মার্জিত বোধ ছিল ; যা অন্য কোনো মনসামঙ্গল কাব্যে নেই। মধ্যযুগীয় রচনা পাঁচালী রীতিতে রচিত ছিল। সাহিত্য শাখার সম্যক পরিচয় পেতে হলে জনচিত্ত সম্পর্কে, সমসাময়িক ভাবধারা সম্পর্কে, আলোচনা থাকা চাই। ঐ সময়কার রচনায় তা ছিল না। ছিল শুধু জনচিত্ত মুগ্ধ করার ও রুচিহীন রঙ্গরসের সমাবেশ।

নাথসাহিত্য ছিল বাঙালি, 'যুগী' সম্প্রদায়ের বিহিত ক্রিয়াকর্মাদিকে অবলম্বন করে। এই সাহিত্য ছিল তন্ত্র হঠযোগ আধিদৈবিক ও আদিমানসিক ধারাতে রচিত। ইহা কোনোরূপ অধ্যাত্মবাদ নিয়ে রচনা নয়। গোরক্ষনাথ ও মীননাথ প্রভৃতি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনাগুলি যাত্রা-পাঁচালী-তর্জা-আখড়াই হাফ-আখড়াই প্রভৃতি শ্রেণী-সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। যাত্রা-পাঁচালী প্রভৃতিতে পৌরাণিক ঐতিহ্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবী যুগকে তুলে ধরার ও রঙ্গব্যঙ্গের প্রবেশ করিয়ে অবক্ষয়ী সমাজ দর্শনকে তুলে ধরার মতো কৃতিত্ব যে তাঁদের ছিল তা অস্বীকার করা যায় না মোটেই।

যাই হোক যেখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমাপ্তি সেখানেই বৈষ্ণব পদাবলীর যাত্রা শুরু। উত্তর ভারতের বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা ঐ বইখানাও তথাই ভাগবত অবলম্বনে বৈষ্ণবতন্ত্র গড়ে তুলেছিল। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা চলছিল। এই ধারার পরিমাণ ও গুণ নিয়ে আর কারো সাথে তুলনা হয় না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে পদসাহিত্যের যেন জোয়ার এল। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল উত্তরভারতে। চৈতন্যদেব এই ধারা আনেন গৌড় বাংলায়।

চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণবপদসাহিত্যের পরিচয় দিতে গেলে প্রথমে চোখে পড়ে যে, এই পদ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা ধর্মবোধ সঞ্জাত নয়। কাব্যবোধের উৎস থেকেই উৎসারিত। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় সেখানে শৃঙ্গার রসাশ্রয়ী বিষয়রূপেই ব্যাখ্যাত। বিদ্যাপতির কাব্যে দেখা যায়, আভিজাত্য তথা বৈদগ্ধ্যের ছায়াপাত। কবির মননশীলতায়, বক্রকটাক্ষে অতিমার্জিত ভাষা ভঙ্গিতে ও আলঙ্কারিকতার, সৌন্দর্য চেতনায়, ইন্দ্রিয়প্রধান দেব ভাবনায় ও কল্পনার ব্যাপক ঐশ্বর্যে সর্বত্রই বৈদগ্ধ্যের সুর। ক্বচিৎ ভাব গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। কোথাও প্রণয় ব্যাকুল হয়েছে সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতাব দিকে কবি প্রাণের নিরুদ্দেশ যাত্রা প্রকাশ পায়নি।

বিদ্যাপতির রাধা তাই নিপুণা নাগরী, তার প্রেম ছলাকলাময়। অপরদিকে চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার প্রেম বস্তুবোধের রাজ্যে ভ্রমণ করে না। বস্তুরূপ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত এক গভীর রহস্যালোকে কবিচিত্তের পরিক্রমা। চণ্ডীদাসীয় পদসাহিত্যের অপর যে বৈশিষ্ট্য তা হল তাঁর গীতিপ্রাণতা। রাধার বিরহক্রন্দনে চণ্ডীদাসের ব্যক্তিক অনুভূতি আর্তক্রন্দনে হাহাকার করে উঠছে। তাঁর প্রেমানুভূতির কোমল ও স্পর্শকাতরতা এক ইন্দ্রিয়োর্ধ অনির্বচনীয় আত্মহারার সুর বাজেই। তাই চণ্ডীদাসের কাব্য রোমান্টিক, কবি সংকেতে রহস্যগভীর ভাব ফুটিয়েছেন। চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব পদসাহিত্যের যে দিকটা লক্ষণীয় তা হল ধর্মীয় প্রেরণার সঙ্গে কাব্যিক প্রেরণার সহজাত মিলন ঘটেনি।

এই কাজটি চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদসাহিত্যের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে। তাঁর মহিমায় নবদ্বীপের ভক্তদের নিত্যানন্দ পন্থী বা গৌরনাগরী মতবাদে বিশ্ববাসীদের জন্য। বিশেষ করে দার্শনিক, তাত্ত্বিক ভাবনার প্রতিফলনের কারণেই। ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব সাহিত্য একটা প্রবল দীর্ঘস্থায়ী ভাবান্দোলনের ফলেই বিপুল শক্তিতে বিকাশ-লাভ করেছে। সম্ভব হয়েছিল, একটা তত্ত্ববোধানুসারেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান। তিনি অংশাবতার বা যুগাবতার নন। অতএব তিনি সাকার হয়েও সর্বগুণান্বিত, নির্গুণ নিরাকার হয়েই রয়ে গেছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন যে, ভগবান লীলার জন্য জগৎ ও জীব সৃষ্টি করেছেন।

ভগবান কৃষ্ণের প্রধান শক্তি হল হ্লাদিনী শক্তি। ঐশ্বর্যে তাঁর সত্য পরিচয় নেই, মাধুর্যের মধ্যেই তাঁর সত্যরূপ, সম্পূর্ণ রূপ মিলবেই। কারণ তিনি সচ্চিদানন্দ, কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সার নির্যাস, মিলনেতে পাই রাধাকেই।

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমানষ। চন্দ্রে আর তার জ্যোৎস্নায় যেমন ভেদ আছে সেইরূপ তারা ভেবেছিল রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা রূপক নয়। নিত্য বৃন্দাবনে এই ভগবৎ প্রেমলীলার অনুষ্ঠান নিত্যই চলছে। বৈষ্ণব কবিগণ যেমন, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, লোচনদাস ধর্মীয় প্রেরণায় সারস্বত প্রতিভার মধ্যে একীভূত করেছেন তাঁদের লেখায়।

এরপর সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিরা এলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর খ্যাতিমান কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে মার্জিত রুচির বিদগ্ধ সারস্বত সাধক ছিলেন। উচ্চ জমিদার বংশে জন্ম সত্ত্বেও তাঁর তা সারাজীবন কেটেছে অত্যন্ত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা, ভাগীরথীর তীরবর্তী নগর কেন্দ্রে সদ্য গঠিত কলকাতার বিত্তবান সমাজে এক প্রকার লঘু ধরনের গীতবাদ্য, যাত্রা, পাঁচালীর প্রচলন হয়। সব মিলিয়ে অষ্টাদশ শতক ছিল অবক্ষয়ী—সমাজ। ভক্তিপ্রধান পাঁচালীকে তারা পঙ্ক্তি বহির্ভূত করে ছেড়েছে। সমগ্র লোকসাহিত্যে বিশেষ কোনো সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থান নেই সে সময়ের রচনায়। এইসময় জুড়ে গৌড়দেশে চলেছে বৈষ্ণবতন্ত্র আরাধনার ফুল রিহার্সল। দীর্ঘ ১৬০৬—১৮৭৪ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের রচিতহয়—মাধবীকঙ্কন, মহারাষ্ট্রের জীবন সন্ধ্যা, রাজপুত জীবন সন্ধ্যা এবং ১৮৭৯ প্রকাশ। ১৮৮৩ রবীন্দ্রনাথের বউ ঠাকুরানীর হাট, ১৮৮০ রাজর্ষি ইত্যাদি পর্যন্ত দীর্ঘ কমবেশি ১৭৫ বছর ধরে গৌড়দেশ তথা সমগ্র বাংলার জন্য ধর্মের নিগড় তৈরি হয়ে গেল, নির্ঝঞ্ঝাটভাবেই। আমরা দেখলাম সারা পুরাণ গ্রন্থ, গীতাসহ নতুন নতুন সৃষ্টি হয়েছে।

সমস্ত ধর্মশাস্ত্রসমূহ সংস্কৃত ভাষায় মূল রচনা। তখন মিথিলা এবং গৌড়দেশ সংস্কৃত পঠনপাঠনের পীঠস্থান বলা যায়। কারণ আমরা দেখেছি সংস্কৃত ভাষার একটা গৌড়ীয় রীতির প্রচলন হয়েছিল। প্রথম আমাদের হুগলী তথা কলকাতার রামমোহন রায় পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য করলেই হিন্দু শাস্ত্রের হাল

হকিকত জানা যায় কিছু। বাংলা সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে আমি কি অনুসন্ধান করে লিখলাম আশা করি বোঝাতে পেরেছি।

এবার আসা যাক, ভাগবতের এয়োদশ অধ্যায় থেকে ১২/১৩ শ্লোক নিয়ে—অমৃত সাগর সম

ভাগবত সার ;
যতদিন শ্রুত নাহি হয় কভু আর।
ততদিন সাধুদের সমাজে নিশ্চয়।
অন্যান্য পুরাণের সমাদর হয়।।
এই ভাগবত হয় বেদান্তের সার।
বসনায় যদি পান নাহি করে একবার।।
কিছুই যে তৃপ্ত তার নাহি হয় মন।
নদী মধ্যে খ্যাত গঙ্গা যথা নারায়ণ।।
দেবমধ্যে ভক্তমধ্যে খ্যাত যথা শংকর দেবতা।
পুরাণের মধ্যে তথা ভাগবত কথা।।
নির্মল পরম জ্ঞান তার মাঝে রয়।
পরম বৈরাগ্য এতে আবিষ্কৃত হয়।।
হরি বিনা নাহি গতি এ জগতে আর।
সদা ভাব হরিপদ পাইবে নিস্তার।।

এবার ভাগবত ৭/৬ দ্রষ্টব্য

দশবিধ আছে রাজা নামেতে সংস্কার।
দ্বিজ আখ্যা পায় যারা করে সে আচার।।
যজনাধ্যয়ন দান ক্রিয়াকর্ম আর।
দ্বিজের কর্তব্য সদা শুন গুণাধার।।
যট কর্ম ব্রাহ্মণের সদাই বিহিত।
অধ্যযন অধ্যাপনা যজন বিদিত।।
দান প্রতিগ্রহ আব কর্ম যে যাজন।
সর্বদা কবিবে মান্য এ সবে ব্রাহ্মণ।
প্রতিগ্রহ ছাড়া আব কর্ম সমুদয়।
অবশ্য পালিবে রাজা ক্ষত্রিয় নিচয়।।
দণ্ডের বিধান আর শুল্কের গ্রহণ।
করিবে যতেক আছে ক্ষত্রিয় রাজন।।
কৃষি বাণিজ্যাদি রাজা বৈশ্যবৃত্তি হয়।
বৈশ্যা সদা ব্রাহ্মণের অনুগত রয়।।
দ্বিজসেবা শূদ্রকর্ম জানিবে নিশ্চিত।
উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের জীবিকা বিদিত।।

নীচ কভু অন্য বৃত্তি না করে গ্রহণ।
আপদকালেতে কিন্তু নাহিক নিয়ম।।
ক্ষত্রিয় গ্রহণ কভু না করিবে দান।
ইহাই নিয়ম তার শুন মতিমান।।
ঋতাম্বত সত্যানৃত্য মৃত বা প্রমৃত।
বিপদে ধরিবে সবে যা হয় স্বহিত।।
কুকুরের বৃত্তি কভু ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।
জীবিকা নিমিত্ত নাহি করিবে গ্রহণ।।
ইন্দ্রিয় দমন ক্ষমা দয়া সরলতা।
মনের সংযম জ্ঞান বিষ্ণুর বশ্যতা।।
সন্তোষ ও সত্য হয় ব্রাহ্মণ লক্ষণ।
ধৈর্য তেজ দান ক্ষমা ও আত্মদমন।।
প্রভাব প্রসাদ সত্য জানিবে রাজন।
ইহারই হয় সদা ক্ষত্রিয় লক্ষণ।।
দেবগুরু কৃষ্ণভক্তি ত্রিবর্গ-সাধন।
আস্তিকতা নিপুণতা বৈশ্যের লক্ষণ।।
স্বামীসেবা শুদ্ধি সত্য আর নমস্কার।
গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা আর অচৌর্য আচার।।
মন্ত্রহীন যজ্ঞ এই শূদ্রের লক্ষণ।

এখানে আলোচনায় দশবিধ সংস্কার সহ সব সমাজের জন্য যে সংস্কারবিধি বলা হয়েছে বৈষ্ণবতন্ত্র মতাবলম্বীদের কোনো পর্যায় ধরতে হবে তা বোধগম্য নয়।

ধরা যাক, বৈশ্য শ্রেণীর কোনো ব্যক্তি বর্তমান দাস অধিকারী নাম লিখিতেছে, মহাবৈষ্ণব বেশ ও আচরণ দৃশ্যমান। এই ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের সংস্কার বিধি কি অন্যরূপ হবে? এখানে ভাগবতে বৈষ্ণবদের নামই দেখা যায় না। বাস্তবে সংস্কারকর্ম তো দূর-অস্ত, এঁরা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধেও কোনো উল্লিখিত সংস্কার কর্ম করেন না। অতএব হরিভক্তি মার্গীয়দের এই হল নিশ্চিত এই মত ও পথের নতুন আবিষ্কার । ভাগবত নিশ্চয়ই তাদের নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ বলা যায়। আবার বলা যায় না, হতেও পারে।

হরিভক্তিদের মুক্তির উপায় ও পূজাবিধি! ভাঃ ১১/২

বৈদিক বিধির সহ তন্ত্র বিধি আর
একত্রেতে দুই বিধি করিয়া মিলন।
সর্বদা করিবে সেই কেশবে অর্চন।।
গুরুকৃপাবশে তবে মানব নিকর।
দর্শন করিবে সেই জগৎ-ঈশ্বর।।
নিজ অভিমত—মূর্তি মনে মনে গড়ি।
অর্চনা করিবে সেই পরমাত্মা হরি।।

এখানে বক্তব্য এই যে, পরমাত্মা হরির কি কোনো রূপ হয়? হয় না। অতএব বিষ্ণু হরি নয়। বিষ্ণু কৃষ্ণ নয়। কৃষ্ণ হরি নয়, হরি ভগবান নয়।

প্রতিমা সম্মুখে দেহ করিয়া নির্মল।
প্রাণায়াম আদি করি হয়ে অচঞ্চল।।
ভূতশুদ্ধি আদি করি শরীর শোধিবে।
তদন্তর সর্বময় হরিকে পূজিবে।।
প্রতিমা আদিতে কিংবা আপন হৃদয়ে।
অর্চনা করিবে হরি মূলমন্ত্র লয়ে।।
অঙ্গ ও উপাঙ্গ আর সহ পরিবার।
পাদ্যঅর্ঘ্য দানে পূজা করিবে তাঁহার।।
ধূপ দীপ আদি আর সুগন্ধি চন্দন।
আতপ তণ্ডুল মালা নৈবেদ্য রচন।।
নিজ নিজ মূল মন্ত্র করি উচ্চারণ।
ভক্তিভাবে করিবেক তাঁহাকে পূজন।।
এইরূপ বিধিমত পূজা সমাপিয়া।
স্তবন করিবে হরি প্রণতি করিয়া।।
আপনারে কৃষ্ণময় করিয়া চিন্তন।
আনন্দে করিবে সেই হরির পূজন।।
সেই নির্মাল্য তথা মস্তকে ধরিবে।
পূজিত হৃদয়স্থানে স্থাপন করিবে।।
এইরূপে জল আদি সূর্য হুতাশন।
ঈশ্বর আত্মাকে যেই করিবে অর্চন।।
অনায়াসে মুক্ত হবে সে জন ত্বরায়।
মুক্তির বিধান আমি কহিনু তোমায়।।

চৈঃ চঃ মধ্যলীলায় আছে —"ভুক্তি মুক্তি যাবত পিশাচী বর্ততে কথন্তুদয়ো।"

হরিভক্ত যে কৃষ্ণদাস তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। কারণ দাসের কোনোদিন মুক্তি হয় না। এখানে ভক্ত আর ভগবান দুজন হয়ে আছে। যখন অনন্য ভক্তির অধিকারী হওয়া যায় তখনই মুক্তি সম্ভব হয়।

হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল কামনা আছে, যার শেষ কথা মোক্ষ।

মোক্ষ মানে কী?

মোক্ষ মানে কিন্তু বেদান্তে মুক্তি বলে না। সেখানে মোক্ষ অর্থে আত্যন্তিক সুখ বা চিরসুখ, দুঃখের কণামাত্র নেই। সকল গার্হস্থ্যের জন্য ইহাই মুক্তি বোঝা যায়। আর প্রকৃতপক্ষে মুক্তিই নেই। মুক্তির যে অর্থ বেদান্ত করেছে, তা এরূপ—

তপোলোক—দশ সহস্র দেব যুগ অবস্থান।

ভূলোক—দশ সহস্র বৎসর অবস্থানের পরে।

দেবলোক—কিছুদিন অবস্থান করে।

স্বর্গলোক—দশ সহস্র বৎসর অবস্থান।

গোলোক—এখানে উপস্থিত হতে পারলে পুনর্জন্ম হয় না। তিনি ব্রহ্মময় হয়ে গেলেন। ধর্ম করলে বা সর্বত্যাগ করলে ওখানে যাওয়া যায়। পূর্বে ত্যাগের বিষয় বলেছি।

কী ত্যাগ?

অন্তঃকরণ বাহ্যকরণের কাজকর্মই ধর্ম। এতে জানা যায় যে, চক্ষু কর্ণ নাসিকার কাজও ধর্ম। দর্শন—শ্রবণ—আঘ্রাণাদি। সেও এই ধর্ম। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। সুতরাং জাতিভেদ ধর্মভেদ মূলে কিছুই নেই। এসব মানুষই করেছে। হিংসা, রাগ, বিদ্বেষ ত্যাগ করে বিধিপূর্বক ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারলে ধর্ম হয়। বিধিপূর্বক ইন্দ্রিয় কর্মকে প্রাণায়াম বলে। সাধকের কাছে প্রাণায়ামময় জগৎ বা জগৎকে প্রাণায়াম দ্বারাই বিশেষভাবে জানতে পারা ও বোঝা যায়।

কৃষ্ণের বাঁশি কেন?

ভগবান অসীম হয়েও নির্লিপ্ত থাকেন। আত্মস্বভাবে প্রথমে শব্দ তৎপরে মন-বুদ্ধি-অহংকার-ইন্দ্রিয় ও বিষয় প্রকাশ হয়ে থাকে। তিনি যখন আত্মস্বভাবে অসীম তখন সসীমে আসার বোধ জন্মাল। এই সময়ে যে কর্মই করা হোক তাতে বন্ধন হয় না। এই অসীম হতে সসীমে আসা এবং সসীমের থেকে অসীমে যাওয়াকে কৃষ্ণের বাঁশি বলা হয়। এই বংশীর ধ্বনি যে শুনেছে সেই স্থান ত্যাগ করে যেতে পারে না। এইজন্য গোপিনীগণ বাঁশি শুনে উন্মত্ত হয়ে যেত।

গোবিন্দ কে?

গো অর্থে জীবভাব, বিন্দ অর্থে সকল। জীবভাব সকলকে যিনি জানেন তিনি গোবিন্দ। মনে সংকল্প উঠলেই জীবভাব, মন সংকল্পশূন্য হলেই গোবিন্দের অভাব সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ গোবিন্দের অভাব ঘটে থাকে।

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে, গোবিন্দকে স্মরণ করেন। ঐসব নামে নর্তন কুন্দন করে থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়—নর্তন কুন্দন নহে ধর্মের প্রকাশ। গরুড় পুরাণে সেই মতই দিয়েছে। সেখানে মনে মনে স্মরণ করার—জপ করার কথা আছে। তাহলে নাম কীর্তনএবং মহোৎসব কেন?

খণ্ডরসে রসাস্বাদন করাই ধর্ম।—চৈঃ চঃ।

গরুড় পুরাণ পূর্ব খণ্ডম ১৯-২০ শ্লোক ৫৬০ পাতায় আছে—

> ধ্যায়েন কৃতে জপন্নস্ত্রেতায়াং
> দ্বাপরেঽর্চয়ন সদাপ্নোতি
> তদাপ্নোতি কলৌ অর্থাৎ সংস্মৃত্য কেশবং।

অর্থাৎ হরিকে সত্যযুগে **ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে নামজপ দ্বারা** , দ্বাপর অর্চনা দ্বারা যুগে এবং কলিযুগে কেবল নাম স্মরণ দ্বারা আরাধনা করবে।

২০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে—

> **জিহ্বাগ্রে বর্তসে যস্য হরিরিতৎক্ষরদ্বয়ম্।**

অর্থাৎ দুটি বর্ণ মাত্র জিহ্বাদ্বারা উচ্চারণ করলেই বিষ্ণুপুরে গমন করা যায়।

কিন্তু? শাস্ত্র বলছে, অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র বা সর্বশাস্ত্রই বলছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। এইরূপ গীতায় থাকে বলছে যোগীর লক্ষণ।

মা উলঙ্গ কেন?

ঐ উলঙ্গ অবস্থায় চরণে শিব কেন? উলঙ্গ অর্থে সঙ্গশূন্য। তাঁর চরণে অর্থাৎ অন্তঃকরণে। বাহ্যকরণের কাজকর্মে শিব দেখা যায় অর্থাৎ স্বভাবজ কাজে ব্রাহ্মীস্থিতি হয়। ইহাই কালীর উলঙ্গ অবস্থা ও চরণে শিব।

এখানে চব্বিশ তত্ত্বের বা চব্বিশ অঙ্গের কোনো অঙ্গই থাকে না। ইহা রূপক মাত্র। হিন্দুদের শাস্ত্রে সন তারিখ কিছু নেই, অন্তঃকরণ বাহ্যকরণ নিয়েই শাস্ত্র। উহার আদি অন্ত মধ্য নেই। এইজন্য সনাতন চিরকাল আছে, ছিল এবং থাকবে।

অনেকে বলেন ভগবান আছেন কি?

উত্তরে বলা হয়েছে, ভগবান আছেন। আবার নাই।

ইন্দ্রিয়ান্তর না হয়ে বিধিপূর্বক কাজ করা হলে ভগবান আছেন! যখন অভ্যাস বশে ইন্দ্রিয়ান্তর হয় না, সকল কর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান একত্রীকরণে ব্রাহ্মণস্থিতি হয়ে থাকে তখন **সোঽহং অবস্থা**; ভগবান ভিন্ন আর কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলা হয়েছে তুমি কর্ম কর কিন্তু বুদ্ধি খরচ করিও না। কেন না? বুদ্ধির দ্বারা সংকল্প পরিবর্তন হয়ে নানা বিভ্রাট সৃষ্টি করে।

কেমন করে তা হয়? তিনি বললেন, তুমি মনে করলে, ও পাড়ায় মুখার্জিদের বাড়ি যাবে। বেরিয়ে পড়লে। যেতে যেতে আবার সংকল্প করলে স্কুলে যে যাওয়ার দরকার ছিল।

রাস্তায় যেতে যেতে দেখলে এক জায়গায় মাছ ধরা হচ্ছে, প্রয়োজনবোধে কিনে ফেলেছ এবং আনন্দ করে বাড়ি ফিরে এলে। তাহলে দাঁড়াল ব্যাপরাটা কি? মহাভারতের কৃষ্ণ আর গীতার কৃষ্ণ ভারতবাসীর চিত্ত্ মোহিত করেছে। এর মাঝে কোন্ তত্ত্ব লুক্কাইত আছে তা আমাদের জানতে হবে না? প্রথমে মহাভারত সম্পর্কে বলা হয়েছে—

ধর্মক্ষেত্রে-কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।

মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়।

এই শুরু হল যুদ্ধ ও তার বিবরণ। রাজা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র, তাঁব একশত পুত্র। অপব পক্ষে পাণ্ডবগণ পঞ্চজনা এবং অন্যান্য অনেক চরিত্রের সমারেশ হয়েছে। একটা নাটক করতে গেলে তো অনেক কুশীলব থাকবেই।

কিন্তু, আমরা জানি ধর্ম অধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব মাত্র। ধর্ম এখানে ন্যায্য ভাগ, অধর্ম অর্থাৎ অন্যায় বঞ্চনা মাত্র। এর মোড়ক কৃষ্ণ, ভগবানের ভূমিকায় মহাভারতের আগাগোড়াই। এই নিয়ে গীতার সূত্রপাত হল সবাই জানে।

প্রকৃত রূপক কী?

আমাদের দেহের রাজা মন, মন অন্ধ। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ১০০ শত ছেলে—কেন? আমাদের মধ্যে ৫টি কর্ম-ইন্দ্রিয় ৫টি জ্ঞান-ইন্দ্রিয়। ইহারা দশদিক সদা সতর্ক থাকে। ১০ × ১০ = ১০০ পুত্র। সঞ্জয়—দিব্যজ্ঞান, ইনি বাড়ি বসে অন্ধ রাজাকে যুদ্ধের বিবরণ শোনাচ্ছেন। দ্রোণাচার্য এবং কৃপাচার্য উভয়পক্ষের অস্ত্রগুরু! দ্রোণাচার্য—জেদ।

জেদ তো সব কাজেই থাকে বা থাকতে হয়। ভালো কাজে জেদ থাকে এবং মন্দ কাজ তাতেও জেদ থাকে। তাই দ্রোণাচার্য উভয় পক্ষের গুরু। পঞ্চপাণ্ডবদের সম্পর্কে রূপক এইরূপ—ভীম বায়ুতত্ত্ব, অর্জুন—জঠরাগ্নি ইনি সব্যসাচী বা পারঙ্গম ব্যক্তি। 'নকুল ও সহদেব = দেহের-রস-রক্ত-জলতত্ত্ব। যুধিষ্ঠির স্থিরচিত্ত, ইনি স্বর্গের অধিকারী। সাধক যখন বিষয় বৈভব ইন্দ্রিয়াদি সুখ, স্ত্রী-পুত্র সকল কিছু হতে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারেন তখন তাঁর সাধনা ফলবতী হয়ে মুক্তির অধিকারী হতে পারে। যুধিষ্ঠির একাই স্বর্গের যাওয়ার অধিকারী হয়েছেন। এই কথাটি বোঝাবার জন্য রূপকের আশ্রয় নিয়ে সুন্দর বিষয় নির্বাচন যথার্থ হয়েছে, অসাধারণ।

এখানে কৃষ্ণ কে? কৃষ্ণ কেন কালযবনের কাছে বারে বারে হেরে যাচ্ছেন? কৃষ্ণকে পালিয়ে লুকোচ্ছেন? সেইসব রূপকের অর্থ হল—

কৃষ্ণের অসংখ্য নামের মধ্যে একটি নাম হল কেশব। কে—ব্রহ্মা, অ—বিষ্ণু, ঈশ—শিব, ব—গবনার্থ বা ধাতুত্ব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অর্থাৎ রজ সত্ত্ব তম—এই তিন গুণরূপ তিন দেবতা যাঁর শাসনাধীন রয়েছেন, তিনিই কূটস্থ চৈতন্যই! কেশব—পদবাচ্য।

যিনি কেশী নামক অসুরকে বিনাশ করেছিলেন তিনিই কেশব। কংসরাজ এই দৈত্যকে কৃষ্ণের বিনাশের জন্য ব্রজধামে প্রেরণ করেন। পরে কৃষ্ণ কর্তৃক এই কেশী নিহত হয়। এই হেতু কৃষ্ণকে কেশব বা কেশীনীসূদন বলে। কংস—কম = বাঞ্ছা, কর + শ অর্থাৎ বাঞ্ছা বা কামনাই হচ্ছে কংস।

শ্রীকৃষ্ণ—শ-শব্দে আত্মা—প্রাণবায়ু, র-শব্দে বহ্নিবীজ অর্থাৎ চক্ষুঃ স্থানীয় তেজস্তত্ত্ব, ঈ অর্থাৎ শক্তি। এই শক্তি তেজঃ কর্তৃক চক্ষে বায়ুকে স্থির করতে পারলে যে অবস্থা হয় (বিনালোকনে) সেই অবস্থায় তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো, নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ
তয়োরেকঃ পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যাভিধীয়তে।

কৃষ্ণ ধাতু কর্ষণ করা, ন নির্বৃত্তি বাচক, অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস রূপে প্রাণের যে কর্ষণ ক্রিয়া হচ্ছে তাহার নিবৃত্তিবাচক স্থিরাবস্থাই স্থির প্রাণরূপ কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ এবং অর্জুন দিব্য দুটি শঙ্খ বাজাচ্ছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কূটস্থ চৈতন্য ও তেজস্তত্ত্বরূপ অর্জুন দুজন। কূটস্থ চৈতন্যের স্মরণে মায়ারূপ দৈত্যের নাশ হয।

হে মাধব = মা অর্থে লক্ষ্মী, ধব অর্থে স্বামী, অর্থাৎ আত্মা প্রকৃতিরূপা লক্ষ্মীব যিনি স্বামী—স্থির প্রাণরূপ আত্মা, তিনিই মাধব। জনার্দন=জন অর্থে অসুর, অর্দন। পীড়ন করা অর্থে কূটস্থের স্মরণে অসুব ভাবের নাশ হয় বলেই তিনি জনার্দন পদবাচ্য।

বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণি বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ। বৃষ্ণিবংশ প্রচণ্ড জ্যোতি। সেই জ্যোতি হতে উদ্ভূত কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার কৃষ্ণই বার্ষ্ণেয়। কুণ্ডলিনীশক্তি = "কুণ্ডলিনীশক্তিঃ পদং হংসমুদাহৃতম্ ইতি"। গুরুগীতা দ্রষ্টব্য। স্থিরবায়বীয় রূপে কুণ্ডলিনী, অচৈতন্যভাবে মূলাধারে রয়েছে। এই মূলাধারস্থ স্থির বায়বীয় শক্তিরূপিণী কুণ্ডলিনী চেতনময়ী করে বিষ্ণুপদে আজ্ঞাচক্রে স্থিতিরূপে অর্পণ করতে পারলেই প্রকৃত পিণ্ডদান করা হয়, ও জীবের মুক্তি হয়।

অনঘ কথার অর্থ কী? ন অর্থাৎ অন— অঘপাপ, যাতে পাপ নেই। নির্মল পবিত্র যাহাই

তাই অনঘ। শ্রীভগবান = ষড়ৈশ্বর্যবান—অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব এইসকল অবস্থার মাধ্যমে সর্বভূতের স্বামীত্বই ভগবান। আমাদের শরীরের মধ্যে ছয়গুণ আছে ; এই সত্য জানা দরকার।

১। মূলাধারে শাশ্বত পদ

২। সাধিষ্ঠানে শান্তি

৩। মণিপুরে রেতঃপূর্ণ

৪। অনাহতে স্বরূপ

৫। বিশুদ্ধার্থে তুষ্টি

৬। আজ্ঞাচক্রে জ্যোতিঃ

হৃষীকেশ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের যিনি ঈশ্বর।

অচ্যুত = অ-চ্যুত (চ্যুত বা ক্ষয়িত হওয়া) + অ ক ভ্রংশ, নিজপদ হতে যার ভ্রংশ নেই। অর্থাৎ নাশবিহীন বা ক্ষয়বিহীন যিনি। **গুড়াকেশেন** = গুড়াকা অর্থাৎ নিদ্রা, তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেন (অর্জ্জনেন)। যিনি নিদ্রাকে জয় করেন।

ধর্ম = জীবের প্রতি দয়া, যাতে জীবের রক্ষা হয় তার নাম দয়ারক্ষা, অর্থাৎ স্থিতি। প্রাণের চঞ্চল গতিকে স্থির করার নামই জীবের স্থিতি। ইহাই ধর্ম এবং স্থিতিরূপ ধর্ম না করার নামই অধর্ম।

বিশ্বেশ্বর = "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" বলে ব্রহ্মাণ্ডময়ই ব্রহ্মের রূপ ; **ইনিই বিশ্বরূপ**।

সর্বধর্ম ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো, সমুদয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমাকে আশ্রয় করো আমার শরণ লও। অর্থাৎ নানা স্থানে অনুরক্ত না হয়ে আত্মকর্মে রত হয়ে দেহের উর্ধ্ব ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্ম স্থানে মনকে অবস্থিত করো ; আমি তোমায় সর্ব পাপ হতে মুক্ত করব। কৃষ্ণ ও মহাভারত সম্পর্কে এই কথা মনে রাখতে হবে।

মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, দ্রুপদ ইত্যাদির মধ্যে যে রূপক দেখানো হয়ছে তা এইরূপ ভীষ্ম বা ভয় কর্তৃক রক্ষিত সৈন্যগণ যুদ্ধে অসমর্থ।

ভীত বা বায়ু (প্রাণবায়ু) তৎকর্তৃক বক্ষিত পঞ্চতত্ত্বের দলের সৈন্যগণ যুদ্ধে সমর্থ। সাধন সমরে প্রাণবায়ুর কার্য আরম্ভ হলে ভয় কতক্ষণ থাকতে পারে? ঐ বায়ু ক্রিয়া দ্বারা ভয় সহজেই তিরোহিত হয় ; সুতরাং ভীষ্ম কর্তৃক রক্ষিত সেনাগণ পূর্বশ্লোকোক্ত রূপ রণনিপুণ হলেও যুদ্ধে অসমর্থ। এ কারণে অপর্যাপ্ত। ভীমদ্বারা রক্ষিত সেনাগণ যুদ্ধে সমর্থ—একারণ পর্যাপ্ত।

কুরুবৃদ্ধ পিতামত ভীষ্ম অর্থাৎ কর্ম সম্বন্ধে অধিক ভয়। ইনি কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই পিতামহ ; কারণ ভয় উভয় পক্ষেরই আছে ; যদ্যপি সমরে হেরে যাই এই ভয়। দুর্যোধনের আনন্দ জন্মায়। অর্থাৎ দুর্মতি পক্ষের হর্ষ উৎপাদন করে উচ্চৈস্বরে সিংহনাদ করে শঙ্খ বাজানো। উচ্চ অর্থাৎ দেহের উপরিভাগস্থিত নাসিকা। স্বর অর্থাৎ ওয়াজ ; নাসিকার দ্বারা দীর্ঘ নিশ্বাসের আওয়াজই হল উচ্চঃস্বর। সাধনকালে সাধকের মনে ভয়ের সঞ্চার ঘটলে সাধক ভীত হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলেন ; এই দীর্ঘ নিশ্বাসই সিংহনাদ সহ শঙ্খ বাজানো।

সঞ্জয় বললেন অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি কর্তৃক মনের নিকট প্রকাশিত হল। হে ভারত! অর্থাৎ মনোরূপ ধৃতরাষ্ট্র চন্দ্রবংশীয় ভরত রাজার বংশজাত বলে এ স্থলে ধৃতরাষ্ট্রকে ভারত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মনকেও চন্দ্র বলে ; মনের উৎপত্তি প্রাণ হতে, প্রাণের চঞ্চলাবস্থাই মন ; প্রাণবায়ু চন্দ্র নাড়িরূপ ঈড়াতে রয়েছে। ঈড়ানাড়িস্থিতপ্রাণবায়ুই চন্দ্র বা সোমপদবাচ্য এবং প্রাণের চঞ্চলাবস্থা হতেই মনের উৎপত্তি ; তাই মনকে চন্দ্রবংশীয় ভরতের বংশজাত বলা হয়েছে। ভরত—ভর + তন— বিস্তার করা + ড অর্থাৎ যিনি বিস্তার করেন।

তত্রাপশ্যাৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান।........ শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োবুভয়োরপি। গীতা ১/২৬

তাৎপর্য্য হল—পিতৃব্য অর্থাৎ মনোরূপী ধৃতরাষ্ট্র প্রাণরূপী আত্মাই পিতা এবং প্রাণের অজপারূপ চঞ্চলাবস্থা হতে উৎপন্ন মনোরূপ উপাধিই পিতৃব্য। পিতামহ ভীষ্ম অর্থাৎ ভয়, আচার্য অর্থাৎ জেদ। মাতুল অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে চলিত রীতি। ভ্রাতা পুত্র পৌত্র অর্থাৎ পূর্বে যা যা বর্ণনা করা হয়েছে। সখা অর্থাৎ সংকল্পের সহিত মায়াতে অভিভূত থাকা এবং সুহৃদগণ অর্থাৎ হাস্যপরিহাসাদি কুপ্রবৃত্তির দল সমুদয়—এই সকলকে জীবভাবরূপে সাধক অবলোকন করেন।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধু ন কাস্থিতান।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নি দমব্রবীৎ।

সাধনারম্ভকালে জীবভাবের মনে উদয় হল যে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে দমন করতেই হবে। এর দ্বারা ভোগ চরিতার্থ করে আনন্দ লাভ করা যায়। আজ ইহাদের কি করেই বা দমন করব? ইত্যাদি নানা চিন্তার উদয়ে বিষাদযুক্ত হওয়ায় কূটস্থ চৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

জীবভাব ইন্দ্রিয়গণকেই স্বজন বলে জান এবং ইন্দ্রিয়গণ দেহের সম্মুখভাগেই আছে। জীব ইন্দ্রিয় দ্বারা উপস্থিত সুখ লাভ করে—তাতেই মুগ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়গণকে বন্ধু বলে জানে, সেই বন্ধুগণকে দমন করতে হবে, এই আশঙ্কায় জীবভাবের মুখ শুষ্কশরীর অবসন্ন ইহাই কৃষ্ণের কাছে অর্জুন বলছেন। অর্জুনের হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে। (শরীর রূপ গাণ্ডী) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হতে বন্ধন ঢিলা হয়েছে এবং গাত্রের চর্ম যেন দগ্ধ হতেছে। সাধনকালে সাধক এইরূপ অনুভব করে থাকেন। সাধনকালে মন নানা বিষয়ে ধাবিত হলেই শরীরের উক্তরূপ নানাভাবে অনুভূত হয়।

জীবভাবে যে ইন্দ্রিয়দিগকে স্বজন বলে জানে এবং যাদের দ্বারা এতদিন সুখভোগ করে আসছে এই সাধনরূপ সমরে দমিত করে, ভাবী আত্মরাজ্য সুখ চাইছে না। অর্থাৎ জীব পরিণামদর্শী নহে। এবং প্রকৃত সুখ যে কি, তাও সে জানে না। আপাত মোহজনক ইন্দ্রিয়সুখকেই সুখ বোধে মোহবশত মুগ্ধ হয়ে আত্মরাজ্য স্থাপিত হলে যে সুখলাভ হবে তারা আশা পরিত্যাগ করে বলছে—আমি জয় চাই না, রাজ্য চাই না সুখ চাই না।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩২-৩৫ শ্লোকে উক্ত বক্তব্য পরিষ্কার হয়েছে। ইন্দ্রিয়াদির জন্য রাজ্যসুখ-শান্তি আশা করা হয়। তাদের যদি বধ করি রাজ্য লাভের প্রয়োজন কি? আত্মীয় বন্ধু-স্বজনদের বধ করে কাদের নিয়ে সুখভোগ করব, পরিষ্কার কথা হল, ভোগী কে—

ত্যাগী না হলে (বৈরাগ্য) সাধন কর্ম হবে না, হয় না । ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের মাপকাঠি। প্রাকৃত রাজ্য ও দেহরাজ্য (সমর) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। এই রূপকের মোড়কে আছে মহাভারত কাহিনী এবং গীতা গণসাহিত্যখানি।

আবার আসা যাক গীতার প্রথম অধ্যায় ৩৮—৪১ শ্লোকগুলিতে।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভেপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদোহে চ পাতকম্।।
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন।।
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত।।
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যান্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।।

শ্লোকগুলির অর্থ বা তাৎপর্য এইরূপ—

সাধনকালে কূটস্থ সম্মুখে ব্যক্ত হচ্ছে হে জনার্দন। জনার্দন অর্থাৎ জন শব্দে অসুর অর্দ্দন পীড়ন করা, কূটস্থ স্মরণে অসুর ভাবের নাশ হয় বলে তিনিই জনার্দন পদবাচ্য।

মনের দুর্মতি প্রভৃতি পুত্রগণ লোভান্ধ হয়ে যদিও পঞ্চতত্ত্বময় শরীরের সহিত জীবকে নষ্ট করতে উদ্যত হয়ে কুলক্ষয় করতে চায় উহার দোষজনিত পাপ বুঝতে পারছে না। কিন্তু! আমি জেনেও কেন নিবৃত্ত হব না কু অর্থাৎ কু-পৃথিবী, লা অর্থাৎ ধারণ করা ড যিনি পৃথিবী ধারণ করে আছেন প্রাণরূপী ঈশ্বর, তিনিই কুল এবং সেই প্রাণ দ্বারা বংশ উৎপন্ন হয়। প্রাণের অভাবে কিছুই হয় না।

কিন্তু জীব তা জানে না। জীব পরম্পরা প্রসূত বংশকেই কুল বলে। এই কারণ ইন্দ্রিয়ের অভাবে শরীর জড় পিণ্ডবৎ হয়ে যায় ; বংশোৎপত্তি আব হবে কি করে? এই মনে করেই ইন্দ্রিয় দমনরূপ যুদ্ধকে পাপ বোধ হয়। সাধন সমর হতে অর্জুন নিবৃত্ত হতে চাইছেন তাই। এইজন্য কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখেও আমাদের এই পাপ হতে নির্বৃত্তি হবার ইচ্ছা কেন না হবে?

আত্মাই হচ্ছে প্রকৃত কুল এবং সেই আত্মধর্মই সনাতন ধর্ম; সনাতন কুলধর্ম। প্রাণাভাবে বংশ থাকে না। বংশ উৎপত্তি হয় না। এই কারণে প্রাণরূপ আত্মাই একমাত্র কুল। জীবভাবে পুত্রপৌত্রাদি বংশকে কুল বলে। ইন্দ্রিয় দমনে বংশোৎপত্তির অভাব হেতু কুলক্ষয় বলা হয়েছে। সাধন দ্বারা প্রকৃত কুলের প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট পুত্র উৎপন্ন হবার ক্ষমতা থাকে না।

এই স্বধর্মরূপ আত্মকর্ম করণে কুলক্ষয় হয় না—ইহার অ-কারণেই প্রাণের গতি চঞ্চল হওয়ার জন্য আয়ুক্ষয়ের জন্য কুলক্ষয় হয়। কুলস্ত্রীগণ যদি দুষ্টা হয়, ইহাতে বর্ণ সংকর হয়। হে কৃষ্ণ! অর্থে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার নিবৃত্তি বোঝায়। কৃষ্ ধাতু কর্ষণ করা। এই শ্বাসপ্রশ্বাস রূপ কর্ষণ বুঝতে হবে।

কুলের নরক অর্থাৎ দেহের অর্ধভাগ স্বর্গ অর্ধভাগ নরক অর্থাৎ আত্মার অধোগতি। এই অধোগতি যাওয়ার নামই কুলের নরকগমন ও কুলঘ্নের নরক।

এখানে পিণ্ড অভাব হেতু নরকগামীর কথাও আছে। স্থির বায়ুরূপিণী কুণ্ডলিনী অচৈতন্যভাবে মূলাধারে আছে; এই মূলাধারস্থ স্থির কুণ্ডলিনীকে চৈতন্যময়ী করে বিষ্ণুপদে। যে স্থান হতে অজপা রূপ হংসের উৎপত্তি অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিরূপ অর্পণ করলেই প্রকৃত পিণ্ডদান ও জীবের প্রকৃত মুক্তি ঘটে। মূলাধারস্থ স্থিরবায়ুকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করে রাখার নামই কুণ্ডলিনীর চৈতন্য অবস্থা। ইহা যিনি করেন তাঁর প্রবোধরূপ পুত্র লাভ হয়। তিনি এবং তাঁর পিতৃপুরুষগণ সেই পুত্র দ্বারা নরক হতে উদ্ধার পান। 'পিতা হ বৈ প্রাণাঃ'— প্রাণকে অধঃপতিত করার নামই পিতৃগণের পতিত হওয়া এবং পিণ্ডরূপ কুণ্ডলিনীর চৈতন্য অবস্থাই প্রবোধরূপ (প্রকৃষ্টরূপ) পুত্র কর্তৃক অর্থাৎ পুং নামক নরক হতে উদ্ধার হয়।

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে তা রাজযোগী হরিপদ পরমহংস (গীতারত্ন) মহাশয় কী বলছেন, তা একবার লক্ষ্য করুন—

ব্যাসদেব রচিত মহাভারত বাদ দিলে কৃষ্ণনামের অস্তিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। উক্ত পুস্তক হতে কৃষ্ণনাম জনসমাজে প্রচারিত হয়েছে। রামের ন্যায় কৃষ্ণ নামে কোন মনীষী ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ব্যাসের কল্পিত কৃষ্ণ নহেন। কৃষ্ণ শব্দের উল্লেখ বেদেও পাওয়া যায়।

বেদ দ্বাপর যুগে রচিত নয়। বেদে কৃষ্ণ অর্থে যিনি সকলের আকর্ষণকারী সেই ব্রহ্মকে বলা হয়েছে।

গীতা যদি দ্বাপর যুগের দেহধারী শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী হয়ে থাকে, তবে সেখানে 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ' ২/২০ গীতা অর্থাৎ ভগবান জন্মেনও না বা মরেনও না।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ২/২০ গীতা অর্থাৎ তিনি জন্মরহিত, সর্বদা একরূপ চিরকাল অবস্থিত এবং তিনি সকলের আদি।

উপরিউক্ত গীতার বাণীগুলি হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে দ্বাপর যুগের কৃষ্ণ আর গীতার কৃষ্ণ এক নহেন। গীতার কৃষ্ণ ব্যাসের মনোকল্পিত। তিনি বেদের ব্রহ্মাকেই কৃষ্ণরূপে অঙ্কিত করেছেন।

তাছাড়া গীতায় আছে, মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত কয়েকটি শ্লোক মাত্র। যে মহাভাবত ব্যাসদেব প্রণয়ন করেছেন, একটি অংশ কি অন্য অপর কেউ রচনা করেছেন? তা হয় না। গীতা যদি অপর কারও রচিত হত তবে তার নাম থাকত। ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করে তাতে বাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়ার প্রয়াসে উপনিষদসমূহ হতে জ্ঞান ও কর্মমূলক শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছেন। অনেক স্থলে উপনিষদের ভাবসমূহ সংযোজিত করেছেন। যেহেতু উপনিষদসমূহ সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রণীত, সুতরাং উহা অভ্রান্ত। উপনিষদকে যেমন আমরা ভগবানের বাণী মনে করি, গীতাও সেইরূপ ভগবানের বাণী মনে করা হয়। ভগবান ব্যাসদেব গীতাগ্রন্থ প্রণয়ন করে জনসমাজে প্রচার করেছিলেন।

'সর্বোপনিষদগাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।'

উপনিষদ হল গাভীস্বরূপ। গোপাল শব্দটির অর্থ হল—গো পৃথিবী অর্থাৎ পাল অর্থে যিনি পালন করেন অর্থাৎ যিনি পৃথিবীকে তথা সকল বীরকে পালন করেন তিনিই গোপাল। তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তান বেদব্যাস উপনিষদ হতে সেই দুগ্ধ দোহন করেছিলেন।

বেদরচিত হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছর পূর্বে। সেই ইতিহাস কেউ স্মরণ করতে পারে কি? কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল ১২ লক্ষ বছর পূর্বে। কলিযুগ ৪ লক্ষ বছর এবং দ্বাপর ৮ লক্ষ বছর অর্থাৎ ১২ লক্ষ বছর আগের ঘটনা ; তখন কৃষ্ণ ছিল কি না, অথবা থাকলেও তাঁর কী রূপ ছিল কল্পনা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

মহাভারত, ভাগবত ব্যাসদেবের রচনা বলে অনেকে বেশ জোর দিয়েই বলেন ; এখন বুঝুন—সত্যযুগে বেদ রচনা হয়েছে। সেই যুগে ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করেছেন, তাহলে—সেই ব্যাসদেব দ্বাপরে এসে ঐসব রচনা করতে পারেন কেমন করে? এও এক প্রকার মহিমা! সেই মহিমার মোহে সবই ভেসে গেল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, পুরাণগুলি সর্বত্রই শোনাচ্ছেন সূত মুনি। কোথাও ব্যাসের নাম নেই। যদিও কোথাও থাকে তবে সে ব্যাসদেব হলেন ইতিহাসের গুপ্তযুগের কোনো ব্যাস হবেন।

কারণ ঐ যুগের সময় ষষ্ঠ শতাব্দীর সময়ে সমস্ত পুরাণগুলি লিখিত হয়েছে। কারও কারও মতে ভাগবত রচনা হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাসদ **বোপদেব গোস্বামী** দ্বারা রচিত। গ্রন্থখানি জনসমাজে চালু করবার জন্য, বৈভব বাড়াবার জন্য ব্যাসদেব রচিত পুরাণের মধ্যে শামিল করে বা ব্যাসদেব নাম দিয়ে চালিয়েছেন।

মহাভারতে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই শুকদেব গোস্বামীর মহাপ্রয়াণ হয়েছে। অতএব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রায় ৫০ বছর পর শুকদেব কর্তৃত মহারাজকে (পরীক্ষিৎ) ভাগবত শ্রবণ করানো বড়ো অসামঞ্জস্য হয় না কি?

বৈদিক যুগের বহু ঋষিদের নাম যেমন—পুলহন্, পুলস্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরশুরাম, পরাশর, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, দেবল, গৌতম, নারদ, বেদব্যাস প্রভৃতি দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনের ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং ঐ ভাগবত গ্রন্থখানি জনসমাজে প্রচার করার ছলনা ছাড়া আর কি?

পুরাণগুলিতে দেখা যায় দুটি ভাগ বর্তমান ছিল একটিতে ব্রহ্মের শুদ্ধাশুদ্ধ মিলিত ভাব। অপরটিতে শুধু মনের শুদ্ধ ভাবকে, ভগবান সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রকারগণ ঐ প্রথমটি গ্রহণ করে উহা অবলম্বনে বহু তন্ত্র রচনা করেন। তন্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী যাঁরা ছিলেন তাঁরা তান্ত্রিক। মনেব শুদ্ধতার বা ভগদ্ভাব অবলম্বনে যেসব পুরাণ লিখিত হয়েছে তাদেরকে বৈষ্ণব পুরাণ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। **অখণ্ড প্রাণ বা আত্মা যা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে তারই নাম বিষ্ণু। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এক নয়।**

ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতি, লয়ের মধ্যে মাত্র বিষ্ণু স্থিতি বা পালনের মালিক। বিষ্ণু ব্রহ্মের তিনটি ভরের মধ্যে একটি ভরের দ্যোতক। সুতরাং বিষ্ণু ব্রহ্মের আংশিক প্রকাশ। বিষ্ণু ব্রহ্মা নন। বিষ্ণুকে যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা বৈষ্ণব, কৃষ্ণের উপাসকদের বৈষ্ণব বলা যায় না। বিষ্ণুকে নারায়ণ ভাবাও যায় না। বিষ্ণু সত্যযুগের দেবতা, নারায়ণও তাই। বলা বাহুল্য, নারায়ণ একটি অংশ মাত্র। বিষ্ণুরই যদি বলি, তবে তা ভোগবাদী হেতুমলিন। এঁদের পূজা করা যায় না।

বিষ্ণুর কোনো পিতামাতা নেই। **কিন্তু কৃষ্ণের পিতা-মাতা আছে সেই হেতু তিনি জীব, তিনি ভগবান নহেন।**

কৃষ্ণ উপাসকগণ তাঁদের ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণে লজ্জাবোধ করেন, তাই কৃষ্ণের নামে পরিচিত হননি—তাঁরা অন্য পিতার নামে পরিচিত এই কথা শাস্ত্র বলছে। ভাগবতের উপাখ্যান কিছু শোনা যাক—

কংসের কারাগারে বসুদেব শৃঙ্খলিত, দেবকীও তাই। তদবস্থায় তাদের বুকের উপর ৮ মণ পাথর চাপা দেওয়া ছিল। এমতাবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের অর্থাৎ রমণক্রিয়া হতে পারে কি? ভাগবতে বলা হয়েছে, শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় তাঁদের ছয়টি পুত্র জন্মে এবং পর পর কংসের হস্তে তুলে দিতে বাধ্য হন। এবং ছটি শিশুপুত্রই কংস কর্তৃক নিহত হয়। সপ্তম গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। কিন্তু ভাগবত বলে যে, ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই দেবকীর গর্ভ মথুরা হতে বসুদেবের অপরা স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে ব্রজের অন্তর্গত নন্দ গোকুলে, যোগমায়া কর্তৃক নীত হয়েন। এইভাবে রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হল এবং কংসের কারাগারে দেবকীর গর্ভবিস্রস্ত অর্থাৎ নষ্ট হয়েছে ঘোষণা করা হয়। ঘটনাটি এবার বিশ্লেষণ করা যাক—

সাধারণ অজ্ঞানী লোক ভগবানের নাম শুনলেই যে-কোনো অযৌক্তিক কথা হলেও তা বিনা বিচারে বিশ্বাস করে নেয়। ইহা তাদের মানসিক দুর্বলতা ছাড়া আর কি? যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠ মুনি স্পষ্টই বলেছেন, যুক্তিযুক্ত বাক্য হলে তা বালকের নিকট হতেও গ্রহণ করা উচিত কিন্তু ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত হলেও অযৌক্তিক বাক্য তৃণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা উচিত।

(যোগবাশিষ্ঠ মুমুক্ষু প্রকরণ ১৮ সর্গ।)

কাজেই মথুরাতে শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় দেবকীর গর্ভ ব্রজধামে রোহিণীর গর্ভে চালনা করে নেওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ বলেই মনে হয়। কারণ দেবকীর গর্ভ হতে একটি স্থূল অবয়ব বিশিষ্ট বলরামকে অপর লোকের গর্ভকোষে আরোপিত করা সম্ভব হয় কেমন করে? সেই শিশু কোন্ রাস্তা দিয়া প্রেরিত হল? আর, দুরাশয় কংসকে নিধন করাই যদি ভগবানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, তবে সাক্ষাৎ ভগবানের ইঙ্গিত মাত্র যে-কোনো প্রকারেই তো দুরাচার কংসের মৃত্যু ঘটানো যেত। সাধারণ একটি ক্ষত বিষাক্ত হয়ে তো মানুষ মারা যায়। তার জন্য কেন ভগবানের এত সাজ সাজ রব করতে হবে? ভাগবত রচয়িতা বোপদেব গোস্বামী মানুষ কৃষ্ণকে ভগবানরূপে প্রচার করবার জন্য এত শত মিথ্যার আশ্রয় নেন। বসুদেব ও দেবকীকেও ধন্যবাদ জানাই যে, ৮ মণ ওজনের পাথর চাপ ধারণ করেও ঐ শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় থেকে তাঁদের বংশবৃদ্ধির ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয়নি।

এই রূপকেরও ভাবার্থ আছে। জীবের মধ্যে যে শুদ্ধভাব আছে যাকে চৈতন্য সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয় মহামতি ব্যাসদেব মহাভারতে তাকেই কৃষ্ণ বলে অঙ্কিত করেছেন। এই চৈতন্যের চেতনায় প্রাণবান হয়ে ব্রহ্মা হতে কীটাণু পর্যন্ত সকলেই জীবিত রয়েছে। কোনো কোন শাস্ত্রকার এই শুদ্ধ জীবচৈতন্যকেই ঈশ্বর বলেছেন। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বরের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইরূপ—

"ক্লেশকর্মবিপাকাশায়ৈঃ অপরামিষ্ট পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর"।

অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক, ও আশয় যাকে সংস্কারে লিপ্ত করতে পারে না ; এইরূপ পুরুষকেই ঈশ্বর বলে অভিহিত করা হয়। স্থূল কথা হল যিনি জাগতিক সুখ-দুঃখে আসক্ত

হননি, এইরূপ শুদ্ধ মনবিশিষ্ট পুরুষই ঈশ্বর। এই ঈশ্বরকে জানবার জন্য তত্ত্ববিদ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

গুরু এসে নিজের জ্ঞানশক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চালন করলেই জীব অজ্ঞানতার অপগমে স্বীয় অন্তরে আসীন ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারেন। গুরু পথ প্রদর্শন না করলে ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে আসীন থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁকে জানতে পারেন না। গুরুর যে শুদ্ধ জ্ঞানশক্তি তার ভিতর হতে বার হয়ে শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত—সঞ্চালিত হয় তাই, তারই নাম বলরাম। এই গুরুশক্তি সঞ্চালনকেই গ্রন্থকার দেবকীর গর্ভ হতে বলরামকে রোহিণীর গর্ভে নীত রূপে দেখিয়েছেন এবং বলরাম অগ্রে জন্মালেন। ইনি গুরুস্বরূপ তাই বুঝতে হবে, অন্য কিছুই নয়?

বলরামের হস্তে লাঙল কেন ব্যবহৃত হত? লাঙল দ্বারা যেমন জমি কর্ষিত হলে সেখানে শস্য জন্মায়, সেইরূপ গুরুশক্তিরূপ লাঙলের দ্বারা মানবজমিন চাষ হলে তাতে চৈতন্যরূপ অমর ফল জন্মায়। প্রকৃতপক্ষে বলরাম নামে কোনো লোক ছিলেন না। গুরুশক্তিকেই ব্যাসদেব বলরামরূপে সজ্জিত করেছেন। বলরাম কোনো লোকের নাম হলে তাকে একের গর্ভ হইতে অপরের গর্ভে নিয়ে যাওয়া কখনই সম্ভব হত না।

আর একটি মতবাদ বলরাম সম্পর্কে আছে। পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় জীবন্তরূপে কোনো কিছু ছিল না। তখন পৃথিবী জলে জলাকার। সেই সময় প্রথমে মীন (মৎস্য) অবতারের সৃষ্টি হয়। কেননা জল থাকলে সেখানে মৎস্য জন্মাবার পক্ষে কোনো বাধা হয় না। মাছের খাবি খাওয়া থেকে শেওলার জন্ম হয়, সেই শেওলা একত্র হয়ে জন্ম হয় দ্বীপ ; তা থেকে সৃষ্ট মাছি, কচ্ছপের ডিম পাড়তে কোনো অসুবিধা থাকে না। তৃতীয় অবতার বরাহ (শূকর) কেননা মাটি পড়ে থাকলে সেখানে লতাপাতা কচুগাছ প্রভৃতি জন্মায়। চতুর্থ অবতার নৃসিংহ এই অবতারে অর্ধেক পশুর অপরার্ধ মানুষের মতো। পশু হতে মানুষ হওয়ার এই সূত্রপাত বোঝানোর জন্য।

পঞ্চম অবতার বামন ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ। ষষ্ঠ অবতার জামদগ্নি। জামদগ্নি হতেই প্রথমে গৃহ নির্মাণ করে বসবাসের পরিকল্পনা আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বের মানুষ গাছের বা উপব গাছেব নীচে কুটির বাঁধতে তখনও অভ্যস্ত নয়, গাছের তলায় বাস করত।

ক্রমে ক্রমে মানুষ বৃদ্ধি পায়, চাষবাস কবার প্রয়োজন হযে পড়ে। সপ্তম অবতার বলরামই চাষের উদ্ভাবন কর্তা ছিলেন। তাই তাঁর লাঙল অস্ত্র রোহিণীর সপ্তম গর্ভে তাই বলরাম জন্ম নিলেন এবং বলরামের জন্মের মধ্যে কি তত্ত্ব আছে তাও জানালাম। মহামুনি ব্যাসদেব মহাভারত লিখেছেন—শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-দেবকী কংসের কারাগারে শৃঙ্খলিত পাষাণ চাপানো অবস্থায় দেখাইয়াছেন। বাসুদেব অর্থ যে শুদ্ধচিত্ত তাও জানিয়েছেন, ভগবান জন্মেনও না, মরেন ও না, গীতার ১০/২০ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এখানে দুটি বিশ্লেষণ দেখার, প্রথমত বাসুদেব—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণান্বিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অতীত। এখানে বাসুদেব কৃষ্ণ স্বয়ং ৮টি বিবাহ করেছেন।

অতএব বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের অভিসারকে বোঝাতে চাহেন যে, দৈহিক প্রণয় সে নয়। তাঁরা সবই বোঝেন। তবু ভান করেন কেন? বাসুদেব যে অমর!

কৃষ্ণের দেহ রাখার ঘটনা কী ব্যাখ্যা হবে? অবতার? লীলা? জীব যখন অশুভ করে যে সে মহামায়ার কারাগারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তখনই তাহার মুক্তির ইচ্ছা বলবতী হয়ে ওঠে।

বন্ধন ও মুক্তি জীবের হৃদয়ে দুই অবস্থাই থাকে। উপযুক্ত গুরু করলে এই অবস্থার মুক্তি ঘটে, জাগরণ হয়। মনে রাখতে হবে, ব্রহ্মবিদ গুরু চাই। গুরুগিরি করা কোনো সংসারীর পক্ষে অসম্ভব! সব ত্যাগী মুক্ত শুদ্ধ যিনি সেই গুরু চাই। উপযুক্ত শিষ্য হলে গুরু তাকে খুঁজে আসেন, এইটি মহিমা। পথপ্রদর্শক না ইলে জীব কিছুই জানতে পারে না। অবশেষে ব্রহ্মবিৎ গুরু এসে যখন তাকে বুঝিয়ে দেন যে, ভগবান বাইরে নেই—তিনি অন্তর্যামী, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন, যখন গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী ভক্ত সাধন-ভজন করে তখন নিজের ভিতরেই তাঁকে প্রত্যক্ষ আসীন দেখে শান্তি ও আনন্দ লাভ করতে পারে।

পুত্র যেমন মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে তেমনি ভগবান (শুদ্ধ চৈতন্য ও সাধক হৃদয়ে পর্ব হতে থাকলেও) জীব কর্মবশে তাঁকে বিস্মৃত হয়ে যায়। জীবের মধ্যে অজ্ঞানতার মলিনতার জন্য শুদ্ধচৈতন্য আবৃত থাকেন। তপস্যা দ্বারা পুনরায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মবিদ গুরুলাভ হলেই তিনি নিজের তপস্যাসম্ভূত শক্তি দিয়ে সঞ্চালিত করেন এবং সেই শক্তি প্রভাবেই শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন শিষ্য নিজ হৃদয়ে ভগবানকে দর্শন করেন।

গুরুর শক্তি সঞ্চালন হলে, ভগবান দর্শন লাভ হয়। তাই বলরামকে কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভাই করা হয়েছে। তাঁর জন্ম বলরামের জন্ম গুরুর শক্তি সঞ্চালনের উদাহরণ। এই তত্ত্ব বোঝাবার জন্যই উক্ত কাহিনীর অবতারণা। ভুলে গেলে চলবে না, আত্মা বা ভগবান নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেহধারী কল্পনা করলে ভগবৎ বাণী মিথ্যা হয়ে পড়ে, কারণ ভগবানকে অস্ত্রছেদন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না।

মহাভারতে জরা ব্যাধের বাণে শ্রীকৃষ্ণ হত হওয়ার পর অর্জুন তাঁর মৃত দেহ চিতার আগুনে ভস্মসাৎ করেছেন। তাহলে দেখা যায় যে কৃষ্ণের মধ্যে যে, আত্মা আছে তাকে ভগবান বলে উপাসনা করা হয়েছে। সেখানে তাঁর বিবাহ করা, বা রাধার সাথে কোনোরূপ লীলা করা, অর্জুনের সখা হিসাবে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া, গীতায় বাণী প্রচার করা আদৌ কৃষ্ণের কাজ হতে পারে না। সেইজন্যই রূপক বলা হয়েছে।

কালযবনের বধ ঘটনাটি সম্পর্কে বলতে গেলে আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। কংসের দুই স্ত্রী অস্তি ও প্রাপ্তি পিতৃগৃহে গমন করে মগধরাজ জরাসন্ধের নিকট তাদের বৈধব্যের কারণ বর্ণনা করে। জরাসন্ধ তখন অত্যন্ত কুপিত হয়ে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা সহ মথুরা নগরী অবরোধ করেন। জরাসন্ধের সহিত, রাম ও কৃষ্ণের তুমুল যুদ্ধ হল, বহু সৈন্য হতাহত হওয়ার পর হতসৈন্য ও রথহীন জরাসন্ধকে বলপূর্বক গ্রহণ করে বলরাম সংহার করতে উদ্যত হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বাধা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিত হয়ে মগধরাজ মগধে ফিরে গেলেন। কিন্তু তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত পুনরায় মথুরা নগরী আক্রমণ করেন। 'জরাসন্ধ এইভাবে ১৭ বার মথুরা নগরী আক্রমণ করেছিলেন। এর পরে নারদ কর্তৃক কালযবন প্রেরিত হয়েন। তিনি ৩ কোটি ম্লেচ্ছ সৈন্যসহ মথুরা অবরোধ করেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে রক্ষা করার জন্য বিচলিত হয়ে পড়েন এবং মনুষ্যের অগম্য সমুদ্র মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এক দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে জ্ঞাতিদিগকে রেখে এসে, পরে কালযবনকে সংহার করেছিলেন।

কালযবনকে কেমন করে সংহার করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ পুরী হতে নিরস্ত্র হয়ে পদব্রজে বেড়াচ্ছেন। দেবর্ষি নারদ ভগবানের যেসব লক্ষণ বলেছিলেন, তাতে ইনিই যে সেই বাসুদেব ইহা অবধারণ করে কালযবন হরির পশ্চাৎ নিরায়ুধ হয়ে ধাবমান হল। কিন্তু কোনোক্রমেই তাকে ধরতে পারল না।

শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে পশ্চাতে দেখে একটি গিরিখাত বা গহ্বরে প্রবেশ করলেন। যবনও গহ্বরতে প্রবেশ করে ইতস্তত অন্বেষণ করবার সময় সেখানে একটি মানুষকে শয়ান দেখতে পায়। তাকেই শ্রীকৃষ্ণ মনে করে প্রবল পদাঘাত করল। পদপ্রহারে শায়িত মানুষটি নিদ্রাভঙ্গ হতে দৃষ্টিপাত করা মাত্র তাঁর দেহজ বহ্নি দ্বারা কালযবন মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে গেল। নিদ্রারত এই মানুষটি ছিলেন মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ। ইনি পূর্বে অসুর নিধনের জন্য দেবগণের পক্ষে যুদ্ধ করে দেবতাদের নিকট হতে বর লাভ করেছিলেন যে, যে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ করাবে সেই ভস্ম হয়ে যাবে।

এদিকে বলরাম এবং কৃষ্ণ জরাসন্ধের আক্রমণে ভীত হয়ে পলায়ন পূর্বক প্রবর্ষণ পর্বতে গিয়ে লুকিয়ে থাকেন। জরাসন্ধ ইহা দেখেছিলেন এবং গহ্বর হতে বার হচ্ছে না দেখে প্রচুর কাষ্ঠাদি জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিলেন, সেই গিরি দগ্ধ করলেন। চতুর্দিকে অগ্নি নিরীক্ষণ করে রাম ও কৃষ্ণ একাদশ যোজন উচ্চ হতে ভূতলে পতিত হলেন এবং অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকায় হাজির হলেন।

এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। মনুষ্য অগম্য স্থানে দুর্গ বলরাম ও কৃষ্ণ নির্মাণ করলেন কী করে এবং যাদবগণ সেখানে গেলেন কী করে? যাদবগণ সবাই কি ভগবান ছিলেন? আর কৃষ্ণ যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত দুর্গ নির্মাণ করলেন, তা নির্মাণ করবার মালমশলা মানুষ ব্যতীত কে বা কারা নিয়ে গিয়েছিল? সেই সময় কালযবনের সৈন্য সামন্তগণ কি ঘুমিয়েছিলেন যে তাঁরা কিছুই জানতে পারল না?

শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার সাহায্যে ঐ দুর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন বলে কাহিনীতে প্রকাশ। যোগমায়া প্রভাবে যখন এত কিছু সম্ভব হয়ে থাকে তবে কালযবন বা তার সৈন্যদের নিধনের জন্য কোনো উপায় কেন যোগমায়া করলেন না? একটু ফুসকুড়ির ক্ষতের কারণে মানুষের মৃত্যু হতে পারে অথচ যিনি ভগবান, যাঁর ইচ্ছায় নিমেষের মধ্যেই পৃথিবীতে প্রলয় হয়ে যায়, তাঁর পক্ষে কি কালযবনের নিধন এতই কঠিন ব্যাপার ছিল?

যে কৃষ্ণ ৭ দিন ও ৭ রাত গোবর্ধন ধারণ করে রেখেছিলেন কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা ; সেই কৃষ্ণের সেই শক্তি গেল কোথায়? তিনি কি নিজ শক্তি দ্বারা সমুদ্রের মাঝে পুরী নির্মাণ করতে পারলেন না যোগমায়ারই প্রয়োজন হল?

যোগমায়া কাকে বলে? ভগবানের মায়াকে কি যোগমায়া বলে না? যে মায়ার দ্বারা পৃথিবী মোহিত হয়ে আছে তার নাম কি যোগমায়া নয়? হ্যাঁ! মায়া কখনও সত্য হতে পারে না। যে বস্তুর অস্তিত্ব না থেকেও অস্তিত্ববান বোঝায় তারই নাম তো মায়া যেমন—রজ্জুতে

সর্পভ্রম। মায়া কখনও সারবস্তু হতে পারে না। অতএব প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ কোনো দুর্গ নির্মাণ করেন নি। কৃষ্ণ ভগবান বলে যদি সত্যসত্যই দুর্গ নির্মাণ করে থাকেন তবে আর যোগমায়ার আশ্রয়ের কী প্রয়োজন? কৃষ্ণ আর যোগমায়া পৃথক করা যায় না। কৃষ্ণ স্বয়ং যোগমায়ারই অধীশ্বর যদি হন তবে তো তিনি যে-কোনো সময়েই যোগমায়ার প্রভাব প্রয়োগ করতে পারতেন। কিন্তু কৃষ্ণ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে প্রবর্ষণ পর্বতে আশ্রয় নিলেন কেন? তিনি যদি সর্বশক্তিমান হতেন তবে সামান্য জরাসন্ধকে পরাজিত করা কি তাঁর পক্ষে এতই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল? বিশেষত শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বংশে উদ্ভূত। সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করে হত হওয়াই ক্ষত্রিয় ধর্ম ; এই কৃষ্ণ কি অর্জুনকে বলেছিলেন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই করাই একমাত্র ধর্ম? ২/৩১ গীতা দ্রষ্টব্য।

"স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাশ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।

যিনি অর্জুনকে সম্মুখ সমরে মৃত্যুবরণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনিই আবার কার্যকালে ভয়ে ভীত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করলেন কেন! ইহাই কি ভগবানের শক্তির প্রমাণ?

ভাবার্থ হল যে, কংসের দুই স্ত্রী ছিল—আস্তি ও প্রাপ্তি—কংসরূপ-অজ্ঞানতার দ্বারা মোহিত থেকে মানব নশ্বর সুখভোগসমূহকে সত্য মনে করে বিষয়গুলি প্রকৃতপক্ষে সুখকর না হলেও মোহবশত পরম সুখকর বলে অনুভব হয়। ইহারই নাম অস্তি। যাতে সুখ নেই, তাকে সুখকর হল অস্তি বলে। অস্তিবোধ হওয়ার দরুন মানব উহাদের প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু অজ্ঞানতার দ্বারা যে সুখরূপ অস্তি ও প্রাপ্তি মানবের নিকট রমণীয় বলে অনুমিত হয়, অজ্ঞানতার অপগমে তারা সৌন্দর্যবিহীন হয়ে স্বামীহীন হয়ে পড়ে। ইনি সাধককে পরিত্যাগ করে পিতৃগৃহে গমন করেছেন। ইহাদের পিতা জরাসন্ধ। চিৎ ও জড়ের সন্ধির নাম জরাসন্ধ। চিৎ ও জড়ের মিলনের দ্বারা যে বিষয় সৃষ্টি হয়, প্রাপ্তির অজ্ঞানতার প্রভাবে তার উপর সুখবোধ অর্থাৎ অস্তি ও তা প্রাপ্তির ইচ্ছা বলবতী হলে সেই ইচ্ছার নামই প্রাপ্তি।

এরা সকলকে ত্যাগ করলেই যে তার মূল অজ্ঞানতা নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি সমূলে নষ্ট হয়ে যায় তা নয়। দেহাত্মবুদ্ধি পুনঃপুন সাধককে উঁকি মারতে থাকে। ইহাই জরাসন্ধ কর্তৃক কৃষ্ণকে বার বার আক্রমণ বলা হয়েছে। মানবগণ বরং অস্তি ও প্রাপ্তিকে ছেড়ে থাকতে পারেন, কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করা সাধকের পক্ষে অতীব কষ্টকর। তাই কৃষ্ণ পুনঃপুন জরাসন্ধের আক্রমণে বিব্রত হচ্ছেন। এর পর সাধক কালযবনের ন্যায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। কালযবন অর্থ যে অখণ্ডকাল জীবত্বের দ্বারা যে খণ্ড খণ্ড বলে বোধ হয়। বিষয়ের আসক্তি কমে গেলেও কালের খণ্ডত্বকে ছেড়ে কালের উর্ধ্বে অবস্থান করা বড়োই শক্ত। খণ্ড কাল যেন সাধককে অবরোধ করে রাখে। ইহাও মলিন অজ্ঞানতারই অন্যতম বিকাশ। মলিন বলে কালকে কালযবন বলা হয়েছে। ইহাই কালযবন কর্তৃক মথুরা অবরোধ।

আত্মাবস্থার স্থিতি না হলে কেউই এই অবরোধ হতে মুক্ত হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে গীতার বাণীতে বলা হয়েছে

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্য কর্মণাম্।। ১৮/৭১

অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াবিহীন (দোষদর্শিতাশূন্য) হয়ে যিনি শ্রবণ করেন—তত্ত্বসংবাদ ; তিনি পবিত্র লোকসকল প্রাপ্ত হন।

স্বামী রামসুখদাস বলেছেন—

নিজের অসহায়তার অনুভূতি এবং ভগবানের মহান প্রভাবের প্রতি বিশ্বাস হলে মানুষ ভক্ত হতে পারে। ভগবান সর্বজ্ঞ, পরম সুহৃদ এবং সর্বশক্তিমান। নিজের মধ্যে কিছু ক্ষমতা যোগ্যতা বিশেষত্ব দেখে অসহায়তার জন্য দুঃখিত হয়ে তা দূর করবার প্রযোজন অনুভূত যদি হয় এবং ভগবানের প্রভাবের উপর বিশ্বাস হয় তিনি ভক্ত হতে পারেন।

ভগবান সংসারকে ভক্তের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর সুখের জন্য ভক্তকে নিজেব জন্য সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের সুখের জন্য ভক্তের অস্তিত্ব। বাস্তব সুখের ভোক্তা ভগবান, জীব নন। যেমন শিশু মায়ের জন্য। তেমনি ভক্তও ভগবানের জন্য।

ভক্তিতে সৎ-এর সাথে অসৎও এসে যায়। সংসারে ভোগ করবার সময় অসৎ-এর সঙ্গে সৎও এসে যায়। অর্থাৎ ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ তিনটিই অসৎ হয়ে যায়। সুতরাং, ভগবানের প্রতি ভক্তি—ভক্তের অনন্য ভাব থাকতে হবে। ভক্তি প্রধানত ভগবৎ প্রেমী, মহাপুরুষদের কৃপায় অথবা ভগবৎ কৃপায় হতে পারে।

সকাম ভাব হল ভক্তি, নিষ্কাম থাকলে ভক্তিযোগ হয়। কেবল কর্মে, কেবল জ্ঞান দ্বারা কোনো লাভ হয় না। কেবল ভক্তি হতে লাভ হয়। কেননা ভক্তিতে ভগবানের সম্বন্ধ থাকে, এইজন্য ভগবান সকাম বিশিষ্ট। আর্ত এবং অর্থার্থী ভক্তদের উদার বলা হয়। 'উদারাঃ সর্ব এবৈতে।'—গীতা ৭/২৮।

১৮৬ রামচরিত মানস দ্রষ্টব্য।

গরুড় পুরাণ পূর্ব খণ্ডতে সেই ভক্তের উদ্দেশে বলা হয়েছে, ১৯ এবং ২০ শ্লোক দুটি দেখনু—

'ধ্যায়েন কৃতে জপন্নস্ত্রেতায়াৎ দ্বাপরেঽর্চয়ন
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংস্মৃত্য কেশবং।'

বাংলা অর্থ হল—হরিকে সত্যযুগে ধ্যান দ্বারা
ত্রেতাযুগে নামজপ দ্বারা
দ্বাপর যুগে অর্চনা দ্বারা
কলিযুগে কেবল নাম স্মরণ দ্বারা
আরাধনা করবে।

এখানে কিন্তু নামসংকীর্তনের কোনো পরিচয় নেই।

পরবর্তী শ্লোকটি হল—

জিহ্বাগ্রে বর্তসে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্
সংসার সাগরং তীর্ত্বা সা গচ্ছেদ্বৈষ্ণবংপদম্।

বাংলা অর্থ হল যিনি হরি এই দুটি বর্ণ জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করেন তিনি সংসার সাগর হতে উত্তীর্ণ হয়ে বিষ্ণুপুরে গমন করে থাকেন।

মুক্তির নিমিত্ত সকল শাস্ত্রে স্বীকৃত পথ একই। তার জন্য নিম্নযোগ প্রণালীগুলি হল যথাক্রমে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। এই অষ্টাঙ্গ যোগ প্রণালী মুক্তির নিমিত্ত অনুস্মৃত হওয়া চাই।

চৈতন্য চরিতামৃতম্ বলেছে—

বহিরঙ্গ নিয়া করে নর্তন কুর্দন
অন্তরঙ্গ দিয়া করে রসাস্বাদন।

এখানে অন্তরঙ্গ সাধন বলতে যে নামকীর্তন নয় তা সহজেই পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের শিষ্য সনাতন যখন বললেন—'প্রভুঃ' আমি তো আপনার নির্দেশিত উপায়েই হরিনাম করছি, কিন্তু আমার অজ্ঞানতা তো বিদূরিত হচ্ছে না"?

চৈতন্যদেব বললেন, "সনাতন! তুমি যে মায়ার ফেরে পড়েছ"। আত্মজ্ঞান ব্যতীত মায়ার হস্ত হতে কেহই পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। সেই হেতু তিনি অন্তরঙ্গদের নিয়ে আত্মজ্ঞানের দ্বারা ভগবৎ রস আস্বাদন করতেন, ইহাই সিদ্ধান্ত। হরিনামের দ্বারা যে জীব মুক্ত হতে পারে, তা কীরূপে স্বীকৃত হয়।

এখানে ধর্ম, রহস্য—রাজযোগীর ঘোষণা হচ্ছে এই রকম—

মহাপ্রভুর যিনি গুরু ছিলেন, সেইসব শংকরপন্থী (আচার্য শংকর) তাঁরা কেউ নাম-কীর্তনের প্রচলন করেননি। সুতরাং তিনি গুরুগণের অনুসরণ না করে সুযোগ্য শিষ্য হয়েও ভিন্নপথ গ্রহণ করেছিলেন, তার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে তিনি (গৌরাঙ্গদেব) নামকীর্তন প্রচলন করেননি। নাম প্রচারের মালিক নিতাই। দেশে নামকীর্তন প্রচার করবার জন্য বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর দেহত্যাগের পর তাঁকে সামনে রেখে তাঁর মুখ দিয়ে হরিনাম প্রচার করেছেন। **প্রকৃতপক্ষে হরিনামের প্রবর্তক স্মৃতিকার রঘুনন্দন শিরোমণি**। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে কোনো ভুল নেই। অতএব হরিনাম প্রচার করেছেন। রঘুনন্দন শিরোমণি। গৌরাঙ্গ বা নিত্যানন্দসহ কেউই নয়।

চৈতন্য মধ্যলীলা ১৯/৩৪৮ দ্রষ্টব্য।
"আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।"

এই পদটির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করুন।

স্বর্গাদি সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা কৃষ্ণভক্তগণ করবে না। তারা জ্ঞানী ও কর্মীর সঙ্গ করবে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা শুধু কৃষ্ণেরই পূজা করবে এবং তার লীলা শ্রবণ করবে।

"অন্যবাঞ্ছা" অর্থে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ের কামনা ত্যাগ এবং অন্য পূজ্য অর্থে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোনো দেবদেবীর পূজা না করার নির্দেশ গ্রহণ করেছেন। কারণ কী? মন বহু বিষয়ে ধাবিত হলে বিক্ষিপ্ত হয় এবং ভগবানে তা স্থির ভাবে রাখা যায় না।

"অন্য বাঞ্ছা নাহি করি জ্ঞান—কর্ম পরিহরি।"

কিন্তু শ্লোকের অপর অংশের দ্বারা এরূপ ব্যাখ্যা—গ্রাহ্য হয় না। কারণ? ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ। সেই জ্ঞানকে যদি পরিহার কবা হয়, তবে অন্য দেবতার পূজা বাদ দিয়ে ব্রহ্মের পূজার অর্থ হয় না। অতএব এখানে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের পূজা না কবে মনঃসৃষ্ট কোনো আকারবান পূজার কথাই বলা হয়েছে। ব্রহ্মই হোক কৃষ্ণই হোক অথবা অপর কোনো দেবতাই হোক, যে-কোনো বস্তুকে জানার নাম জ্ঞান। জ্ঞান পরিত্যাগ করলে ভক্তগণ, ভগবানকে না জেনে পূজা করবেন কীরূপে? সুতরাং জ্ঞান কেউ ত্যাগ করতে পারে না। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভক্তগণকে কর্ম ত্যাগ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ কর্ম করলে মন সেখানে কিছুটা দিতেই হয়। বাঃ! সুন্দর বৈষ্ণববিধান। কৃষ্ণের ভজনা করা তাঁর লীলা শ্রবণ করা, সে কি কাজ না? কর্ম না করে কেউ ক্ষণকাল থাকতে পারেন না, এমনকি প্রাণেও বাঁচেন না। মল, মূত্র ত্যাগ করা, সেও তো কর্ম?

বৈষ্ণবশাস্ত্রে—ভগবান কৃষ্ণের বা বিষ্ণুর আরাধনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভগবানের কোনো আকার হয় নাকি?

ভগবান তাঁর ভক্তের লক্ষণ কেমন হবে তা জানিয়েছেন—যিনি শোক করেন না, কোনো কামনা করেন না, যিনি শুভাশুভ সর্বপ্রকারের ভাব ত্যাগ করেছেন, এইরূপ ব্যক্তিকেই ভক্ত বলা হয়।

উল্লিখিত ভক্তের লক্ষণ স্পষ্টরূপেই বলা যায় যে, মানসিক গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ভক্ত গুণাতীত মার্গে পৌঁছেছেন। আপাতত তাই ধরা উচিত। এইরূপ ভগবদ্ভক্ত ও জ্ঞানীগত কোনোই প্রভেদ নেই। সুতরাং যিনি জ্ঞানী, তিনিই ভগবদ্ভক্ত। **ভক্তি হল মনের অবিকৃত অবস্থা, এরই নাম গুণাতীত অবস্থা। এর বিশেষ অবস্থান অনন্যাভক্তি।**

হরিপদ যোগী—বৈষ্ণবদের চার যুগের তারকব্রহ্ম নাম সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন।

সত্যযুগের তারকব্রহ্মনাম—

নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ
নারায়ণ পরামুক্তিঃ নাবাযণ পবাগতিঃ।।

ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম—

রাম নারায়ণ অনন্ত মুকুন্দ মধুসূদন
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হবে বৈকুণ্ঠ বামন।

দ্বাপর যুগের তারকব্রহ্মনাম—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণুঃ নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।।

কলিযুগের তারকব্রহ্মনাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

ভগবানের এই নাম যদি মানবগণের মুক্তি হবে তাহলে বেদ উপনিষদে কোনো সংহিতায় এইসব নামের কোনো উল্লেখ নেই কেন?

হিন্দুশাস্ত্রের ২০টি সংহিতার কথা বলা আছে, কোনো সংহিতায় নামের পরিচয় নেই। কোথা থেকে এল, কীভাবে এল, তার প্রয়োজন কী ইত্যাদি বলা হয়েছে।

সুতরাং, উহা তারক ব্রহ্মনাম হতে পারে না। ইহা নিজেদের মতবাদকে পুষ্ট করবার জন্য সম্প্রদায়গণ কর্তৃক প্রচারিত হয়েছে মাত্র।

তারকব্রহ্মাপ্রমাণ করবার যে প্রয়াস তা বিস্ময়কর। কৃষ্ণ যে কংসারী তা ত্রেতাযুগের মানুষ জানল কী করে?

দ্বাপরযুগে কি মধুকৈটভ নিহত হন? তার অনেক অনেক পরে তো কৃষ্ণের জন্ম?

বিষ্ণু আর কৃষ্ণ এক নহেন। কৃষ্ণকে বাসুদেব, কোথাও বসুদেব নন্দন বলা হয়েছে। তা ভ্রান্ত। বাসুদেবকে নিত্য শুদ্ধ, কূটস্থ চৈতন্য, আত্মা ব্রহ্ম এইসব নামে অভিহিত করা হয়।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং গীতা দ্রষ্টব্য।

গুণ ব্যতীত কর্মের কোন কর্তা নাই ;

কর্তা না থাকিলে কর্ম হয় না।

ভগবান গুণাতীত! ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা কদাচিৎ। ২/২৮ গীতা দ্রঃ।

তিনি পূর্বে কখনও জন্মেছিলেন বা পরে কখনও জন্ম নেবেন এমন হতে পারে না।

জ্ঞানীর নিকট যাদুবিদ্যা অলৌকিক কাজকর্ম কখনোই আদরণীয় নয়।

একরকম যোগসাধনা হঠযোগ দ্বারা নানান অলৌকিক ক্রিয়া সম্ভব হয়। কিন্তু মূলে কোনো দ্রব্যগুণ থাকা চাই, তারপর হাতের সাফাই ম্যাজিক, মন্ত্র ইত্যাদি আছে বা থাকে।

কৃষ্ণের মধ্যে যে ভাব দেখানো হয়েছে তা অনুধাবন করলে ধরা পড়ে সবই। দেখুন পূর্বে কংসের হাতে মহামায়া বধ! মায়া তিরোহি না হলে অজ্ঞানতা থাকবেই। অজ্ঞানতা দূর না হলে ভগবত দর্শন হবে না। বলরামের জন্ম মানে দীক্ষাগুরু পথ দেখালেন। কৃষ্ণের কালিয় দমন সাধক যেমন ইন্দ্রিয়গণ (রিপুর) দ্বারা তাদের দমন এই ঘটনার রূপক হল— নিমিত্ত লেগে থাকেন ; এখানে কালিয় নাগের সাথে ধস্তাধস্তি শেষে তার মস্তক উপরে দণ্ডায়মানই ইন্দ্রিয় দমন হল।

এইসব ভাব নিয়ে কৃষ্ণের উপাখ্যান অনুভব করতে হবে। এই রূপক ভেদ করা চাই। তবেই সঠিক ধর্মের হদিস পাওয়া যাবে।

এইবার ঋগ্বেদে কৃষ্ণের সন্ধানে যাওয়া যাক। ইহা শেষের পর্বে কেন? ভোজনের পরে যেমন মিষ্টদ্রব্য আসে এ ক্ষেত্রেও তাই। এর পরে আর কিছু নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন—পৃথিবীর সকল জাতের সকল ধর্মের সূতিকাগার হল যে বেদ—ঋগ্বেদ সংহিতা। আমাদের ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মে ঐ বেদখানিকে মহামতি ব্যাসদেব বিভাজন করেছেন—

ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব।

সামবেদের কোনো ক্রিয়া আদি নেই, ইহা কেবল গীতিময়।

৬টি সংহিতার এবং বেদ অনুসারী বিভিন্ন সম্প্রদায় হেতু। ছটি দর্শন—গীতা, উপনিষদ/ব্রাহ্মণ্ আরণ্যক ইত্যাদি সকল শাস্ত্র স্বীকৃত অনুমোদিত উক্ত ঋগ্বেদ-এ আলোচিত "ব্রহ্মবাদ" নিয়েই।

ঋগ্বেদে যে সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হত তাঁদের শুধু নাম পরিচয় ছাড়া বেশি বলা যাবে না। কারণ ঐ দীর্ঘায়িত ভয়।

১। **অগ্নিদেবতা**—এঁকে শক্তিপুত্র বলা হয়েছে।

২। **ইন্দ্রদেবতা**—ইন্দ্র মানে প্রচণ্ড বলশালী এবং সোমপায়ী, ইনি বৃত্র হননকারী।

৩। **পুষা দেবতা**—দীপ্তিশালী, ধনপ্রবাহ স্বরূপ বলা হয়েছে।

৪। **সরস্বতী দেবতা**—রথারূঢ়া, শত্রুঘাতিনী নদীরূপা, বিদ্বান বলা আছে।

৫। **অশ্বিনীদ্বয় দেবতা**—শত্রুনিবারণ করেন, অন্ধকার দূর করেন। দ্যুলোকের নেতা, এই ভুবনের ঈশ্বর এনারা।

৬। **উষা দেবতা**—যিনি দীপ্তিমান, যিনি কিরণযুক্ত।

৭। **মরুৎগণদেবতা**—সমান ও স্থির পদার্থে অবনমনকারক ও প্রীতিকর, বেগবান, বিদ্বান।

৮। **মিত্রবরুণ**—সকলের জ্যেষ্ঠতম এই দুজন অসম ও বস্তুশ্রেষ্ঠ এবং রজ্জুর ন্যায় এঁরা বাহু দ্বারা জনগণকে সংযত করেন।

৯। **বিষ্ণুদেবতা**—এই সাথে ইন্দ্রদেবতার নামে ওহেঃ দেবতাগণ তোমরা উপদ্রব-শূন্য মার্গ দ্বারা আমাদের পার করে থাক।

১০। **দ্যাবাপৃথিবী দেবতা**—হে দ্যাবা পৃথিবী তোমরা উদকবতী ভূতসমূহের আশ্রয়-নীয়া।

১১। **সোম দেবতা**—এঁর সাথে ইন্দ্রদেবতাও আহূত। তোমরা মহৎ এবং মুখ্যভূতসমুহ করেছ, সূর্য লাভ করিয়েছ ইত্যাদি।

১২। **বৃহস্পতি দেবতা**—যে বৃহস্পতি অদ্রি ভেদ করেন, যিনি প্রথমে জাত হয়েছেন, যিনি সত্যবান অঙ্গিরা ও যজ্ঞভাগী।

১৩। **রুদ্র দেবতা**—এখানে সোমরুদ্র একই সাথে আহূত তোমরা অসূর্য বলদান করো, তোমরা সপ্তরত্ন ধারণ করে থাক, তোমরা আমাদের সুখকর হও।

১৪। **আপ্রীদেবতা**—হে অগ্নি অদ্য আমাদের সমিধ সেবা করো। যজনীয় ধূম প্রবেশ করে, অত্যন্ত দীপ্ত হও।

১৫। **সবিতা দেবতা**—সবিতাদেব যে হিরণ্ময় প্রভা ধারণ করেন, যে প্রভাবকে উদ্‌গত করছেন, সবিতাদেব মনুষ্যের হবণীয়।

১৬। **বায়ুদেবতা**—হে বায়ু, তুমি বীর শুদ্ধ মাধুর্যযুক্ত অভিযুত, সোম অধ্বযুগন তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করছে। তুমি নিযুৎগণকে রথে যোজিত করো।

১৭। **পর্জন্য দেবতা**—যিনি ওষধিসমূহের ও জলের বৃদ্ধি করে, যে দেবতা সমস্ত জগতের ঈশ্বর তিনি তিন প্রকার ভূমিবিশিষ্ট গৃহ ও সুখ প্রদান করুন।

১৮। **জলদেবতা**—হে জল তুমি সুখের আধারস্বরূপ। তুমি অন্ন সঞ্চয় করে দাও। তুমি অতি চমৎকার জল দান করো।

১৯। **যম ও যমী দেবতা**—এরা যমজ ভ্রাতৃভগ্নী বলে বিদিত। ভগ্নী ভায়ের সংসর্গ চাইলে, যম অস্বীকার করেছেন।

২০। পিতৃলোক ও যম প্রভৃতি দেবতাগণকে হে অন্তঃকরণ, তুমি বিবস্বমানের পুত্র, যমকে হোমের দ্রব্য নিয়ে সেবা কর। তিনি সৎ কর্মস্থিত ব্যক্তিদের সুখের দেশে নিয়ে যান।

২১। বিশ্বদেব দেবতা, দেবগণের দেবতা বৃহস্পতি, ঋষি। এখানে বলা হচ্ছে—অবিদ্যমান হতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হল। দেবোৎপত্তির পূর্বতন কালে অবিদ্যমান হতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হল। পরে উত্তীর্ণপদ হতে সকল পৃথিবী জন্মাল, পৃথিবী হতে দিক সকল। অদিতি হতে দক্ষ দক্ষ হতে আবার অদিতি জন্মিল।

২২। **বিশ্বকর্মা দেবতা**—হে বিশ্বকর্মা বিশ্বদর্শনকারী দেব কোনো স্থান থেকে পৃথিবী নির্মাণ পূর্বক প্রকাণ্ড আকাশকে উপরে বিস্তারিত করে দিলেন? সে এক প্রভু! তাঁর সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, পদ, হস্ত। ইনি দুই হস্তে এবং বিবিধ সঞ্চালন পূর্বক নির্মাণ করেন।

এইসব কাহিনী নিয়ে পুরাণগুলি তৈরি হয়েছে দেখা যায়। রাজা উত্তানপাদ, দিতি, অদিতি দক্ষ থেকেই পৃথিবীর বিস্তার হয়েছে।

২৩। মনু দেবতা, পুরুরবা ও উর্বশীকে দেবতা বলা হয়েছে। প্রার্থনা আছে।

২৪। **ওষধি দেবতা**—পূর্বকালে তিন যুগ ধরে দেবতারা যে সমস্ত প্রাচীন ওষধি সৃষ্টি করেছেন সেইসকল পিঙ্গল বর্ণ ওষধিরা একশত সপ্ত স্থান বিদ্যমান আছে, আমি এইরূপ জ্ঞান করি।

২৫। **দক্ষিণা দেবতা**—এ সকল যজমানদের যজ্ঞ নির্বাহের জন্য সূর্যরূপী ইন্দ্রের বিপুল তেজ প্রকাশ হল। সকল প্রাণী অন্ধকার হতে মুক্তি পেল। পিতৃলোকগণ যে বিপুল জ্যোতি দিয়েছিল তা উপস্থিত হল।

২৬। পাণিগণ, সরমা দেবতা, তারাই ঋষি। হে সরমা, যে ইন্দ্রের দূতী হয়ে তুমি দূরদেশ হতে এসেছ, সেই ইন্দ্র কীরূপ? তাঁকে দেখতে কেমন? তিনি আসুন, তাঁকে আমরা বন্ধু বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি।

এই অংশের টীকায় বলা হয়েছে—

ঊষা কর্তৃক প্রাতঃকালে আলো উদ্ধারকে উপমাচ্ছলে সরমা কর্তৃক গাভী উদ্ধার রূপ বর্ণিত হয়েছে। গ্রীকদের ট্রয়ের যুদ্ধের গল্পরূপেও এইরূপ বর্ণনা আছে।

২৭। বেন দেবতা—বেন ঋষি।

২৮। পরমাত্মা দেবতা—বাক্ ঋষি।

২৯। রাত্রি দেবতা—কুশিক ঋষি।

৩০। বিশ্বদেব দেবতা—ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম. অত্রি, বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি, বশিষ্ঠ ঋষি।

৩১। সাবিতা ও বিশ্ববসু দেবতা।

৩২। সপত্নী পীড়ন দেবতা।

নোট আছে এই ঋণকটি অতি আধুনিক।

৩৩। পরমাত্মা দেবতা—প্রজাপতি ঋষি।

যাই হোক, ঋগ্বেদের ২য় অংশে যে-সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেওয়া হত তাঁদের উল্লেখ করলাম এবং ১/২টি ঋকের বাংলায় কি উদ্দেশে আহুতি প্রদান করতেন, তার উল্লেখ করলাম। এখানে কৃষ্ণদেবতা নামের কোনো উল্লেখ নেই। অতএব কৃষ্ণ পুরাণের যুগের দেবতা এবং কেবল মহাভারত ও গীতায় কৃষ্ণের আবির্ভাব এই মাত্র বোঝা গেল। তাহা হলে বিষ্ণু পুরাণে যে কৃষ্ণের বিস্তারিত বর্ণনা দেখা যায়? হ্যাঁ! বিষ্ণুপুরাণখানি নতুন করে রচনা। বিষ্ণুকৃষ্ণ একীভূত করার প্রয়াস থেকেই। তা না হলে বিষ্ণুর যে মহিমা তা তো মৎস্যপুরাণ, বামন পুরাণ, গরুড় পুরাণে সম্পূর্ণ আছে। বিষ্ণু পুরাণের কী প্রয়োজন? বিষ্ণুপুরাণের প্রয়োজন আরো একটি কারণে দেখা যায়। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ভক্ত। ইহা বলার জন্যই বিষ্ণুপুরাণের প্রয়োজন। প্রহ্লাদ আদৌ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন না। মহা বিদ্রোহী বা শত্রু ছিলেন এবং বিষ্ণুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে, তার প্রমাণ আছে।

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ঋগ্বেদে কৃষ্ণের নাম আছে ১১৬/২৩ ঋক ১ মণ্ডল দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ আদিম জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ কোনো যোদ্ধা। আবার কৃষ্ণনামে ঋষি আছে দেখা যায়। সায়নাচার্য এর বেশি কোনো ব্যাখ্যা দেননি।

বেদে "ভূতঞ্চ বিষ্ণু ভবনঞ্চ বিষ্ণু" বলা হয়েছে—গীতায় বলা হল "বাসুদেব সর্বমিতি"। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১-১২ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ সূচনায় বলা হয়েছে, কস্মান্মানুষতাং প্রাপ্তোনির্গুণোঽপি জনার্দনঃ। বাসুদেবোঽখিলা ধারঃ। অর্থাৎ যিনি সকলের কারণ, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার সেই জনার্দ্দন বাসুদেব নির্গুণ হয়েও কীজন্য নির্গুণ সগুণ ব্রহ্মের আলোচনায় প্রবেশ করতে হয়েছে এবং তার পরীক্ষা চতুর্ব্যূহ সিদ্ধান্তে বলেছে।

চতুর্ব্যূহ সিদ্ধান্ত কী? "বৌদ্ধ মাতৃতন্ত্র শাস্ত্র"। সেখানে আছে নারায়ণের সগুণ নির্গুণ রূপটি চারটি রূপ নিয়েই অবস্থান করছেন—নির্গুণ ব্যাখ্যার অতীত। পণ্ডিতগণ তাকে শুক্লা মূর্তি এবং বাসুদেব বলেই ব্যাখ্যা করেন। ঐ বাসুদেব রূপটিকে কবির কল্পনা বলা হয় কারণ? যোগী ও সেই শুদ্ধরূপকে যথাযথ উপলব্ধি করতে পারেন না। সেই শুক্লমূর্তির রূপ রং মুখে বর্ণনা করা সে নিছক কবির কল্পনাই মাত্র।

সেই পবিত্র মূর্তি সর্বদেশে সর্বকালে সমভাবে বিদ্যমান বলা হয়। কিন্তু বেদে একেই বলা হয়েছে ভূতঞ্চ ভবনঞ্চ বিষ্ণু। গীতায় তাই বলা হয়েছে 'বাসুদেব সর্বমিতি'। ভগবানের দ্বিতীয় রূপ শেষনাগ বা সঙ্কর্ষণ নামে পাতালে অবস্থান করছেন এবং মাথার উপর পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। তৃতীয় রূপটি হলেন প্রদ্যুম্ন। চতুর্থ মূর্তিটি অনন্ত শয্যায় শয়ান। পঞ্চম মূর্তি রজঃগুণযুক্ত অনিরুদ্ধ প্রজাপালনকারী মূর্তি যেহেতু অনুরুদ্ধ প্রজাপালনকারী অধর্মের অভ্যুত্থান ও ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হলে তিনিই অসুর নিধন করেন ধর্মের পুনঃস্থাপন করেন।

ক্ষীরোদসাগরে যে বিষ্ণু তিনিই প্রয়োজনে মূর্ত হন। এই সগুণ ও নির্গুণ তত্ত্বের কথা ব্রহ্মপুরাণে বিষ্ণু পুরাণেও আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সেই ব্যাখ্যাই করা হল। যেহেতু মার্কণ্ডেয় বিষ্ণু পুরাণ নয়।

এখানে অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, ভগবানের পঞ্চ রূপের মধ্যে কৃষ্ণের কোনো নাম নেই।

ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণকে গূঢ়ঃ কপট মানুষ বলা হল, কেননা চাংশকলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।

ইহা অনুধাবনযোগ্য যে ব্যূহবাদ, পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে—এই কথা বলা হয়েছে।

এখানে ব্যূহবাদ আর পঞ্চরাত্র বিরোধ! এক দলের মতো পঞ্চরাত্র থেকেই ব্যূহবাদ। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ততে আছে। অতএব ব্যূহবাদ যেহেতু বহু প্রাচীন। তার কিছু পরিচয় যেমন—চণ্ডী পড়ার আগে ও পরে দেবী সূক্ত পড়া হয়। এদের কিন্তু স্মার্ত মতাবলম্বী বলা হয়েছে। বৌদ্ধ, জৈনরা দেবীপূজা করতেন। বায়ুপুরাণও আমরা শিলালেখ থেকে জানতে পারি ; তখন কৃষ্ণপুত্র শাম্ব ও তাঁর স্ত্রীকে পূজা করা হতই—

"শাম্বশ্চ গদাহস্তঃ প্রদ্যুম্নশ্চাপভৃৎ
সুরূপশ্চ অনয়োঃ।"
স্ত্রিয়ৌ কার্যৌ খেটক নিস্ত্রিশূলধারিণ্যৌ
সাত্বত পরম পৌষ্কর অহিব্যুধ্নঃ।"

ইহা পঞ্চরাত্র সংহিতা মতাবলম্বীদের। ইহা ভাগবত সম্প্রদায় কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে। বায়ুপুরাণে নৈমিষারণ্যে সূত কর্তৃক বক্তব্য ঋষিদের নিকট দেখুন কি বলছে।

"মনুষ্য প্রকৃতিন দেবান কীর্তমানান্নিবোধিত
সঙ্কর্ষণ বাসুদেব প্রদ্যুম্নশাম্ব এবচ অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে
বংশবীরা প্রকীর্তিতাঃ।"

এখানে বংশবীরা এই কথার অর্থ বৃষ্ণ বংশীয় ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর বীরদের মধ্যে যাঁরা বিখ্যাত। কৃষ্ণ কিন্তু বৃষ্ণি বংশীয় লোক ছিলেন।

তবে কি ব্যূহবাদ, পঞ্চরাত্র মতকে ত্যাগ করে, বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকে বেছে নিলেন ; কোনো উপায় না পেয়েই ? তথাই ভাগবত হতে নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ নিজেদের মতো করে ভাগবত রচনা করে নিয়েছেন ; আর বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন থেকে রাধাকৃষ্ণ চরিত—ইহাই বৈষ্ণবদের সম্বল বোঝা যায়।

কেউ বলেন এসব ঘটনা ২৫০০ বছর আগের, কেউ বলেন ৮০০০ বছর আগের ঘটনা। তবে ইতিহাস বলে ২৫০০ বছর আগের ঘটনা হবে।

ঋগ্বেদে কৃষ্ণ হলেন ঋষি বা ভীষণ যোদ্ধা। কোন্‌টা হবে, ভাবতে পারেন—

নৃবিজ্ঞানীদের অনুস্মরণ করলে—

জার্মানির হোমোইরেকটকাসদের মধ্যে কিছু দৈহিক বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হলেও এদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য ছিল না, বলেই বিজ্ঞানীদের অভিমত। মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীর ঠিক কোন্ স্থানে ঘটেছিল সে কথার মতবিরোধ আছে—তেমনি ঋগ্বেদের রচনা নিয়েও মতবিরোধ আছে। একদল বিজ্ঞানীর মতে, দক্ষিণ-মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূভাগ মানুষের আদি নিবাস! এখানেই প্রথম মানুষের শুভ পদচারণ ঘটেছিল।

মধ্য ও উচ্চ মায়োসিন যুগে হিমালয় পর্বত আকস্মিক মাথা তুলে উঠলেই দক্ষিণ-মধ্য এশিয়ার জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন আসে। হিমালয়ের উত্তর দিকে বিশাল বনভূমি থাকায় তা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। ফলে বৃক্ষবাসী 'এপ' ও ঐ জাতীয়

প্রাণীরা ভূমিবাসী হতে বাধ্য হয়ে যায়। এই বাধ্যতামূলক পরিস্থিতিই পরবর্তীকালে তাদের সন্তানসন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। আবার অভিব্যক্তিবাদের প্রবক্তাগণ যেমন চার্লস ডারউইন আফ্রিকাকেই প্রথম মানুষের জন্মভূমি মর্যাদা দান করেছেন।

তবে দক্ষিণ-মধ্য এশিয়াই বেশি গ্রহণযোগ্য। যেহেতু ঐ এলাকা হতে এসেছিল শক, হুন, গুর্জর, আভীর প্রভৃতি জাতিরা এই ভারতবর্ষে। এবং কৃষ্ণ ঐ আভীর বা 'আহির' জাতির পূজিত বৃষ্ণির বীর এবং এই বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেবকে বলা হয়েছে?

বায়ুপুরাণে সূত বললেন, "মনুষ্যপ্রণতিন দেবান কীকৃর্তমানান্নিবোধিত সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব প্রদ্যুম্ন শ্বাম্ব এব চ অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে বংশবীরা।"

আদিম যুগে—এইরূপ দলনেতাকে পূজা করা হত। তাঁদের দলনেতার খাবার পরেই অন্য সবাই খেতে পারত। তাঁর হুকুম অমান্য করা হলে তার বিচার হত না, তাকে মেরে ফেলা হতই। জাভাদ্বীপের এইরূপ কাহিনী আছে। সেখানের নেতা "রাটোরসি" "বিচিত্র জগৎ"—দ্রষ্টব্য।

অতএব—ঋগ্বেদে যে কৃষ্ণ যোদ্ধা এইরূপ সংগত বলা যায়।

সমাপ্ত

৭। যুগধর্ম ॥ ও ॥ কলির ধর্ম

ষষ্ঠ খণ্ড—বিষ্ণুপুরাণ মতে কলিধর্ম বিষয়ক বর্ণনায় যে রূপে প্রলয় ঘটে তার হিসাব মানুষের ১ মাস যতদিনে পিতৃগণের ও দেবতাদের তা ১ দিন রাত, ২৪ ঘণ্টা হয়। ২৪,০০০ যুগ অবসান হলে ব্রহ্মার ১ দিন এই হিসাবে ১৪ মন্বন্তর অতীত হলে আসে কল্প। নতুন সবকিছুই সৃজন হয়। এইভাবে সত্য, ত্রেতা দ্বাপর অতীত হয়েও কলির আগমন। এই সময় বেদ, বর্ণ, আশ্রম, আচার কলিকালে একে একে সবই নষ্ট হয়ে যাবে। এই কালে বলবান দুষ্ট গুন্ডাদের অধিকার কায়েম হবে। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ থাকবে না। নিয়ম মেনে বিধান হবে না।

শ্রাদ্ধাদি প্রায়শ্চিত্ত কর্মে কোনো নিয়ম-কানুন থাকবে না। যা ইচ্ছা তাই শাস্ত্রবশে চালানো হবে ; আত্মভরিতায় বা ধনগর্বে উচ্ছৃঙ্খলতা, আত্মভরিতায় ভীষণ, মাথা দিয়ে উঠবে, বে-আব্রু হতে মহিলারা কুণ্ঠা বোধ করবে না। নির্ধন স্বামী হলে তার প্রতি নারীর কোনোই ভালোবাসা থাকবে না ; তাকে ত্যাগ করতে চাইবে ও অন্য পুরুষের অনুগামী হবে। ব্রাহ্মণের কোনো মর্যাদা থাকবে না। দুগ্ধহীন হবে গাভী হীন মীন হবে, বৃক্ষহীন হবে জল ; জীনের হবে অতি বল। মুচি হবে নরপতি, চণ্ডালের মাথায় দ্বিজ ধররে। সদাই ঘটাবে অকালমৃত্যু। সর্বদাই দুর্ভিক্ষ দেশে দিবে দংশন। দেবপূজা, লিঙ্গপূজা, অতিথি ভোজন, হ্রস্ব দেহ লব্ধ হবে যত নরগণ। মোট কথা যতরকম অনাচার—অহরহ তা ঘটবেই। সপ্তবর্ষে রমণীর হবে সন্তান। দশ বর্ষে পুরুষেরা হবে পুত্রবান। দ্বাদশ বর্ষে বৃদ্ধ হবে জনগণ। বিংশতি বয়স মাত্র ধরবে জীবন। সাধুর মর্যাদাহানি হবে যখন, ঘোরকলি তারে বলে জানিবে সুজন। কৃষ্ণপূজাহীন নর যেই কালে হবে, কলির প্রাবল্য ঠিক তখনি ঘটিবে। কলির ব্যাপার এমনি

অনেক বলা যাবে। আবার এই কলিকালের গুণ অধিক হবে। এখন কলির কিছুক্ষণ তবে তায় না করি সংশয়। একদা স্নান করি ব্যাসদেব আপন বদনে ; "ধন্য ধন্য কলি যুগ" এই কথা ভনে।

পূর্ণ বর্ষার জল মধ্যে আচমন করিয়া "ধন্য ধন্য শূদ্রজাতি" করেন উচ্চারণ। আবার সলিলে স্নান করিয়া চলেন, সব নদীর পাড়ে অপেক্ষমান কতিপয় ঋষি তা শুনেছিলেন এবং সাক্ষাতে সর্বসময়ে ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করলেন, "এরূপ বলার কারণ আমাদের বলুন।" তিনি বললেন, সত্যকালে দশবই ধর্ম কৈলে আচরণ, সেই পুণ্য তাহে লাভ করে জীবগণ। অহরাত্র ধর্মকর্ম কৈলে কলিকালে সেই পুণ্য উপার্জন হয় অবহেলে।

এর পরে বললেন——

সত্যকালে ধ্যান, দ্বাপরে অর্চনা ত্রেতায় যজ্ঞ দ্বারা যে পুণ্য আছে নিরূপণ কলিতে সেই মত দেয়, শ্রীহরির গুণকীর্তন। ইতি পূর্বে যুগধর্ম কলিধর্মের আলোচনায় বলেছি বিষ্ণুপুরাণে নামের মহিমা আছে। এখানে বক্তব্য, ব্যাস যে-কথা বলেছেন তা ঠিক নয়, ভ্রান্ত।

যেহেতু কলির প্রবক্তা পরাশর তাই বিষ্ণুপুরাণেরও বক্তা পরাশর ছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ বহু প্রাচীন, সৃষ্টিকালীন যে ঘটনা বরাহ পুরাণ অন্তর্গত এই পুরাণে সেসব ঘটনা বিন্যাস তা আধুনিক মাত্র গুপ্ত যুগের BC ৬৭৩ বামন পুরাণে প্রহ্লাদের সাথে নারায়ণের হয় প্রবল যুদ্ধ। এখানে দেখা যায়, প্রহ্লাদ ভয়ানক বিষ্ণুভক্ত। বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের বিধান এবং তার নাম কীর্তন প্রচার। কী করে হয়? বিষ্ণু আর কৃষ্ণ এক হয় নাকি? বিষ্ণু তা আত্মা যা চোখ বন্ধ করে অনুভব করা সম্ভব; তা হলে হরিনাম কীর্তন করে, হবে কেন?

কৃষ্ণ... কোন্ কৃষ্ণ? তার পরিচয় থাকা দরকার ... বেদে কৃষ্ণনাম আছে ; তা আকাশ মহাশূন্য বোঝায়, ঋষি বোঝায়, বলশালী বীর বোঝায় ইত্যাদি। দৈবকীগর্ভজাত কৃষ্ণ যদি হন তবে বলা ভালো তখন কৃষ্ণ জন্মাননি। বেদব্যাস ভারত রচনা করেছেন। তাঁর পিতা পরাশর কৃষ্ণ তখন জন্মাননি।

এইমত যথাযথ বলা হল। জৈনদের তথাই ভাগবত আর কৃষ্ণকথা, বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীর অনুকরণ সংকলন অনুবাদ (সংস্কৃত ভাষা হতে) করে মালাধর বসুর এই ভাগবত সম্পদ। ভাগবত হল মোহশাস্ত্র।

মোহশাস্ত্র কী? যে শাস্ত্র অনুধাবন করলে অতি পণ্ডিতও পতিত হয়ে যায়।

পতিত মানে কী? পতিত মানে অনাচারী বা বেদভ্রষ্ট। উপনিষদ গীতা সংহিতা ভ্রষ্ট। এই বোঝায় যখন জ্ঞাত এক আর কি, বলার দরকার কিছু? সারা বিষ্ণুপুরাণে সকল পরিচ্ছদ অধ্যায় সন্নিবেশিত আছে তা সমস্তই অন্যত্র গৃহীত এই বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণকে অন্তর্ভুক্তির কারণে ; বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না। গৌড় দেশের মহিমায় এমনতর ঘটেছে।

বাসুদেব কর্তৃক নরক সখা **দ্বিবিধ নামক** বানরের নিপাতন **ষষ্ট ত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য**। এখানে বাসুদেব কে? নিশ্চই কৃষ্ণ... কৃষ্ণ কি বাসুদেব হয়? বাসুদেব পুত্র অসীকৃষ্ণ শিবের নিকট হতে পাশুপত লাভ করেছিলেন।

আবার বাসুদেব অর্থে জগদীশ্বর ভগবান নির্গুণ, অখণ্ড, অসীম বুঝায় (তন্ত্রমতে)। **বিষ্ণুপুরাণ অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য**।

অর্জুনের বলক্ষয় আভীরগণ কর্তৃক যদু মহিলাদের হরণ এবং ব্যাসের নিকট অর্জুনের খেদ। এখানে ব্যাসের নিকট অর্জুনের খেদ ...

এ জিনিস বোঝবার মাথা হিন্দুজাতির আছে বলে বোধ হয় না...

ত্রেতাযুগে ব্যাসদেব ঋগ্বেদের বিভাগ করেছেন, লেখা হয়েছে।

এখানে দ্বাপর যুগে ব্যাসের উদয় হল কেমন করে?

বিষ্ণুপুরাণের ৮, ৯, ১০ .... ১৭ বক্তা ঔর্বব ঋষি এখানে সগর জন্ম ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। এঁনারা ত্রেতাযুগের মানুষ .... বক্তা ঔর্বব।

কিন্তু বলা হল বক্তা পরাশর ; ভিতরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ঔর্ববকেই। কেন? দ্বাপরের পরেই কলির হরিনাম প্রচার উদ্দেশ্য বটে।

পরাশর ঋগ্বেদের যুগের ঋষি।

কিন্তু ঔর্বব নয়। ঔর্বব আর পরাশর এই দুই ঋষির সময়ের ব্যবধান অঙ্ক কষে বলা যায় না। তাঁদের একই পঙ্‌ক্তিতে আনা, কোনো সাধুজনের কাজ নয়।

বলাবাহুল্য, পুরাণগুলি রচনা হয় গুপ্ত যুগের খ্রি. পূ. ৬৭৩ সময় কালের ব্যাবধানে কলির ৫৫০ আর গত হলে আর কলির ৬৫২ বছর গত হলে যুধিষ্ঠির মহাভারতের রাজা পাণ্ডব রাজত্ব করতেন ইহাই ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত।

পাঞ্চরাত্র তন্ত্রমতে ভগবানের চারিটি রূপ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ বিষ্ণু প্রদ্যুম্ন।

১। বাসুদেব শুক্ররূপ ইহা বর্ণনা করা যায় না। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে বাসুদেবের বিলীন হয়ে যায়।

২। সঙ্কর্ষণ নাগরূপে পৃথিবী ধারণ করে আছেন।

৩। বিষ্ণু রূপটি হলে শয়ান সৃষ্টির প্রয়োজনে ইনিই মূর্ত হন।

৪। প্রদ্যুম্নরূপ হল প্রজাসৃষ্টিকারী রূপ (কামদেব)। কামদেব পূজাবিধি তন্ত্র মতে আছে। অতএব, বাসুদেবপুত্র কৃষ্ণ হতে পারেন না।

আমার ধর্ম হিন্দুধর্ম লিখতে বসেছি আমি— হিন্দুবর্ণের স্বরূপ বলবই। 'যত মত তত পথ' এর মধ্যে যার যা অভিমত সে তো করবেই। একলব্য হতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু .... গুরুদক্ষিণা দিতে যে হয়? ঐ যে বলছিলাম যার নাম প্রচারের জন্য এমন সব কাণ্ড করতে হল। শুধু কি তাই? আমি লিখেছি—ব্যাসদেব একটি পুরাণ লিখে লোমহর্ষ কে দিয়েছিলেন তার পর বলেছি ব্যাস ১৮৪ জন নামের, শাস্ত্র খুঁজে ধরা পড়েছে ; এ সকল মনে রাখতে হবে।

আমি বলেছি ব্যাস বাল্মীকি বলে কোনো ব্যক্তিই ছিলেন না। এবং ধর্মশাস্ত্রগুলি রূপকের আশ্রয়ে রচিত হয়েছে এবং ইহা বোঝবার ও বোঝাবার জন্য গুরুর দরকার হয়। সৎগুরু মিলে না। গুরু কেমন ব্যক্তি হত হবে তাও বলেছি। হিন্দু জাতটা খুবই ধর্মভীরু এটা হিন্দুজাতির দুর্বলতার দিক। আমি লিখেছি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাসযোগ্য ভূমি এই ভারতবর্ষ। এঁদের মতো সরল, নিরহংকার সাধুভাবের মান পৃথিবীর কোথাও নেই। কথাগুলি আমার কিন্তু না, আমি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছি মাত্র।

যাইহোক এখন হরিনাম সংকীর্তন ও নামমহিমা সম্পর্কে বলব।

হরিনাম মহিমা—

৮। হরিনাম মহিমা ৷৷ ও শাস্ত্রীয় মত কী ?

কিন্তু পুরাণের পঞ্চম অধ্যায় হতে বোঝা যায় হিন্দু শাস্ত্রের বংশবিস্তার। এই অংশ এত সুন্দর উৎপাদক যাকে কামধেনু কল্পবৃক্ষ অপেক্ষা ন্যূন করা যায় না। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেবতা। সৃষ্টির আদিতে এঁদের আবির্ভাব যেভাবেই হোক অর্থাৎ কল্পনা ঋগ্বেদ হতেই। এঁদের রূপ কল্পনা বিজ্ঞান যোগশাস্ত্র শাক্ত-শৈব-গাণপত্য) এবং অধ্যাত্মবাদ স্বীকার করে নিয়েছেন— দেবতা হিসাবেই। ভগবান নন। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অধ্যায় আছে বেদ বিভাগ বর্ণনা।

"বৈবস্বত মন্বন্তরের আঠাশ দ্বাপরে চারিভাগ করেন ব্যাস জানিবে বেদেরে।"

ত্রেতাযুগের মধ্যভাগ হতে প্রকৃত সৃষ্টির ধারা আগেই আলোচনা করেছি। তার আগের সৃষ্টির ব্রহ্মের যজ্ঞ বহির্ভূত বস্তু। যজ্ঞ বস্তু হিসাবে গণ্য প্রাকৃত সৃষ্টি, সুতরাং বেদ চারি ভাগ হয়েছে ব্যাস কল্পনা তখনকার। দ্বাপরে এসে কত কত নশ্বর ব্যাস এসব বলেছেন তার উল্লেখ নেই। উল্লেখ নেই যেহেতু বৈধ নয়। এখানে বলা প্রয়োজন যেহেতু তৃতীয় অধ্যায় বেদব্যাসের ভিন্ন ভিন্ন রূপে উৎপত্তি যখন আছে তখন কোনো সময়ে কোনো নামের আবির্ভাব তা বলা যাবে না?

এত শুনি মিষ্ঠভাষে কহে পরাশর।
শুন শুন ওহে বৎস তুমি গুণধর।।
অসংখ্য আছয়ে ভাগ বেদের এমন।
করি সাধ্য সবিস্তারে করয়ে বর্ণন।।

অধ্যায় ২৮ ....ব্যাসের বর্ণনা এইরূপ—

দ্বিতীয় দ্বাপর হতে পর্যায়ক্রমেতে
প্রজাপতি আদি কবি জানিবেক চিতে
প্রজাপতি শুক্রাচার্য পরে বৃহস্পতি
সবিতা পরেতে মৃত্যু ওহে
মহামতি তার পরে ইন্দ্রদেব বশিষ্ঠ পরেতে
সারস্বত ও ত্রিযামা জানিবে ক্রমেতে
ত্রিবৃষা ও ভরদ্বাজ অন্তরীক্ষ আর
অত্রি এয্যারুণ পরে ওহে গুণধর
উত্তম হর্ষাত্মা আর রাজশ্রবা 'পরে
তৃণ বিন্দু ও বাল্মীকি জানিবে অন্তরে
শক্তি আমি তার পরে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
বেদের বিভাগকারী ওহে তপোধন।।
ইহারাই যথাক্রমে বেদব্যাস নামে
বিদিত আছেন, বিশেষ কহি তব স্থানে।।

কল্প শেষে সেই যুগের বা কল্পের ভূমি ———————— তৃণাদি কিছুই থাকে না। সকল কিছুই পুড়ে যায় বা ভেসে যায়। যেমন সুনামির ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম তখন দেবগণ পিতৃগণ বৈমানিক হয়ে যান। এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে তর্পণবিধি আছে। বেদব্যাস মহাশয় বেদবিভাগ করেছেন দেখা যায়। কিন্তু রচনা করেননি। এইটাই ভালো।

দ্বাপর যুগে কোনো দেবদেবীর পূজার বিধান লেখা নেই। শুধু বলা আছে আর্চয়ণ ঃ এত বেদ ভাগের কী দরকার তার কারণ কিছু জানা গেল না।

তারপর বৈষ্ণবধর্মীদের সাথে বেদের কী সম্পর্ক? বিষ্ণুপুরাণকে অবলম্বন করে কৃষ্ণের পূজা এটা ধর্মের (হিন্দুধর্মের) মধ্যে কোনো সূত্রে সংগত হয়? অতএব রাধাকৃষ্ণ ভাগবত, পদাবলী এ সকল মোহশাস্ত্রাধীন বস্তু। বিষ্ণুপুরাণের "সংস্রব নয়" কারণ বলেছি "বিষ্ণুপুরাণ প্রকৃত বামন পুরাণ"। হরিনাম মহিমা কীর্তন করবার জন্যই বিষ্ণুপুরাণ ; কেন না লেখা হল 'ধ্যায়েৎ কৃৎ এ জযন যজ্ঞে স্ত্রেতায়াং অর্চয়ণ দ্বাপরে, কলৌ দান কর্মণি' ইহা স্মৃতিতে আছে। সেইজন্য পুরাণ নয়, অর্থাৎ মানা যাবে না। স্বয়ং ব্যাসদেব এই বিধান দিয়েছেন। নামে মুক্তি হয়, শাস্ত্রে নেই এবং শাস্ত্রগ্রাহ্য নয়।

বিবেকানন্দকে নব বৈদান্তিক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বিবেকানন্দের ভাষা অধ্যাত্মবাদ রূপ "আত্মাব্রহ্ম" অমূর্ত ভগবানকে স্মরণ করতে মনে জোর পাই না, তাই বললেন— বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

এখনো আমি বলতে চাই যে কোনো মহৎ নামসংকীর্তন করায় কোনো দোষ নেই। তবে শাস্ত্রসম্মত হলে ভালো হয়। যুগধর্ম মান্য করতে হলে নাম হতে হবে—

সত্যে ব্রহ্ম দ্বাপরে বিষ্ণু ত্রেতায়
সূর্য কলিতে রুদ্র বা শিব স্মরণে।
যেহেতু মনু লিখেছেন 'স্মৃতিতে'—
"অন্যে কৃতযুগে ধর্মোস্ত্রেতায়াং
দ্বাররেঽপরে, কলিযুগে নৃনাং
যুগহ্রাসানুরূপতঃ।"

শাম্বপুরাণ মতে যাই বলুক, তাও আমি বাদ দিলাম ; কেননা পুরাণ এবং স্মৃতি বিরোধে, স্মৃতিগ্রাহ্য। মনুসংহিতায় এই শ্লোকটি স্পষ্ট। কৃৎ-এ মানবাধর্ম, দ্বাপরে গৌতাস্মৃত ত্রেতায় সাখ্য লিখিত কলৌ পরাশর—স্মৃতি।

ধ্যায়েৎ কৃৎ-এ জযনয়ে জ্ঞেস্ত্রে তায়াম
দ্বাপরে অর্চয়ণ কলৌ ঃ দান কর্মাণ।

নাম করা দোষের নয়। তবে শাস্ত্রানুসারে বেদান্তের অনুবন্ধে বলা আছে যে, প্রত্যেক শাস্ত্রীয় বিধানে ৪টি অনুবন্ধ = বিষয় সম্বন্ধ প্রয়োজন অধিকারী, থাকতেই হবে কারণ ; প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেউ কিছুই করে না। তাই বেদান্তের অনুবন্ধ মানতে হবে। আমি বলি নামসংকীর্তন হলে ভালো হয়। যথা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

হরে ভবকাণ্ডারী ভবকাণ্ডারী।
পারের কাণ্ডারী হরে হরে।
এই মণ্ডলের এখানে সমাপ্তি।

৯। আত্মগীতা (কর্মময়)

এই মণ্ডলে আমি প্রথমেই পরীক্ষিতের রাজ্যলাভ পর্ব হতেই, শুরু করলাম কেননা এই সময় হতেই কলির উদ্ভব হয়েছে ; তাই এখান থেকেই কর্মময় আমাদের জীবন কথা হিসাবে গ্রহণ করলাম, আরম্ভ করলাম।

রাজা পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক পর্ব—।

পাণ্ডবপ্রিয় ধৌম্য পুরোহিত সস্নেহে বললেন, বৎস.... তুমি যতই বিজ্ঞ বহুদর্শী ও বুদ্ধিমান হও না কেন আমরা তোমাকে সেই বালক বলিয়াই জানি ; অতএব যা বলি মনযোগের সাথে অনুধাবন কর। হে রাজন .... সুরাচার্য বৃহস্পতি বলেছেন। গুরু বা পুত্র যদি অপরাধ করে তাদেরও দণ্ডবিধান কর্তব্য। নিরপরাধ শত্রুকেও সমদৃষ্টিতে দেখা উচিত। বলবানের সঙ্গে সন্ধি করবে। দুর্বলের প্রতি অভ্যুত্থান ঘটাবে ; ইহাই রাজধর্ম। কখনও পুরুষকার থেকে বিচ্যুত হবে না। দৈব অপেক্ষা পুরুষকার বলবান, প্রত্যক্ষ ফলদাতা। একবার কোনো কার্য সিদ্ধ না হলে ভগ্নহৃদয় বা পশ্চাৎপদ হতে নেই, সত্য সরলতা দুইটি মহৎগুণ সর্বদা মনে রেখো।

আরও একটি মহৎ গুণ ধৈর্য।

ভৃত্যদিগের সঙ্গে ব্যবহার গাম্ভীর্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। আত্মসুখের প্রতি সর্বদা অনীহা এবং প্রজাদের মনোরঞ্জন রাজার একান্ত কর্তব্য। লোভ পরম শত্রু ইহা মনে রাখবে। মিষ্ট কথায় কার্যসাধন করতে যত্নবান থাকবে। অত্যাচারী, অধর্মপরায়ণ হলে রাজা রাহুর ন্যায় গতি হবে। রাহু রাজা ইনি অনৃতির দ্বারা বশীভূত হয়েন এক সাধু দ্বারা জৈনধর্মের ম্লেচ্ছ ধর্মের অনুগামী হয়ে পড়ায় রাজার রাজ্যপাট সবই চলে যায় এবং রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে গমন করলেন সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়; তারই স্বসত্ব স্ত্রীর গর্ভে ঔর্বব ঋষির অনুগ্রহে স-গ-র—সগর রাজার জন্ম হয়। সেই কাহিনী অনেক বড়ো।

সকল বর্ণের সাধারণ ধর্ম যেমন—

রাগদ্বেষাদি ত্যাগ, সত্যভাষিতা, ক্ষমা, সরলতা, পোষ্যবর্গের পোষণ, পবিত্রতা, এখানে অর্থ রোজগারে পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে। এবং বিবাহ করে পুত্রলাভ কাম্য। যার ধন নেই সে জীবন্মৃত। আর যার ধন আছে সে প্রকৃত জীবিত হইা শাস্ত্র অভিমত দেয়। যার অনেক আছে তার আরও চাই এই হল জগতের নিয়ম। কৃতঘ্ন, পাপাত্ম ও মিত্রদোহী এই তিন লোক যে স্থানে থাকে, সেই স্থান ত্যাগ করাই উচিত। কোনো কার্যসাধনে দীর্ঘসূত্রী হবে না। এইসব কথাগুলি নারদ মুনি বললেন।

অতঃপর স্নেহগর্ভ বচনে মহামুনি কণ্ব রাজা পরীক্ষিতকে বললেন, বৎস, রাজনীতি, ধর্মনীতি ও আরদ্ধকর্ম, ন্যায়, কামনাত্যাগ ও সৎসঙ্গ আশ্রয় নিলে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

কাল অনন্ত.... একশত বর্ষ সেই অনন্তকালের সামান্য মাত্র। সেই একশত বৎসর যখন মানুষের পরমায়ু তাতে কি আস্থা করবে? সকল কর্মে আমি অখণ্ডা এইরূপ দৃঢ়ভাবনা রাখবে ; তাহলে সমাগত কার্যে লিপ্ত হবে না। এই শরীর এক ব্যক্তি পালন করে এক ব্যক্তি দাহ করে ; ইহাতে খেদ বা হর্ষ হয় কেন? আত্মা কর্তা বোধ করায় কিনা তাই.... সে সংকল্প সর্ব পদার্থে সমতারূপে স্থিত হয় তাকেই ব্রহ্মপরা স্থিতি কহে। যার চিত্ত সাদৃশ মমতায় থাকে তাকে পুনঃরায় ভববন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় না। "সেই আমি, এই আমি নাহি" আমি এই কর্ম করি ইহা করি না ; এইরূপ ভাবনা পরিতুষ্টির হতে পারে না। "আমি দেহরূপী" এইপ্রকার যে স্থিতি তাই কালসূত্র, অতএব সর্বনাশ হলেও দেহে আত্মবুদ্ধি করিও না। অতঃপর মহামুনি কণ্ব বললেন বাসনা দ্বারা যে বন্ধন তাহাই প্রকৃত বন্ধন। এই বাসনারূপ বন্ধন ক্ষয় হলে মোক্ষলাভ হয়। সাধারণ শাস্ত্রের ইহা মোক্ষ নহে, সূক্ত বলে। "মোক্ষ কিন্তু বাসনার অধীন ইহা উপনিষদ বলে"। ইহা আকাশ ভূমি প্রভেদ। আমি কলির ধর্ম লিখছি বলে কি মানুষের দু-হাত দু-পা তার পরিবর্তে, ৩টি করে হাত পা আছে বলতে পারি কী?

সংকল্প বিকল্প অহংকার রাগ হিংসা সমস্তই থাকবে। কিন্তু..... চিৎ বা মুক্ত অন্য পর্যায়। কুণ্ডলিনীর জাগরণ অর্থাৎ সুষুম্না দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উন্নীত করতে পারলে অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্যে নিয়োগ করলেই ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়, ইহাই মুক্ত বা মুক্তি। ইহাই দর্শনের সিদ্ধান্ত। যোগসাধনও তাই বলে, বিজ্ঞান স্বীকার করে। বিজ্ঞান ইহাকে নিউট্রন ফিল্ড বলেছে ; যার প্রতি ১২ থেকে ১৪ মিনিট অন্তর একটি প্রোটন একটি ইলেকট্রন উদ্ভব হয়।

মহাতপা জৈগীষব্য এক সময় নির্জনে সমাধিনিষ্ঠ ছিলেন, তারপর তাঁর কী অবস্থা হল? তিনি মহাপ্রলয়কালীন জলধির ন্যায় বিক্ষিপ্ত হলেন, কি করি, কোথায় যাই, কোন্ বস্তু নেব আর কোন্‌টি নেব না ইত্যাদি বুঝতে। এবং তিনি দেখলেন পরমাত্মা বিশ্বময় ব্যাপ্ত। তিনি দেখলেন পরমাত্মা বিশ্বময় ব্যাপ্ত সেই জৈগীষব্য বলতেন, হে বৎস ঃ এই অনিত্য সংসারে যা কিছু বিদ্যমান কালে অনন্ত কালগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। কোনো অবস্থাই স্থির নয় ; এই সংসার অহরহ পরিবর্তিত হতেছে। বাল্যের পর কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য —মৃত্যু যেমন আগে অনুরূপভাবে এই পৃথিবীব সকল কিছু চক্রবর্ত। এই নিযম কালেব রশিতে বাঁধা। হে বৎস ঃ তোমার পিতামহ যুধিষ্ঠির, স্বয়ং ধর্মরাজ। তোমার পিতা মহাবীব অভিমন্যু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়, তথাপি ..... বিধিনির্দিষ্ট অখণ্ড নিয়ম স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন কেউই লঙ্ঘন পরিবর্তন করতে পারে না। তাই আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমি কে? কোথা থেকে এলাম, শেষে কোথায় যাব ইত্যাদি। এইরূপ ভবিতব্য নিয়মবিধি নিয়ে প্রত্যহ আলোচনা করার নামই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, এইরূপ সুন্দর সমুজ্জ্বল জীবনের পূর্ণদৃষ্টি এই কথাগুলি খেয়াল রাখবে।

মনীষীগণ বলেন, দান, ধ্যান ও যজ্ঞাদি দ্বারা বহু বিলম্বে ফল লাভ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান প্রভাবে আশু মুক্তিলাভ হয়ে যায়। **মনের প্রীতির নাম স্বর্গ, বিপরীত হল নরক**। আমরা পুণ্য, পাপকেও ঐরূপই জানি। এইরূপ সদা স্মরণে রাখলে অমঙ্গলের কারণ নেই।

সাধ্য ও সাধন দ্বারা ব্রহ্মের প্রীতিলাভ হয়। ব্রহ্মের মূর্ত ও অমূর্ত ২টি রূপ ; আবার

উহা ক্ষর, অক্ষর বলে। ব্রহ্মা সর্বভূতেই আছেন, এর মধ্যে অক্ষর পরব্রহ্ম আর ক্ষর ব্রহ্ম। ক্ষর ব্রহ্মাই হল সমস্ত জগৎ। অগ্নিতে যেমন নৈকটস্থ ও দূরত্ব হেতু প্রভাব তারতম্য ঘটে ; তেমনি ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মাদি স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত ক্ষেত্রে অবিদ্যারূপ আবরণের তারতম্য আছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিন ব্রহ্মের শক্তিই বোঝান। দেবগণ তাঁদের অপেক্ষা ন্যূন ব্রহ্মশক্তি। দক্ষাদি প্রজাপ্রতিগণ তদপেক্ষা ন্যূন। মনুষ্যগণ তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশুপক্ষী সরীসৃপাদি তদপেক্ষা হীন এবং বৃক্ষগুল্ম লতাদি তদপেক্ষা ক্ষুদ্রব্রহ্ম শক্তির অংশভূত জানবে।

মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্দ্রনীল, বজ্র এই পঞ্চরূপ যে বৈজয়ন্তীমালা বুদ্ধিরূপ গদা, তামস, ভূতাদি, রাজা ইন্দ্রিয়াদি দ্বিবিধ অহঙ্কার, বায়ুবৎ বেগগামী অথচ বায়ু অতিক্রমকারী। সাত্ত্বিক অহং মন চক্রস্বরূপ বিরাজিত ভগবান "বিষ্ণুতে পুরুষ প্রধান" বুদ্ধি অহংকার স্থূল সূক্ষ্মভূত। মন—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বিদ্যা অবিদ্যা সকলেই আশ্রিত হয়ে আছে ব্রহ্মে। যদিও তিনি রূপবিহীন তথাপি মায়ারূপ হয়ে প্রাণীদের কল্যাণে অস্ত্রভূষণ ধারণ করেই আছেন। কিন্তু ... তিনি বিকাররহিত "প্রধান"। অখিল জগৎ ধারণ করে আছেন তিনি। ভূ-লোক ভব-লোক, স্ব-লোক, মোহ-লোক, জন-লোক, সত্যলোক এই সপ্তলোকে বিরাজিত ভগবান। উক্ত সমুদয় বিশ্লেষণ—মুনি কৃশাশ্ব করিলেন।

রাজা পরীক্ষিৎকে ঋষিবর বিভাণ্ড বললেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম গৃহস্থাশ্রমের কর্তব্যসমূহ জ্ঞাত থাকা উচিত। দান, বেদধ্যপন ও যজ্ঞ এই তিনটি ব্রাহ্মণ-এর ধর্ম পবিত্র ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ গ্রহণ এই হল জীবিকা। অনুরূপ পৃথিবী পালন ও শস্ত্রবিদ্যা হল ক্ষত্রিয়ের জীবিকা বা ধর্ম। দান, অধ্যয়ন যজ্ঞ বৈশ্যজাতির ধর্ম এবং বাণিজ্য পাশুপালন কৃষি উহাদের জীবিকা। দান, যজ্ঞ, দ্বিজসেবা-শূদ্রজাতির ধর্ম। দ্বিজসেবা ক্রয়বিক্রয় উহাদের জীবিকা। সেইদিন এখন নেই। এই কালে সকলের স্ব স্ব ভাবনাই বলবৎ হয়। অহিংসা, অনসূয়া, ক্ষমা, আসংজ্ঞা, অকার্পণ্য। সন্তোষ, সন্তুষ্টি, সত্য, শৌচ্য, **অষ্টবিধ ধর্ম** সকল বর্ণাশ্রমীদের অবশ্য পালনীয়।

মহর্ষি দেবল বলেন, পাণ্ডব বংশ ধর্ম ও অন্যান্য কারণে ত্রিভুবন বিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয়। আশা করি তুমি সেইরূপ ধর্ম পালনে প্রবৃত্ত থাক। তোমার গুণে বংশ গৌরব সমুজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করুক। সৌভাগ্যবশে আজ তুমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। সকল বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা তোমার আবশ্যক। ধার্মিক, ক্ষীণ, দুর্বল ও দরিদ্র এদেরকে দান করবে। অশন বসন-শয়ন-আসন-ভূপান, ভূমি শ্রেষ্ঠদান, বিদ্যাদান সর্বশ্রেষ্ঠদান ; ক্ষমতা থাকলে দান করায় কুণ্ঠাবোধ করবে না।

পাপ ত্রিবিধ, **কায়িক** পরদারগমন—পরহিংসা, চুরি করা এগুলিও কায়িক। পরদ্রব্যেব প্রতি লোভ, পরের অনিষ্ট চেষ্টা, বেদে অশ্রদ্ধা এইগুলি **মানসিক** পাপ। অসদালাপ, নিষ্ঠুর, মিথ্যাভাষণ ও পরপরিবাদ এই কয়েকটি হল **বাচ্চিক** পাপ। আপনার মনের শ্রদ্ধা ভাব থেকে আসে পবিত্রতা। ইহা সভ্যের পথে নিয়ে যায়। ক্ষমা, আনসংশা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সরলতা এসবই ধনের লক্ষণ। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, পুত্রস্নেহ, পত্নীপ্রণয়, বন্ধুপ্রীতি এইগুলি ধর্ম নামের যোগ্য, লৌকিক যাত্রাপথের উপায় ; পরলোকে ইহা শুভফল দেয়।

হে রাজন! সকল কাজের উপযুক্ত একটা সময় আছে। পূর্বাহ্নে অর্থ উপার্জন, মধ্যাহ্নে সঞ্চয়, অপরাহ্নে ভোগ করতে হয়। একটি বিষয়ে বিশেষ সর্তক থাকিও ; স্ত্রী ও মদ অপেক্ষা

মোহজনক জগতে অন্য কোনো পদার্থ নেই। বৎস অহিংসা পরম ধর্ম। ধর্ম অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর নেই। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সহায় দ্বিতীয় কিছুতে নেই। এ সম্পর্কে জ্যেষ্ঠ পিতামহ যুধিষ্ঠিরই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। দুর্যোধন বহু ধনে-জনে কুরুক্ষেত্রে পরাজিত।

শুকদেব বললেন, অবন্তীরাজ দণ্ডী ইন্দ্রিয়ের বশবর্তী হয়ে মহা সংকটে পড়েছিলেন। তাঁকে উর্বশীর কাছে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, না হয় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই বাধ্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ ... রাজা দণ্ডী দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। অনেক চিন্তাভাবনা করে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুপক্ষীয়দের সঙ্গো সাক্ষাৎ করেছেন দুর্যোধন, শিশুপাল, দন্তবক্র, জরাসন্ধ, পর্বতরাজ হিমগিরি সকলের সাহায্য প্রার্থনা করে কেউই তাঁকে সাহায্য দিলেন না, বিফল হলেন। রাজা দণ্ডী গত্যন্তর না দেখে আকাশ-পাতাল শূন্য দেখতে লাগলেন। নিষাদরাজ নল-দময়ন্তী। শ্রীবৎস-চিন্তা যেমন সংকটে পড়েছিলেন ; গ্রহ বিপর্যয় হেতু অবন্তীরাজ দণ্ডীর অনুরূপ অবস্থা ঘটেছে। হায় ... হায় ... তিনি কোনো চিন্তা করতে না পেরে কেবল অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন ; বাদরায়নি বললেন, মানুষ স্বভাবত দুর্বল ; সেইজন্য সে পদে পদে বিপন্ন হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে রাজা-প্রজা-ধনী-দরিদ্র কোনো ভেদ নেই। তবু লোকে আপনার অবস্থা ও পদকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করতে অভিলাষী হয়ে থাকে ; ইহা প্রকৃতিসিদ্ধ। নারদ বললেন, এই মোহময় সংসারের গতি কি বিচিত্র .... যাঁরা কিছুই অভাব নেই, সেই নারায়ণও উর্বশীর জন্য চিন্তামগ্ন—উর্বশীকে তাঁর চাই-ই। এই সংসারে সবাই সুখের ভাগী। ২টি জিনিস মানুষ না মরলে ত্যাগ করে না। করতে পারে না। এক ধনের আকাঙ্ক্ষা ও বেঁচে থাকার ইচ্ছা। মনীষীগণ বলেছেন শারীরিক বল, বল নহে। মনের বলই প্রকৃত বল।

ভয়কে ততক্ষণ ভয় করবে যতক্ষণ ভয় উপস্থিত না হয়। ভয় উপস্থিত হলে আর ভয় করতে নেই। ভয়ের মোকাবিলা করবে।

মহাঋষি শমীক তাঁর পুত্র শৃঙ্গীকে বলেছিলেন, হিংসা একটি মহাপাপ। হিংসাই সাক্ষাৎ নরক, অহিংসা স্বর্গস্বরূপ। মানুষের স্বভাব অপরাধ করা। কিন্তু তপস্বীর স্বভাব এমন হতে পারে না। শৌনিক জিজ্ঞাসা করলেন হে সূত! মনুষ্যযোনিতে জন্ম নিতে বিদ্যাধরের এত আপত্তি ছিল কেন?

সূত বললেন, ভগবন ... বিদ্যাধরের ঐ রূপ অনিচ্ছার কারণ হল, মানুষের কিছুই ভালো না। মানবজাতি অল্পায়ু অল্পভাগ্য, অল্পাহারী, অল্পবুদ্ধি, জ্ঞান সত্ত্বেও তার জ্ঞান নেই। বিদ্যা সত্ত্বেও বিদ্যা নেই এবং বিবেকহীন। এরা পূর্বাপর কার্য করতে জানে না। তারা ভবিষ্যতে জ্ঞানবিরহিত। সুতরাং পশু অপেক্ষা হীন বোঝা যায়।

পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। কিন্তু তারা ভবিষ্যৎ ভেবে কার্য করে ; তজ্জন্য তারা স্ত্রী-পরিজন নিয়ে শান্তিতে বাস করে। মানুষ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সর্বদা শশব্যস্ত দেখা যায়। একদা ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে মহাতপা দুর্বাসার চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। তিনি ইন্দ্রিয়গণের সন্তুষ্টি বিধানে অভিলাষ করলেন। তিনি গাত্রোত্থান পূর্বক ধরণি পর্যটন মানস করলেন। কিন্তু কোথাও তাঁর প্রীতি সম্পাদনের উপায় দেখতে পেলেন না ; সুরপুরে সর্বলোকোত্তর অপার স্বর্গীয় বিভব দর্শন করতে করতে এক সময় তাঁর মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং শচীপতি ইন্দ্রের কাছে বললেন— "তুমি অবশ্য শুনে থাকবে, আমি ব্রহ্মসাধন কামনায় সহস্র বর্ষব্যাপী

কঠোর তপস্যা করেছি তোমাদের কল্যাণের জন্য ; আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে"। কিন্তু, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রার্থনা পূর্ণ করতে এ যাবৎ সমর্থ হইনি। সেই কারণে এখানে উপস্থিত হয়েছি। পার্থিব সকল বিষয় আমি উপভুক্ত হয়েছি, এখন স্বর্গীয় কৌতুকাদি বিষয় ভোগ হলে ইন্দ্রিয়গ্রামের চরম তৃপ্তি হয়। স্বর্গের পর ব্রহ্মধান তার পর বৈকুণ্ঠধাম ঐ সমস্ত লোকে কোনোরূপ ইন্দ্রিয় ব্যাপার নেই তৎস্থানে যাব না। সেই অমরাবতীতে মলয় সমীরণ মৃদুমন্দ গতিতে সর্বক্ষণ প্রবাহিত হচ্ছে। আশ্চর্য ... উহার সুখময় শীতল স্পর্শে মর্ত্যলোকের ন্যায় কামের আবির্ভাব হয় না। বরং নিরুপম ব্রহ্মানন্দের সঞ্চারই হয়ে থাকে। মহাতপা দুর্বাসার পদস্পর্শে মন পবিত্র পরম প্রফুল্ল হয়ে আপনাকে কৃতকৃতার্থ বোধ করলেন"।

ব্রহ্ম স্বরূপেতে নিয়তির স্থান নেই। এই ছবি দেখানো হল।

এখানে নিয়তির স্থান নেই, বন্ধন নেই, দুঃখ নেই, সুখ নেই, ব্রহ্ম কৈবল্যরূপ। একে ব্রহ্মানন্দ বলা হয়। যেমন কর্ম তেমন ফলই 'নিয়তি'। যে কারণের যে ফল বিলম্বে বা সত্বর তা ঘটবেই ঘটবে ইহাই নিয়তি।

মনীষীগণ লিখে গেছেন— সর্বথা সর্বে প্রথমে আত্মাকে রক্ষা করতে হয়, ইহা শাস্ত্রের নির্দেশ সংসারে শিষ্ট-শান্ত, বিনয়ী হওয়া সকলের উচিত।

লোকের হিতসাধন করা পরম কল্যাণকর কাজ। আত্মতৃপ্তি ও মঙ্গল হয়। সকলের প্রীতিভাজন ও আত্মীয় হবার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। কারও স্তুতিনিন্দায় কর্ণপাত করা উচিত নয়, ঈশ্বরের প্রতি অটল ও অকৃত্রিম ভক্তি রাখা পবিত্র মনের পরিচয়। পবিত্র মন সকল সুখের আশয়। কোনো মানুষ এতটুকু দুঃখ পেতে চায় না অর্থাৎ সুখবাদী। অপবিত্র অশুচি, কদাচার, কু-রীতি ব্যভিচার, মিথ্যাচার এ সবই দুঃখের সোপান।

আত্মাকে সকল শাস্ত্রই ব্রহ্ম বলে নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রহ্ম সর্বজীবে, সর্বভূতে বিরাজিত আছেন। আত্মা সকলের মধ্যে আছেন তিনিই অন্তর্যামী। ঈশ্বর—প্রাণ, মহেশ্বর-কাল, অগ্নি নামে পরিচিত আছেন। তিনিই প্রপঞ্চ ; তিনিই বেদ বলে বিদিত। বিশ্ব তাঁরই দ্বারা উৎপন্ন এবং তাঁতে লয় হয়ে থাকে। তিনিই মায়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বিবিধ দেহ সৃষ্টি করেন। কিন্তু ; আত্মা ও মায়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন রৌদ্র ও ছায়া, পরস্পর ভিন্ন। রৌদ্র না প্রকাশ হলে ছায়ার অস্তিত্বও থাকে না। আত্মা-নিত্য, সর্বত্র, সাক্ষীস্বরূপ দোষহীন। তাঁকে পরমান্বিত বা অদ্বৈতই বলে থাকেন।

প্রতিটি জীবন আত্মা, প্রতি আত্মাই প্রপঞ্চ। প্রতিপ্রপঞ্চই মায়া।

মায়া = মৃত্যু ও নিয়তি।

জীবন = আত্মা ছায়া ও রবির কিরণ এবং প্রপঞ্চ।

এই সূত্রে খ্রি. পূ. ৩য় শতকে লেখা বস্তুবাদ বৌদ্ধ গ্রন্থ। সেখানে—বৈষ্ণব—সৌর—শৈবতন্ত্রের কথা আছে, কিন্তু শক্তিপূজার কথা নেই। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে শক্তির পূজক ছিলেন তার পরিচয় আছে।

যাইহোক—পঞ্চরাত্র সংহিতার মতে—প্রলয়কালে সৃষ্টি আরম্ভের পূর্বে বাসুদেব কৃষ্ণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডলীন হয়ে যায়।

স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টির বাসনা যখন জাগে তার সেই ইচ্ছাকে মহাশক্তি স্ত্রীদেবীর মধ্যে

সম্প্রসারণ করেন সমস্ত কারণ একীভূত হলেই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। শুদ্ধ সৃষ্টির প্রথম প্রকরণ জ্ঞান, বল, বীর্য, ঐশ্বর্য, শক্তি ও তেজ। এইটি গুণোন্মেষ দশা এই ছয়টি গুণ আবার শ্রমভূমি ও বিশ্রামভূমি ২ ভাগে বিভক্ত আছে। এই শ্রমভূমি ও বিশ্রামভূমির মিলনই ব্যূহবাদ। বৌদ্ধগ্রন্থতে বৈষ্ণব—সৌর—শৈব পূজকদের কথা আছে, কিন্তু দেবী পূজকদের কথা নেই। অথচ বৌদ্ধগণ দেবীপূজা করতেন তার প্রমাণ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে—সেখানে পাখিরা চতুর্ব্যূহ সিদ্ধান্তের কথা বলেছে, নারায়ণের সগুণ, নির্গুণ রূপটির বাসুদেব শুক্লমূর্তি সে রূপের বর্ণনা হয় না। সেই পবিত্র মূর্তি সর্বকালেই বিদ্যমান। ভূতঞ্চ বিষ্ণু ভবনঞ্চ বিষ্ণু। গীতায় তাই 'বাসুদেব সর্বমিতি'। দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ। তৃতীয় প্রদ্যুম্ন। চতুর্থ নারায়ণ। পঞ্চম অনিকদ্ধ। অনিরুদ্ধ হলেন প্রজা পালনকারী মূর্তি।

এই তত্ত্ব বায়ুপুরাণে নৈমিষ্যণরণ্যে সূত কর্তৃক ব্যক্ত হয়েছে যে—

মনুষ্য প্রকৃতি দেবান কীর্ত মানান্নিবোধিত সঙ্কর্ষণ,

বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব এব চ অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে বংশবীরা প্রকীর্তিতা।

এখানে মনুষ্যদেহধারী দেবতারূপে পূজিত পাঁচজন বংশবীর (বৃষ্ণিবংশ) তাঁদের বর্ণনা করা হল। বাসুদেব অর্থ কি কৃষ্ণ হবেন? তা যদি হয় তাহলে বলা যায়—কৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব এবং অনিরুদ্ধ এই পাঁচজন হয়। সঙ্কর্ষণ মানে? পাঞ্চরাত্র ও ব্যূহবাদে সঙ্কর্ষণ মৎস্যরূপে পৃথিবী ধারণ করে আছেন বলা হয়েছে। তাই অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। বাসুদেব ভগবানের রূপ, যে রূপের কোনো বর্ণনা করা যায় না। সেখানে কেবল যোগীগণ পৌছোতে পারেন মাত্র। তাহলে বাসুদেবকৃষ্ণ মনুষ্যরূপে নরলীলা করতে পারেন না। এইটাই সংগত ব্যাখ্যা হয়। বসুদেবপুত্র কৃষ্ণ সংসারের প্রতি বীতরাগ তথা বনবাসী। শিব পুরাণ দ্রষ্টব্য। অতএব বৈষ্ণব —তন্ত্র মতে কৃষ্ণ নর কৃষ্ণলীলার অধিকারী হলেন, ভাবাই যায় না।

শুধু তাই নয়। আরো জিজ্ঞাসা আছে। গরুড় পুরাণে কৃষ্ণের শালগ্রাম। যার বর্ণনা এইরূপ, যথা— কৃষ্ণ নামক শালগ্রাম নীলবর্ণ, ত্রিষ্ঠ রেখা-অঙ্কিত স্থূল চক্র কূর্মচিহ্ন-বিশিষ্ট বিন্দুযুক্ত বর্তুলাকার ও উন্নতপৃষ্ঠ বলা হয়েছে।

৪৫ অধ্যায় ১৯ শ্লোক ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ঐ অধ্যায় ৭নং শ্লোকে বাসুবেদের শালগ্রাম বর্ণনায—চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম স্থিত শিলাকে বাসুদেব বলা যায়। ১নং শ্লোকে আছে যে, শালগ্রাম শিলাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চিহ্ন আছে। তাহার নাম কেশব।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় পৃ. সপ্তম দ্রষ্টব্য। রুদ্র কহিলেন হে হরে .... সংক্ষেপে বলো বিষ্ণুরূপী সূর্যদেবের পূজা করলে ইহকালে ভোগ ও পরকালে মুক্তি লাভ হয় কি?

বাসুদেব বললেন, হে রুদ্র ! পুনর্বার সূর্যার্চণ বলেছি শ্রবণ কর। শিবপুরাণে হরে, অর্থ শিবকে বলেছে। ব্রহ্মা, শিবের যে সহস্রনাম বর্ণনা করেছেন সেখানে হরে সম্বো ত্রয় স্ত্রিংশ অধ্যায়, পূর্ব খণ্ডম দ্রষ্টব্য। মহেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—হে গদাধর তুমি আমায় নিকট সুদর্শন পূজা বল। হরি বললেন, হে বৃষধ্বজ। সুদর্শন পূজা বলছি শ্রবণ করো।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়—পূর্ব খণ্ডম দ্রষ্ট্য।

মহেশ্বর বললেন হে হৃষীকেশ, হে গদাধর পুনর্বার দেবার্চন বল। তিনি হয়গ্রীবদেবের

পূজা বলেছেন। এবং মূল মন্ত্র স্মরণ করত শঙ্খ পদ্মাদি মুদ্রা প্রদর্শন করবে বলেন। এইরূপে হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণুর ধ্যান করে মূল মন্ত্রে পূজা করবে বলেছেন।

একে একে তিনি গায়ত্রীর ছন্দ ঃ ন্যাগাদি—প্রাণায়াম, বলেছেন।

হরি মানে কোনো দেবতা বোবার চেষ্টা করেছি মাত্র। হরি মানে, হৃষীকেশ বা গদাধর জানা গেল। বাসুদেব ও কৃষ্ণ যে ভগবান নন্ দেবতা মাত্র ; এইরূপ গরুড় পুরাণ প্রতিপন্ন করেছে।

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর আরাধনা করেন না এই বোঝা যায়।

গরুড় পুরাণ মতে, বাসুদেব ও কৃষ্ণ ভগবান নন। সেখানে ভগবান হরি, হরে অর্থাৎ গদাধর, হৃষীকেশ বোঝায়। পঞ্চরাত্র / ব্যূহবাদ ইত্যাদিতে বাসুদেবকে, ভগবানের শুক্ররূপ বলা হয়েছে। ব্রহ্মবাদীগণ প্রণবকে ভগবান জ্ঞান করে থাকেন। গরুড় পুরাণের মতে, এক বিষ্ণু হতেই বাসুদেব / সঙ্কর্ষণ / প্রদ্যুম্ন/ অনিরুদ্ধ / নারায়ণ বলা হয়েছে, এই পঞ্চরূপই হল বৈষ্ণবদের পঞ্চতত্ত্ব যথা—গৌর, গদাধর, শ্রীবাস, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ।

ইহা ভয়ংকর ব্যাপার। ভীষণ ব্যাপার ! এসব মনে করতে শিহরণ আসে। গরুড় পুরাণ ৬৫ পৃষ্ঠা ৩২ পূর্ব মণ্ডলম্ দ্রষ্টব্য ২-৫ শ্লোক।

হরি, পবিত্র ও কলিদোষ বিনাশক পঞ্চতত্ত্ব শ্রবণ করে সেই অদ্বিতীয় অব্যয়, শান্তশীল, পরমাত্মা, সনাতন, বসুদেবতনয় বিষ্ণু নিশ্চল, শুক্রস্বভাব, সর্বব্যাপী ও তেজোময়। হে মহাদেব। সেই এক বিষ্ণু ত্রিভুবনের হিতসাধনের জন্য নিজ মায়ায় পঞ্চরূপ মাত্রা করেছেন। এক বিষ্ণু বাসুদেবরূপে, সঙ্কর্ষণরূপে, প্রদ্যুম্নরূপে, অনিরুদ্ধরূপে ও নারায়ণরূপে বিভক্ত হয়েছেন।

পূজাবিধি বলেছেন—

আত্মাকে পরমেশ্বর বাসুদেব স্বরূপ চিন্তা করে আসনপূজা করবে, তারপর ধাত্র নমঃ, বিধাত্রে নমঃ, পত্রে বাসুদেবের অগ্রভাগে গরুড়ায় নমঃ, মণ্ডল মধ্যে ওঁ শঙ্খায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, ওঁ গদায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ এই সকল অর্চনা করবে। আত্মা-বাসুদেব, বাসুদেব বাহন গরুড় দেখা যায়। বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব। আত্মাস্বরূপ বাসুদেব চিন্তা করবে। কিন্তু কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন কি করে হয়? উপরে লিখিত বিবরণ পড়ুন। দেখুন। বুঝুন।

হিন্দুধর্মের সকল শাস্ত্র মতের ব্রহ্মাণে বক্তব্য কি বলছি— আমি—। "হরি" যিনি সংস্রাফ, সংস্রপাদ, সহস্রোরু, সহস্রবাহু, সহস্রবদন, সূক্ষ্মতম, স্থূল হইতে গুরু হইতে (৩ম) ; বেদের বাকে অনুবাকে, ব্রাহ্মণকাণ্ডে, উপনিষদে, সামে যে সত্যকর্মা সত্যরূপী তিনিই হরি। আবার তিনিই সূর্য বিষ্ণু হরে ব্রহ্মা ইত্যাদি। অতএব বিষ্ণু সূর্যের একটি নাম হেতু—ধরা হল। অতএব হরে নামের পঙ্‌ক্তিতে রাম ও কৃষ্ণ বসতে পারেন না ; (বসুদেবপুত্র কৃষ্ণ বলা হল), নাম উচ্চারিত হতে পারে না। ভগবান আর দেবতার ভেদ। যেমন ভক্ত ও ভগবানে ভেদ এখানে বাসুদেব কৃষ্ণ বলা যায়। যোগশাস্ত্রে বিষ্ণুকে আত্মতত্ত্ব সেই ভগবান বলেছে, বলা যায়। শক্তির সাধক ব্যূহবাদীগণ ভগবান বাসুদেবকে (কৃষ্ণকে) সেই ব্রহ্মজ্ঞান করেন। কেবল কৃষ্ণ নন (বাসুদেব) পাঞ্চরাত্র—সাধকগণ, বাসুদেবকে সেই ভগবান জ্ঞান করেন।

গরুড় পুরাণ পূর্ব খণ্ডে ৭ম অধ্যায় ১ ও ২ নং শ্লোক অনুসারে হরি অর্থে ব্যাস !

যেন গোলোকধাঁধার পাকে ধর্ম তৈয়ারি হয়েছে—।

অতএব এই আলোচনায় কোনো প্রয়োজন নেই।

ব্যূহবাদে বাসুদেব কৃষ্ণ ভাগবান

পঞ্চরাত্র বাসুদেব ভগবান

ভক্তিবাদে চৈতন্যদেব হরি বোঝেন ভগবান হরে নন।

নিছক কৌতুক বলতে পারেন। কিন্তু না। সত্য অনুসন্ধান চাই-ই চাই। হরে, রুদ্র, শিব একই।

গরুড় পুরাণ মতে, ১৪৮ অধ্যায় ৩৪০ পৃষ্ঠা ব্রহ্মা বললেন, হরি বংশ কীর্তন করছি। ইহাতে কৃষ্ণমাহাত্ম্য উত্তমরূপে প্রকাশিত আছে।

বসুদেব ঔরসে দেবকীর গর্ভে বাসুদেব কৃষ্ণ ও বলদেব জন্মগ্রহণ করেন।

এখন বৌদ্ধদের ব্যূহবাদ স্মরণ করতে হয়। কারণ সেখানে সুদর্শন, শ্রীহরি, অচ্যুত, ত্রিবিক্রম, চতুর্ভুজ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, পুরুষ এই দশজন দেবতা ভগবানের অংশ বলা হয়।

অতএব বৈষ্ণবতন্ত্রে বাসুদেব কৃষ্ণ নামে একজন নতুন দেবতার সৃষ্টি হল। আসল কথা, তত্ত্ব অন্যরূপ আছে। সেই তত্ত্বের অনুসরণ করলে অর্থও আছে। অন্যথায় কোনো মূল্য নেই ; নিছক রূপক গল্প থেকেই যায়।

যাইহোক, শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব কৃষ্ণ বলতে হবে। কেবল কৃষ্ণ বলা যায় না। পুনরায় হরে সম্পর্কে ভিন্নমতটি অনুধাবন করুন। ত্রিপুর বিজয়ের পর স্বয়ং ব্রহ্মা ও দেবগণ শিবের যে সহস্র নাম স্তব করেছেন সেখানে হে—হরে ! সম্বোধন করে সহস্র নাম জপ করেছেন। শিব হর হরে, এঁর পিতামাতা নেই। ব্রহ্মা—বিষ্ণু—শিব বেদের যুগের দেবতা মাত্র। এঁরা ভগবান নন, কিন্তু ! সেই অর্থে —রাম—কৃষ্ণ এঁদের পঙ্‌ক্তিতে হরে নাম উচ্চারণ হয় না। রাম, কৃষ্ণ, শিব এক হতে পারেন না। শাস্ত্রবাদ দিয়ে ধর্ম হয় না !

আচারে ধর্ম, বিচারে পণ্ডিত। এই প্রবাদবাক্য বা নীতি নিহিতম গুহায়ামন —কিন্তু তত্ত্ব কেবল তত্ত্ব মাত্র থেকে যায়। মূলে কোনোদিন বিভেদ নেই। অন্তত হিন্দুধর্মে তাই প্রতিপন্ন হয়ে আছে। এর ব্যতিক্রম হিন্দুধর্মের বিষয় না। যে কেউ ধর্মের ব্যাখ্যাতা হতে পারেন না। সাধু—সন্ন্যাস—পরমহংস —অবধূত কচীচক যোগী। কোন্‌টি শ্রেয় বোঝেন, অতএব পথটি আপনি ঠিক করবেন, কোনো হুজুগ, খেয়াল, যথেচ্ছাচার, অনীতি ধর্ম হয় না, হতে পারে না, তাতে কল্যাণ হয় না। অষ্টা যোগ, অষ্টাঙ্গ ন্যাসই সকল ধর্মের স্বরূপ প্রকট করে এর বাইরে কোনো কিছু নেই। শিবকে শক্তি। শক্তিমান বলা হয়, তাঁর সাধনা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবকে তাই অষ্টম গর্ভে জন্ম নিতে হল। বলদেবতা গুরুদীক্ষা মাত্র। গুরুদীক্ষা শিষ্য এর মধ্যে সঞ্চারিত হলেই মুক্তি হয়। দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে সঞ্চালিত করার এই অর্থ হয়। অন্যথায় বাজে কথা। অশাস্ত্রীয় কথা প্রতিপন্ন হয়। একটা স্থূল জিনিস এক শরীর থেকে অন্য শরীরের মধ্যে প্রতিস্থাপন, হাওয়াভরে হয় না কি ? কোনো ভগবানের কাজ নয় ! ভগবানের চেয়ে মানুষের ক্ষমতা বেশি—এর জন্য চাই পুরুষকার।

অষ্টাঙ্গ যোগের প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, যম নিয়ম আগম প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা

সমাধি অষ্টাঙ্গ ন্যাসকরণঃ—প্রথম কর্ম। ওঁ নমঃ বাসুদেবায় নমঃ মস্তক। শ্রীধরায় নমঃ মুখে জল দিবে। কৃষ্ণায় নমঃ কণ্ঠে। শ্রীপতয়ে নমঃ বক্ষদেশ। কেশবায় নমঃ উদর। ত্রৈলোক্যপ্রত্যয় নমঃ কক্ষে। সর্বপতয়ে নমঃ মেঢ্রদেশ।

তাই বলছিলাম, বাসুদেবকৃষ্ণ বলতে হবে, মস্তক বাদ দিয়ে অন্য কিছুই চিন্তা করা যায় না।

আত্মা = ব্রহ্মা, শুদ্ধ, শান্ত, সূক্ষ্ম, সনাতন অন্তর্যামী এইরূপ নাম আছে। তিনি ঈশ্বর, প্রাণ, মহেশ্বর, কাল ও অগ্নির দ্বারাই প্রপঞ্চ উদ্ভূত। তিনিই বেদ বলে শাস্ত্রের মত। ইহাই হিন্দুধর্ম।

ধর্মাত্মা মহাত্মা কোনো ব্রহ্মচারী পুরুষ দ্বারা নিজের সর্বনাশ ঘটালেন, পতিত হয়ে গেলে অইন্তের ক (অনৃতের দ্বারা যাকে আচার বহির্ভূত বলা হয়) দ্বারা। হিন্দুশাস্ত্রে বেদরূপা "গায়ত্রী"কে বলা হয়।

গায়ত্র্যে পরো বিষ্ণু গায়ত্র্যেব পরো শিবঃ।
গায়ত্র্যে পরো ব্রহ্মা গায়ত্র্যেব ত্রয়ী ততঃ
দেবত্রয়ং স ভগবানসহস্ত মালী দিবাকর
সর্বেষাং মহস্যাং রাশিঃ কালঃ কালপ্রবর্তকঃ।

গায়ত্রী জপ ত্রিসন্ধ্যা ঃ তিন অঞ্জলি জল অর্পণ প্রার্থনা সূর্যদেবের। সূর্যদেব মন্দার অসূর নাশের জন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা তিন অঞ্জলি জলের আশা করেন।

তাই গায়ত্রীপাঠে ও কর্মে মোক্ষলাভ দূরের কথা পৃথিবী সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করতে মুনি বলে কীর্তিত আছে। বিশ্বামিত্র মুনি ক্ষত্রিয় হয়ে ও ব্রাহ্মণ হলেন এই গুণেই।

সংসার জীবনে যত ভালোবাসা-প্রেম-প্রীতি বিস্তার করা হয় ততই তার জন্য শোক শঙ্কুল লিখিত হয়, একে সংসারাসক্ত ভাব বলা হয়। সংসারাসক্ত ব্যক্তি অনত্র গেলেও তার চিত্ত বিচলিত হয়—বাড়ির জন্য। ইহাই অশান্তির কারণ, দুঃখের মূলীভূত কারণ, সংসারে জন্ম গ্রহণ করার সময় দুঃখ, মরণে দুঃখ, যমালয়ে দুঃখ এইরূপে আবার জন্ম। আবার অনুরূপ ঘটনা এই রীতি নিয়েই জগৎ জীবন। কর্মদ্বারা উহা নিবারিত হয়, সেই সুকর্মের লালন-পালন আমাদের ধর্ম নামে অভিহিত আছে।

সংসারীর পুত্রার্থীর! ইহাই মহৎ ধর্ম বলা হয়। পুত্র—পুন্নাম্ নরক, শিষ্য—শেষ নরক হতে উদ্ধার করেন। শেষ পাপ কি? দেব—ঋষি—ভূত—সংকর বর্ণের ভেদ-রহিত পাপ; পিতৃদিগের ঋণ শোধ না করার পাপ, লোকের যশঃ, অপহরণ করা, ব্রাহ্মণ হয়ে যে ঘৃত বিক্রয় করেন, চণ্ডালাদির দান গ্রহণ করেন, তার জন্য পাপ হয়। এইগুলিকে শেষ পাপ বলে জানবে।

সংসারের একটা মায়া বন্ধন আছে ইহা কেমন তার জন্য রাজা সুরথও সমাধিবৈশ্য গল্পটা জেনে নিও, ভালো লাগবে। মূলত সংসার জীবন সংসার বন্ধন সংসার মোহ; ইহাই জগৎ স্থিতির কারণ! শাস্ত্রজ্ঞান এইজন্য সব মানুষের দরকার। শাস্ত্রাদিতে আছে ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ। উক্ত চিরন্তন ভাবরাজির সাথে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারলেই সুন্দর জীবনের অধিকারী হওয়া যায়। দেশপ্রেম,

নীতিবোধ, ধর্মবোধ সবকিছুরই ভাবের আধার, জ্ঞানের আধার পুরাণ ইতিহাসসমূহ। আমি বলেছি মানুষ যেন ধর্ম নিয়েই জন্মায় ; এ যেন কোনো কালের অমোঘ বিধান! এজন্য শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার দরকার দেখি না। গীতার ১৭ অধ্যায় সত্তঃ, রজঃ, তমঃ গুণের ব্যাখ্যা আছে। সমাজজীবনে বা সকল জীবনের আশ্রয় ঐ তিনগুণ। কমবেশি—অধিক মতাবেক চালচলনে বাক্য বিনিময়ে অবয়বে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। সেই মতো সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক—দৈনন্দিন কাজ কর্মে পরিগণিত হোক, এতেই কল্যাণ হবে।

তপস্যা তিন প্রকার হয়—শারীরিক, বাঙ্ময় ও মানস। কোনো পূজা পাঠ দান ধ্যান ব্যাপারে—ঐ তিন ভাব প্রকট হয়। যার যেমন ভাব। মানুষ সর্বদা গ্রহ পরিচালিত বটে। জন্ম তিথি এইজন্য সহায়ক ঘটনা। শাস্ত্রে বলে বশিষ্ঠ পুরোহিত, পবিত্র বিবাহ লগ্ন, ও বার তিথি, তথাপি সীতা জনকনন্দিনীর দুঃখের অন্ত নেই।

দান করলে মঙ্গল হয়, ধর্ম হয়, মহৎ কাজ হয়। কলিতে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম লিখিত আছে। কিন্তু! দেশ—কাল—পাত্র বিচার করতে মানুষের সকল কাজেই ঐ তিন অবস্থা বিচার্য। কোনো সময় ভুল হলে হবে না, চলবে না।

"ওঁ, তৎ, সৎ।

এই তিন রকম পরমাত্মার নাম। এই হল বৈদিক সুক্তের ব্রহ্ম, যজ্ঞ ও বেদ। "ওঁ" এই উচ্চারণ করেই ব্রহ্মবাদীগণ যজ্ঞ দান তপঃ কার্যাদি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন।

সদ্ভাবে সাধুভাবে সৎ শব্দ প্রযুক্ত। যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের মতো কর্মকে তাই সৎ কর্ম বলে চিহ্নিত করা আছে। তৎ শব্দ মোক্ষকাগণ কোনো ফলাদির আশা না করেই তৎ শব্দ ব্যবহার করেছেন। শাস্ত্রে সন্ন্যাস ও ত্যাগ দুটি কথা আছে। ইহা কেমন?

কাম্যানং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং করয়ে বিদূঃ।
সর্বেকর্মে ফলংত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ। গীতা ১৮/২ দ্রঃ।

কর্মের ৩টি ভাব।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা কর্মের প্রবর্তক। করণ—কর্ম—কর্তা কর্মের আশ্রয়।

জ্ঞান, কর্ম, কর্তা। ইহাও তিন প্রকার। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, কার্য-অকার্য, ভয়-অভয় বন্ধ-মোক্ষ, এই সকলকে জানার বুদ্ধি আছে। উপায় আছে। প্রয়োজন হলে জানা যায়

গীতা ১৮/১৮ দ্রষ্টব্য।

মনুসংহিতায় বলে, বাসনা ছাড়া কোনো কর্ম হতেই পারে না। কর্ম ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচে না। মলমূত্র ত্যাগও কর্ম। একই কথা বলেছে গীতায় ৩/৫ শ্লোক

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ।

আদিকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা "যজ্ঞসহ কৃত প্রজা" উৎপাদন করে বলেছিলেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে থাকো। যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণের সংবর্ধন করো, সেই দেবগণও তোমাদিগকে আপ্যায়িত করুন। এইভাবে পরস্পর সম্বর্ধিত হলে পরম মঙ্গল লাভ করবে।

মনুসংহিতা ঃ ৩/১০-১১ দ্রষ্টব্য।

আমরা মানুষ, ক্ষুদ্র পিপাসু মাত্র। আমাদের কর্মফলাকাঙ্ক্ষা জোরদার সন্দেহ নেই। ফল

ঈশ্বর দেবেন ঠিক আছে। কিন্তু! আমার কর্মটা কেমন নিষ্ঠাযুক্ত হল তা দেখতে হবে! ফল ফলবেই। দৈবের চেয়ে পুরুষাকার বড়ো এইজন্য বলেছে। "দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"

জগতে নারী আর পুরুষ। পুরুষ আর প্রকৃতি (এখানে "স্ত্রীলিঙ্গ") অষ্ট প্রকৃতি বলে, সেই প্রকৃতির দ্বারাই জগদ্ধৃত আছে।

গীতা ৭/৪।৬ দ্রষ্টব্য।

বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত শাস্ত্র, বৈষ্ণবশাস্ত্র এইরূপ পথই প্রচারিত আছে। ঐ সকল পথের পথিকরা মনে করেন, আমরা যে পথের পথিক সেইপথই ভালো। মানুষের রুচি বিচিত্র, তাই পথও বিচিত্র। পথের এই বিভিন্ন যে-যে পথেই যাউক গম্য "তুমি"। এই কথাশাস্ত্র বলেছে।

শ্রেষ্ঠ সংহিতাকার মানবশ্রেষ্ঠ মনু বলেন, সকল মানুষ বেদাধ্যয়ন, মদ্যপানরহিত, ব্রতানুষ্ঠান, হোমকার্য, ত্রৈবিদ্য নামক বিশেষ ব্রতপালন, দেবতা ঋষি পিতৃতপর্ণ, পুত্রোৎপাদন কর্ম দ্বারা এবং ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টো দ্বারা দেহবিচ্ছিন্ন আত্মাকে ব্রহ্ম প্রাপ্তর যোগ্য করিবেক।

মনুঃসংহিতা ২২/১৮ দ্রষ্টব্য।

১০। জ্ঞানভারতী "শাস্ত্রসার"

(১) আচারে তিষ্ঠতঃ আর্যঃ, অনার্য অনাচারেৎ।

(২) বিদ্যা বিনয়ং দদাতি, বিনয়াদ্‌জাতি পাত্রত্বাৎ পাত্র্যৎতৎ ধনমাপ্নোতি ধনাৎধর্মো ততো সুখম্‌।

(৩) আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিত।

(৪) শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্‌।

(৫) মনসা চিন্তিতম্‌ কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ অন্যলক্ষিত কর্মস্য যতঃ সিদ্ধির্নজায়তে।

(৬) যস্মিন্‌ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ণ চ বান্ধবাঃ ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তৎ দেশং-পরিবর্জয়েৎ।

(৭) গুরুরগ্নি দ্বির্জাতীনাং বর্ণনাং ব্রহ্মণো গুরুঃ পতিরেকো গুরুস্ত্রীনাং সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ।

(৮) অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্‌ থোমো দৈবোঃ বলি ভৌতো নৃযজ্ঞোহং তিথি পূজনম্‌।

(৯) যস্য ন জ্ঞায়তে নাম ন চ গোত্রং ন চ স্থিতি অকস্মাদ্‌ গৃহমায়াতি সোহতিথি প্রোচ্যতে বুধৈঃ।

(১০) তস্করস্য কুতো ধর্মো দুর্জনস্য কুতঃ ক্ষমা।
বেশ্যানাঞ্চ কুতঃ স্নেহঃ কুতঃ সত্যঞ্চ কামীনম্‌।

(১১) কষ্টবৃত্তি পরাধীনা কষ্টো বাসো নিরাশ্রয়ঃ
নির্ধনো ব্যবসায়শ্চঃ কষ্টসর্বরিদ্রতা।।

(১২) বেদ বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ।
আর্শীবাদপরো প্রাজ্ঞ সঃ পুরোহিত তথা।।

(১৩) কিং করিষ্যন্ত বক্তাবঃ শ্রোতা যত্র ন বিদ্যতে
নগ্নক্ষপনকো দেশে রজকঃ কি করিষ্যতি।।

(১৪) যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ নৃনাং প্রজ্ঞা প্রজায়তে
তৎ পদং প্রযুজ্যতে চাণক্যেন যথা বিধুঃ। শ্লোকগুলির বাংলা অর্থ সকলের বিদিত। তবু সংক্ষেপে নিহিতার্থ এই রূপ।

সদাচার—আর্য। অনাচার—অনার্য। শাস্ত্র বহির্ভূত কর্মই অনাচার। বিদ্যা মানুষকে বিনয়ী করে, সৎ হতে পবিত্রতা হতে, ধনলাভের সহায় হয়। সুখ—হয়, ধর্ম কর্মে মন প্রণোদিত হয়। সদাচার কর্মের সহায় হয় কাজে উন্নতি হয়। আর সর্বদিক বিবেচনা করে চলাই জ্ঞানীগুণীর লক্ষণ। এই মানবশরীর ব্যাধির আগার। শরীরের প্রতি যত্নবান হতে হয়। যে দেশে বা স্থানে মানসম্মান থাকে না, বান্ধব থাকে না, জ্ঞানীগুণীজন বাস করেন না, সেই স্থানে বাস করাই উচিত নয়; কেন-না ন্যায়-অন্যায় কোনো কিছু বোঝবার অবকাশ থাকে না। অগ্নি ব্রাহ্মণের গুরু, ব্রাহ্মণ বর্ণগুরু জাতির গুরু, স্থানীয়, স্ত্রীলোকের স্বামীই গুরু। অতিথি সকল সময় সকলেরই গুরু। বেদপাঠ-ব্রহ্মযজ্ঞ বলে বিবেচিত তর্পণ করাই পিতৃযজ্ঞ, হোম, পূজাপাঠ, দেবযজ্ঞ, বলিদান, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যসেবা, অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ নামে খ্যাত।

অজ্ঞাত কোনো মানুষকে আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, ইহাতে বিপদ ঘটতে পারে।

চোরের ধর্ম নেই, দুর্জনের সঙ্গ ভালো না।

স্নেহ ভালোবাসা প্রকৃত প্রেম বারবনিতার কাছে পাওয়া যায় না।

পরের অধীনে যার জীবিকা নির্ভর তার ভীষণ কষ্ট। ধনহীন ব্যবসায়ী ও আশ্রয়হীন ব্যক্তি সমান দুঃখে দুঃখী।

দারিদ্রতাও বহু দুঃখেরই।

পুরোহিত কাকে বলব? বেদজ্ঞ-শাস্ত্রজ্ঞ-সদাচারী ব্যক্তিই প্রকৃত পুরোহিত।

ভালো বক্তা কি করবে! যদি শ্রোতা না থাকে। গরিব, রুচিহীন লোকের বাস যেখানে থাকে সেক্ষেত্রে ধোপার কোনো দরকার হয় না। বিধান ব্যক্তিকে দেখে বোঝা যায়, কথা-বার্তার মাধ্যমে আরো পরিষ্কার জানা যায়। বিদ্যার একটা রূপ আছে, তা অবয়বে ফুটে ওঠে। এইরূপ নীতিশাস্ত্রের মতো দেখা যায়।

"মহাকাব্য" জ্ঞান ভারতী (শাস্ত্র-সার) ২৯৭/৩২৮

জ্ঞানমার্গ না পেলে না হবে চৈতন্য
চিত্তশুদ্ধি হলে মানুষ হতে পারে ধন্য।
এই তো মুক্তির সুখ মোক্ষ যার নাম
চতুরাশ্রম রীতি ধন্য পুরে মনোস্কাম।
চরিত্র গঠন আগে ধর্ম তার পর
নহে পিছু হঠতে যে হবে গুণধর।

কি কাজ করিতে আছে হয় অগ্রগণ্য
সাধন শাস্ত্র মতে তবে বলি শোন।
হৃদয়ে হৃদয় নাথ অলক্ষ্যে দেখেন
তুমি খোঁজ স্বর্গ যেথা সেথায় আছেন।
হায় অন্ধ! অন্ধ তুমি অন্ধ কি জগৎ
সুপথ হইলে হারা, হারা সর্ব পথ।
পথের শেষেতে পথ মেলে মিথ্যা নয়
সেই পথের আদি অন্ত মিলে না যে তায়!
দিগ্‌ভ্রষ্ট নৌকাখানি অসীম পারাবার
এই মন্ত্র জপ মালা কর চিরন্তর।
শুভ নক্ষত্র শুভ গ্রহ বশিষ্ঠ পুরোহিত
হইল অশেষ দুঃখী সীতা যে বিদিত।
মনের সে সুখ শান্ত যদি আশা কর
রাগ হিংসা বিদ্বেষ আগে দূর কর।
শঠতায় না মিত্রতা, সম্পদ বিদ্যাদি,
সকল হয় নিষ্ঠাবান হতে পার যদি।
ঋণের শেষ শত্রুর শেষ কভু রেখো না
বিপদ বাড়ে তায় ভেবেই দেখ না।
অনবধান, বিশ্বাস, লোভ ত্যাগ করিবে
এ তিন নিষেধ সদা স্মরণে রাখিবে।
মহতের নীচু কার্য মহত্ত্ব বাড়ায়
গুরুর গুরু যে বিদ্যা, জানিবে নিশ্চয়।
সু-হীন কবিতায় ঘটনায় দেখা যায়
ধনবানে ধন দান বিষ্ঠা হবে তায়।
সমুদ্রের বারি দেখ নাহি প্রয়োজন
তাহাকে বারিদান হাসির সমান।
কর্কশ চঞ্চল মলিন বেশধারী
স্বয়ং আগত ব্রাহ্মণ ত্যাজ্য অহংকারী।
ললাটে লিখন যাহা দৈব কি করিবে
ঘটে তায় প্রাপ্ত হয়, অবশ্য জানিবে।
পরাধীন কর্মে যার জীবন ধারণ
বাঁচা মরা সমতুল্য বিষাদ কারণ।
শত্রুনাশ করি তুমি দেখাইবে বল
উপার্জনে পোষ্যগণে রাখ চিরকাল।
কূর্মপুরাণেতে আছে যুগ চতুঃষ্টয়

তপঃ যজ্ঞ জ্ঞান দান তার পরিচয়।
কৃতে ব্রহ্মা দ্বাপরে বিষ্ণু ত্রেতায় সূর্য হয়
কলি কালে মহেশ্বর রুদ্র পরিচয়।
অতএব কলি ধর্ম করিবে পালন
তবে তুমি হতে পার সুধীর সুজন।
বেদে বলে অষ্টাদশ বিদ্যা সার মীমাংসা
তাহার তাহার পর কবির জিজ্ঞাসা।
তর্ক শাস্ত্র পুরাণাদি শ্রৌত উপনিষদ
গায়ত্রী সবার শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের বিশদ।
গায়ত্রী হইল বেদ ব্রহ্মার জননী
গায়ত্রী জপিয়া শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র মুনি।
আত্মধর্ম লাভ হেতু মানব জীবন
আত্মা শুদ্ধ নির্মল সূক্ষ্ম সনাতন।
অন্তর্যামী আত্মা পুরুষ প্রাণ মহেশ্বর
সর্ব শাস্ত্র মান্য হয় নাই প্রকারান্তর।
তিনি কাশ অব্যক্ত বেদ স্বকীয় মায়ায়
বিশ্ব উৎপন্ন হয় তারই ইচ্ছায়।
প্রপঞ্চ ও পরমাত্মায় নাই সম্বন্ধ
জানায় আতপে যথা ভিন্ন-আবদ্ধ।
আত্মা হয় সূক্ষ্মরূপে বিক্ষয়ের ভোক্তা
অবিনাশী নিত্যবুদ্ধ সর্বত্র বিজ্ঞাতা।
অদ্বৈত, দ্বৈতভাব ঘুমে দেখা স্বপ্ন
অন্তঃকরণ জাত ভাব আত্মায় লিপ্ত না কখন।
আকাশ যেমন মলিন দেখো ধোঁয়ায
অহংভিন্ন সেই আমি সদা ব্রহ্মময়।
যোগে চিত্তের সমতা আনে সমতায় জ্ঞান
জ্ঞানের প্রবৃত্তি যোগ, যোগধর্ম আন।
স্বাথা স্বধাকার ষট্‌কার হন্দকার
চারটি স্তন আছে গাভী দেখ তার।
অন্তরীক্ষে পিতৃপুরুষের স্বধাকার
ঋষিগণ ষটাকার মানুষ হন্তকার।
পান করিতেছে সদা শুন অনিবার।
গার্হস্থ্যধর্ম হবে তোমার শুন হে কারণ
মদালসা বলেন। 'পুত্র অর্ক শ্রীমান'।
গার্হস্থ্য ধর্ম হেতু পৃথিবী পালন

সবাই তাকিয়ে আছে তাহার বদন।
অসুর পশু পাখি পোকামাকড় যত
মানুষাদি পূর্বপুরুষ ঋষি মুনি তত।
গৃহস্থ কামধেনু কল্পবৃক্ষ ওরে
সবার চাহিদা পূরণ যত করিবারে।
নিজের শরীর যথা যত্ন-আর্তি চায়
সেইমত দেবঋষি ভূত সমুদয়।
উপযুক্ত মতে সেবা কর বৎস তুমি
পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ মুখ চুমি।
স্নানের পরে পবিত্র ভাবে তর্পণ করিবে
চন্দন ধূপ ধুনায় দেবতা পূজিবে।
পূর্বে ইন্দ্র দক্ষিণে যম পশ্চিমে বরুণ
উত্তরে সোম, নিম্নে বসুমতী নাগগণ।
ঘরের দরজায় ধাতা আছেন বিধাতা
আর্য মা ঘরের বাহিরে সর্বথা।
আকাশের দিকে নিশচর সমুদয়
এইভাবে "সর্বাগ্রে বলি দিতে হয়"।
অতঃপর আচমন করিবে বিধি মতে
করিবে প্রণাম স্তুতি করি দণ্ডবতে।
জ্ঞানী গৃহ স্বামী যত এ মত আচারে
পালিবেন গৃহকর্ম ভূত ভবিষ্যৎ তরে।
একগ্রাস ভিক্ষানাম চার গ্রাস অগ্র
চার অগ্র 'হন্তকার, নামে জান শীঘ্র।
অতিথি খাওয়ার পর নিজ নিজ জাতি
বন্ধু প্রার্থী বিকল বাচ্চা বৃদ্ধ আতুর আর্তি।
নিঃস্ব বা দুঃখী লোক যদি খাবার চায়
উচিত খাবার দেওয়া খাবার দেওয়া সমর্থ কর তায়।
নিজের গোত্রের লোক মানি ধনী হয়
হিষ্যা ভাগী না হবে,—হবে পাপের উদয়।
অত্রিগুরু কহিলেন গৃহস্থের প্রতি
করিবে এ মতে সেবা যদি থাকে সম্পত্তি।
দেবতা পিতৃপুরুষ অতিথি বন্ধু সগোত্রে
গুরুর পূজা করি অন্ন দিবে পক্ষী ও ভূতে।
ভূত, পক্ষীদের ভাত দিতে হয় মাটিতে
মাংস ভাত শাক অন্ন যা থাকে বাড়িতে।

গৃহস্থের তিন কর্ম আছে যে বিদিত
নিত্য নৈমিত্তিক, নৈমিত্তিক ও নিত্য।
পাঁচ যজ্ঞ নিত্য কর্ম শুন দিয়া মন
নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ—পার্বণ।
সন্তান জন্মের পর যত কাজ আছে
নৈমিত্তিক কর্ম তাহা ভুলিও না পাছে।
অভীপ্সিত আরো যত যজ্ঞ কর্মে হয়
বাসনার নৈমিত্তিক কহিলাম তায়।
এই কর্ম করি গৃহী পায় দেখ মোক্ষ
ইহার প্রমাণ হিন্দু শাস্ত্র আছে সাক্ষ্য।
অতিগুরু কর্ম হল "নিত্য—নৈমিত্তিক"
বিশেষ ভাবের বার শ্রাদ্ধের ভিত্তিক।
চাঁদের ক্ষয়ের সময় নাম হল দর্শ
ইহাকেই সকলেই বলে অমাবস্যাহ।
নিত্য নৈমিত্তিক কথা করাতেই স্মরণ
নিয়ত অমাবস্যার উদয় যে কারণ!
অনুলেপ সম্বন্ধী আর নীচু কুলভুক্ত
পূর্বপুরুষ কিংবা যাদের অপমৃত্য
তাদের শ্রাদ্ধ বিধি শুনিলে আশ্চর্য।
মাটিতে ছড়াবে ভাত স্নান কাপড়ে বারিপাত
পায়ের জলে ফোঁটা পিণ্ডপাত্র তুলেতে
অবশিষ্ট পড়ে থাকে যেটা।
তাহাতে তৃপ্ত হয় পূর্বপুরুষ যারা
পচাভাত বাঁটার জলে মুক্তি পাবে তারা।
শিশু বয়স কিংবা অধিক সংস্কার ছাড়া
এই নিয়মেই শ্রাদ্ধ পাবে যে তারা।
তৃপ্ত হয় অন্যজাতে যাওয়া পিতৃপুরুষেরা।
বন্ধুরা শ্রাদ্ধ করে যে জল অন্ন দিয়া
তাহাতে তৃপ্ত হয় পিতৃপুরুষ হিয়া।
অতএব ভক্তি চিত্তে শাক অন্ন যথা
শ্রাদ্ধ দিবে পূর্বপুরুষের সঠিক বারতা।
খুব সৎ শ্রোত্রিয় যোগী জ্যেষ্ঠ সাম-গায়ক
ত্রিমধু ষড়ঙ্গ জানেন আর অগ্নির উপাসক।
আরো বহু গুণের যাহারা শরিক
কেবল যাজক যোগ্য কহিলাম ঠিক।

সর্বধর্ম সারধর্ম এবে কর জ্ঞান
শ্রাদ্ধ কর্মে যত ধর্মের নাই তার স্থান।
শ্রাদ্ধ কর্মে যদি তৃপ্ত রুদ্রগ্রহাদি
সন্তুষ্ট পিতৃপুরুষ হলে বসু আদিত্যাদি।
আয়ু, জ্ঞান, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ, আর
অবশ্য পারেন দিতে রাজ্য অধিকার।
কাম্য শ্রাদ্ধ যথাযথ অনুধাবন করিয়া
করিবে যাপন যথা সঠিক বুঝিয়া।
সারা বৎসর শ্রাদ্ধক্রিয়া করিতে যে পার
তাহাতে যে ফল ফলে একবার যাত্রা কর।
অমাবস্যা পূর্ণিমা সাতাইশ নক্ষত্র জুড়ে
চতুর্দশী মোর তিথি যত তার পরে।
"দেব ঋষি ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, হুতাশন"
পিতৃ কর্মের অধিকারী শুনন সুধীজন।
একটা ছাড়িয়া অন্য লাগিবে যে ধাঁধা।
প্রতিদিন আর যত চার ভাগ করিবে
তাহার অর্ধেক তোমার নিজের হইবে।
অপর দুই অংশ থাকে একভাগ পরের
অপর ভাগ যাহা অবশ্য ধর্মের।
এই রূপে জীবনধারণ দুই ধর্ম লাগি
কাম্য ধর্ম, নিষ্কাম ধর্মের হইবে যে ভাগী।
এই কাল পরকাল সুখের আগার
এইভাবে করিবে ধর্মে এই সংসার।
গার্হস্থ্য ধর্মের চেয়ে নাই কোনো ধর্ম
সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম কহিলাম মর্ম।
সংসার ধর্ম হইবে করিতে পালন
নিষেধ কর্ম কিছু রাখিবে স্মরণ।
গুরু যদি করি করে চাহে তব মন
দেবতার সেবার নাহি কোনো প্রয়োজন।
সেই গুরু মিলিবে না কি কহিব আর
সে গুরু কোথায় তোমায় করিলে উদ্ধার।
অতএব আগুন জল ধরতে যাবে না
অব্যর্থ অমোঘ বাণী কভু ভুলিবে না।
দু-হাতে অঞ্জলি ভরি জল খাইবে না
যে গাভী দুধ দেয় তার বৎসে তাকে ডাকিবে না

মুখ দিয়া আগুন নিভাইবে না কভু
অম্ল বেশি, মল ত্যাগ শৌচ শীঘ্র তবু।
ধনী নদী বৈদ্য শত্রু জয়ী রাজা
থাকেন যেথা থাক হয়ে তাঁর প্রজা।
আর এক গুরু কথা কহিব তোমায়
উৎসবে মাতিয়া করে অশুভ শোভন
অতি নণযা ব্যভিচার করিবে গোপন।
উজানেতে নৌকা চলে লাগে বড়ো ধাঁধা
তার চেয়ে সঙ্ঘ দলমত সেথায় সাধা।
হয় নয় কভু নয় তবু হয়ে যাবে
সুখের আগার খুঁজে একটি নাহি পাবে।
বাসি খাবার, পুরাতন ঘি, ছানা ইত্যাদি
গ্রাম্য শূকর মোরগমুরগি পশু যদি।
খাইবে না নিষেধ সদা স্বাস্থ্যের কারণ
যেমন বিকাল বেলা বাগানে যাওয়া বারণ।
ঘোড়া ছাগলের মুখ শুদ্ধ জানা যায়
তেমন গো-মল মূত্র পাখির বিষ্ঠা হয়।
আসন, বিছানা, নৌকা পথের ঘাস
চন্দ্র-সূর্য কিরণ আর মুক্ত বাতাস।
না জেনে যদি খাও অখাদ্য অপবিত্র
তিনদিন উপবাস থাকিলে পবিত্র।
আর যদি জেনে শুনে কর এমন কাজ
প্রায়শ্চিত্ত তাহার বিধি, না করিবে ব্যজ।
অশুচি হয় মানুষ ঋতুমতী দর্শনে
নপুংসক, চণ্ডাল, মরা সর্পদর্শনে।
করিলে সূর্য দর্শন শুদ্ধ হইবে তাব।
জন্মে—মরণে—অশৌচ ব্রাহ্মণের দশ
ক্ষত্রিয়ের বার বৈশ্যের পণের শূদ্রের ত্রিদশ।

শ্রাদ্ধবিধি "একাহাত শুদ্ধতে প্রিয় অগ্নি বেদ সমন্বিতব্রাহ্মণ—এাহ্যত কেবল বেদমন্ত্র, বিহীনো দশভি দিনৈদের ঃ

সগোত্রীয় মৃতদেহ দাহ করে যারা
চার সাত নয় দিনে জল দিবে তারা।
চার দিনে সংগ্রহ করিবে ছাই, অস্থি যথা
করিবে গায়েতে স্পর্শ উচিত এই কথা।
মৃত্যুর দিন যারা পিণ্ডদান করে, মুখে দেয় জল

বিহিত তাদের জেনো সগোত্র সকল।
অস্ত্র, আগুন, জলে, বিষে—তাদের একদিন
মরিলে সগোত্র হইবে অবশ্য মলিন।
সৎ কাজ তাকে বলে জেনে রাখ ভাই
যে কাজের কোনো কিছু গোপন করার নাই।
বালক আশ্রমবাসী বিদেশে বাসি হলে
শেষ হয়ে যায় অশৌচ সঙ্গে সঙ্গে বলে।

অশৌচ বিধি সম্পর্কে গরুড় পুরাণ কি বলেছে তা তুলে ধরলাম এখানে। এ থেকে প্রচলিত পথ কত প্রভেদ দেখতে পাবেন, যথা—

পূর্ব খণ্ডম ৯৩ অধ্যায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ব্রাহ্মণ এই চারি প্রকার জাতি আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত জাতি দ্বিজ সংজ্ঞা। ইহারা নিষেক হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত সমস্ত কর্মই স-মন্ত্রক করিবে। ১। গর্ভাধান ২। পুংসবন ৩। স্ত্রীমনোত ৪। জাত কর্ম ৫। নামকরণ ৬। নিষ্ক্রমণ ৭। অন্নপ্রাণ ৮। চূড়াকরণ করবে।

স্ত্রীগণ অ-মন্ত্রক কার্য করবে। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—মনু, বিষ্ণু, যম, অঙ্গিরা, বলিষ্ঠ, দক্ষ, সম্বর্ত, শাতাতপ, পরাশার, আপস্তম্ব, উশনা, ব্যাস, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, গৌতম, শঙ্খ লিখিত হারীত, আর্ত্র আমরা ধর্মবক্তা, এরা সকলেই বিষ্ণুর ন্যায় সেবনীয়।

১০৭ অধ্যায় পূর্ব খণ্ডমে আছে পরাশর স্বয়ং ব্যাসকে বলেছিলেন—

ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ প্রেতাশৌচ ও জননাশৌচ তিন দিনে শুদ্ধিলাভ করবে। ব্রহ্মবিৎ ক্ষত্রিয় দশ দিনে ব্রহ্মধি বৈশ্য দ্বাদশ দিনে, শূদ্র এক মাসে শুদ্ধিলাভ করবেন।

কেবল জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ ১০, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে জাতি মাত্র বৈশ্য ১৫ দিনে এবং শূদ্র এক মাসেতে শুদ্ধ হবে উল্লেখ আছে।

ত্রিরাত্র অশৌচ কথা কেহ কেহ বলে
এই কথার অর্থ কর নিজেরা সকলে।
জন্ম অশৌচ ক্রিয়া মরণে অশৌচ
এক হতে অন্য যদি হয় আগন্তুক।
প্রথম অশৌচ ধরি করিবেক ক্রিয়া
অনুরূপ ক্রিয়া কর জন্ম মৃত্যু দিয়া।
খেয়ে পরে জীবন ধারণ নহে মাত্র কাম্য
আত্মজ্ঞান লাভ করে ঈশ্বরকে জানাই ধর্ম।
মানুষের জীবনই ধর্মময় যে জানিবে
অজ্ঞানতাই মমতার বৃক্ষটি জানিবে।
জ্ঞান কুঠার, সৎ সঙ্গ, সমতা বৃক্ষের ছেদন
করিতে পারিলে পাবে ঈশ্বর দর্শন।
সেই পথের দোষ ঢাকা প্রাণায়ামে জানা
টাকাপয়সা ছাড়া পাবে পারের ধারণা।

নাস্তিকতা নাশ কর ধ্যানমগ্ন হয়ে
যেমন ধাতু নষ্ট হয় আগুনে পুড়লেয

প্রাণায়াম—কী এবং কেমন?

প্রাণ অপান বায়ু কর বন্ধ এবে
ইহা যে তিন রকম লঘু উত্তরীয় মধ্য হবে।
বারো মাত্রা লঘু কহে এর দ্বিগুণ মধ্য।
প্রথম মাত্রায় ঘাম দ্বিতীয়ে কাঁপুনি, ঘাম।
তৃতীয় প্রাণায়ামের দুঃখ দূর হয় জানি।
বাঘ-হাতি সিংহ হয় প্রাণায়াম শিষ্য
যোগী ঋষি ইহা বলেন বুঝিবে অবশ্য।
চেষ্টা কর দম বন্ধ করিয়া একবার
মর্ম সে বুঝিতেই নাই কোনোই ব্যাপার।
অধিক ব্যাখ্যা দিতে গেলে হয় আধোমুখী
প্রাণায়াম মুক্তি মুক্ত আরো বহু মুখী।
ধ্বস্তি, প্রাপ্তি, সম্বিৎ ও আছে প্রসাদ।
কাজের শেষে মনের অশান্তি চলে যায়
চন্দ্র সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রের জ্ঞান জন্মে তায়।
পরে সবজান্তা হয়ে হয় যোগীবর
লোভ মোহ সর্বকাম জয় করে হয় "প্রাপ্তি" ধর।
অতঃপর সম্বিৎ আগে-আত্মার প্রসাদ
যোগী মানে সবজান্তা.শুন মতবাদ।
এত সময় কিছু কথা তাহার সোপান
সুশীল সংক্ষেপে দিল তাহারই বিধান।
অর্জুনকে কৃষ্ণ বলেন যোগী হও তুমি
জানিবে নিশ্চিত কে আমি। তুমি।
অ—উ—ম সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক
তিন মাত্রার ঊর্ধ্বে আধমাত্রা কেবল যৌগিক।

ওঁ এখানেতে যোগী ছাড়া কেহ নাই

এই গান্ধার নামক স্তর। এই মাত্রার গতি পিপঁড়ার মতো সঙ্কিল। সুষুম্না দ্বারা কুণ্ডলিনী যখন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে (কূটস্থ চৈতন্য ভেদ করে) তখন ব্রহ্মময় হয়ে যায়।

ষড়্ যোগে-সুন্দরভাবে বোঝানো আছে এই তত্ত্ব।

আ—পৃথিবী, উ—অন্তরীক্ষ, ম—স্বর্গ।

ভারতীয় দর্শনের দুটি ভাগ দেখা যায়।
চিরসুখ মোক্ষনাম অপর দুঃখময়।
কপিল, বৈশেষিক গৌতম কণাদ

তাঁহারা চান দুঃখের নিবৃত্তি
এতে নাই কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ।
জৈমিনি—ব্যাস গুরুশিষ্য একমত হন
দুঃখের লেশমাত্র দেখিতে না চাওয়া।
আত্যন্তিক সুখ যাতে সেই মোক্ষ নাম
দুই চূড়ামণি করেন শাস্ত্রের সংগ্রাম।
জৈমিনীর পূর্ব মীমাংসা ধর্মের সহায়
এখানে তারই কিছু দিচ্ছি পরিচয়।
বেদ আছে তিন কাণ্ডে বিভক্ত জানিবে
কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড আরণ্যক বুঝিবে।
কর্মকাণ্ড যাহা আছে ধর্মের মাঝে ভুক্ত ;
দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে সেই সকল তত্ত্ব।
ধর্মের কি প্রমাণ আছে ?
জৈমিনি বলেন আছে (না লক্ষণো—হর্থো জানি-ধর্ম)।

এর মানে আপ্তি বিপরীত—শ্রেয়স্কর বা বিধি—বাক্য; যাহা অনর্থ বিপরীত বা শ্রেয়স্কর বা ইষ্ট তাই ধর্ম।

প্রায়শ্চিত্ত কী? যে সকল কার্য কেবল পাপক্ষয়ের জন্য বিহিত।

উপাসনা কী? শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন।

শাণ্ডিল্য বিদ্যায় জানা যায়—উপাসনার বিষয়সমূহ।

উপাসনা দ্বারা আত্মাকে জানা যায়। এবং সেই পরমাত্মা এই জীবাত্মা জানতে পারা যায়।

জগৎ—সপ্তদশ অবয়বে উপেত। এবং চতুর্থ স্থূল শরীরেই জগৎ বিরাজিত।

স্থূল শরীর = অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ।

স্থূল শরীরকে লিঙ্গ শরীর বলে। শিবলিঙ্গ পূজা সেই প্রতীক।

বুদ্ধি ও মনের বিত্তি হল = চিত্ত, অহংকার ও সংকল্প।

সপ্তদশ অবয়ব কী?

পাঁচ কর্মে ইন্দ্রিয়, পাঁচ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ প্রাণবায়ু, বুদ্ধি ও মন। ১৭

তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় কী?

শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন তত্ত্বের বিষয়। সংক্ষেপে-স্থূল শরীরই আত্মা।

তত্ত্বমতের বিষয় অন্য মতগুলি	= ইন্দ্রিয়ই আত্মা
মন	= ইন্দ্রিয়ই আত্মা
বুদ্ধি	= ইন্দ্রিয়ই আত্মা
বিজ্ঞান	= ইন্দ্রিয়ই আত্মা
অজ্ঞান	= ইন্দ্রিয়ই আত্মা
শূন্য	= ইন্দ্রিয়ই আত্মা
অজ্ঞান ও চৈতন্য	= ইন্দ্রিয়ই আত্মা

= যাহা পর পর লেখা হল তাহাব সমাধানের পথই তত্ত্ব। এই ইন্দ্রিয হতে অজ্ঞান ও চৈতন্য পর্যন্ত ইত্যাদি বিষয়ের সমাধনই তত্ত্ব কথার বিষয। সিদ্ধান্ত ঃ শুদ্ধ—সত্ত্ব—বুদ্ধ—চৈতন্যই আত্মা। আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মাই জগৎ। এইরূপ ভাবে একম্‌ব্রহ্ম মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চারিটি বেদ ইহাকে স্বীকার করেছে। যত বিরোধ তত্ত্বে, মূলে নয়। অতএব তত্ত্ব আদৌ বিকৃত নয়। **ধর্ম মানে কী পণ্ডিতের লড়াই?** না হতে পারে না। এর পিছনে যে কারণ থাকে তা থেকেই সমাধান হতে হয় বা হতে হবে।

আমাদের পুরাণগুলিতে ব্যাসদেবের ছড়াছড়ি। অতএব কালিদাস ঠিকই বলেছেন—এইসব অসূয়া ব্যাপার !

‘সধর্মে নিধনম্ শ্রেযঃ পরঃ ধর্মে ভয়াবহ।’

এই পথেই কলির গতি ও মতি। (ভয়াবহ) এই যখন পুরাণ বলেছে—ইহা আধুনিক মত (যদিও পুরাণ)। কিন্তু ! সংহিতা বহু প্রাচীন। জগতের জীবকুল, সংহিতা পরাশব মতেই চলবে—সিদ্ধান্তশাস্ত্রের। অতএব “হিন্দু ধর্মের” ইহাই শাস্ত্র, ইহাই পথ, মত ও গতি।

তত্ত্ব! ব্রহ্মের মীমাংসা?

“মীমাংসা? বেদান্ত মতে—অনুভব সিদ্ধ।”

পৃথিবীতে জলে, জলভূত তেজে।

তেজভূত—বায়ুতে, বায়ুভূত-আকাশে।

আকাশভূত—অজ্ঞানে।

তখন অজ্ঞানোপাহিত—চিদাত্মা মাত্রাবিশিষ্ট থাকেন মাত্র। শুদ্ধ—সত্ত্ব—বুদ্ধ—চৈতন্যই হল আত্মা।

“হরি নাম সংকীর্তন—যাহা এইমতো করা যায় যুগধর্ম মেনে—। যেমন—

হরে ববম্ ববম্ বম্ হরে হরে
হরে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম হরে
হরে ভবকাণ্ডারী ভবেরকাণ্ডারী
পারের কাণ্ডারী হরে হরে।

প্রচলিত নাম এই রূপে হওয়াই উচিত বলে আমি মনে কবি। কেন না বিনা প্রয়োজনে বেদান্ত মতে তাই বলতে হয়। জগতে কেহ কোনো কিছুই করেন না।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে ভব কাণ্ডারী ভব কাণ্ডারী
পারের কাণ্ডারী হরে!

তমসো মা জ্যোতির্গময়।

যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি ঃ

বেদও উপনিষদ সমূহ।

দর্শনসমূহ ও বেদান্ত-অনুবন্ধ।

পুরাণসমূহ।

মহাভারত ; রামায়ণ ; ভাগবত।

চৈতন্যচরিতামৃতম্ ও রামচরিতমানস।

বিদ্যাসাগর রচনাবলী।

হিন্দুশাস্ত্র ; পন্থাপথীয় ; ধর্মরহস্য

একান্ন পীঠ, মাতৃতত্ত্ব।

"আর্য জাতির অস্তিত্ব ছিল না"

পরমেশ চৌধুরী লিখিত

রামসুখ দাস গীতারত্নর মধুগীতা ইত্যাদি।

প্রভাস খণ্ড ও দণ্ডীপর্ব।

অধ্যাত্মগীতা—গুরুগীতা ; বিবেকনন্দ ভারত প্রত্যাবর্তন ; রাজা রামমোহন রচনাবলী ; শংকরাচার্য জীবনী ;

নৃবিজ্ঞান ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

নন্দন তত্ত্ব ; সাংখ্য কণ্ঠহার ; প্রেমচন্দ্রিকা ;

যোগশাস্ত্র ; অদ্ভুত রামায়ণ। গুরুমুখী মহাভারত ; চাণক্য ; বরাহ—বৃহৎসংহিতা ; কালিদাস ; অরণ্যের অধিকার ; চট্টী মুণ্ডার তীর ; গীতগোবিন্দম্— জয়দেব ; গীতা দর্শনম (রামসুখদাসজি) ; যোগাবাশিষ্ঠ রামায়ণ ; পাঞ্চরাত্র ; রাজতরঙ্গিণী ; মনু ; পরাশর ; আপস্তম্ভ ; এবং অন্যান্য সংহিতাসমূহ।